ইতিহাসের আলোকে দেশ বিভাগ ও কায়েদে আযম জিন্নাহ

এম. এ. মোহাইমেন

ইতিহাসের আলোকে দেশ বিভাগ
ও
কায়েদে আযম জিন্নাহ

এম. এ. মোহাইমেন

পাইওনিয়ার পাবলিকেশন্স

www.amarboi.org

ইতিহাসের আলোকে দেশ বিভাগ ও কায়েদে আযম জিন্নাহ

লেখক ও প্রকাশক
এম এ মোহাইমেন

লেখক কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত

প্রথম প্রকাশ
মাঘ, ১৪০০ সাল
ফেব্রুয়ারী, ১৯৯৪ইং

প্রচ্ছদ
কে, জি, মুস্তাফা

মুদ্রণ
দি পাইওনিয়ার প্রিন্টিং প্রেস লিঃ

পরিবেশক
পাইওনিয়ার পাবলিকেশনস্
২৮/১, টয়েনবি সার্কুলার রোড
মতিঝিল বা/এ, ঢাকা-১০০০
ফোন ঃ ২৩১৫৯১, ২৩৪১৪৩

মূল্য ঃ ১২৫.০০ টাকা

Itehaser Aloke Desh Bibhag-O-Quaide-e-Azam Jinnah
By- M. A. Mohaimen. Printed by The Pioneer Printing Press Ltd.
Dhaka-1000, Bangladesh Price Taka 125.00 US $ 5.00

www.amarboi.org

উৎসর্গ

একজন অনন্য শিক্ষাবিদ, মানুষ গড়াই ছিল যাঁর জীবনের একমাত্র লক্ষ্য, ভাল ছাত্র ক্লাশে দেখলে বাসায় ডেকে এনে বিনা পয়সায় প্রাইভেট পড়াতেন, চা-মুড়ি খাওয়াতেন, অন্যায়ের কাছে কোনদিন মাথা নত করেননি, আমার সেই শ্রদ্ধেয় পিতা মরহুম জনাব আবদুল মতিন বি, এ, বি, টি, সাহেবের স্মৃতি ও বর্তমান প্রজন্মের উদ্দেশ্যে বইটি উৎসর্গিত।

এম এ মোহাইমেন

www.amarboi.org

আমার কথা

আলাপচারিতায় দেখা যায় বর্তমান প্রজন্মের যুবকেরা তাদের অতীত সম্বন্ধে প্রায় কিছুই জানেনা। দেশ বিভাগের প্রথমাবধি বামপন্থী বুদ্ধিজীবিদের নিরুদ্ধ প্রচারণায় তাদের মন এমনভাবে বিষিয়ে দেওয়া হয়েছিল যে, তাদের পূর্বপুরুষ যাদের অবদানে তারা আজ বাংলাদেশ নামক একটি স্বাধীন রাষ্ট্রের মালিক হয়েছে তাদের সম্বন্ধে জানবারও কোন আগ্রহবোধ বর্তমান প্রজন্মের যুবকদের মধ্যে দেখা যাচ্ছেনা। অধিকাংশ যুবককে তাদের অতীত সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলে দেখা যাবে ১৯৫২ সনের ভাষা আন্দোলনের পূর্বের কাহিনী তারা প্রায় কিছুই জানে না।

যে জাতি তার অতীত সমন্ধে কিছুই জানেনা, তাদের মহান পূর্বসূরীদের অবদান, ঐতিহ্য, আত্মত্যাগ সম্বন্ধে সম্পূর্ণ অজ্ঞ তারা শিকড়হীন বৃক্ষের মত। মাটির সঙ্গে সম্পর্কশুন্য। এদের কোন মহৎ আদর্শ চিন্তা বা লক্ষ্য কিছুই থাকেনা। কোন মহৎ কাজ এদের দ্বারা কখনও সম্ভব হয়না।

তাই এদেরকে অতীত সম্পর্কে সচেতন সজাগ ও পরিচিত করে তোলার জন্য আমি **"ইতিহাসের আলোকে দেশ বিভাগ ও কায়েদে আযম জিন্নাহ"** বইটি লেখার সিদ্ধান্ত নিয়েছি যাতে দেশ বিভাগের পরবর্তী প্রায় অর্ধশতাব্দিকাল যাবৎ বিরুদ্ধ প্রচারণার শিকার আমাদের যুব সম্প্রদায় জানতে পারে কায়েদে আজম মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ কত বড় বিরাট ব্যক্তিত্বসম্পন্ন পুরুষ ছিলেন-আজকে যে তারা অখন্ড ভারতের হিংস্র ব্রাহ্মন্যবাদের হাত থেকে রেহাই পেয়ে একটি স্বাধীন রাষ্ট্রে নিরাপদ জীবনযাপন করতে সক্ষম হচ্ছে এ ব্যপারে তাঁর অবদান কতখানি রয়েছে। আমার লেখা এই বই বর্তমান যুব সমাজের একটি অংশকেও মোহমুক্ত করে যদি জিন্নাহর ভূমিকার প্রতি শ্রদ্ধাশীল করে তুলতে পারে তবে আমি আমার শ্রমকে স্বার্থক মনে করব।

এম এ মোহাইমেন

www.amarboi.org

কৃতজ্ঞতা স্বীকার

'ইতিহাসের আলোকে দেশ বিভাগ ও কায়েদে আযম জিন্নাহ' বইটি লেখার ব্যাপারে আমি বিদেশী বহু লেখকের বইয়ের সাহায্য নিয়েছি। এগুলো হলঃ 'Jinnah Creator of Pakistan' by Hector Bolitho, 'Legend and Reality,' by H. M. Seerval, Attorney General of Moharastra for 17 years, রাজমোহন গান্ধীর 'দি মুসলিম মাইন্ড' এবং সর্বশেষে আমি প্রচুরভাবে সাহায্য নিয়েছি কলকাতা থেকে প্রকাশিত শৈলেশ চট্টোপাধ্যায়ের 'জিন্নাহ-পাকিস্তান-নতুন ভাবনা' বইটি থেকে। উপরোল্লেখিত বইগুলি থেকে আমি যে শুধু তথ্য নিয়েছি তাই নয় অনেক ক্ষেত্রে এই বইগুলি থেকে আমি বিভিন্ন ক্ষেত্রে প্রচুর উদ্বৃতিও দিয়েছি। উক্ত বইগুলির লেখকদের কাছে তাই আমি জানাই আমার আন্তরিক কৃতজ্ঞতা। এ ছাড়া উলপার্ট, রামগোপাল প্রভৃতির বই থেকেও আমি কিছু কিছু উদ্বৃতি দিয়েছি যার জন্য তাঁদের কাছেও আমি কৃতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ।

বইটি লেখার ব্যাপারে অনেকেই আমাকে অনেক ভাবে সাহায্য করেছেন। প্রুফ দেখে, শ্রুতিলিখনে সাহায্য করে অনেকে আমাকে সহায়তা করেছেন। তার মধ্যে মোজাম্মেল হক মজুমদার ও মুসা আখন্দ-এর নাম উল্লেখযোগ্য। বইটি সম্পাদনার ব্যাপারে ই, বিল্লাহ চৌধুরী সাহেবও আমাকে যথেষ্ট সাহায্য করেছেন। এ ছাড়া আরও বহু ব্যক্তি আমাকে উৎসাহ ও অনুপ্রেরণা যুগিয়েছেন বইটি যথা শীঘ্র ছেপে বের করার জন্য।

জনাব রোস্তম আলী সাহেব, অবসরপ্রাপ্ত ইন্সপেক্টর অব রেজিস্ট্রেশন, আমাকে হেক্টর বলিথোর ও এইচ, এম, সিরভাই-এর এই অমূল্য বই দু'টি সরবরাহ করে আলোচ্য বইটি লেখার ব্যাপারে প্রভূতভাবে সাহায্য করেছেন। তাঁর কাছে এ জন্য আমি আজীবন কৃতজ্ঞ থাকব।

বইটির প্রচ্ছদ এঁকেছেন প্রখ্যাত শিল্পী জনাব কে, জি, মুস্তাফা। তিনি অল্প সময়ে একটি সুন্দর প্রচ্ছদ এঁকে আমাকে বিশেষ কৃতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ করেছেন। আমি তাঁর ঋণ অপরিশোধ্য মনে করি।

সবশেষে কম্পিউটার অপারেটর মোহাম্মদ নাছিরুল হক শারীরিক অসুস্থতা সত্ত্বেও যথাশীঘ্র কম্পোজের কাজ শেষ করে বিশেষভাবে উপকৃত করেছেন যার জন্য তাকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

এম এ মোহাইমেন

www.amarboi.org

ভূমিকা

সমগ্র পাক ভারত উপমহাদেশে জিন্নাহ্ সাহেব এক বহুল আলোচিত ব্যক্তি এই উপমহাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামে তাঁর ভূমিকা ছিল অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। পাকিস্তানে যেখানে তিনি জাতির জনক হিসাবে পূঁজিত, ভারত ও বর্তমান বাংলাদেশে তিনি একজন বহুল বিতর্কিত ব্যক্তি। ভারতবাসী তাঁকে মুসলিম বিচ্ছিন্নতাবাদের প্রবলতম প্রবক্তা ও ভারত বিভাজনের কারণ মনে করে। এই বাদ প্রতিবাদের কুয়াশার অন্তরালে জিন্নাহর আসল ভূমিকা কি ছিল তা নিয়ে এই উপমহাদেশের সর্বত্র আজ নূতনভাবে গবেষণা ও মূল্যায়নের প্রবণতা পরিলক্ষিত হচ্ছে। এতকাল ভারতবাসীর দৃঢ় ধারণা ছিল ভারত বিভক্তির জন্য জিন্নাহ সাহেবই এককভাবে দায়ী। কিন্তু গত দু'দশক ধরে ভারতের বিভিন্ন পত্র পত্রিকায় যে সব তথ্য প্রকাশিত হয়েছে বিশেষতঃ মাওলানা আবুল কালাম আজাদের "ইন্ডিয়া উইন্‌স ফ্রিডম" বইটি প্রকাশের পর এটা পরিষ্কারভাবে প্রমাণিত হয়েছে যে ভারত বিভক্তির জন্য জিন্নাহ সাহেব মোটেই দায়ী নন। ক্যাবিনেট মিশন প্লান গ্রহণ করে তিনি ভারতকে এক রাষ্ট্র রাখতে স্বীকৃত হয়েছিলেন কিন্তু জওহরলাল নেহরু গান্ধী প্যাটেল প্রভৃতি লর্ড মাউন্টব্যাটেনের সহযোগিতায় ভারতকে বিভক্ত করে ফেলেছিল যখন তাঁরা মাউন্টব্যাটেনের কাছ থেকে আশ্বাস পেল পাঞ্জাব ও বাংলাদেশ ভাগ করে দেয়া হবে। উপরন্তু আসামকেও পূর্ব পাকিস্তান থেকে বিচ্ছিন্ন করে ভারতকে দিয়ে দেয়া হবে তখন ভারতের বৃহত্তর অংশের মালিক হওয়ার লোভে কংগ্রেস নেতারা ভারত বিভাজনে সম্মত হয়ে গেলেন।

গত দুই দশক ধরে এসব তথ্য উদঘাটিত হওয়ার পর আজ ভারতের সর্বত্র জিন্নাহ্ সাহেবের পুনঃ মূল্যায়ন আরম্ভ হয়েছে। ভারত বিভক্তির ফলে পাঞ্জাব ও ভারতের বিভিন্ন অংশে যে মর্মান্তিক হিন্দু-মুসলিম দাঙ্গা সংঘঠিত হয়ে লক্ষ লক্ষ লোক নিহত ও উদ্বাস্তু হয়েছিল তার জন্য জিন্নাহ্ সাহেবকে দায়ী করে ভারতে তাঁর প্রতি যে বৈরী মনোভাব সৃষ্টি হয়েছিল আজ সে মনোভাবের অনেকখানি পরিবর্তন ঘটেছে। একদা কংগ্রেস নেতা দাদা ভাই নওরজীর সচিব গোপাল কৃষ্ণ গোখলে, সরোজিনী নাইডু কর্তৃক হিন্দু মুসলিম ঐক্যের রাজদূতরূপে অভিনন্দিত-১৯২৩ সন পর্যন্ত কংগ্রেসের প্রথম সারির নেতা জিন্নাহ্ কেন কংগ্রেস ত্যাগ করে শেষ পর্যন্ত মুসলিম লীগের কর্ণধার হয়ে পাকিস্তান প্রতিষ্ঠায় আত্মনিয়োগ করেছিলেন এসব তথ্য জানার পর ভারতের বর্তমান যুবসমাজ জিন্নাহ সাহেবকে অনেকটা শ্রদ্ধার চোখে দেখতে আরম্ভ করেছে।

www.amarboi.org

দুর্ভাগ্যক্রমে ভারত বিভাগের পর পাকিস্তানের পূর্বাঞ্চলে বেশ কিছু বুদ্ধিজীবী ভারত বিভাগের জন্য জিন্নাহ সাহেবই দায়ী এ মতবাদ প্রচার করে জিন্নাহ সাহেবকে বাঙ্গালী মুসলমান যুব সমাজের কাছে হেয় প্রতিপন্ন করে তাঁর ভাবমূর্তি নষ্ট করার অপপ্রয়াসে যত্নবান হন। পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার জন্মলগ্ন থেকে পশ্চিম পাকিস্তান কর্তৃক পূর্ব-পাকিস্তানের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক শোষণের ফলে পশ্চিম পাকিস্তানের প্রতি পূর্ব-পাকিস্তানীদের যে বৈরী মনোভাব গড়ে উঠেছিল তার অসহায় শিকার হয়েছিলেন জিন্নাহ সাহেব। এখানকার অধিকাংশ বুদ্ধিজীবী জিন্নাহ সাহেবকে সংকীর্ণমনা, সাম্প্রদায়িক, পশ্চিম পাকিস্তানের স্বার্থ রক্ষার প্রতিভূ হিসাবে চিত্রিত করে এদেশের যুব সমাজের কাছে তাঁর ভাবমূর্তি নষ্ট করার চেষ্টা চালিয়ে যান। পাকিস্তানের প্রথম জাতীয় পরিষদে জিন্নাহ্ সাহেব যে ভাষণ দেন তাতে দ্ব্যর্থহীন কণ্ঠে তিনি ঘোষণা করেন "আজ থেকে পাকিস্তানের অধিবাসীদের হিন্দু, মুসলিম, বৌদ্ধ, খৃষ্টান বলে আলাদা কোন পরিচয় থাকবেনা। তাদের পরিচয় হবে, তাঁরা পাকিস্তানী। তাদের আলাদা কোন স্বত্ত্বা থাকবেনা। তারা সবাই মিলে হবে এক পাকিস্তানী জাতি।' এই ভাষণ থেকে পরিষ্কার প্রতীয়মান হয় জিন্নাহ্ সাহেব পাকিস্তানকে ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্ররূপে কল্পনা করেছিলেন, যে রাষ্ট্রে কেউ কাউকে শোষণ করতে পারবেনা, আইনের চোখে সবার হবে সমান অধিকার। উপরোক্ত ভাষণ থেকে পরিষ্কার প্রমাণ হয় জিন্নাহ্ সাহেব মোটেও সাম্প্রদায়িক ছিলেন না, তিনি ছিলেন অত্যন্ত উদার মনের গণতান্ত্রিক চেতনা সম্পন্ন মানুষ। ধর্মীয় গোঁড়ামী তাঁর মোটেই ছিল না। তিনি যে সম্পূর্ণ অসাম্প্রদায়িক এবং রাজনীতিতে ধর্মকে টেনে আনার সম্পূর্ণ বিরোধী ছিলেন এটার প্রমাণ পাওয়া যায় বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ এ. এল. ব্যানার্জি রচিত 'All India University essays and letters' গ্রন্থ থেকে। তিনি লিখেছেন 'In those days he was a member of the Congress' and inspite of his comparative youth he was looked upon with respect by politicians much older in age and influence. He was far above all communal bias and he belived that if India had to be liberated it must be by the joint efforts of the Hindus and the Muslims; All those years his dream was the establishment of a united India where questions of religion must not be allowed to influence political life in any way. He held sternly aloof from the Muslim League of those days and he passionately pleaded for national unity. But gradually he abandoned this hope and dream of those years. The change came with the advent of Gandhiji in Indian politics. For Gandhiji's whole creed was basically Hindu : when he spoke of the past he remembered the nebulous glories of

www.amarboi.org

'Rama-Rajya' Gandhiji's outlook on life was almost mediaeral, Jinnah was strikingly modern. He liked parliamentary democracy and if the Congress had abandoned Gandhism and had followed the path indicated by deshbandhu C. R. Das, there is no doubt that Jinnah would have gladly aligned himself with it"

কিন্তু দুঃখের বিষয় আমাদের দেশে অধিকাংশ বুদ্ধিজীবী অতীত ইতিহাস সম্পর্কে অজ্ঞতার কারণে অথবা সংকীর্ণ স্বার্থসিদ্ধির উদ্দেশ্যে জিন্নাহ সাহেবকে সংকীর্ণমনা সাম্প্রদায়িক অগণতান্ত্রিক মনোভাব সম্পন্ন ইংরেজের পদলেহী চাটুকার বলে চিত্রিত করে প্রথমাবধি এদেশের যুব সমাজের কাছে অগ্রহণীয় করে তোলার প্রয়াস পাচ্ছিলেন। মনে হয় সমগ্র প্রচারটাই ছিল উদ্দেশ্যমূলক, পাকিস্তানের জনকের প্রতি ঘৃণার সৃষ্টি করে পাকিস্তানকে দুর্বল করে ফেলা। পাকিস্তানের আন্দোলনের সাথে যাঁরা সক্রিয় ভাবে জড়িত ছিলেন তাঁদের প্রতি ঘৃণা সৃষ্টি করা। জিন্নাহ সাহেবের মৃত্যুর পর পাকিস্তানের রাজনীতিতে যে পরিবর্তন আসে পশ্চিম পাকিস্তানের রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ সামরিক গোষ্ঠির সাহায্যে পূর্ব পাকিস্তানকে শোষণ করার যে হীন চক্রান্ত আরম্ভ করে তাঁর সঙ্গে জিন্নাহ সাহেবের কোন সম্পর্কই ছিল না। পশ্চিম পাকিস্তানের এ শোষণ প্রক্রিয়ার কারণে পূর্ব পাকিস্তানের জনমনে যে ঘৃণা ও শত্রুতামূলক মনোভাবের সৃষ্টি হয় তাঁর উৎপত্তির সঙ্গে জিন্নাহ সাহেবকে জড়িয়ে ভারতের মুসলমানদের স্বাধীন আবাস ভূমি প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে তাঁর যে বিরাট অবদান রয়েছে সেটা মানুষের মন থেকে মুছে ফেলার উদ্দেশ্যেই আমাদের কতিপয় বুদ্ধিজীবী এ প্রচেষ্টা চালিয়ে ছিলেন বলে মনে হয়।

জিন্নাহ সাহেবকে বাঙ্গালী যুব সমাজের কাছে হেয় প্রতিপন্ন ও অশ্রদ্ধেয় ব্যক্তি হিসাবে প্রমাণ করার জন্য তারা প্রধান দ'টি যুক্তির অবতারণা করেন। একটি হল জিন্নাহ সাহেব জোর করে বাঙ্গালীদের উপর রাষ্ট্র ভাষা হিসাবে উর্দু চাপিয়ে দিতে চেয়েছিলেন। পাকিস্তানের সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষের ভাষা যেহেতু বাংলা তাই বাংলা-ই পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা হবে এটাই পূর্ব পাকিস্তানের মানুষের দাবি ছিল। একমাত্র বাংলা যদি রাষ্ট্রভাষা নাও হয় তথাপি উর্দুর সঙ্গে বাংলাও রাষ্ট্র ভাষা হবে এটাই ছিল পাকিস্তানের সংখ্যাগরিষ্ঠ অধিবাসী পূর্ব পাকিস্তানীদের দাবি। এ দাবিকে উপেক্ষা করে জিন্নাহ সাহেব উর্দুকেই একমাত্র রাষ্ট্রভাষা করার পীড়াপীড়ির পিছনে জিন্নাহ বিরোধীরা তাঁর বাঙ্গালী বিদ্বেষী মনোভাবও পশ্চিম পাকিস্তানের স্বার্থ রক্ষার ঐকান্তিক আগ্রহের প্রমাণ বলে মনে করেন। বাংলাদেশের অধিকাংশ মানুষের ধারণা জিন্নাহ সাহেবের মাতৃভাষা ছিল উর্দু। তাই উর্দুকে রাষ্ট্রভাষা করার দাবির পিছনে জিন্নাহ সাহেবের স্বীয় ভাষার প্রতি পক্ষপাতিত্বের নিদর্শন মনে করে বাঙ্গালী মাত্রই ক্ষুব্ধ হয়ে

www.amarboi.org

উঠে। কিন্তু অধিকাংশ বাঙ্গালীই জানে না যে জিন্নাহ সাহেবের মাতৃভাষা ছিল গুজরাটি; উর্দু নয়। উর্দুকে রাষ্ট্রভাষা করার পিছনে তাঁর উদ্দেশ্য ছিল পাকিস্তানের বিভিন্ন ভাষা ভাষী পাঁচটি রাষ্ট্রকে একই ভাষার মাধ্যমে এক জাতিতে পরিণত করা। ভাষা যেহেতু জাতি গঠনের মাধ্যম হিসাবে অনন্য অবদান রাখতে সক্ষম তাই এক ভাষার মাধ্যমে ভিন্ন ভিন্ন ভাষা ও সংস্কৃতিসম্পন্ন মানুষগুলোকে এক জাতীয়তা ও ভ্রাতৃত্ববোধে উদ্বুদ্ধ করার জন্য উর্দুকে মাধ্যম হিসাবে গ্রহণ করার সিদ্ধান্ত নেন। তাঁর ধারনা ছিল উর্দু যেহেতু বাংলা, পাঞ্জাব, সিন্ধু, সীমান্ত প্রদেশ ও বেলুচিস্তান কারোই ভাষা নয়, তবে সব প্রদেশগুলোতেই এ ভাষা মোটামুটি বোধগম্য তাই এ ভাষাকে রাষ্ট্র ভাষা করলে সবাই মোটামুটি মেনে নেবে এবং বিরোধিতা তেমন হবে না। কিন্তু বাংলা যেহেতু পাকিস্তানের অন্যান্য অংশে বোধগম্য নয় তাই বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা করলে অন্যান্য প্রদেশ থেকেও তাদের ভাষাকে রাষ্ট্রভাষা করার দাবি উঠবে। উর্দু যেহেতু পাকিস্তানের কোন প্রদেশের ভাষা নয়, এটি ভারতের যুক্ত প্রদেশের মুসলমানদের ভাষা যার সঙ্গে সারা ভারতের মুসলমানরা মোটামুটি পরিচিত তাই এ ভাষা রাষ্ট্রভাষা হিসাবে গ্রহণ করতে পাকিস্তানের সকল অংশের মানুষ সহজে রাজি হবে।

এক জাতি গঠনের লক্ষ্যে জিন্নাহ সাহেব যে এ সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন এবং এর পিছনে তাঁর কোন সংকীর্ণ মনোভাব ছিল না এর প্রমাণ পাওয়া যায় ভারতে কংগ্রেস নেতৃবৃন্দের হিন্দিকে ভারতের রাষ্ট্রভাষা করার সিদ্ধান্ত থেকে। হিন্দিকে ভারতের রাষ্ট্রভাষা করার পিছনে কি উদ্দেশ্য ও মনোভাব প্রধানমন্ত্রী হিসাবে জওহরলালের চিন্তাকে প্রভাবিত করেছিল তার প্রমাণ পাওয়া যায় তাঁর রচিত Glimses of World History থেকে। তিনি যখন ১৯১২ সনে সানইয়াৎ সেনের সঙ্গে দেখা করার জন্য চীনে যান তখন তাঁর অভিজ্ঞতা সম্বন্ধে তিনি লিখেছেন চীনের উত্তর অঞ্চল মানচুরিয়া থেকে দক্ষিণে নানকিং পর্যন্ত এ সাড়ে তিন হাজার মাইলের বিরাট দেশে সমস্ত মানুষই চীনা ভাষায় কথা বলে, যদিও উত্তর আর দক্ষিণের মধ্যে উচ্চারণে স্থানীয় কিছু কিছু পার্থক্য রয়েছে। এ পার্থক্য সত্ত্বেও উত্তর থেকে দক্ষিণ পর্যন্ত এ বিরাট দেশের লোক একজনের কথা আরেকজন সহজে বুঝতে পারে। এর ফলে এই বিরাট দেশের মানুষগুলোর মধ্যে একটা অখণ্ড জাতীয়তা ও ভ্রাতৃত্ববোধ গড়ে উঠেছে যেটা ভারতে সম্পূর্ণ অনুপস্থিত। চীনের ঐক্য ও জাতীয়তাবোধের প্রেক্ষিতে তিনি দুঃখ করে বলেছেন হায়-রে আমার ভারতবর্ষ-সেখানে বাঙ্গালী গুজরাটির ভাষা বুঝে না, গুজরাটি আবার মারাঠিদের ভাষা বুঝে না, মারাঠিরা আবার তামিলদের ভাষা বুঝে না। তারা প্রত্যেকে একজন থেকে আর একজন সম্পূর্ণ আলাদা স্বতন্ত্র জীবন-যাপন করছে। কারও মধ্যে ভাষার বিভিন্নতার কারণে চিন্তার দিক থেকে কোন ঐক্যবোধ নেই। এক জাতি হিসেবে নিজেদেরকে এরা চিন্তাই

www.amarboi.org

করতে পারে না। চীনের অভিজ্ঞতার কথা বলতে গিয়ে তিনি লিখেছিলেন ভারত যদি কখনো স্বাধীন হয় তবে এই বিভিন্ন ভাষাভাষী মানুষগুলোকে এক জাতিতে পরিণত করার জন্য ভাষাই হবে একমাত্র বন্ধন। স্বাধীনতার পরবর্তীকালে হিন্দিকে রাষ্ট্রভাষা করার পিছনে খুব সম্ভব তাঁর এ মনোভাবই কাজ করেছিল। তিনি ভেবেছিলেন হিন্দি যেহেতু কোন বিশেষ প্রদেশের ভাষা নয় কিন্তু ভারতের সব প্রদেশের লোকই এটা মোটামুটি বুঝতে পারে তাই তিনি ভারতের বিভিন্ন ভাষাভাষী অঞ্চলের মানুষদেরকে এক ভারতীয় জাতি হিসাবে গড়ে তুলবার মানসে হিন্দিকে ভারতের রাষ্ট্রভাষা হিসেবে প্রবর্তনের সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ ভারতের উত্তর অঞ্চলে তিনি সফল হলেও দক্ষিণ অঞ্চলে অদ্যাবধি সফল হন নাই। দক্ষিণের তামিল তেলেগু অর্থাৎ বৃহত্তর মাদ্রাজ অঞ্চল আজও হিন্দিকে গ্রহণ করেনি। যেমন বাংলাদেশ উর্দুকে গ্রহণ করেনি। হিন্দিকে ভারতে রাষ্ট্র ভাষা করার পিছনে জওহরলালের যেমন সৎ ইচ্ছাই ছিল, কোন কু-মতলব ছিল না তেমনিই আমাদের মনে হয় উর্দুকে পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা করার পিছনে জিন্নাহ্ সাহেবেরও সৎ উদ্দেশ্যই ছিল, কোন প্রকার উদ্দেশ্য প্রণোদিতমূলক দুরভিসন্ধি ছিল না। তাঁর গৃহীত নীতি হয়তো ভুল হতে পারে তবে এর পিছনে যে তাঁর কোন অসৎ উদ্দেশ্য ছিল না এটা নিঃসন্দেহে বলা চলে।

জিন্নাহ্ সাহেবের প্রতি দ্বিতীয় অভিযোগ হল যে, তিনি ১৯৪৬ সনের মার্চ মাসে দিল্লীতে অনুষ্ঠিত মুসলিম লীগ কনভেনশনে দুই সার্বভৌম স্টেট্সকে এক স্টেটে রূপান্তরিত করেন। '৪০ সনের মূল লাহোর প্রস্তাবে ছিল পূর্ব ও পশ্চিম সীমান্তে দুইটি সার্বভৌম স্বাধীন মুসলিম রাষ্ট্র গঠন হবে। '৪৬ সনে তিনি দুই রাষ্ট্রের জায়গায় এক রাষ্ট্র করে বাংলার মুসলমানদের পশ্চিম পাকিস্তানীদের অধীন করার ষড়যন্ত্র করেছিলেন। আমাদের পূর্ব পাকিস্তানের বুদ্ধিজীবীরা জিন্নাহ্র '৪৬ সনের এই পরিবর্তনকে বাঙালী জাতির প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা হিসেবে চিহ্নিত করে তাঁকে বাঙালীর শত্রু হিসেবে প্রতিপন্ন করার প্রয়াস চালিয়ে আসছিল।

জিন্নাহ্ সাহেবের গণতন্ত্রের চেতনা, তাঁর নির্লোভ চরিত্র ও যুক্তিবাদী চিন্তার সঙ্গে যারা পরিচিত তাদেরকে তাঁর শেষ মুহূর্তের এ সিদ্ধান্ত নেয়ার পেছনে জাতীয় স্বার্থের দৃষ্টিকোণ থেকে কোন তাগিদ ছিল কিনা এ ব্যাপারে গভীরভাবে ভাবিয়ে তুলেছিল। জিন্নাহ্ সাহেব জন্মসূত্রে পশ্চিম পাকিস্তানের লোক ছিলেন না। তাঁর মাতৃভাষা উর্দু ছিল না। ধন-দৌলতের প্রতি তাঁর কোন মোহ ছিল না। খ্যাতনামা ব্যারিস্টার হিসেবে বিপুল অর্থ উপার্জনের মারফত যে অগাধ সম্পত্তির মালিক তিনি হয়েছিলেন সে অর্থ নিজের একমাত্র কন্যাকে দান না করে দেশের জন্য তিনি দান করে গিয়েছিলেন। এহেন ব্যক্তির কাছে পূর্ব এবং পশ্চিম পাকিস্তানের স্বার্থকে আলাদা চোখে দেখার কোন কারণ ছিল বলে মনে হয় না। দুই অঞ্চলের লোকের

www.amarboi.org

স্বার্থকে তাঁর মত সচ্চরিত্র ও ন্যায়নিষ্ঠ ব্যক্তির সমান দৃষ্টিতে দেখাই ছিল স্বাভাবিক। এই সম্পর্কে গভীরভাবে যারা চিন্তা করেছেন তাদের কাছে তাই মনে হয়েছে পূর্বাঞ্চলের অধিবাসীদের স্বার্থেই তিনি এই সিদ্ধান্ত নিতে বাধ্য হয়েছিলেন।

১৯৪৫ সনে কেবিনেট মিশন প্লানের আলোচনার সময় আলোচনার বিভিন্ন স্তরে এবং শেষ পর্যন্ত যখন কেবিনেট মিশন প্লান প্রত্যাখ্যাত হয় তখন জিন্নাহ সাহেব বুঝতে পেরেছিলেন যে, তাঁর কল্পিত পুরো পাকিস্তান তিনি হয়ত পাবেন না। কংগ্রেসের চাপে বৃটিশ সরকার শেষ পর্যন্ত পাঞ্জাব ও বাংলাকে ভাগ করে ফেলতে পারে এবং আসামের অধিকাংশ অঞ্চল হাতছাড়া হয়ে যেতে পারে। এমতাবস্থায় খণ্ডিত বাংলা ও আসামের যেটুকু পাওয়া যেতে পারে তা দিয়ে সার্বভৌম রাষ্ট্র হলে তার অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখা সম্ভব হবে কিনা সন্দেহ। পূর্বাঞ্চলে এই ক্ষুদ্র দুর্বল রাষ্ট্রটিকে পশ্চিমাঞ্চলের বৃহৎ অংশের সংঙ্গে একত্র করে এক রাষ্ট্র করাই পূর্বাঞ্চলের ক্ষুদ্র রাষ্ট্রটিকে রক্ষা করা সর্বোত্তম উপায় বলে তিনি বিবেচনা করলেন। এ কারণেই '৪৬ এর মার্চে দিল্লিতে লীগের ওয়ার্কিং কমিটি ডেকে দুই রাষ্ট্রের পরিবর্তে এক রাষ্ট্র করার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন। পূর্বাঞ্চলে যে ক্ষুদ্র এলাকা নিয়ে সার্বভৌম পূর্ব পাকিস্তান রাষ্ট্র গঠিত হত সে রাষ্ট্রকে অস্তিত্ব রক্ষার জন্য যে সব সম্ভাব্য প্রশাসনিক, অর্থনৈতিক ও সামরিক সমস্যার সম্মুখীন হতে হতো সে সম্পর্কে নিম্নোক্ত আলোচনা থেকে এক রাষ্ট্র করার জিন্নাহ্‌র সিদ্ধান্ত কতখানি বাস্তবধর্মী ছিল তা প্রতীয়মান হয়।

মাউন্টব্যাটেনের চক্রান্তের ফলে আমরা গোটা আসাম ও অখণ্ড বাংলার অর্ধেকের মত শেষ পর্যন্ত হারিয়ে পূর্বাঞ্চলের যে অংশটুকুর মালিক হয়েছিলাম স্বাধীন রাষ্ট্র হিসেবে টিকিয়ে রাখতে আমরা সক্ষম হতাম না নিম্নোক্ত কারণগুলোর জন্য ঃ যেহেতু বৃটিশ আর্মীতে বাঙালীদের সংখ্যা ছিল অতি নগন্য তাই যে সময় দেশ ভাগ হয় সেই সময় নব্য স্বাধীন দেশটিকে শত্রুর আক্রমণ থেকে রক্ষার জন্য কোন সেনাবাহিনী গঠন করার মত লোক আমাদের ছিল না। সবশুদ্ধ মিলে ওই সময় ৪/৫ জন বাঙালী কিংস কমিশন অফিসার ও ৫০/৬০ জন জে. সি. ও এবং শ' দু'য়েক সিপাহী আমাদের হাতে ছিল যাদের দিয়ে দু'চার/ছয়মাস তো দূরের কথা দু' এক বৎসরের মধ্যেও কোন সৈন্যবাহিনী গড়ে তোলা সম্ভব ছিল না।

এছাড়া পূর্ব পাকিস্তানের সাড়ে চার কোটি লোকের ১৯টি জেলায় পুলিশ প্রশাসন আমরা গড়ে তুলতাম কিভাবে? ১৯টি জেলার কম করে হলেও দু'শত থানায় ৫০ জন করে অফিসার ও সিপাহী দিতে গেলেও আমাদের কমপক্ষে ৫/৭ শত অফিসার ও ৮/৯ হাজার প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত সিপাহী কনস্টেবলের দরকার ছিল। এতগুলো অফিসার ও সিপাহী কনস্টেবল যেখানে প্রয়োজন সেখানে দেশ ভাগের সময় উর্ধে শ' খানেক অফিসার ও ৩/৪ শত কনস্টেবল ও সিপাহী আমাদের হাতে ছিল। প্রয়োজনীয় সংখ্যক এই ৫/৭ শত অফিসার ও ৮/৯ হাজার কনেস্টবল সিপাহী

www.amarboi.org

রাতারাতি তৈরি করে পুলিশ প্রশাসন চালু করা আমাদের পক্ষে তখন সম্ভব ছিল না কিন্তু এক পাকিস্তান হবার ফলে ভারতের বিভিন্ন অংশের পুলিশ বিভাগের কয়েক হাজার লোক এসে হাজির হওয়ায় পুলিশ প্রশাসন গড়ে তুলতে আমাদের কোন অসুবিধা হয়নি।

তৎকালে দেশ শাসনের জন্য প্রশাসন ব্যবস্থা গড়ে তোলা সম্পর্কেও একই কথা বলা চলে। জেলার প্রশাসক হিসেবে কাজ করার মত দক্ষ লোক আমাদের একজনও ছিল কিনা সন্দেহ। বৃটিশ আমলে জেলার কর্তা হতেন অভিজ্ঞ আই. সি এস. অফিসাররা। দেশ বিভাগের সময় আমাদের হাতে প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষায় পাস করা কোন আই. সি. এস অফিসারই ছিল না। দেশ বিভাগের পূর্বে পাস করা আই. সি. এস বাঙালীদের মধ্যে একজনই হয়েছিল, যার নাম আখতারুজ্জামান। তিনি ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলার লোক, দেশ বিভাগের সময় তিনি পাকিস্তানে না এসে ভারতে থেকে যান। সে সময় অবিভক্ত বাংলায় দু'জন মাত্র বাঙালী আই. সি. এস. ছিলেন। তারা হলেন নূরনবী চৌধুরী ও মিঃ মোর্শেদ। তবে দু'জনই ছিলেন নমিনেটেড আই. সি. এস। এ দু'জনের মধ্যে নূরন্নবী সাহেব এদেশে এসেছিলেন। মোর্শেদ সাহেব পশ্চিমবঙ্গে রয়ে যান। এ অবস্থায় ১৯টি জেলা ও ৬০/৭০টি সাবডিভিশনে প্রশাসন ব্যবস্থা গড়ে তুলবার মত লোক আমরা কোথায় পেতাম? বাঙালী আই. সি. এস. একজন ও ছিল না। ডেপুটি সাব ডেপুটি আমাদের হাতে তখন ২০/২৫জনের বেশী ছিল কিনা সন্দেহ। এ অবস্থায় স্বাধীন পূর্ব পাকিস্তানের প্রশাসন যন্ত্র গড়ে তোলা ছিল প্রায় সম্পূর্ণ অসম্ভব এবং উপযুক্ত প্রশাসন যন্ত্র ছাড়া দেশ একদিনও চলতে পারত না। এ অবস্থায় অত্যন্ত বিচক্ষণ ও দূরদৃষ্টিসম্পন্ন নেতা বলে জিন্নাহ্ সাহেব খণ্ডিত স্বাধীন পূর্ব পাকিস্তান ভবিষ্যতে যে সমস্ত সমস্যার সম্মুখীন হবে তা বুঝতে পেরেছিলেন বলেই এক পাকিস্তান করার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন বলে মনে হয়।

এক পাকিস্তান হওয়ার ফলেই বিহার, উড়িষ্যা, যুক্তপ্রদেশ, আসাম থেকে মুসলমান রেলওয়ে অফিসার ও কর্মচারী ১৯৪৭ সনে পূর্ব পাকিস্তানে এসে হাজির হয়েছিল বলেই আমরা আমাদের কয়েকশত মাইল রেলওয়েকে তখন চালু রাখতে সক্ষম হয়েছিলাম। রেলওয়ে চালু রাখার জন্য আমাদের যেখানে কয়েক হাজার দক্ষ লোকের প্রয়োজন ছিল সেখানে বাঙালী টি, টি, স্টেশন মাস্টার, ট্রেন চালক ও কর্মচারী ছিল সর্বসাকুল্যে কয়েক শত। তাই এক পাকিস্তান হওয়াতেই বিহার, উড়িষ্যা, যুক্তপ্রদেশ, আসামের দক্ষ রেলওয়ে কর্মীদের সাহায্য-সহযোগিতা আমরা পেয়েছিলাম, নচেৎ অবাঙালী সবাই পশ্চিম পাকিস্তান চলে যেত। এক পাকিস্তান হওয়াতেই বিহার, যুক্তপ্রদেশ, মধ্যপ্রদেশ থেকে বহু পুলিশ অফিসার, প্রশাসনে দক্ষ আই. সি. এস. ও অন্যান্য বিভাগের অবাঙালী অফিসার পূর্ব পাকিস্তানে এসে হাজির হয়েছিল বলেই আমরা বেসামরিক প্রশাসন ও পুলিশ বিভাগ গড়ে তুলতে সক্ষম

www.amarboi.org

হয়েছিলাম। সকল সমস্যার মধ্যে সামরিক বিভাগের দুর্বলতার কথাই বোধহয় জিন্নাহ্ সাহেব সবিশেষ গুরুত্বের সঙ্গে বিবেচনা করেছিলেন। কাজেই তিনি বুঝতে পেরেছিলেন যে, পূর্ব পাকিস্তানে কোন উপযুক্ত সৈন্য বাহিনী না থাকলে পার্শ্ববর্তী ভারত যে কোন অজুহাতে যে কোন সময়ে পূর্ব পাকিস্তানকে গ্রাস করে নিতে পারে এবং একবার কোনভাবে নিতে পারলে পশ্চিম পাকিস্তানের যত আপত্তি ও সমবেদনাই থাকুক না কেন শেষ পর্যন্ত জাতিসংঘে প্রস্তাব পাস করানো ছাড়া আর কিছুই করার থাকবে না। পূর্ব পাকিস্তান এবং পশ্চিম পাকিস্তান যেহেতু আলাদা রাষ্ট্র তাই পূর্ব পাকিস্তান আক্রান্ত হলে পশ্চিম পাকিস্তানের পক্ষে যুদ্ধে নামা মোটেই সম্ভব হবে না। কিন্তু এক পাকিস্তান হলে পূর্ব অঞ্চল আক্রান্ত হলে পশ্চিম পাকিস্তান যুদ্ধে নামতে বাধ্য এবং ভারত এটা বুঝবে বলে সহজে পূর্ব পাকিস্তান আক্রমণ করতে সাহস করবে না।

জিন্নাহ্ সাহেবের সিদ্ধান্ত ও ধারণা যে সঠিক ছিল পরবর্তী ঘটনা থেকে তা স্পষ্ট প্রমাণিত হয়। বিভিন্ন অছিলায় ভারত যখন পর পর জুনাগড়, মান্ডাভার ও হায়দারাবাদ দখল করে নিল তখন পাকিস্তান অসহায়ের মত শুধু তাকিয়েই রইল, কিছুই করতে পারলনা। এরপূর্বে কাশ্মীরেরও দুই তৃতীয়াংশ যখন দখল করে নিল পাকিস্তান যুদ্ধে নেমেও আজ পর্যন্ত তার কোন ফয়সালা করতে পারেনি। উপরোক্ত ঘটনাগুলোর প্রেক্ষিতে চিন্তা করলে পরিষ্কার মনে হয় ১৯৪৬ সনে এক পাকিস্তান করার যে সিদ্ধান্ত তিনি নিয়েছিলেন সেটা আমাদের পূর্ব পাকিস্তানীদের অস্তিত্ব রক্ষার স্বার্থেই নিয়েছিলেন। এ সিদ্ধান্ত পশ্চিম পাকিস্তানীদের স্বার্থে নেয়া হয়নি। এখানে স্মরণযোগ্য পঁচিশ বৎসর পর যখন আমরা স্বাধীন হয়ে আলাদা হয়ে গেলাম তখনকার পরিস্থিতি সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র ছিল। এ পঁচিশ বৎসরে আমরা প্রশাসন, পুলিশ ও অন্যান্য বিভাগ গড়ে তুলেছি। আমাদের সৈন্য বাহিনীও ততদিনে গড়ে উঠেছে। তাই নূতন রাষ্ট্র পরিচালনায় আমাদের কোন বেগ পেতে হয়নি।

উপরোক্ত বিষয়গুলো একটু গভীরভাবে চিন্তা করলে পরিষ্কার বুঝা যায় পূর্বাঞ্চলের সম্ভাব্য ভবিষ্যত অবস্থার কথা চিন্তা করেই জিন্নাহ্ সাহেব states থেকে 's' বাদ দিয়ে state করেছিলেন আমাদের ভবিষ্যত মঙ্গল ও নিরাপত্তার জন্যে, পশ্চিম পাকিস্তানের সুবিধার জন্যে নয়।

এম এ মোহাইমেন

www.amarboi.org

সূচীপত্র

	পৃষ্ঠা
• জিন্নাহর রাজনীতিতে প্রবেশ	২
• হোমরুল লীগ	৩
• জিন্নাহ্‌-গান্ধী বিরোধের সূচনা	৬
• জিন্নাহর বিবাহ্‌	১১
• লর্ড উইলিংডন-জিন্নাহ্‌ ও জিন্নাহ্‌ হল	১৪
• জিন্নাহ্‌ ও গোখলে	১৬
• মুসলিম লীগের জন্ম, সৈয়দ আহম্মদ ও আমীর আলী	১৭
• মুসলমানদের সম্পর্কে বৃটিশ নীতির পরিবর্তন	২১
• লর্ড মিন্টোর সঙ্গে জিন্নাহর বিতর্ক	২৩
• আইনজীবী জিন্নাহ্‌	২৪
• জাতীয়তাবাদী জিন্নাহ্‌ ও স্বতন্ত্র নির্বাচন	২৬
• মুসলিম লীগের নীতির পরিবর্তন	২৮
• জিন্নাহর লীগে যোগদান	২৯
• লক্ষ্ণৌ প্যাক্ট ও জিন্নাহ্‌	৩৩
• খেলাফত আন্দোলন ও জিন্নাহ্‌	৩৯
• জিন্নাহর কংগ্রেস ত্যাগ	৪৪
• কংগ্রেস সম্পর্কে মুসলমানদের মনোভাবের পরিবর্তনের সূচনা	৪৬
• হিন্দু-মুসলিম সমস্যা সম্পর্কে সি আর দাস ও বেঙ্গল প্যাক্ট	৪৯
• বেঙ্গল প্যাক্টের বিলুপ্তি সম্পর্কে আবুল মনসুর আহাম্মদ	৫২
• জিন্নাহর পরবর্তী কার্যকলাপ	৫৬
• দিল্লী-মুসলিম প্রস্তাব	৫৮

www.amarboi.org

- সাইমন কমিশন বয়কট ৫৯
- নেহেরু রিপোর্ট ৬০
- নেহেরু রিপোর্ট সংশোধনে জিন্নাহর ব্যর্থতা ও অশ্রুসজল নয়নে কোলকাতা ত্যাগ ৬৩
- রতন বাঈ-এর মৃত্যু ও জিন্নাহ ৭০
- জিন্নাহর বিখ্যাত ১৪-দফা ৭৩
- প্রথম ও দ্বিতীয় গোলটেবিল বৈঠক ৭৮
- জিন্নাহর লন্ডনে বসবাসের সিদ্ধান্ত ৮২
- জিন্নাহর ভারতে প্রত্যাবর্তন ৮৮
- সাম্প্রদায়িক বিবাদে জিন্নাহর মধ্যস্থতা ৯১
- ১৯৩৭ সনের নির্বাচনে লীগের অংশগ্রহণের সিদ্ধান্ত ৯৩
- কংগ্রেস কর্তৃক কোয়ালিশন সরকার গঠনের ওয়াদা খেলাপ ১০৩
- কংগ্রেসের ওয়াদা খেলাপের মারাত্মক পরিণতি ১০৯
- বাস্তব বুদ্ধিসম্পন্ন জিন্নাহ ১১৯
- কোমল হৃদয় জিন্নাহ ১২০
- হিন্দু মহাসভার দ্বি-জাতি তত্ত্ব ১২৩
- ১৯৪০ সনের লাহোর প্রস্তাব ১৩১
- প্রথম সিমলা কনফারেন্স ১৩৪
- বড় লাটের জাতীয় প্রতিরক্ষা পরিষদ গঠন ও জিন্নাহর আপত্তি ১৩৬
- জিন্নাহ-গান্ধী আলোচনা ১৫০
- জিন্নাহ সম্বন্ধে রানা লিয়াকত আলী খান ১৫৭
- এ্যাটলীর সোসালিস্ট পার্টির ক্ষমতায় আগমন ১৬১
- ১৯৪৬ সনের নির্বাচনের ফলাফল ১৬৬
- ক্যাবিনেট মিশন প্লান ১৬৮
- জিন্নাহর অসুস্থতা ১৭০
- জওহরলালের মিশন প্লানের অপব্যাখ্যা ও সংকট সৃষ্টি ১৭৩

www.amarboi.org

- লীগের মিশন প্লানের স্বীকৃতি প্রত্যাহার ১৭৫
- জিন্নাহর চরিত্র, ব্যক্তিত্ব সম্পর্কে কেসীর মন্তব্য ১৭৬
- কোলকাতা ও বিহারের নৃশংস হিন্দু-মুসলিম দাঙ্গা ১৮১
- কংগ্রেস-লীগ নেতৃবৃন্দের বিলাত গমন ১৮৪
- মিঃ এ্যাটলীর ঘোষণা ও ওয়াভেলের অপসারণ ১৮৭
- মাউন্টব্যাটেনের ভারত আগমন ১৮৮
- ভারত বিভাগের প্রক্রিয়া আরম্ভ ও দাঙ্গার বিস্তৃতি ১৯০
- ভারত বিভাগের ব্যপারে মাউন্টব্যাটেন ও রেডক্লিপের বিশ্বাসঘাতকতা ১৯৩
- অখন্ড বাংলার জন্য সোহরাওয়ার্দী-শরৎবোস প্রচেষ্টা ১৯৫
- পাকিস্তানের স্থায়ীত্ব সম্বন্ধে কংগ্রেসের সন্দেহ ১৯৮
- বাংলা বিভাগকালে সম্পদ বন্টনে বঞ্চনা ২০৩
- মাউন্টব্যাটেনকে পাকিস্তানের গভর্ণর জেনারেল করতে জিন্নাহর অস্বীকৃতির প্রতিশোধ ২০৫
- গভর্ণর জেনারেল হিসাবে জিন্নাহর করাচী আগমন ২০৮
- নতুন রাষ্ট্র গঠনে জনগণের নিষ্ঠা ২১১
- গণপরিষদে জিন্নাহর প্রথম ভাষণ ২১২
- পাকিস্তান সরকার গঠনে বৃটিশ কর্মচারীদের অবদান ২১৫
- জিন্নাহর চরিত্রের বৈশিষ্ট্য ২১৮
- কাশ্মীর সমস্যা ও কায়েদে আযম ২২১
- গান্ধী-জিন্নাহ ব্যক্তিগত সম্পর্ক ২২৪
- জিন্নাহর ব্যক্তিত্ব সম্পর্কে বিশিষ্ট ব্যক্তিবৃন্দের মন্তব্য ২২৮
- জিন্নাহর শেষ দিনগুলি ২৩৭
- ক্যাবিনেট মিশন প্লানের বাস্তবায়ন মুসলমানদের জন্য মঙ্গলকর হতো কি ? ২৪১
- জিন্নাহ দ্বি-জাতি তত্ত্বের নীতি কি বিসর্জন দিয়েছিলেন ? ২৪৭

www.amarboi.org

ইতিহাসের আলোকে দেশ বিভাগ ও মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ

ভারত বিভাগের পর ক্রমাগত বিরুদ্ধ প্রচারণার ফলে ভারত ও পাকিস্তানের পূর্বাঞ্চলের অধিকাংশ লোকের বদ্ধমূল ধারণা হয়েছিল যে জিন্নাহ সাহেব পূর্বাবধিই সাম্প্রদায়িক ভেদ বুদ্ধি দ্বারা পরিচালিত হয়েছিলেন যার ফলশ্রুতিতে শেষ পর্যন্ত ভারত বিভাগ অনিবার্য হয়ে উঠেছিল। কিন্তু ভারত বিভাগের পরবর্তীকালে যে সব তথ্য ও দলিল পত্র প্রকাশিত হয় তাতে পরিষ্কার প্রমাণিত হয় ১৯৪৫ সালে কংগ্রেসের এক তরফা জিদের ফলে ক্যাবিনেট মিশন প্লান পরিত্যক্ত হওয়ার আগ পর্যন্ত জিন্নাহ সাহেব ভারতের অখন্ডতা রক্ষার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করেছিলেন। ১৯০৬ সালে কংগ্রেসের ভেতর দিয়ে রাজনীতিতে আসার পর থেকে তিনি গভীর জাতীয়তাবাদী চেতনায় উদ্বুদ্ধ একজন কংগ্রেস নেতা হিসাবে ভারতের হিন্দু মুসলিম দুই বৃহৎ সম্প্রদায়কে নিজেদের সংকীর্ণ চিন্তার উর্ধে তুলে কাছাকাছি নিয়ে আসার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করে যাচ্ছিলেন। তারই চেষ্টায় ১৯১৬ সালে লক্ষ্ণৌতে কংগ্রেস ও মুসলিম লীগের অধিবেশন এই সময়ে একসাথে পাশাপাশি অনুষ্ঠিত হয়েছিল যে অধিবেশনে লীগ ও কংগ্রেসের মধ্যে একটা সমঝোতা সৃষ্টি হয়ে সেল্‌ফ গভর্নমেন্টের পরিকল্পনা রচনার ভিত্তিতে কংগ্রেস ও লীগের মধ্যে একটি চুক্তি স্বাক্ষরিত হয় যেটা 'লক্ষ্ণৌ প্যাক্ট' নামে পরিচিত হয়। মুসলিম লীগের এই অধিবেশনে জিন্নাহ সভাপতিত্ব করেছিলেন। লক্ষ্ণৌ প্যাক্টের প্রধান উদ্যোক্তা ছিলেন মিঃ জিন্নাহ এবং তাঁকে সক্রিয়ভাবে সাহায্য করেছিলেন অপর দুই প্রখ্যাত কংগ্রেস নেতা লোকমান্য তিলক ও অ্যানে বেসান্ত। অ্যানে বেসান্ত ছিলেন একজন আইরিশ মহিলা যিনি ভারতকে মাতৃভূমি বলে গ্রহণ করেছিলেন এবং এই মহিলা বিখ্যাত হোমরুল আন্দোলনের প্রবক্তা ছিলেন।

এর পূর্ববর্তী বৎসর অর্থাৎ ১৯১৫ সালে বলতে গেলে জিন্নাহ সাহেবের প্রচেষ্টাতেই বোম্বেতে একই সঙ্গে একই স্থানে কংগ্রেস লীগের বাৎসরিক অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়েছিল এবং মুসলিম লীগ সেখানে জিন্নাহর পরামর্শে কয়েকজন কংগ্রেসের হিন্দু নেতার মধ্যে মিঃ গান্ধীকেও নিমন্ত্রণ করেছিলেন যার জন্য অবশ্য তাঁকে অনেক মুসলিম লীগ নেতার সমালোচনার সম্মুখীন হতে হয়েছিল।

www.amarboi.org

জিন্নাহর রাজনীতিতে প্রবেশ

১৯০৫ সালে জিন্নাহ সাহেব তদানীন্তন কংগ্রেসের প্রেসিডেন্ট দাদাভাই নওরোজীর শিষ্য ও প্রাইভেট সেক্রেটারী হিসেবে ভারতীয় রাজনীতিতে যোগ দিয়েছিলেন। ১৯১২ সাল পর্যন্ত পরোক্ষভাবে সম্পর্ক রক্ষা করে চললেও ১৯১২ সাল পর্যন্ত তিনি মুসলিম লীগে অফিসিয়ালি যোগ দেননি। ১৯১২ সালে কংগ্রেসের প্রথম সারির নেতা গোপাল কৃষ্ণ গোখলেসহ যখন জিন্নাহ ইউরোপ গমন করেন তখন মুসলিম লীগ নেতা মাওলানা মোহাম্মদ আলী ও ওয়াজির হাসান ইংল্যান্ডে তাঁর সঙ্গে দেখা করে তাঁকে মুসলিম লীগে যোগ দেয়ার অনুরোধ জানান। জিন্নাহ সাহেব তাদের অনুরোধে মুসলিম লীগে যোগ দিতে স্বীকৃত হন। ভারতীয় মুসলমানদের চিন্তা-চেতনা ও আশা-আকাঙ্খার মূল স্রোত মুসলিম লীগকে কেন্দ্র করে বয়ে যাচ্ছিল এটা ততদিনে জিন্নাহ সাহেব বুঝতে পেরেছিলেন। তাই এই মূল স্রোতধারার সঙ্গে সংযুক্ত হতে তিনি আগ্রহী হয়ে উঠেছিলেন । তবে সে সঙ্গে সর্ববৃহৎ রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান কংগ্রেস যার মাধ্যমে সর্বভারতীয় রাজনীতিতে তিনি এতখানি প্রতিষ্ঠা লাভ করেছিলেন তার সঙ্গেও তিনি সম্পর্ক ছিন্ন করতে রাজি ছিলেন না।

এ সময় ভারতীয় রাজনীতির বৈশিষ্ট্য ছিল যে, একই সঙ্গে একজন কংগ্রেস ও মুসলিম লীগের সভ্য হতে পারতেন। মাওলানা মোহাম্মদ আলী, শওকত আলী, ডাঃ আনসারী, হাকিম আজমল খান, ফজলুল হক প্রমুখ একই সঙ্গে মুসলিম লীগ ও কংগ্রেসের সভ্য ছিলেন আবার হিন্দু নেতৃত্বের মধ্যে কে, এল, মুন্সী, শ্রদ্ধানন্দ প্রমূখ অনেকে এক সঙ্গে হিন্দু মহাসভা ও কংগ্রেসের সদস্য ছিলেন।

জিন্নাহর মুসলিম লীগের সদস্য হতে রাজি হওয়ার প্রসঙ্গে কংগ্রেসের একজন প্রথম সারির নেত্রী প্রখ্যাত কবি ও রাজনীতিবিদ মিসেস সরোজিনী নাইডুর মন্তব্য বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য। সরোজিনীর ভাষায় মাওলানা মোহাম্মদ আলী ও ওয়াজির হাসান জিন্নাহর মুসলিম লীগে যোগদানের স্বীকৃতি আদায়ের সময় পরিষ্কার ভাবে যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন সে সম্পর্কে সরোজিনী বলেনঃ-"They had to make a solemn preliminery covenent that loyalty to the muslim league and the muslim interest in no way and at no time imply even the shadow of disloyality to the larger national cause to which his life was dedicated" (Reference-Under- standing the Muslim Mind-Rajmohan Gandhi)

"তাদেরকে পরিষ্কারভাবে প্রাথমিক প্রতিশ্রুতি দিতে হয়েছিল যে, মুসলিম লীগ বা মুসলিম স্বার্থের প্রতি আনুগত্য জিন্নাহ সাহেবের কোনভাবে এবং কোন

www.amarboi.org

সময়ই বৃহত্তর জাতীয় স্বার্থ যার জন্য তাঁর সমস্ত জীবন উৎসর্গকৃত তার বিন্দু মাত্র প্রতিকূল বা আনুগত্যহীন হতে পারবেনা। মুসলিম লীগে যোগদানের ব্যাপারে জিন্নাহর এ শর্ত আরোপ থেকে বুঝা যায় তখন পর্যন্ত কংগ্রেসের আদর্শ ও নীতির প্রতি তাঁর কতখানি শ্রদ্ধা ও আন্তরিকতা ছিল।"

কিন্তু ইতিহাসের নির্মম পরিহাস যে, পরবর্তীকালে জিন্নাহ্ সাহেবই হিন্দু-মুসলিম ঐক্য ধ্বংস করে পাকিস্তান সৃষ্টি করার অপবাদে আখ্যায়িত হয়েছিলেন।

১৯১৪ সালের ৪ঠা আগস্ট প্রথম মহাযুদ্ধ শুরু হলে ভারতবর্ষ মিত্রশক্তির বিজয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিল। ফলে যুদ্ধশেষে স্বাধীনতার ব্যাপারে ভারতবাসীর আশা আকাঙ্খা তীব্র হয়ে উঠে। ইতিমধ্যে কংগ্রেসে যে বিভক্তি এসেছিল তার প্রেক্ষিতে অ্যানি বেসান্ত ভারতের স্বাধীনতার জন্য "হোমরুল লীগ" নামে একটি নতুন রাজনৈতিক সংগঠনের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেছিলেন। উলেখ্য, প্রথম মহাযুদ্ধে বৃটিশের পক্ষে ভারত সক্রিয়ভাবে যোগ দেবে কিনা এটা নিয়ে কংগ্রেস নেতারা দ্বিধাবিভক্ত হয়ে পড়েন। মহাত্মা গান্ধীর নেতৃত্বে কংগ্রেসের অধিকাংশ নেতা বৃটিশকে বিনা শর্তে সাহায্য করার পক্ষে মতামত রাখেন কিন্তু অ্যানি বেসান্ত, মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ, মাওলানা মোহাম্মদ আলী, সুভাষ বোস প্রমূখের এই সাহায্যের বিনিময়ে ভারতকে স্বায়ত্তশাসন দেয়ার ব্যাপারে বৃটিশ সরকার থেকে আগাম কিছুটা প্রতিশ্রুতি আদায়ের ইচ্ছা ছিল, তবে বৃটিশ সরকার শেষ পর্যন্ত এ ব্যাপারে প্রতিশ্রুতি দিতে রাজি হয়নি।

হোমরুল লীগ (Home Rule League)

যা হোক, যুদ্ধের পর ভারতবাসীর মনে স্বায়ত্তশাসনের ব্যাপারে আশা আকাঙ্খা বৃদ্ধির পরিপ্রেক্ষিতে অ্যানি বেসান্ত যখন "হোমরুল লীগ" প্রতিষ্ঠা করেন তখন ৯১ বছর বয়স্ক প্রবীণ কংগ্রেস নেতা দাদা ভাই নওরোজী তাতে যোগদান করেন। কিন্তু কংগ্রেসের নীতি নির্ধারক মহল এই "হোমরুল লীগ" এর বিরোধিতা করেন। ১৯১৬ সালের ১লা আগস্ট মিসেস বেসান্ত সর্বভারতীয় "হোমরুল লীগ" প্রতিষ্ঠা করেন এ কারণে যে, এর ফলে যুদ্ধের পরবর্তী পরিস্থিতিতে ইংরেজদের কাছ থেকে সুযোগ-সুবিধা দ্রুত আদায় করে নেয়া সম্ভব হবে। এই হোমরুল লীগ প্রতিষ্ঠার কারণে ১৯১৭ সালের জুন মাসে মিসেস বেসান্ত ও তার সহযোগীরা অন্তরীণ হন। এ অবস্থায় প্রখ্যাত আইনজীবী ও কংগ্রেস নেতা স্যার তেজ বাহাদুর সাপরু এবং মতিলাল

www.amarboi.org

নেহেরু এলাহাবাদে হোমরুল লীগের এক শাখা গঠন করেন এবং জিন্নাহকে সভাপতি করে বোম্বের শাখাটি পুনঃগঠিত করা হয়। ভারতের এই রাজনৈতিক কর্মকান্ড ইংল্যান্ডে যথেষ্ট প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে। এই প্রেক্ষাপটে বৃটিশ সরকারের ভারত বিষয়ক সেক্রেটারী মিঃ মন্টেগু ১৯১৭ সালের ২০শে আগস্ট এক ঐতিহাসিক ঘোষণার মধ্য দিয়ে বলেন যে, বৃটিশ সরকারের লক্ষ্য হলো প্রশাসনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে ভারতীয়দের অংশগ্রহণের মাত্রা বৃদ্ধির মারফত ভবিষ্যতে তাদেরকে একটি দায়িত্বশীল সরকার গঠনের উপযুক্ত করে তোলা যাতে তারা ভবিষ্যতে বৃটিশ সাম্রাজ্যের অংশ হিসেবে স্বতন্ত্রভাবে দেশ শাসনের যোগ্যতা অর্জন করে।

এই ঘোষণা হোমরুল লীগের সম্মান অনেকাংশে বৃদ্ধি করলো। মিসেস বেসান্ত ও তাঁর সহকর্মীদের ১৯১৭ সালের সেপ্টেম্বরে মুক্তি দেয়া হলো এবং সে বৎসরের ডিসেম্বরে কোলকাতায় অনুষ্ঠিত কংগ্রেস সম্মেলনে তিনি সভাপতি নির্বাচিত হলেন। সে সম্মেলনে কংগ্রেস নীতির অংশ হিসেবে হোমরুল স্বীকৃতি পেল। ইতিমধ্যে মন্টেগু চেমস্‌ফোর্ড সংস্কারের ভিত্তিতে বৃটিশ সরকার ভারতীয় শাসন আইন ১৮১৮ বলবৎ করলো। এই আইনে 'দ্বৈত' প্রথার প্রবর্তন করা হলো। এই প্রথা অনুযায়ী প্রদেশগুলোতে কিছু কিছু বিষয় নির্বাচিত মন্ত্রীদের অধীনে ন্যস্ত করা হলো। বাকিগুলো গভর্নরের এক্সিকিউটিভ কাউন্সিলের মেম্বারদের ন্যায় সরকারী কর্মচারীদের অধীনে রাখা হলো। রাজনৈতিক দলগুলো যদিও উৎসাহের সঙ্গে এই প্রথাকে মেনে নিতে রাজি হলো না তথাপি এটাকে কার্যকরী করা যেত কিন্তু ইতিমধ্যে দমনমূলক রাউলাট আইন ও জালিনওয়ালাবাগে হত্যাকান্ডের কারণে আইনটি প্রবর্তনের চেষ্টা ব্যর্থ হয়ে গেল। জেনারেল ডায়ারের আদেশে নিরস্ত্র জনগণের উপর জালিনওয়ালাবাগে যে নিষ্ঠুর হত্যাকান্ড সাধিত হয়েছিল তাতে সমগ্র দেশের মানুষের মনে বৃটিশ শাসনের বিরুদ্ধে যার পর নাই ঘৃণা ও বিক্ষোভ সৃষ্টি হয়েছিল এবং সেই পরিস্থিতিকে উপলক্ষ্য করে গান্ধীজী তাঁর অহিংস অসহযোগ আন্দোলনের প্রস্তুতি নিলেন।

এখানে উল্লেখযোগ্য যে, এর কিছুকাল আগে আফ্রিকা থেকে দেশে ফিরে এসে গান্ধীজী ভারতীয় রাজনীতিতে যোগ দিয়ে সাধারণ মানুষের মধ্যে অসম্ভব জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিলেন। তাঁর সাধারণ জীবনধারণ প্রণালী ও সম্মোহনী শক্তি সাধারণ মানুষের মধ্যে প্রচন্ড প্রভাব সৃষ্টি করে। সাধারণ হিন্দু জনগণের ধর্মীয় অনুভূতি ও দৃষ্টিকোণ থেকে তিনি একজন সাধু পুরুষ হিসেবে জনগণের

www.amarboi.org

কাছে পরিচিত হয়ে উঠলেন। রাজনীতির সঙ্গে এরূপ ধর্মীয় সংমিশ্রণে বিরক্ত হয়ে অ্যানি বেসান্ত ১৯২০ সালে হোমরুল লীগ পরিত্যাগ করেন এবং গান্ধী তার সভাপতি নির্বাচিত হলেন। এই ঘটনা ভারতের ও ইংল্যান্ডের হোমরুলের সমর্থক উদারপন্থীদের উদ্বিগ্ন করে তুললো যারা বরাবরই রাজনীতি থেকে ধর্মকে আলাদা রাখতে চেয়েছিলেন।

রাজনীতির সঙ্গে ধর্মের সংমিশ্রণে সাধারণ লোকের মনে ধর্মীয় উন্মাদনা সৃষ্টির মারফত তাদের রাজনৈতিক চেতনার উন্মেষ ঘটিয়ে একটি বিরাট রাজনৈতিক শক্তি সৃষ্টি করা সম্ভব কিন্তু তাতে বিপদও আছে। এর জন্য একদিন চরম মূল্য দিতে হয় যেটা দিতে হয়েছিল শেষ পর্যন্ত দেশ বিভাগের ভিতর দিয়ে। হোমরুলের সভাপতি হিসেবে গান্ধী হোমরুলের মূলনীতিরই পরিবর্তন ঘটালেন। লীগের পূর্ব ঘোষিত নীতি 'বৃটিশ সাম্রাজ্যের মধ্যে স্বশাসন (Self government)' নীতির পরিবর্তন করে বৃটিশ সাম্রাজ্যের সঙ্গে সম্পর্কহীন 'স্বরাজ' শব্দ প্রবর্তন করা হলো এবং লীগের ঘোষিত লক্ষ্য 'শান্তিপূর্ণ ও আইনসঙ্গত ভাবে' পরিবর্তে শাসনতান্ত্রিকভাবে শব্দ যোজন করা হলো। এখানে হোমরুল লীগের গঠনতন্ত্রের পরিবর্তনের ব্যাপারে জিন্নাহ সাহেব আপত্তি তুললেন লীগের গঠনতন্ত্র পরিবর্তনের জন্য তিন চতুর্থাংশ সদস্যের সম্মতি প্রয়োজন এবং তার জন্য উপযুক্তভাবে পূর্বাহ্নে সদস্যদের নিকট নোটিশ পাঠাতে হবে বলে দাবী যখন জিন্নাহ সাহেব উঠালেন তখন গান্ধীজী সভাপতি হিসেবে সমস্ত আপত্তি বাতিল করে দিয়ে সিম্পল মেজরিটিতে প্রস্তাব পাস করে নিলেন, এতে কানাইলাল মুন্সী, জয়া কর, যমুনা দাস, মঙ্গলদাসসহ ১৯ জন সদস্যকে নিয়ে জিন্নাহ সাহেব হোমরুল লীগ ত্যাগ করলেন।

প্রখ্যাত কংগ্রেস নেতা কানাই লাল মুন্সী (কে, এল, মুন্সী) এসম্পর্কে আক্ষেপ প্রকাশ করে বলেন,

"When Gandhiji forced Jinnah and his followers out of the Home Rule League and later the Congress, we all felt, with Jinnah, that a movement of an Unconstitutional nature, sponsored by Gandhiji with the tremendous influence he had acquired over the masses, would inevitably result in wide spread violence, barring the progressive development of self governing institutions based on a partnership between educated Hindus and

www.amarboi.org

Muslims. To generate coercive power in the masses would only provoke mass conflict between the two communities, as in fact it did, with his keen sense of realities Jinnah firmly set his face against any dialogue with Gandhiji on this point." (Ref. partition of India, Legend and Reality by H. M. Seervai, (page no-12-13).

("জিন্নাহ ও তাঁর সমর্থকদের যখন প্রথমে হোম রুল লীগ এবং পরবর্তীতে কংগ্রেস থেকে বেরিয়ে যেতে বাধ্য করা হলো তখন জিন্নাহসহ আমরা সবাই অনুভব করলাম যে গান্ধী জনগণের মধ্যে যে বিরাট প্রভাব ও জনপ্রিয়তা অর্জন করতে সক্ষম হয়েছেন তার সুযোগ নিয়ে দেশে একটা অসাংবিধানিক আন্দোলন সৃষ্টি করতে যাচ্ছেন যেটা শিক্ষিত হিন্দু ও মুসলমানদের অংশীদারীত্বের ভিত্তিতে পরিচালিত স্বশাসিত প্রতিষ্ঠানগুলোর ক্রমবর্ধমান উন্নয়নকে ব্যাহত করে নিশ্চিতভাবে দেশব্যাপী হিংসা ও সংঘাতের জন্ম দেবে। জনগণের মনে শক্তি প্রদর্শনের মনোভাব সৃষ্টির ফলে দু'সম্প্রদায়ের মধ্যে সংঘর্ষ অনিবার্য করে তুলবে যেটা শেষ পর্যন্ত বাস্তবে সংগঠিত হয়েছিল। রাজনীতির সঙ্গে ধর্মের সংমিশ্রণের এই কুফল জিন্নাহ তাঁর তীক্ষ্ণ বাস্তব বুদ্ধি থেকে বুঝতে পেরে ছিলেন বলে এ বিষয়ের উপর জিন্নাহ গান্ধীর সঙ্গে কোন আলোচনা করতেই রাজি হলেন না।")

জিন্নাহ-গান্ধী বিরোধের সূচনা

হোমরুল থেকে পদত্যাগের পর পদত্যাগপত্র প্রত্যাহারের জন্য গান্ধী জিন্নাহকে অনুরোধ জানিয়ে যে পত্র লেখেন তদুত্তরে জিন্নাহ গান্ধীকে যে কথাগুলো লেখেন তা সবিশেষ প্রণিধানযোগ্য। জিন্নাহ শাসনতান্ত্রিক বেআইনী কাজের সমালোচনা করে ভবিষ্যতে দেশের জন্য এর ফলাফল যে কিরূপ মারাত্মক হবে তা উল্লেখ করে বলেনঃ

"আপনি অনুগ্রহ পূর্বক প্রস্তাব করেছেন যে, 'দেশের সামনে যে নবীন জীবনের সম্ভাবনা দেখা দিয়েছে আমি যেন তাতে অংশগ্রহণ করি।' আপনার এই প্রস্তাবের জন্য ধন্যবাদ জানাই। 'নবীন জীবন' বলতে আপনি যদি আপনার কর্মপদ্ধতি ও কর্মসূচীর প্রতি ইঙ্গিত করে থাকেন, তাহলে আমার ভয় হচ্ছে যে আমি তা গ্রহণ করতে অক্ষম।.... আপনার কর্মপদ্ধতি ইতিমধ্যেই সেই সব প্রতিষ্ঠানের বিভাজন এবং দলাদলি সৃষ্টি করেছে যার সঙ্গে আপনি যুক্ত হয়েছেন। দেশের জনজীবনেও আপনার দান অনুরূপ। কেবল হিন্দু মুসলমানের

www.amarboi.org

মধ্যেই নয়-হিন্দুও হিন্দু, মুসলমান ও মুসলমান, এমন কি পিতাপুত্রের মধ্যেও বিবাদ সৃষ্টি হয়েছে এবং দেশের সর্বত্র জনসাধারণ বেপরোয়া হয়ে উঠেছে। আপনার চরমপন্থী কর্মসূচী এখনকার মত প্রধানতঃ অনভিজ্ঞ যুবক সম্প্রদায় এবং অজ্ঞ ও নিরক্ষরদের মনে সাড়া জাগিয়েছে। এ সবের তাৎপর্য হল আগাগোড়া গোলমাল ও বিশৃঙ্খলা। এর পরিণাম যে কি হবে তা ভাবতেও আমার হৃদকম্প হচ্ছে। জাতীয়তাবাদীদের সামনে একমাত্র পথ হল সম্মিলিত হয়ে যথাসম্ভব শীঘ্র পূর্ণদায়িত্বশীল সরকার প্রতিষ্ঠার জন্য সর্বজন মান্য কোন কর্মসূচী অনুসারে কাজে লেগে পড়া। এ জাতীয় কর্মসূচী কোন ব্যক্তি বিশেষ চাপিয়ে দিতে পারেন না, দেশের তাবৎ জাতীয়তাবাদী নেতাদের অনুমোদন ও সমর্থন চাই এর পিছনে। আর এই লক্ষ্যের পরিপূর্তির জন্য আমি এবং আমার সহকর্মীরা কাজ করে যাব।" (পীরজাদা সমগ্রন্থ পৃষ্ঠা ৮৭-৮৮)।

গান্ধীজী মাওলানা মোহাম্মদ আলী ও শওকত আলীর নেতৃত্বে পরিচালিত খেলাফত আন্দোলনকে সমর্থন জানিয়ে আর একটা বিরাট ভুল করেছিলেন। প্রথম মহাযুদ্ধের অবসানে তুর্কিতে খেলাফতের অবসান ঘটে। মুসলমানদের মতে, খলিফা হলেন মুসলিম জগতের আধ্যাত্মিক ধর্মীয় প্রধান। তাই খেলাফতের অবসান মুসলমানদের ধর্মীয় অনুভূতিতে মারাত্মকভাবে আঘাত করে এবং দেশব্যাপী খেলাফত আন্দোলন শুরু হয়। এই আন্দোলন যে সম্পূর্ণ ধর্মীয় আন্দোলন ছিল ১৯২১ সালের ২০শে অক্টোবর গান্ধীজীর ইয়ং ইন্ডিয়া বিবৃতির মধ্যেই তার স্বীকৃতি পাওয়া যায়। তিনি লিখেছেন, "I claim that with us both the khilafat is the central fact, with Maulana Muhammad Ali because it is his "religion", with me because, in laying down my life for the Khilafat, I ensure the Safety of the cow, that is my religion, from the Mussalman Knife." (Partition of India: Legend and Reality by H. M. Seervai, p-13).

আমি দাবি করছি যে, মাওলানা মোহাম্মদ আলী ও আমার মধ্যে খেলাফত আন্দোলন ছিল মূল কেন্দ্রীয় বিবেচ্য বিষয়। এটা ছিল নিঃসন্দেহে তাঁর ধর্মীয় বিষয় আর খেলাফতের জন্য জীবন দান ছিল আমার পক্ষে মুসলমানদের হাত থেকে গোমাতাকে বাঁচান।"

এখানে উল্লেখযোগ্য যে, গান্ধীর নেতৃত্বে যখন কংগ্রেস খেলাফত আন্দোলনে যোগ দিল তখন হিন্দু মুসলমান ঐক্য ও হিন্দু সম্প্রদায়ের শুভেচ্ছা

www.amarboi.org

অর্জনের জন্য মুসলমানরা গরু জবাই বন্ধ করতে স্বীকৃত হয়েছিল। গান্ধী বিশ্বাস করতেন যে, খেলাফত আন্দোলন সমর্থন করে তিনি হিন্দু মুসলিম ঐক্যকে আরো সুদৃঢ় করেছিলেন। কিন্তু মুন্সীর ভাষায়ঃ "Jinnah, however, warned Gandhiji not to encourage fanaticism of Muslim religious leaders and their followers. Indeed he was not the only person who foresaw danger in the Khilafat movement. Srinivas Sastri wrote to Sri P,S, Siwaswamy Aiyar... I fear the Khilafat movement is going to lead us into disaster." (partition of India: Legend and Reality by H. M. Seervai, p.-13).

"জিন্নাহ কিন্তু মুসলমান নেতাদের ও তাদের অনুসারীদের ধর্মীয় উন্মাদনায় উৎসাহ যোগাতে গান্ধীকে নিষেধ করেছিলেন। বাস্তবিকপক্ষে খেলাফত আন্দোলন সমর্থনের বিকল্প সম্পর্কে তিনিই যে একমাত্র সচেতন ব্যক্তি ছিলেন তা নয় কংগ্রেস নেতা শ্রী নিবাস শাস্ত্রীও এ ব্যাপারে বেশ সচেতন ছিলেন। তিনি শিব স্বামী আয়ারকে লিখেছিলেন ..."আমার ভয় হচ্ছে খেলাফত আন্দোলন ভবিষ্যতে আমাদের জন্য গভীর ধ্বংসের কারণ হয়ে দেখা দিতে পারে।"

এ ছাড়াও আরো অনেক রাজনৈতিক নেতার মতে, খেলাফত আন্দোলন সমর্থন গান্ধীর পক্ষে মারাত্মক ভুল হয়েছিল। কয়েক বছর পরে বাংলার গভর্নর রিচার্ড কেসি'র সঙ্গে অনেকগুলো সাক্ষাতকারের একটিতে গান্ধী নিজে স্বীকার করেছিলেনঃ

"Jinnah had told him that he (Gandhi) had ruined politics in India by dragging up a lot of unwholesome elements in Indian life and giving them political prominence, that it was a crime to mix up politics and religion the way he had done." (Partition of India Legend and Reality: By H,.M. Seervai. p.-131).

"জিন্নাহ গান্ধীকে বলেছিলেন যে, তিনি (গান্ধী) ভারতের রাজনীতিতে কতকগুলো অস্বাস্থ্যকর উপাদানের আমদানি করে এবং তাদেরকে ভারতীয় জীবন ধারায় গুরুত্ব দিয়ে ভারতের রাজনীতিকে ধ্বংস করে দিয়েছিলেন। তিনি যে ভাবে রাজনীতিকে ধর্মের সঙ্গে মিশিয়ে ফেলেছিলেন এটা হয়েছিল একটা মারাত্মক অপরাধ।

www.amarboi.org

ভারতের অখন্ডতা রক্ষার জন্য রাজনৈতিক লক্ষ্য অর্জনের উদ্দেশ্যে ধর্মীয় অনুভূতির কাছে আবেদন জানানো যে, কত মারাত্মক সে শিক্ষা রাজনৈতিক নেতাদের তখনও হয়নি। এর ফলে পরবর্তী বছরগুলোতে দেশ আরো মারাত্মক বিপর্যয়ের সম্মুখীন হয়েছিল।

একটু আগেই বলেছি, জনগণের কণ্ঠরোধকারী নিবর্তনমূলক বৃটিশ আইন ১৯১৯ সালের জানুয়ারীতে ইম্পরিয়াল কাউন্সিল প্রবর্তন করলো। আইনটি প্রত্যাহারের জন্য গান্ধী ভাইসরয়কে অনুরোধ জানিয়ে স্পষ্টভাবে বলেছিলেন দেশের লোক এ আইন মানবেনা, প্রয়োজনে প্রতিরোধ করবে। এই ঘোষণা দিয়ে গান্ধী দেশের লোকের দারুণভাবে দৃষ্টি আকর্ষণ করতে সমর্থ হলেন এবং তাঁর জনপ্রিয়তা দারুণভাবে বৃদ্ধি পেল। সরোজিনী নাইডু, বল্লভ ভাই প্যাটেল এবং আরো অনেক নেতা গান্ধীকে সমর্থন করে একই মনোভাব প্রকাশ করলো কিন্তু তারা হিংসাত্মক কোন পন্থা গ্রহণের বিরুদ্ধে মত প্রকাশ করলেন। ভাইসরয়ের কাউন্সিল সভায় যেটিতে জিন্নাহ সাহেব ১৯০৯ সাল থেকে একটানা মেম্বার হিসেবে নির্বাচিত হয়ে আসছিলেন তিনি কঠিনভাবে এই বিলের বিরোধিতা করলেন। তিনি তাঁর বক্তৃতায় বললেন, এটা আমার কর্তব্য আপনাদের বলে দেয়া যে যদি এই আইনের ধারাগুলো পাস হয় তবে দেশের একপ্রান্ত থেকে অন্যপ্রান্ত পর্যন্ত এমন অসন্তোষ ও আন্দোলন শুরু হয়ে যাবে যা পূর্বে আপনারা কেহ দেখেননি। (জিন্নাহ -পাকিস্তান-নতুন ভাবনা-শৈলেশ কুমার বন্দ্যোপাধ্যায় পৃষ্ঠা-৩২)

এই আইন পাসের পরে পরেই প্রতিবাদ হিসাবে জিন্নাহ ইম্পিরিয়াল কাউন্সিল থেকে পদত্যাগ করে ভাইসরয়কে যে পত্র পাঠালেন তা তাঁর গভীর দেশপ্রেম ও দৃঢ় চিত্ততার পরিচায়ক।

"এই বিল পাস করে আপনার সরকার মাত্র এক বছর পূর্বে যুদ্ধ সম্মেলনে ভারতবাসীর সাহায্য চেয়ে যে সব যুক্তি দিয়েছিল তার প্রতিটিকে সক্রিয়ভাবে নস্যাৎ করেছে। গ্রেট বৃটেন যে সব নীতি সংরক্ষণার্থে যুদ্ধ করেছিল, সরকারের এই পদক্ষেপের দ্বারা নিষ্ঠুরভাবে তা পদদলিত হয়েছে। ন্যায়বিচারের মূলনীতি অস্বীকৃত হয়েছে এবং যখন রাষ্ট্রের সামনে কোনরকম সত্যিকারের সংকট নেই তখন জনসাধারণের মৌলিক অধিকার খর্ব করা হয়েছে। আর এটা করা হয়েছে এমন এক মাত্রাতিরিক্ত ন্যক্কারজনক ও অযোগ্য আমলাতন্ত্রের দ্বারা যার না আছে জনসাধারণের প্রতি কোন দায়দায়িত্ব, না আছে যথার্থ জনমতের সঙ্গে বিন্দুমাত্র যোগাযোগ।... সুতরাং এই বিল পাস করা এবং যে ভাবে তা

www.amarboi.org

ত্রিশ দশকের শেষ দিকে কায়েদে আযম ও মিস্ ফাতেমা জিন্নাহ

www.amarboi.org

পাস করা হয়েছে তার প্রতিবাদে আমার ইস্তফা পাঠাচ্ছি, কারণ আমি মনে করি বর্তমান অবস্থায় কাউন্সিলে থেকে আমি দেশের জনসাধারণের কোন কাজে লাগবোনা। এ ছাড়া কাউন্সিলের সদস্য জনপ্রতিনিধিদের অভিমতের প্রতি যে সরকার এমন প্রচন্ড তাচ্ছিল্য প্রদর্শন করে তার সঙ্গে সহযোগিতা করা কারও আত্মমর্যাদার অনুকূল নয়। কাউন্সিলের বাইরে যে অগণিত জনসাধারণ রয়েছেন তাঁদের মনোভাব এবং আবেগের মর্যাদা রক্ষার্থেও আমার এই সিদ্ধান্ত। আমার মতে যে সরকার শান্তির সময়ে এ জাতীয় আইন প্রণয়ন করে সে আর নিজেকে সভ্য সরকার বলে দাবি করতে পারেনা।" (পীরজাদা কর্তৃক সমগ্রন্থ-পৃষ্ঠা-৬৫)।

বৃটিশ সরকার জিন্নাহ্‌র কথায় বা গান্ধীর উপদেশে কর্ণপাত করার প্রয়োজনবোধ না করে নমিনেটেড মেম্বার দ্বারা গঠিত হাউসের সাহায্যে বিলটি পাস করলেন। ২২শে মার্চ ভাইসরয় বিলটিতে সই করলেন। পরদিনই গান্ধী সমগ্র দেশে ব্যবসা বাণিজ্য স্থগিত রাখার আহ্বান জানালেন এবং ৬ই এপ্রিল দেশের মানুষকে ঐ দিনটিতে উপবাস ও উপাসনা করার নির্দেশ দিলেন। জিন্নাহ্ ইম্পিরিয়াল কাউন্সিল সভা থেকে এটাকে কালো আইন আখ্যায়িত করে প্রতিবাদ হিসাবে পদত্যাগ করলেন। জিন্নাহ্‌র এই পদত্যাগ তাঁর জন্য যথেষ্ট ক্ষতির কারণ হয়েছিল, কারণ এই সভাতে তিনি অত্যন্ত দক্ষতার সঙ্গে দেশের সেবা করে আসছিলেন যার রেকর্ড ছিল অতিমাত্রায় উজ্জ্বল। কিন্তু তাঁর পদত্যাগ এই মুহূর্তে গান্ধীর আহ্বানে জনমনে যে আলোড়নের সৃষ্টি করতে সক্ষম হলো তার তুলনায় তেমন কোন প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করতে সমর্থ হলোনা। প্রতিবাদে কাজ না হলে প্রতিরোধের আহবানে দেশ পূর্ণভাবে সাড়া দিল এবং গান্ধীকে মহাত্মারূপে আখ্যায়িত করলো। ৬ই তারিখের হরতাল ছিল দেশব্যাপী সর্বপ্রথম হরতাল এবং ঐদিন দেশের সর্বত্র সব কাজ কর্ম বন্ধ ছিল; এ সম্পর্কে সে সময় প্রকাশিত একটি সরকারী রিপোর্ট অনুযায়ী (১৯১৯) দেশের অবস্থা নিম্নরূপ দাঁড়িয়েছিল।

"জনসাধারণের মধ্যে ব্যাপ্ত উত্তেজনার একটি উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য ছিল হিন্দু ও মুসলমানের মধ্যে অভূতপূর্ব হৃদ্যতা। নেতাদের ঐক্য বেশ কিছুদিন যাবৎ জাতীয়তাবাদী মঞ্চের একটা নির্দিষ্ট পরিকল্পনার রূপ নিয়েছিল। জনসাধারণের মধ্যে এই উত্তেজনা ও চাঞ্চল্যের সময়ে এমনকি নিম্ন শ্রেণীরাও অন্ততঃ একবারের জন্য তাদের মধ্যকার ভেদাভেদ বিস্মৃত হতে প্রস্তুত হয়েছিল। এতে ভ্রাতৃত্ববোধের অসাধারণ দৃষ্টান্ত পরিদৃষ্ট হল। হিন্দুরা প্রকাশ্যে

www.amarboi.org

মুসলমানদের হাতে জল নিয়ে পান করা আরম্ভ করলেন। শোভাযাত্রা সমূহে যে সব ধ্বনি উচ্চারিত হতো এবং যে সব শ্লোগান লেখা ব্যানার বহন করা হতো তার মূল বক্তব্য ছিল হিন্দু মুসলিম ঐক্য। মসজিদের বেদী থেকে এমনকি হিন্দু নেতাদের বক্তৃতা দিতে দেয়া হয়েছিল।" (সিতারামাইয়া সমগ্রন্থ, প্রথম খন্ড, পৃষ্ঠা-২৭৫)।

এসময়ে ভারতের রাজনীতি একটা অভাবিতপূর্ব মোড় নিল। ১৯০৬ সাল থেকে জিন্নাহ্ অত্যন্ত দক্ষতা ও কৃতিত্বের সঙ্গে কংগ্রেসের সেবা করে আসছিলেন। লোকমান্য তিলক ও অ্যানে বেসান্তের পর তারই কংগ্রেসে কর্ণধার হবার কথা ছিল, কিন্তু এই ঘটনার পর ভারতীয় রাজনীতিতে অনেক দেরিতে আগত গান্ধী জনপ্রিয়তা ও মর্যাদার দিক থেকে অনেক উপরে চলে গেলেন অর্থাৎ জিন্নাহর যে অবস্থানে পৌছার কথা সে অবস্থান দখল করে নিল মিঃ গান্ধী ।

জিন্নাহর বিবাহ

রাউলাট আইনের বিরুদ্ধে আন্দোলন বা খেলাফত আন্দোলনের অব্যবহিত পূর্বে জিন্নাহর জীবনে একটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা ঘটে গেল। জিন্নাহ্ সাহেবের বাল্যকালে এক বিবাহ্ হয়েছিল যে স্ত্রী তিনি বিলেতে লেখাপড়া করার সময় মারা যায়। তার পর তিনি আর বিয়ে করেননি। ১৯১৭ সালে জিন্নাহর বয়স যখন ৪০ বছর এ সময় রতন বাঈ নামে পার্সি সম্প্রদায়ের এক সুন্দরী সুশিক্ষিতা তরুণী জিন্নাহ্ সাহেবের দৃষ্টি আকর্ষণে সমর্থ হয়। জিন্নাহ্ অত্যন্ত স্মার্ট ও সুপুরুষ, মর্যাদাবান ব্যারিস্টার হিসেবে অনেক তরুণী তাঁর দৃষ্টি আকর্ষণ বা ঘনিষ্ঠ হবার চেষ্টা করেছিলেন। কিন্তু অত্যন্ত পুত ও কঠিন চরিত্রের এ মানুষটি কাউকেই আমল দেয়নি। শোনা যায়, মিসেস সরোজিনী নাইডুও জিন্নাহ্ সাহেবকে উদ্দেশ্য করে অনেক প্রেমের কবিতা রচনা করেন কিন্তু জিন্নাহর তরফ থেকে তেমন কোন অনুকূল সাড়া পাওয়া যায়নি। এতদসত্ত্বেও সরোজিনী নাইডু বরাবরই তাঁর শুভাকাঙ্খী ছিলেন এবং কংগ্রেসে বরাবরই জিন্নাহকে সমর্থন দিয়ে আসছিলেন।

রতি বা রতন বাঈ ছিলেন বিখ্যাত পার্সি সম্প্রদায়ের নেতা বিরাট ধনী স্যার দিনশা পেটিটের কন্যা। দু'জনের বয়সের বিরাট পার্থক্য ও অন্যান্য নানা কারণে দিনশা পেটিট এ বিবাহে রাজি হলেন না এবং মেয়ে অপ্রাপ্ত বয়স্কা কারণ দেখিয়ে কোর্ট থেকে ইনজাংশান জারি করিয়ে উভয়ের দেখা সাক্ষাত বন্ধ করালেন। কিন্তু জিন্নাহ ও রতি দু'জনেই দু'জনকে বিয়ে করার জন্য দৃঢ়

www.amarboi.org

চল্লিশ বৎসর বয়সে রতন বাঈ-কে বিয়ে করার সময় মিঃ জিন্নাহ

www.amarboi.org

প্রতিজ্ঞ বলে তাঁরা এক বছর অপেক্ষা করে পরবর্তী বছর ১৯১৮ সালের এপ্রিলে রতন বাঈ যখন ১৮ বছর বয়ঃপ্রাপ্ত হলো তখন দু'জনে কোর্ট ম্যারেজ করলো। রতন বাঈ ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করলো। জিন্নাহর বিয়ের সংবাদে সরোজিনী নাইডু তাঁর এক বান্ধবীকে লিখেনঃ "জিন্নাহ শেষ পর্যন্ত তাঁর মনের মত সবুজ পুষ্প চয়নে সক্ষম হয়েছেন। তবে বাচ্চা মেয়েটি কত বড় ত্যাগ স্বীকার করেছে এখন না বুঝলেও পরে বুঝবে। কথাটি পরবর্তী কালে বাস্তব সত্য হিসাবে প্রমাণিত হয়েছিল। জিন্নাহর জীবনে হাসি-আনন্দ দেখা দিলেও তা বেশীদিন স্থায়ী হলো না। অল্পদিনেই রতি জিন্নাহর ব্যবহারে ক্লান্তিবোধ করতে লাগলো। এ বয়সে মেয়েরা স্বাভাবিকভাবেই চাইবে স্বামীকে নিয়ে বিভিন্ন পার্টিতে, জলসায়, উৎসবে আনন্দ করে বেড়াতে। কিন্তু ঐ বয়সে জিন্নাহর মত মনের মানুষের পক্ষে মিউজিয়ামে, হলিডে স্পট বা পার্কে ঘুরে বেড়ানো বা নাচগান, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান নিয়ে মেতে থাকা সম্ভব ছিলনা।

রতি অল্পদিনেই জিন্নাহ সাহেবের রাজনীতিবিদদের সঙ্গে সীমাহীন আলোচনায় কালক্ষেপণ ও আইনের বই নিয়ে ডুবে থাকায় অতিশয় বিরক্ত হয়ে পড়লো এবং অল্পদিনেই দু'জনের সম্পর্ক তিক্ত হয়ে উঠলো। যা হোক, বছর দু'এক মোটামুটি তাদের ভালই কেটেছে। ইতিমধ্যে দীনা নামে রতির একটি মেয়ে হলো। বিয়ের দু'বছরের মধ্যেই রতনবাঈ বুঝতে পারলো জিন্নাহকে বিয়ে করে কত বড় মহাভুল সে করেছে। রতি ছিল বোম্বের ধনবান অভিজাত পরিবারের কন্যা। জিন্নাহ সাহেবও ছিলেন অতিশয় মর্যাদাবান ব্যক্তি। তাই রতির মত শিক্ষিতা রুচিবান মেয়ের পক্ষে ক্লাবে জলসায় পরপুরুষের সঙ্গে আমোদ আহলাদ করে জীবন কাটানো সম্ভব ছিলনা। ফলে ব্যর্থ জীবনের গ্লানি বহন করতে করতে অনুশোচনায় বিষাদগ্রস্ত রতি মানসিক ব্যাধিতে আক্রান্ত হয়ে জিন্নাহ সাহেবকে ত্যাগ করে মায়ের কাছে চলে যায়। এরপর অসুস্থ অবস্থায় বিয়ের দশ বৎসর পর ১৯২৯ সনে রতি ইহলোক ত্যাগ করে। অবশ্য রতি জিন্নাহকে ত্যাগ করে চলে যাওয়ার পর বন্ধুবান্ধবের চেষ্টায় দু'একবার উভয়ের মধ্যে খানিকটা বুঝাপড়া হলেও তা বেশীদিন টেকেনি। রতি জিন্নাহর সঙ্গ যে ভাবে কামনা করতো জিন্নাহর পক্ষে তা দেওয়া সম্ভব ছিলনা সে সময় জিন্নাহ রাজনীতিতে গভীরভাবে জড়িয়ে পড়েছিলেন। এছাড়া তিনি ছিলেন ভীষণভাবে বাস্তববাদী, ভাবাবেগ শূন্য মানুষ। তাঁর চরিত্রের গঠনই ছিল সাধারণ মানুষের চাইতে ব্যতিক্রমধর্মী। যে মানুষ সর্ববৃহৎ মুসলিম রাষ্ট্রের জন্মদাতা হিসাবে নিয়তির দ্বারা নির্দিষ্ট হয়েছিলেন তাঁর স্বভাব, মানসিক গঠন

www.amarboi.org

সাধারণ দশজনের চাইতে স্বতন্ত্র হতে বাধ্য। সুন্দরী স্ত্রী নিয়ে আমোদ-প্রমোদে দিনযাপন করতে গেলে তদানীন্তন ভারতীয় রাজনীতিতে যে অসাধারণ ভূমিকা তিনি পালন করেছিলেন এবং তার জন্য যে প্রচুর সময় ও অখন্ড মনোযোগ তাঁকে দিতে হয়েছিল তা দেয়া কখনো সম্ভব হত না।

যাই হোক যে কিছুদিন তারা একত্রে আনন্দে কাটিয়েছিলেন তার মধ্যে কিছু কিছু উল্লেখযোগ্য ঘটনা ঘটেছিল। তার মধ্যে একটি হলো জিন্নাহ ও তাঁর স্ত্রীর নেতৃত্বে বোম্বের গভর্নর স্যার উইলিংডনের নাগরিক সম্বর্ধনা বাতিল করা। ১৯১৮ সালের ১০ই জুন বোম্বেতে সরকারী যুদ্ধ সম্মেলনে জিন্নাহ যোগ দেন এবং সেখানে হোমরুল লীগের প্রতি আনুগত্য, সিভিল সার্ভিসের ভারতীয়করণ এবং দেশে দায়িত্বশীল সরকার স্থাপনের প্রশ্নে বোম্বের গভর্নর উইলিংডনের সঙ্গে প্রকাশ্যে বাকবিতন্ডায় প্রবৃত্ত হন। ছোট লাটের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত ঐ সম্মেলনে জিন্নাহর বক্তৃতা শুধু তাঁর অসম সাহস ও বুদ্ধিমত্তার পরিচয় বহন করেনি, রাজনীতিতে তাঁর তীক্ষ্ণ দূরদৃষ্টির পরিচয়ও বহন করে । যুদ্ধ জয়ের জন্য কেবল ভাড়াটিয়া সিপাহী দিয়ে কাজ হবে না, ভারতীয় যুবকদের দ্বারা জাতীয় সৈন্যবাহিনী গঠনের প্রস্তাব দিয়ে তিনি বলেনঃ "ভারতবাসীরা এই কথা অনুভব করা পছন্দ করে যে তারা সাম্রাজ্যের নাগরিক। আর এরকম হলেই তারা উদ্বুদ্ধ হয়ে এগিয়ে আসবে ও স্বার্থ ত্যাগ করবে। আমরা কেবল কথা শুনতে চাইনা। এ ব্যাপারটার নিষ্পত্তি অনির্দিষ্ট কালের জন্য মূলতবি করা হোক এও আমরা চাই না। আমরা চাই কাজ ও অবিলম্বে তার বাস্তবায়ন। ভারতবর্ষকে সাম্রাজ্যের অংশীদার না করা পর্যন্ত, তাকে বিশ্বাস না করা পর্যন্ত আমরা ভারতের যথার্থ প্রতিরক্ষায় সফল হবো না। সাম্রাজ্যকে সাহায্য করাতো আরো দূরের কথা।"

(সূত্রঃ জিন্নাহ পাকিস্তান-নতুন ভাবনা শৈলেশকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, পৃষ্ঠা-৩০-৩১ কোলকাতা থেকে প্রকাশিত)

বলা বাহুল্য ভারতীয় স্বার্থের পক্ষে এত স্পষ্ট কথা, তাও ছোট লাটের মুখের উপর এটা বলা কম সাহসের কথা নয়। কথাগুলি ছোট লাটের সঙ্গত কারণেই ভাল লাগেনি এবং তিনি বারে বারে জিন্নাহর বক্তৃতায় বাধা দিচ্ছিলেন। এর সাতদিন পরে বোম্বের এক জনসভায় হোমরুল লীগের প্রতি ছোটলাটের অপমানজনক মন্তব্যের জন্য জিন্নাহ তার খোলাখুলি নিন্দা করেন।

www.amarboi.org

সে সভায় লর্ড উইলিংডন যুদ্ধে সাহায্যের ব্যাপারে ভারতীয়দের আন্তরিকতার সন্দেহ প্রকাশ করে কয়েকজন সম্মানিত নেতার নাম উল্লেখ করেন যার মধ্যে দু'চারজন ছিল হোমরুল লীগের নেতা। এ ঘটনার পরপরই একদিন গভর্নর উইলিংডনের বাসভবনে এক ভোজসভায় লেডী উইলিংডন মিসেস রতি জিন্নাহর পোশাক সম্পর্কে বিরূপ মন্তব্য করার প্রতিবাদে জিন্নাহ স্ত্রীর হাত ধরে ভোজসভা থেকে গট্ গট্ করে বেরিয়ে আসেন।

লর্ড উইলিংডন-জিন্নাহ ও জিন্নাহ হল

এর কিছুদিন পর বৎসরের শেষ দিকে লর্ড উইলিংডন যখন মাদ্রাজের গভর্নর হিসাবে বদলি হন তখন বোম্বের মিউনিসিপ্যাল করপোরেশন তাকে একটি নাগরিক সম্বর্ধনা দেয়ার প্রস্তাব করে কিন্তু জিন্নাহর প্রচেষ্টায় সে সম্বর্ধনার আয়োজন পন্ড হয়ে যায় । জিন্নাহ বোম্বের তরুণ ব্যারিস্টার, এডভোকেট ও যুবকদের একত্রিত করে সম্বর্ধনার প্রস্তাব পাসের জন্য আহূত সভায় হলের সম্মুখের সকল সীট প্রথমেই দখল করে ফেলেন এবং প্রস্তাব পাস হতে দিলেন না। ফলে সভা পন্ড হয়ে গেল এবং পুলিশ লাঠি চার্জ করে জোর করে সবাইকে হল থেকে বের করে দিল। এ সময় রতি সর্বক্ষণ জিন্নাহর পাশে ছিলেন এবং প্রতিবাদ সভার আয়োজনে স্বামীকে সাহায্য করেছিলেন। পুলিশের সঙ্গে এ সংঘর্ষে জিন্নাহ কিছুটা আহত হয়েছিলেন। হলের বাইরে রতিকে পাশে নিয়ে তাঁর সমর্থকদের উদ্দেশ্যে বলেন,– Gentlemen you are citizens of Bombay. You have today scored a great victory for democracy. To day, December 11, is a Red-Letter day in the history of Bombay. Go & rejoice . (Ref: Understanding the Muslim mind, by Rajmohan Gandhi, page-131).

"ভদ্র মহোদয়গণ, আপনারা বোম্বের নাগরিক। আজ আপনারা গণতন্ত্রের জন্য একটি বিরাট জয়ের অধিকারী হয়েছেন। আজ ডিসেম্বর ১১ তারিখ বোম্বের ইতিহাসে একটি উজ্জ্বল রক্তিম দিন হিসাবে চিহ্নিত হবে। চলে যান এবং আপনারা গিয়ে আনন্দ উৎসব করুন।" (আন্ডারস্টেন্ডিং দি মুসলিম মাইন্ড, রাজমোহন গান্ধী পৃষ্ঠা-১৩১)।

এই ঘটনা জিন্নাহ সাহেবকে হঠাৎ বোম্বের তরুণ সমাজের কাছে 'হিরো' বানিয়ে ফেললো তাঁর সমর্থকরা তাঁর সমর্থনে ৩০ হাজার টাকা যোগাড় করে বোম্বের বিখ্যাত জিন্নাহ হল তৈরি করে ফেললো, যেটি পরবর্তীকালের শত

www.amarboi.org

ভিত্তিটার [illegible] মধ্যে এখনো সেখানে টিকে আছে। দেওয়ালের একপাশে একটি ফলকে এখনো লেখা আছে ঃ

"Under the brave & brillient leadership of Muhammad Ali Jinnah."

এই ঘটনা থেকেই প্রমাণ হয় রাজনৈতিক জীবনে জিন্নাহ কতখানি সৎ ও সাহসী ছিলেন। ইংরেজদের দালালী করাই তাঁর পেশা, এ সব মন্তব্য যে কত ভ্রান্ত এ থেকেই তার পরিষ্কার প্রমাণ পাওয়া যায়। জিন্নাহকে জানতে হলে ও বুঝতে হলে তাঁর অতীত রাজনৈতিক জীবন, তৎকালীন রাজনৈতিক প্রেক্ষাপট, তাঁর চরিত্র ও মানসিকতা সম্বন্ধে কিছুটা আলোচনা প্রয়োজন। জিন্নাহ ভাই পুঞ্জের প্রথম সন্তান মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ ১৮৭৬ সনের ২৬শে ডিসেম্বর করাচীতে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁরা ছিলেন শিয়াপন্থী খোঁজা সম্প্রদায়ের লোক। তাঁদের আদি বাসস্থান ছিল গুজরাটের কাঙ্গিওয়ার যেটা গান্ধীরও জন্মস্থান। ছাত্রজীবন তাঁর মাদ্রাসায় শুরু হলেও পরবর্তীতে করাচীর ক্রিশ্চিয়ান মিশনারী সোসাইটির প্রতিষ্ঠিত হাইস্কুলে বৎসরখানেক পড়ে ১৮৯২ সনে আইন পড়ার জন্য তিনি লন্ডন রওয়ানা হয়ে যান এবং ১৮৯৫ সনে অল্পবয়সে কৃতিত্বের সঙ্গে ব্যারিস্টারী পাস করে পরবর্তী বৎসর আগস্ট মাসে বোম্বে হাইকোর্টে ব্যারিস্টারী আরম্ভ করেন। বিলাতে পড়াশুনার সময় জিন্নাহ নিয়মিত পার্লামেন্ট সদস্য দাদা ভাই নওরোজীর বিভিন্ন বিষয়ের উপর সারগর্ভ বক্তৃতা মন দিয়ে শুনতেন। বিলাতে থাকা অবস্থায় তাঁর আরো দু'টি হবি ছিল নিয়মিত বৃটিশ মিউজিয়ামের পাঠাগারে যাওয়া এবং রবিবারে হাইড পার্কে গিয়ে বিভিন্ন রাজনীতিবিদদের বক্তৃতা শোনা। 'ভারতের গ্র্যান্ড ওল্ডম্যান' দাদাভাই নওরোজীর একনিষ্ঠ ভক্ত ছিলেন জিন্নাহ এবং মনে মনে ইচ্ছা পোষণ করতেন ভারতে গিয়ে তাঁর মতই লিবারেল ও সাংবিধানিক পার্লামেন্টারিয়ান হবেন।

ব্যারিস্টারী আরম্ভ করার পর প্রথম দিকে তাঁর তেমন প্রসার হলো না, তাই কিছুদিন তাঁকে তৃতীয় প্রেসিডেন্সী ম্যাজিস্ট্রেটের চাকরি নিতে হয়। চাকরিতে থাকা অবস্থায় তাঁর ফৌজদারী আইনের খ্যাতি চারদিকে ছড়িয়ে পড়ে এবং মাস কয়েক পরে চাকরি ছেড়ে স্বাধীনভাবে আইন ব্যবসা আরম্ভ করেন। এবার ভাগ্যদেবী খুব সহসা তাঁর প্রতি সুপ্রসন্ন হলো, দু'বছরের মধ্যেই তাঁর মাসিক আয় দু'হাজার টাকায় এসে দাঁড়ালো যেটা তৎকালীন অর্থমূল্য অনুযায়ী অভাবিত পূর্ব এবং আজকের মূল্য অনুযায়ী দু'লক্ষ টাকারও বেশি। অল্পদিনেই তিনি বোম্বের একজন উচ্চশ্রেণীর ব্যয়বহুল ব্যারিস্টার হিসাবে খ্যাতি লাভ করলেন।

www.amarboi.org

এ সময় তিনি কংগ্রেসের প্রথম সারির নেতা গোপাল কৃষ্ণ গোখলের ঘনিষ্ট সহযোগে আসেন। গোখলে ছিলেন অসাম্প্রদায়িক উদার মন ও নির্মল চরিত্রের মানুষ। জিন্নাহ গোখলের রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গির প্রতি এত আকৃষ্ট হয়েছিলেন যে তিনি আশা প্রকাশ করেছিলেন ভবিষ্যতে তিনি একজন মুসলিম গোখলে হবেন। ১৯০৬ সনের ডিসেম্বর মাসে সে বছরের কংগ্রেসের সভাপতি দাদাভাই নওরোজীর একান্ত সচিব হিসাবে কোলকাতা অধিবেশনে যোগদান করেন। এটাই হলো জিন্নাহর প্রথম কংগ্রেস রাজনীতিতে প্রবেশ। সেখানে একমাস পর ৮ই জানুয়ারী তিনি কোলকাতায় ইন্ডিয়ান মুসলিম এসোসিয়েশনের ভাইস প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হন। এখানে উল্লেখযোগ্য যে, এই সমিতিটি ১৯০৬ সনে ঢাকায় স্যার সলিমউল্লাহর নেতৃত্বে গঠিত মুসলিম লীগের অনেকটা পাল্টা সংগঠন হিসাবে পরিচিত ছিল। ঢাকায় যে মুসলিম লীগ গঠিত হয়েছিল তার উদ্দেশ্য ছিল বৃটিশ সরকারের সঙ্গে দেন দরবার করে মুসলিম স্বার্থরক্ষার চেষ্টা করা। এতদিনে ভারতীয় মুসলমানদের মধ্যে অনেকেই বুঝতে পেরেছিলেন যে কংগ্রেস নিজেকে যদিও অসাম্প্রদায়িক প্রতিষ্ঠান রূপে পরিচয় দিয়ে ভারতের হিন্দু মুসলিম সবাইর স্বার্থ রক্ষার প্রতিভূ হিসাবে জাহির করার চেষ্টা করছে তথাপি মূলতঃ হিন্দু স্বার্থ রক্ষার প্রতিই তাদের আগ্রহ অত্যন্ত বেশী। তাই প্রধানতঃ মুসলিম স্বার্থরক্ষার উদ্দেশ্যে ঢাকায় ১৯০৬ সনে মুসলিম লীগ গঠিত হয় এবং আগাখানের নেতৃত্বে দেন দরবার করে ১৯০৯ সনে মর্লিমিন্টো শাসন সংস্কারের সময় মুসলমানরদের জন্য স্বতন্ত্র নির্বাচন প্রথা বৃটিশ সরকার কর্তৃক স্বীকার করিয়ে নিতে সক্ষম হয়। কংগ্রেস প্রথমে স্বতন্ত্র নির্বাচন প্রথার বিরোধিতা করলেও পরে তা মেনে নেয়।

কোলকাতার মুসলিম এসোসিয়েশন যদিও বেশীদিন স্থায়ী হয়নি তথাপি তাদের উদ্দেশ্য ছিল মুসলমানদের বিশেষ অভাব অভিযোগ লোক চক্ষুর গোচরে আনা ও সে সঙ্গে তাদের স্বার্থরক্ষা করতে গিয়ে ভারতবাসীর রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক উন্নতির জন্য অন্যান্য সম্প্রদায়ের সঙ্গে একত্রে মিলেমিশে কাজ করা।

স্বতন্ত্র নির্বাচন যে হিন্দু মুসলিম উভয়ের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করে ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনকে বিলম্বিত করবে এটা জিন্নাহ সাহেব বুঝতে পেরে প্রথম থেকে স্বতন্ত্র নির্বাচনের বিরুদ্ধে ছিলেন। তাঁর ইচ্ছা ছিল মুসলমানদের

www.amarboi.org

স্বার্থরক্ষা যাতে হয় তার জন্য উপযুক্ত রক্ষা কবচের ব্যবস্থা রেখে যৌথ নির্বাচনের ব্যবস্থা করা।

এ জন্য প্রায় ত্রিশ দশকের গোড়ার দিক পর্যন্ত তিনি উপযুক্ত রক্ষাকবচসহ ও মুসলিম স্বার্থরক্ষার নিশ্চয়তা দিয়ে যৌথ নির্বাচন প্রথা মেনে নিতে রাজি ছিলেন। ১৯১৩ সনে মুসলিম লীগে যোগ দিলেও প্রধানতঃ কংগ্রেসের সঙ্গে তাঁর বেশী ঘনিষ্ঠতা ছিল। নাগপুর কংগ্রেস অধিবেশনের পরে যখন কংগ্রেস ত্যাগ করে ১৯২৭ সনে মুসলিম লীগের কর্ণধার হলেন তখনও প্রায় ১৯৩০ সন পর্যন্ত যখনই সুযোগ এসেছে তিনি যৌথ নির্বাচনের পক্ষে ওকালতি করেছেন। কিন্তু কংগ্রেসের নেতারা উপযুক্ত মানসিক উদারতা দেখিয়ে শাসনতান্ত্রিক ভাবে মুসলমানদের উপযুক্ত রক্ষা কবচ দিতে অস্বীকার করায় হিন্দু মুসলিম ঐক্যের তাঁর সর্ব প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয়। (সূত্রঃ জিন্নাহ-পাকিস্তান-নতুন ভাবনা)।

(পাঠকের কৌতূহল হলে উক্ত বইয়ের শেষ দিকের পাদটীকায় পূর্ণ বিবরণ দেখে নিতে পারেন। আমরা শুধু শৈলেশ বাবুর বইয়ের নামই উল্লেখ করলাম।)

মুসলিমলীগের জন্ম, সৈয়দ আহাম্মদ ও আমীর আলী

এখানে প্রাসঙ্গিক ভাবে উল্লেখ করা যেতে পারে যে ১৯০৬ সনে আগাখানের নেতৃত্বে মুসলিম নেতৃবৃন্দ যে স্বতন্ত্র নির্বাচনের দাবি জানিয়ে ছিলেন তার পিছনে বেশ খানিকটা ঐতিহাসিক কারণ ছিল। ইংরেজদের কাছে রাজ্য হারাবার পর ভারতের অভিজাত মুসলিম শ্রেণী যারা এদেশে মুসলমান সম্প্রদায়কে রাজনৈতিক নেতৃত্ব দিতো তারা আক্রোশ বশতঃ প্রথম দিকে ইংরেজদের সঙ্গে পুরোপুরি অসহযোগিতা করতে আরম্ভ করে। কিন্তু হিন্দু সম্প্রদায় বৃটিশ সরকারের সঙ্গে প্রথম থেকেই সহযোগিতা করতে থাকে। ইংরেজরা জানতো তাদের ক্ষমতা দখলের চ্যালেঞ্জ যদি কখনো আসে তবে মুসলমান অভিজাত শ্রেণী যারা এতদিন ভারত শাসন করে এসেছে তাদের তরফ থেকেই আসবে। তাই মুসলমানদেরকে অর্থনৈতিক দিক থেকে পঙ্গু করে দেয়ার জন্য তাদের লাখেরাজ সম্পত্তি, জায়গীরদারী প্রভৃতি প্রায় সকল সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করে নেয়া হলো। এর পর সরকারী ভাষা পার্সির পরিবর্তে যখন ইংরেজী করা হয়ে গেল তখন চাকরি-বাকরিতে যে কিছু মুসলমান ছিল তারাও বেকার হয়ে গেল। আর এসব জায়গীরদারী, লাখেরাজ সম্পত্তি, চাকরি-বাকরির মালিক হলো প্রায় ক্ষেত্রে হিন্দুরা কারণ তারা প্রথমাবধি ইংরেজদের সহযোগিতা করায় এবং ইংরেজী শিখে নেয়ায় ইংরেজদের

www.amarboi.org

স্নেহভাজন হয়ে পড়েছিল। ইংরেজরাও মুসলমানদের সন্দেহের চোখে দেখতো বলে স্বাভাবিক ভাবেই হিন্দুদের সাহায্য গ্রহণ অনেকটা নিরাপদ ও বুদ্ধিমানের কাজ মনে করতো।

ইতিমধ্যে দরিদ্র হতাশাগ্রস্ত মুসলমানরা ভবিষ্যৎ অন্ধকার দেখে ধর্মীয় আচার অনুষ্ঠানকে আঁকড়ে ধরে নিজেদেরকে সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় জীবন থেকে গুটিয়ে নিয়ে বাঁচবার চেষ্টা করতে লাগলো। তাদের ধারণা হলো ধর্মীয় আচার অনুষ্ঠান আদেশ নির্দেশ থেকে সরে যাওয়াতেই তাদের এই বিপর্যয় হয়েছে। ধর্মীয় মোল্লাদের এই অভিমতকে সঠিক মনে করে তাদের নির্দেশে জনগণ ইংরেজদের প্রবর্তিত শিক্ষা ও জ্ঞান বিজ্ঞানের প্রতি সম্পূর্ণ অসহযোগিতা মূলক মনোভাব দেখিয়ে সব ধরনের প্রগতি ও শিক্ষার সুযোগ থেকে নিজেদেরকে বিচ্ছিন্ন রেখে পিছিয়ে যেতে লাগলো, আর অন্যদিকে নতুন জ্ঞান-বিজ্ঞান ও শিক্ষাকে আয়ত্ত করে হিন্দু সমাজ ক্রমাগত অগ্রসর হতে হতে ভারতের সামাজিক ও রাজনৈতিক ক্ষেত্রে একটা গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করে নিলো।

শুধু যে ধর্মীয় মোল্লাদের প্ররোচনায় মুসলমানরা এরূপ আত্মকুন্ডয়ন নীতি গ্রহণ করেছিল তা নয়। ওহাবী আন্দোলনের প্রবর্তক সৈয়দ আহাম্মদ (১৭৮৬-১৮৩১ খৃষ্টাব্দ) ও তাঁর গুরু বিখ্যাত ইসলামিক দার্শনিক শাহওয়ালী উল্লাহ (১৭০৩-১৭৬২) তদানীন্তন মুসলমান সম্প্রদায়কে ইংরেজদের সঙ্গে সহযোগিতা করতে নিষেধ করেছিলেন। তাঁরা অভিমত ব্যক্ত করেছিলেন যে, ইংরেজ অধিকৃত অঞ্চল ও উত্তর পশ্চিম সীমান্তে শিখ শাসিত এলাকা দারুল হাবাব অর্থাৎ কাফেরের দেশ। এখানে মুসলমানরা ঈমান নিয়ে বাস করতে পারবে না। তাই তিনি এখানে জেহাদ ঘোষণা করে মুসলমানদের আফাগানিস্তান বা অন্য মুসলিম রাষ্ট্র যেটা হলো বায়তুল আমান অর্থাৎ শান্তির রাজ্য সেখানে হিজরত করার জন্য নির্দেশ দিলেন। তদানুসারে প্রায় পঁচিশহাজার লোক এ দেশ ত্যাগ করে আফগানিস্তানসহ বিভিন্ন মুসলিম রাষ্ট্রে চলে যায়। শাহওয়ালী উল্লাহ বৃটিশ বিরোধী আন্দোলন করতে করতে শেষ পর্যন্ত বেশ কিছু অনুচর ও মুজাহিদদের নিয়ে পাঞ্জাবে শিখদের সঙ্গে লড়াই করতে গিয়ে বালাকোটের যুদ্ধে নিহত হন। এদের সবারই লক্ষ্য ছিল ভারত থেকে ইংরেজদের তাড়িয়ে পুনরায় মুসলিম রাজ প্রতিষ্ঠা।

ইংরেজদের প্রতি মুসলমানদের যখন এরূপ মনোভাব সে সময় হিন্দুদের ইংরেজদের সঙ্গে এতখানি সহযোগিতা এবং তার ফলে চাকরি-বাকরি ব্যবসা বাণিজ্য সব কিছুতে তাদের প্রাধান্য দেখে হিন্দুদের প্রতি মুসলমানদের মনে

www.amarboi.org

ক্ষোভের সৃষ্টি হয়। এ ভাবে মুসলমান ও হিন্দুদের মধ্যে সন্দেহ ও বিচ্ছিন্নতার ক্ষেত্র প্রসারিত হতে থাকে। এর পর সিপাহী বিদ্রোহ যখন ব্যর্থ হলো ইংরেজরা বিদ্রোহের জন্য মুসলমানদেরকেই প্রধানতঃ দায়ী করে চরম প্রতিশোধ গ্রহণ করতে আরম্ভ করে। কত সহস্র মুসলমান ফাঁসিতে প্রাণ দেয় এবং কত হাজার হাজার লোককে সম্পত্তি থেকে বঞ্চিত করে ভিক্ষুকে পরিণত করা হয় তার ইয়ত্তা নেই। (ইংরেজ লেখক উইলিয়াম হান্টারের দি ইণ্ডিয়ান মুসলিম বইতে এর কিছুটা বিবরণ পাওয়া যায়)।

সত্যি কথা বলতে কি সিপাহী বিদ্রোহে মুসলামানরাই সিংহভাগ অংশগ্রহণ করেছিল, সমগ্র ভারতে হিন্দুদের অংশগ্রহণ ছিল খুবই সামান্য। সিপাহী বিদ্রোহের প্রথম উৎপত্তি যদিও ছিল বাংলাদেশের ব্যারাকপুরে তথাপি বাংলাদেশের হিন্দুরা সর্বতোভাবে ইংরেজদের সাহায্য করেছিল। তাদের জন্য এটা ছিল অনেকটা প্রভু পরিবর্তন-প্রথমে মুসলমানরা ছিল প্রভু এখন তাদের স্থলাভিষিক্ত হলো ইংরেজরা।

যা হোক, এ সমস্ত ঐতিহাসিক কারণে, সামাজিক ও রাজনৈতিকভাবে হিন্দু মুসলমানদের মধ্যে একটা বিচ্ছিন্নতা ও সন্দেহের ভাব ক্রমশঃ গড়ে উঠতে লাগলো এবং এই দূরত্ব ক্রমাগত বেড়েই চলছিল। মুসলমানরা যখন অসহযোগিতার পথ নিয়ে ক্রমাগত ধ্বংসের দিকে এগিয়ে যাচ্ছিল এ সময় আত্মকুন্ডনয়তা পরিহার করে মুসলমানদেরকে আধুনিক জ্ঞানবিজ্ঞানে সমৃদ্ধ হয়ে বৃটিশ শাসনের সুফলে অংশীদার হওয়ার জন্য যে দুই জন নেতা সর্ব প্রথম মুসলমানদের আহবান জানালেন তারা হলেন স্যার সৈয়দ আহমদ খান এবং সৈয়দ আমির আলী। উভয়েই কিন্তু জাতীয়তাবাদী বা সকল সম্প্রদায়ের ভারতীয় নেতারূপে জীবন আরম্ভ করলেও অল্পদিনেই তারা নিজেদের অধঃপতিত সম্প্রদায়ের উন্নতির ব্যাপারে অধিকভাবে আত্মনিয়োগ করেন। আমির আলী ১৮৯০ খৃস্টাব্দে হাইকোর্টের জজ হওয়ার ১৩ বৎসর পূর্বে সেন্ট্রাল মোহামেডান এসোসিয়েশনের প্রতিষ্ঠা করেন। এটাই ছিল মুসলমানদের প্রথম প্রতিষ্ঠান যার মারফত তারা তাদের সমস্যাবলী ও চিন্তাভাবনা করার একটা পথ খুঁজে পাওয়ার সুযোগ লাভ করে। দেশের বিভিন্ন স্থানে শাখা প্রতিষ্ঠিত এই প্রতিষ্ঠানে প্রথমে কিছু হিন্দু ও ইউরোপীয়ান সদস্য থাকলেও পরবর্তীতে এটা সম্পূর্ণ মুসলমান প্রতিষ্ঠানে পরিণত হয়।

এখানে উল্লেখযোগ্য যে কংগ্রেসের পরিণতি ও শেষ পর্যন্ত অনেকটা এরকমই হয়েছিল। ভারতের রাজনৈতিক আশা আকাঙ্খার প্রতি সহানুভূতি সম্পন্ন ভারতের কয়েকজন ইংরেজ সিভিলিয়ান ভারতের জন্য কিছু

www.amarboi.org

শাসনতান্ত্রিক সুবিধা আদায়ের উদ্দেশ্যে ১৮৮৪ খৃষ্টাব্দে কংগ্রেস প্রতিষ্ঠানের জন্ম দিলেও পরবর্তীকালে এটি একটি ভারতীয় প্রধানতঃ হিন্দু প্রতিষ্ঠানে রূপান্তরিত হয়। এর প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন অ্যালাম অক্টোভিয়ান হিউম। পরবর্তী দু'জন সভাপতিও ছিলেন ইংরেজ।

স্যার সৈয়দ আহমদ (১৮১৭-১৮৯৮ খৃষ্টাব্দ) নিজে ইংরেজী শিক্ষায় শিক্ষিত না হলেও পাশ্চাত্য শিক্ষার গুণাগুণ উপলব্ধি করে স্ব সম্প্রদায়ের লোককে জ্ঞানবিজ্ঞানসহ আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত করে তুলবার জন্য ১৮৭৫ সালে যুক্ত প্রদেশে অ্যাংলো ওরিয়েন্টাল কলেজ প্রতিষ্ঠা করেন যেটা পরবর্তীকালে আলীগড় বিশ্ববিদ্যালয়ে রূপান্তরিত হয়। তিনি সিপাহী বিদ্রোহে যোগ দেন নাই কারণ দূরদৃষ্টিসম্পন্ন এ প্রতিভাবান মানুষটি বুঝতে পেরেছিলেন যে উপযুক্ত নেতৃত্ব ও সুষ্ঠু কর্মপন্থার অভাবে এই বিদ্রোহ শেষ পর্যন্ত ব্যর্থ হতে বাধ্য। তথাপি বিদ্রোহে যোগ না দেয়ার জন্য তাকে যথেষ্ঠ লাঞ্ছনা সহ্য করতে হয়েছিল। দারুল হারাব ও দারুল আমান প্রশ্নে ইংরেজ রাজত্বকে দারুল আমান বলেও তিনি ঘোষণা করেন। এভাবে ইংরেজদের সঙ্গে সম্প্রীতি রক্ষার কারণে তিনি সিপাহী বিদ্রোহে অংশগ্রহণকারী বহুলোককে ইংরেজের রোষাণল থেকে রক্ষা করতে সমর্থ হয়েছিলেন।

ভারতীয় রাজনীতির এই যখন অবস্থা তখন অনেক মুসলিম নেতাও বুঝতে পেরেছিলেন যে কংগ্রেস যেহেতু প্রধানতঃ হিন্দু প্রধান প্রতিষ্ঠান তাই এই প্রতিষ্ঠানের মারফত মুসলমানদের সত্যিকার কোন মঙ্গল সাধন করা সম্ভব হবে না। নিজেদের সম্প্রদায়ের জন্য একান্ত প্রয়োজনীয় বিশেষ কিছু সুযোগ-সুবিধা আদায় করার উদ্দেশ্যে তারা একটি ভিন্ন রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান গঠনের সিদ্ধান্ত নিলেন। তখন প্রাপ্ত বয়স্কদের ভোটাধিকার ছিল না। যারা সরকারী বা চৌকিদারী ট্যাক্স দিতো তারাই শুধু ভোটার হতে পারতো। যেহেতু হিন্দু সম্প্রদায় ব্যবসা-বাণিজ্য, টাকা-পয়সা, সামাজিক আধিপত্য সবদিক থেকে মুসলমানদের চাইতে অনেক শক্তিশালী, তাই যৌথ নির্বাচনে তারা কোন দিনই বিধান সভা বা স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানে জিততে পারবেনা। এখানে শৈলেশ চট্টোপাধ্যায় তাঁর 'জিন্নাহ-পাকিস্তান-নতুন ভাবনা' বইতে ১৬৩ পৃষ্ঠায় উল্লেখ করেছেন 'এখানে বলা যায় হিন্দু প্রভুত্বের ভয় যে একেবারে অমূলক ছিল তাও বলা চলে না। ঐ সময় স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন প্রতিষ্ঠানসমূহ এবং মিউনিসিপ্যালিটি নির্বাচনে মুসলমানরা যে সব এলাকায় সংখ্যাগরিষ্ঠ সেখানেও বিশেষ সুবিধা করতে পারেনি। এই কারণে ১৮৯৫ খৃষ্টাব্দের পুনা মিউনিসিপ্যালিটির নির্বাচনে মুসলমানরা আদৌ অংশগ্রহণ করেনি। তাদের

www.amarboi.org

আশংকা ছিল যে তারা একটি আসনও পাবে না। বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক (বিধান) সভার নির্বাচনে মুসলমানেরা সংখ্যাগরিষ্ঠ হওয়া সত্ত্বেও হিন্দুদের তুলনায় মাত্র অর্ধেক আসন পান। প্রতিনিধিত্বমূলক শাসন ব্যবস্থার যে দাবি উঠেছিল তার মূলে রয়েছে মাথা পিছু একটি করে ভোট। এ পথেতো সংখ্যাগুরু হিন্দুদের শাসনই চিরস্থায়ী হবে এবং এককালের শাসক মুসলমানদের তাদের অধীন হয়েই বরাবর থাকতে হবে। সুতরাং এ পথে মুসলিম আত্মাভিমানী ব্যক্তির প্রকাশ কি করে সম্ভব?" তাদের বরাবরই ভয় ছিল যে ইংরেজ চলে গেলে হিন্দু আধিপত্যের নিষ্পেষণে তারা ধ্বংস হয়ে যাবে। কংগ্রেসের মধ্যে মুসলমানদের দাবি দাওয়া, আশা আকাঙ্খার প্রতি সহানুভূতি সম্পন্ন দু'চারজন নেতা যে না ছিলেন এমন নয়। তবে তাদের সংখ্যা ছিল অতীব নগন্য। অধিকাংশ নেতাই ভিতরে ভিতরে অতিমাত্রায় সাম্প্রদায়িক মনোভাবাপন্ন ছিল বলে মুসলমানেরা স্বতন্ত্র রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান গড়ে নিজেদের সম্প্রদায়ের স্বার্থ রাক্ষার্থে ইংরেজের আনুকূল্য লাভ করার চেষ্টায় সচেষ্ট হলেন। এই উদ্দেশ্যে ১৯০৬ সালে ঢাকায় মুসলিম লীগের প্রতিষ্ঠা করে পরবর্তীতে আগাখানের নেতৃত্বে তারা ভাইসরয় লর্ড মিন্টোর সঙ্গে দেখা করে স্বতন্ত্র নির্বাচন ও সংখ্যালঘু প্রদেশসমূহে মুসলমানদের জন্য কিছুটা অধিক আসনের দাবি জানালেন।

মুসলমানদের সম্পর্কে বৃটিশ নীতির পরিবর্তন

যা'হোক ভারত শাসনের ব্যাপারে ইংরেজদের নীতিতেও এর মধ্যে কিছুটা পরিবর্তন দেখা দিয়েছিল। হিন্দু প্রধান কংগ্রেসের দাবি উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাওয়ায় বৃটিশ সরকারও খানিকটা বিরক্ত ও বিব্রতবোধ করছিলেন। প্রথম দিকে মুসলমানদের দমনের জন্য হিন্দুদের সাহায্য গ্রহণ ও বিনিময়ে তাদের অনেক সুযোগ-সুবিধা দেয়ার নীতি গ্রহণ করে আসলেও পরবর্তীকালে হিন্দু প্রধান কংগ্রেসের চাপটা কিছুটা প্রতিরোধের জন্য তারা ভেদনীতির আশ্রয় নিয়ে মুসলমানদের খানিকটা সুযোগ-সুবিধা দেয়ার নীতি গ্রহণ করলো। তার ফলেই ১৯০৯ সালে মর্লিমিন্টো শাসন সংস্কারে আগাখানের নেতৃত্বে প্রতিনিধি দলের উত্থাপিত দাবিগুলোর অনেকটা মেনে নিলো। পূর্বে বলেছি কংগ্রেস স্বতন্ত্র নির্বাচন প্রথার প্রথমে আপত্তি জানালেও পরে মেনে নেয়। কিন্তু জাতীয়তাবাদী নেতা হিসাবে দেশের মুক্তি সংগ্রামের স্বতন্ত্র নির্বাচন হিন্দু-মুসলমানদের ঐক্যবদ্ধ সংগ্রামকে ব্যাহত করবে মনে করে জিন্নাহ সাহেব প্রথম থেকে স্বতন্ত্র নির্বাচনের বিরোধিতা করে মুসলিম লীগ নেতৃবৃন্দ ও অধিকাংশ মুসলিম

www.amarboi.org

নেতাদের বিরাগভাজন হয়েছিলেন। এর পর ভারতের রাজনৈতিক ক্রমবিকাশের সঙ্গে আমরা জিন্নাহ্ সাহেবের ভূমিকা আলোচনা করবো যাতে পরিষ্কার পরিদৃষ্ট হবে ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামে তাঁর কতখানি গৌরবময় ভূমিকা ছিল, তাঁর ব্যক্তিত্ব ছিল কতখানি প্রখর এবং যেটা ন্যায় ও সত্য মনে করতেন তা প্রতিষ্ঠার জন্য ভারতীয় রাজনীতিতে তিনি কতখানি সাহসী ভূমিকা পালন করেছিলেন।

মর্লিমিন্টো শাসন সংস্কার অনুসারে স্বতন্ত্র নির্বাচনের ভিত্তিতে বোম্বের মুসলিম আসন থেকে জিন্নাহ্ ১৯১০ খৃষ্টাব্দের জানুয়ারীতে বড় লাটের কাউন্সিলের সদস্য নির্বাচিত হন। তৎকালে ভারতের রাজধানী কোলকাতায় ছিল বলে এই কাউন্সিল সভা কোলকাতায় বসতো। বড় লাটের কাউন্সিলের সদস্য হওয়ার পর বিভিন্ন বিলের উপর তাঁর জোরালো আলোচনা, স্পষ্ট বক্তব্য, প্রখর যুক্তি জাল ও নির্ভীক বক্তব্য রাখার সাহসী কৌশল তাঁকে অল্পদিনেই ভারতের সংসদীয় রাজনীতির ক্ষেত্রে এক নতুন ইতিহাস সৃষ্টিকারী পার্লামেন্টারিয়ান হিসাবে দেশবাসীর কাছে পরিচিত করে তুললো।

প্রথমে কাউন্সিলের সদস্য হিসাবে গোখলের উত্থাপিত প্রেস বিলের সংশোধনী প্রস্তাব তিনি অত্যন্ত জোরের সঙ্গে সমর্থন করেন।

অতঃপর যে আলোচনা প্রসঙ্গে তিনি খোদ বড়লাটের সঙ্গে প্রকাশ্যে বাকবিতন্ডায় লিপ্ত হয়ে একজন নির্ভীক কৌশুলি পার্লামেন্টারিয়ান হিসাবে দেশব্যাপী নিজেকে পরিচিত করে তোলেন সেটা ছিল দক্ষিণ আফ্রিকায় গান্ধীর নেতৃত্বে পরিচালিত ভারতবাসীদের স্বাধিকার আন্দোলনের সমর্থনে বক্তৃতা। ভারতের দুই নেতা জিন্নাহ্ ও গান্ধী যারা পরবর্তী জীবনে দুই প্রতিষ্ঠানের কর্ণধার হয়েছিলেন তাদের প্রথম পরিচয় ঘটে পরস্পরের গুণগ্রাহী হিসাবে (যদিও চাক্ষুস নয়) এই বিলের সমর্থনের মাধ্যমে। এটাকে ইতিহাসের এক অদ্ভূত খামখেয়ালীপনা বলা চলে। গোখলে কর্তৃক উত্থাপিত ঐ প্রস্তাব সমর্থন করতে গিয়ে জিন্নাহ্ বলেন ঃ

"মাই লর্ড, গোড়াতেই আমি এমন একটি বিষয় সম্বন্ধে বলতে চাই যা অত্যন্ত বেদনাদায়ক। এ সমস্যাটি এদেশের সর্বস্তরের মানুষের আবেগকে উত্তাল করে তুলেছে এবং তাদের ঘৃণা ও আতঙ্কের ভাবকে উত্তুঙ্গে উপনীত করেছে। বিষয়টি হলো- দক্ষিণ আফ্রিকায় ভারতবাসীর প্রতি অত্যন্ত রূঢ় আচরণ।"

www.amarboi.org

আপত্তি (বড়লাট লর্ড মিন্টো) ঃ

"মান্যবর সদস্য মহোদয়কে শান্ত হতে (To order) বলতে হচ্ছে। আমার মতে নিষ্ঠুরতা শব্দটি অত্যন্ত কঠোর। মাননীয় সদস্য মনে রাখবেন যে তিনি সাম্রাজ্যের বন্ধুত্ব সম্পর্কযুক্ত অঙ্গের সম্পর্কে কথা বলছেন এবং তাই এর ভাষাটাও পরিস্থিতির অনুকূলে হওয়া উচিত।"

জিন্নাহ উত্তর দিলেন ঃ

" মাই লর্ড, আমার আরও কঠোর শব্দ প্রয়োগের ইচ্ছা ছিল। কিন্তু আমি এই কাউন্সিলের বিধান সম্পর্কে সম্পূর্ণভাবে সচেতন এবং তাই এক মুহূর্তের জন্যও সে বিধান ভঙ্গ করতে চাই না। তবুও আমি বলছি যে ভারতবাসীদের প্রতি যে ব্যবহার করা হচ্ছে তা অকল্পনীয় রকমের রূঢ়তম এবং পূর্বেই আমি যে কথা বলেছি এর কারণ এ দেশের মনোভাব বাদবিতন্ডার উর্ধ্বে" (শৈলেশ কুমার চট্টোপাধ্যায় রচিত জিন্নাহ-পাকিস্তান-নতুন ভাবনা, পৃষ্ঠা ১৭,১৮)।

এখানে উল্লেখ্য, শৈলেশ কুমার চট্টোপাধ্যায়, টেন্ডুলকার, মজুমদার, হেক্টোর বালিথো, পট্টভি সীতারমাইয়া, আচার্য কৃপালনী, এম, এইচ, এ, সাঈদ, চৌধুরী খালেকুজ্জামান, উলপার্ট, শরীফ আল মুজাহিদ, এম, আর জায়কার, রাজেন্দ্র প্রসাদ, পীরজাদাসহ প্রায় চল্লিশ পঞ্চাশজন প্রসিদ্ধ লেখকদের বইয়ের নামও পৃষ্ঠাসহ তাঁর জিন্নাহ- পাকিস্তান-নতুন ভাবনা বইতে উল্লেখ করেছেন। প্রত্যেক কোটেশনে বইয়ের নাম উল্লেখ আছে।)

লর্ড মিন্টোর সঙ্গে জিন্নাহর বিতর্ক

গোখলের বক্তৃতার সমর্থন করতে গিয়ে জিন্নাহও লর্ড মিন্টোর সঙ্গে যে বাদানুবাদ হয়েছিল রাজমোহন গান্ধী রচিত 'দি মুসলিম মাইন্ড' গ্রন্থে এর পূর্ণ উল্লেখ রয়েছে। রাজমোহন গান্ধী লিখেছেনঃ লর্ড মিন্টো ভেবেছিলেন তাঁর ধমকে জিন্নাহ ভয়ে চুপসে যাবেন। কিন্তু তিনি, আশ্চর্য হয়ে দেখলেন ঐ হালকা চেহারার দৃঢ়চিত্ত লোকটি মোটেই ভীরু শ্রোতা নয়। (আন্ডারস্ট্যান্ডিং দি মুসলিম মাইন্ড পৃষ্ঠা-১২৭) উক্ত গ্রন্থে ব্যারিস্টার হিসাবে জিন্নাহর সাফল্যের কারণ তাঁর মেজাজ, চরিত্রের বৈশিষ্ট্য, মক্কেলের সঙ্গে ব্যবহার ইত্যাদি সম্পর্কে বেশ কিছুটা তথ্য পাওয়া যায়। রাজমোহন গান্ধী বলেন জিন্নাহ ছিলেন লম্বা, পাতলা, সুপুরুষ ব্যয়বহুল ব্যারিস্টার, তবে তাঁর যোগ্যতা ও মক্কেলকে তিনি যে

www.amarboi.org

সেবা দিতেন সেটা বিবেচনা করলে তাঁর ফী খুব বেশি ছিল বলা চলে না। তিনি দীর্ঘ সময় ধরে মক্কেলের কেস খুব মনোযোগের সাথে পড়তেন, সঠিক ভাবে নিজের বক্তব্য স্থির করে নিতেন, বিপক্ষের দূর্বলতা কোথায় সেটা পরিষ্কার ভাবে অনুসন্ধান করে নিতেন। অতঃপর নিজের বক্তব্য রাখার সময় একজন নিপুণ অভিনেতার মত ধীরে সুস্থে দাঁড়িয়ে ঠিক সময়ে ঠিক কথাটি এমন সুন্দর ভাবে যুক্তিসহ পেশ করতেন যেটা একটা দেখার মত ব্যাপার ছিল। তবে তাঁর সহজীবী ও জজদের মধ্যে কেউ কেউ তাঁকে বদমেজাজী রূঢ় এবং অকরুণ আখ্যায় ভূষিত করেন। কিন্তু জিন্নাহ্ তাঁর সম্বন্ধে এরূপ মন্তব্যকে বিশেষ পরোয়া করতেন না। তবে জিন্নাহ্‌র সব আচরণের মূলে ছিল তাঁর সততা, নিষ্ঠা ও সরল বিশ্বাস; এটা সবাই স্বীকার করতেন। অত্যন্ত প্রত্যুৎপন্নমতিত্বের মানুষ হিসাবে প্রতিপক্ষের রূঢ় বক্তব্য বা সমালোচনার জবাবে তাঁর উত্তর হতো যেমনই কড়া তেমনি শাণিত। একবার এক জজ তাঁকে বলেন; "মিঃ জিন্নাহ্, আপনি স্মরণ রাখবেন একজন তৃতীয় শ্রেণীর জজের সামনে আপনি কথা বলছেন না।"

আইনজীবি জিন্নাহ

জিন্নাহ্ সঙ্গে সঙ্গে উত্তর দিলেন- "মাই লর্ড আমাকে অনুমতি দিন আপনাকে সাবধান করে দেয়ার জন্য যে আপনি একজন তৃতীয় শ্রেণীর এডভোকেটকে উদ্দেশ্য করে কথা বলছেন না।" আইনের মর্যাদা রক্ষার জন্য উপযুক্ত জওয়াব দিয়ে প্রতিপক্ষকে নিশ্চুপ করে দেয়ার এরূপ অসাধারণ ক্ষমতা ছিল জিন্নাহ্ সাহেবের। আইন ব্যবসায় সততার ব্যাপারেও জিন্নাহ্ সাহেব ছিলেন অতুলনীয়। তাঁর নির্ধারিত ফির কমও তিনি কারো কাছ থেকে নিতেন না, আবার কেউ বেশি দিলেও তা ফিরিয়ে দিতেন। তাঁর জীবনীকার মিঃ বলিথো জিন্নাহ্‌র জনৈক সহযোগীর কাছ থেকে একটি ঘটনা শুনেছেন সেটি ছিল নিম্নরূপঃ

হাজী আব্দুল করিম নামে একজন বিখ্যাত ব্যবসায়ী যাকে একটি গুরুতর অপরাধের জন্য কোর্টে হাজির হওয়ার নির্দেশ দেয়া হয়েছিল তিনি জিন্নাহ্ সাহেবকে জিজ্ঞাসা করলেন তার কেসটি কত হলে তিনি নিতে পারবেন। জিন্নাহ্ তাকে পরিষ্কার বললেন তাঁর ফি প্রতিদিন পাঁচশত টাকা করে। ব্যবসায়ী ভদ্রলোক খুব হিসেবী ছিলেন। তিনি জিজ্ঞেস করলেন কেসটি শেষ হতে কতদিন লাগবে আপনি মনে করেন ? আমার সঙ্গে এখন পাঁচ হাজার টাকা আছে। এতে কি আপনি আমার কেসটি করে দিতে পারবেন ?

www.amarboi.org

জিন্নাহ্ সাহেব জবাব দিলেন, আপনাকেতো বলেছি আমার ফিস প্রতিদিন পাঁচ শত টাকা। এই শর্তে রাজি থাকলে আপনি আমাকে নিযুক্ত করতে পারেন, নচেৎ অন্য উকিল দেখুন। আবদুল করিম শর্ত মেনে জিন্নাহকে উকিল নিযুক্ত করলো এবং জিন্নাহ তিন দিনে সে কেসটি জিতে নিলেন। আব্দুল করিম জিন্নাহকে পাঁচ হাজার টাকার চেক পাঠালেন কিন্তু জিন্নাহ্ সাহেব তিন দিনের ফিস ১৫০০ টাকা রেখে বাকি টাকা ফেরত পাঠিয়ে দিলেন। ওকালতি ব্যবসাতে এধরনের ঘটনা জগতে বিরল।

বিনা পয়সায় কেস করার ঘটনা জিন্নাহ্ সাহেবের জীবনে খুবই কম। তবে বিনা পয়সায় যে কয়টি কেস করেছেন সে সব কেসে দেখা গেছে পার্টি টাকা দিতে এলে তিনি নেননি। অনেক সময় দেখা গেছে কেস জিতার পর পার্টি খুশি হয়ে তাঁকে অনেক বেশি টাকা পাঠিয়ে দিতো। জিন্নাহ্ তখন মক্কেলকে রূঢ়ভাষায় পত্র দিয়ে বলতেন আমার পাওনা ছিল এত, আপনি অধিক এত টাকা পাঠিয়েছেন। আমার পাওনা এত টাকা রেখে বাকি এত টাকা আপনাকে ফেরত পাঠালাম। রাজ মোহন গান্ধী জিন্নাহর চরিত্রের আর এক দিক তুলে ধরতে গিয়ে বলেছেন, সরোজিনী নাইডু যিনি প্রথম জীবনে জিন্নাহর প্রতি খুব অনুরক্ত ছিলেন কিন্তু জিন্নাহর তরফ থেকে কখনো কোন সাড়া পাননি, তাঁর মতে জিন্নাহর ব্যক্তিত্ব কোনদিনই ভাবাবেগ, লোভ বা দুর্নীতির দ্বারা বিন্দুমাত্র ক্ষুণ্ন বা দুর্বল হয়নি। সরোজিনী নাইডু জিন্নাহর লন্ডন ত্যাগের পর পরই ক্যামব্রিজে ভর্তি হন এবং পরে কংগ্রেসের প্রথম সারির নেত্রী ও কবি হিসাবে দেশব্যাপী খ্যাতি লাভ করেন। সরোজিনী বলেন জিন্নাহ্ সন্ধ্যা কাটাতেন তাঁর মোকদ্দমার কাগজ পত্র নিয়ে। জীবনে সাফল্য লাভের জন্য একাগ্রচিত্তে সাধনা করে যাচ্ছিলেন আশ-পাশের সব কিছুর প্রতি পরিপূর্ণ ঔদাসীন্য নিয়ে। ১৯১৭ সালে প্রকাশিত জিন্নাহর উপর "Biographical appreciation" নামক গ্রন্থে সারোজিনী বলেন; "জিন্নাহ্ ছিলেন অতিমাত্রায় বাস্তববাদী, জীবনে সবকিছু গ্রহণের ব্যাপারে তাঁর ছিল চরম বৈরাগ্য .. তথাপি তাঁর শান্ত উত্তপ্ততার গভীর তলদেশে ছিল একটি লাজুক ও মধুর আদর্শবাদীতা"। অন্যের চোখে ধরা না পড়লেও সরোজিনীর ভালবাসার চোখে সেটা ধরা পড়েছিল।

দক্ষিণ আফ্রিকায় ভারতীয়দের উপর নির্যাতনের কথা বলতে গিয়ে গান্ধী ও জিন্নাহর চাক্ষুস পরিচয় না থাকলেও তাদের পারস্পরিক শ্রদ্ধার কথা পূর্বেই বলা হয়েছে। জিন্নাহ ও গান্ধীর মধ্যে সংযোগকারী আর একটি ব্যক্তি যাকে

www.amarboi.org

উভয়ে ভালভাবে জানতেন ভালবাসতেন ও গভীরভাবে শ্রদ্ধা করতেন তিনি ছিলেন গোপাল কৃষ্ণ গোখলে। ইনি ত্রিশ বৎসর যাবৎ নাম মাত্র বেতন নিয়ে পুণায় অধ্যাপনা করতেন। পরবর্তীতে কংগ্রেসের নেতা হিসেবে ইম্পিরিয়াল কাউন্সিলের মেম্বার হন। ভারতবাসী তার নিঃস্বার্থ দেশ প্রেমের জন্য গভীরভাবে তাঁকে শ্রদ্ধা করতো এবং বৃটিশ সরকারও তাঁর দক্ষতা ও নমনীয়তার জন্য তাঁকে পছন্দ ও প্রসংশা করতো। দক্ষিণ আফ্রিকায় গান্ধীর কাজ কর্ম দেখার পর গোখলে মন্তব্য করেন ভারতবাসীর যা প্রয়োজন তা গান্ধীর মধ্যে রয়েছে। জিন্নাহ্ সম্বন্ধে তিনি বলেন জিন্নাহ্র মধ্যে খাঁটি জিনিষ রয়েছে, আর রয়েছে সকল প্রকার সাম্প্রদায়িক ভেদবুদ্ধি থেকে মুক্ত একটি মন যার জন্য তাকে হিন্দু-মুসলমান মিলনের সর্বশ্রেষ্ঠ রাজদূত বলা চলে জিন্নাহ্ ও গোখলেকে শ্রদ্ধা জানিয়ে বলতেন যে তাঁর আকাঙ্খা হলো ভবিষ্যতে মুসলিম গোখলে হওয়া। ১৯১২ সনে যখন গোখলে তার এলিমেন্টারী এডুকেশন বিল কংগ্রেসে উপস্থাপন করলো তখন জিন্নাহ্ তাকে মনেপ্রাণে সমর্থন জানিয়ে বলেছিলেন, 'স্যার এটি একটি অতিশয় পুরানো গল্প যে আপনাদের টাকা নেই। আমি যত দূর বলতে পারি যেখান থেকে হোক টাকা যোগাড় করুন। আমি জিজ্ঞাসা করি তিন কোটি টাকা যোগাড় করা কি অসাধ্য ব্যাপার?"

জাতীয়তাবাদী জিন্নাহ্ ও স্বতন্ত্র নির্বাচন

এবার আমরা দেখবো কংগ্রেসের জাতীয়তাবাদী নেতা হিসাবে জিন্নাহ্ বিভিন্ন সমাবেশ অধিবেশনে যখনই সুযোগ এসেছে তখনই কি ভাবে স্বতন্ত্র নির্বাচনের বিরুদ্ধে মত প্রকাশ করেছিলেন। কারণ তিনি বিশ্বাস করতেন যে স্বাধীনতা আন্দোলনকে জয়যুক্ত করার জন্য হিন্দু-মুসলমানের যে অটুট ঐক্যের প্রয়োজন তার জন্য যৌথ নির্বাচনই শ্রেষ্ঠ। পূর্বেই উল্লেখ করেছি তাঁর অভিমত ছিল মুসলমানদের জন্য শাসনতন্ত্রে উপযুক্ত রক্ষা কবচের ব্যবস্থা রাখলে যৌথ নির্বাচন উভয় সম্প্রদায়কে কাছাকাছি নিয়ে আসতে সক্ষম হবে এবং এতে উভয় সম্প্রদায়ের কাছে গ্রহণ যোগ্য ব্যক্তিরাই নির্বাচিত হবে। জিন্নাহ্ সাহেব যে প্রথম অবধি সাম্প্রদায়িক ভেদবুদ্ধির উর্ধ্বে ছিলেন এবং যে কোন নীতি হিন্দু মুসলিম ঐক্যের অন্তরায় তার নিরসন এবং ঐক্যের পক্ষে সহায়ক যা কিছু মনে করতেন তাকে কিভাবে সমর্থন জানাতেন আমাদের বর্তমান প্রজন্মের কাছে এটা পরিষ্কার ভাবে তুলে ধরার জন্য বিভিন্ন ফোরামে তার বক্তব্যগুলোর আলোচনা প্রয়োজন।

www.amarboi.org

১৯১০ সালের ডিসেম্বরে এলাহাবাদ কংগ্রেস অধিবেশনে তিনি সাম্প্রদায়িক নির্বাচন ব্যবস্থার নিন্দা করে এক প্রস্তাব উত্থাপন করেন। বিহারের মৌলভী মজহারুল হক এ প্রস্তাব সমর্থন করেন। বক্তৃতা প্রসঙ্গে জিন্নাহ্ জেলা বোর্ড ও মিউনিসিপ্যালিটি প্রভৃতি স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানসমূহে মুসলিম লীগ নেতাদের মতের বিরুদ্ধে যৌথ নির্বাচনের প্রস্তাব দেন। মাত্র কিছুদিন পূর্বে মর্লিমিন্টো শাসন সংস্কার অনুসারে স্বতন্ত্র নির্বাচনের অধিকার পেয়ে মুসলমানরা দারুণ খুশি। এ সময় এরূপ প্রস্তাব উত্থাপন সত্যিই অত্যন্ত সাহসের ব্যাপার। অবশ্য তার বক্তৃতায় তিনি বলেন এটা তার ব্যক্তিগত মতামত। মুসলমান সমাজের সম্মতি নিয়ে তিনি এ কথা বলছেন না বলে উল্লেখ করলেন।

১৯১১ সালে নববর্ষেও এলাহাবাদে কংগ্রেস সভাপতি স্যার উইলিয়াম ওয়েডার বার্ণের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত হিন্দু-মুসলমান ঐক্য সম্মেলনে অংশগ্রহণ করেন। সেই বৎসর ১৬ই মার্চ জিন্নাহ্ ইম্পিরিয়াল কাউন্সিলে গোখলের এলিমেন্ট্রি এডুকেশন বিলের সমর্থনে বক্তৃতা করেন। এর মধ্যে গোখলে ও জিন্নাহ্ জুটি দেশের সবাইর দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে। উভয়কেই উভয়ে খুব পছন্দ করতেন। দেশের সবাইর মঙ্গলের জন্য দু'জনে একত্রে কাজ করতেন। সরোজিনী নাইডু তাঁর 'এমবেসেডার অফ ইউনিটি' গ্রন্থে বলেছেন যে, সে সময় জিন্নাহ্ বলতেন তাঁর আকাঙ্খা হলো গোখলের পদাঙ্ক অনুসরণ করা।

১৯১২ সালে জিন্নাহ্ বড় লাটের কাউন্সিলে ভুপেন্দ্রনাথ বসুর পুলিশ প্রশাসন পদ্ধতি বিলের সমর্থনে বক্তৃতা দেন। ৩১শে ডিসেম্বরের বাঁকিপুরে মুসলিম লীগ কাউন্সিলের সভায় বিশেষ নিমন্ত্রিত অতিথি হিসাবে যোগদান করে ভারতবর্ষের পক্ষে উপযুক্ত স্বায়ত্তশাসন প্রাপ্তি ও জাতীয় ঐক্য স্থাপনকে লীগ যাতে তাদের লক্ষ্য হিসাবে গ্রহণ করে তার জন্য মতামত রাখেন।

মর্লিমিন্টো শাসন সংস্কারে স্বতন্ত্র নির্বাচন স্বীকৃত হওয়ার পর মুসলিম লীগ নেতারা ভবিষ্যত সম্বন্ধে খানিকটা নিশ্চিন্ত হওয়ায় ১৯১০ সন থেকে লীগের রাজনীতিতেও খানিকটা পরিবর্তনের হাওয়া লক্ষ্য করা গেল। ঐ বৎসরের দিল্লী অধিবেশনে আগাখান ও স্যার আমীর আলী উভয়ে বললেন যে এবার রাজনৈতিক ক্ষেত্রে কংগ্রেসের সঙ্গে সহযোগিতা করা যেতে পারে। লীগের এই দৃষ্টিভঙ্গির প্রশংসা করে কংগ্রেস সভাপতি স্যার উইলিয়াম ওয়েডার বার্ণ এলাহাবাদের হিন্দু-মুসলিম ঐক্য সম্মেলনে লীগের প্রতিনিধিদেরও যোগ দেয়ার প্রস্তাব করেন কিন্তু বৃটিশ স্বার্থের সংরক্ষক কিছু লোকের প্রতিরোধে এটা সম্ভব

www.amarboi.org

হয়নি। ১৯১২ সনের মার্চে কোলকাতায় অনুষ্ঠিত লীগের অধিবেশনে হিন্দুদের সঙ্গে একতাবদ্ধভাবে কাজ করার মনোভাব পুনরায় ব্যক্ত করা হয়। জিন্নাহ লীগের পালে লাগা এ নতুন ভাবধারাকেই পুষ্ট করে লীগ কংগ্রেসকে কাছাকাছি আনার চেষ্টায় আত্মনিয়োগ করলেন।

১৯১৩ সালের ২১ শে মে মুসলিম লীগের তদানীন্তন সম্পাদক সৈয়দ ওয়াজির হাসানকে জিন্নাহ এক পত্রে লিখেন যে, "হিন্দু-মুসলিম ঐক্য প্রতিষ্ঠার জন্য উভয় সম্প্রদায়ের নেতাদের একটি সম্মেলন আহ্বান করা দরকার এবং হিন্দু-মুসলমানদের জন্য পৃথক পৃথক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠার পরিবর্তে দুই সম্প্রদায়ের ছাত্ররা যাতে পরস্পরের সঙ্গে যথাসম্ভব অধিক মিত্রতা বন্ধনে আবদ্ধ হয় তার জন্য একই বিদ্যালয়ে পৃথক পৃথক শাখা খুলে হিন্দু মুসলমান ছাত্রদের স্থান দিতে হবে।" (জিন্নাহ-পাকিস্তান-নতুন ভাবনা, পৃষ্ঠা ১৯)।

এদিকে ভারতের মুসলমানদের মধ্যে তখন জাতীয়তাবাদের জোয়ার জেগেছে যদিও তা অনেকখানি ধর্মীয় অনুভূতির ধারায় পুষ্ট। তুরস্ক, মিশর, পারস্য প্রভৃতি দেশে জাতীয়তাবাদের আন্দোলন যেমন তাদের প্রভাবিত করেছিল তেমনি তুরস্কে ডাঃ আনসারী, চৌধুরী খালিকুজ্জামান প্রভৃতির নেতৃত্বে মেডিক্যাল মিশন প্রেরণ ও জমিন্দার পত্রিকার সম্পাদক মৌলানা জাফর আলীর কনস্ট্যান্টিনোপলে গিয়ে সেখানের ভিজিরকে ভারতীয় মুসলমানদের তরফ থেকে তুরস্কের সুলতানের যুদ্ধ প্রচেষ্টায় সাহায্যার্থে সংগৃহীত বিপুল পরিমাণ অর্থের তোড়া উপহার দেয়া প্রভৃতি তাদের মধ্যে একটা নবচেতনা সৃষ্টির উন্মেষে সাহায্য করে। মৌলানা আজাদ তার উর্দু আল-হিলাল পত্রিকার মাধ্যমে মুসলমানদের মধ্যে জাতীয়তাবাদের চেতনা মাহাত্ম্য প্রচার করতে থাকে। মৌলানা মোহাম্মদ আলীর কমরেড এবং উর্দু হামদার্দ পত্রিকাও মুসলমানদের আত্মবিশ্বাসে উদ্বুদ্ধ হয়ে জাতীয়তাবাদের ধারায় নিজেদের অভিষিক্ত করার জন্য অনুপ্রেরণা দিতে থাকে।

মুসলিম লীগের নীতির পরিবর্তন

"মুসলিম লীগও দেশব্যাপী এই জোয়ারের প্রভাব এড়াতে পারলো না। স্যার ইব্রাহিম রহিমতুল্লার সভাপতিত্বে ১৯১৩ সালের মার্চ মাসে লক্ষ্ণৌ অনুষ্ঠিত অধিবেশনে প্রতিষ্ঠানের পুরানো ধরনের কিছু মূল লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যকে বাদ দিয়ে সংবিধান পরিবর্তন করা হল। ইংরেজ তোষণের নীতি বাদ দিয়ে অন্যান্য আদর্শের মধ্যে বৃটিশ সাম্রাজ্যের মধ্যে সাংবিধানিক পদ্ধতিকে ভারতের

www.amarboi.org

উপযুক্ত স্বায়ত্তশাসন প্রতিষ্ঠার লক্ষ্য হিসাবে পরিগণিত হল। আরও স্থির হয় যে, জাতীয় ঐক্যের ব্যাপ্তি , ভারতবাসীর মধ্যে জনসেবার চেতনা বৃদ্ধি ঘটিয়ে প্রচলিত প্রশাসন পদ্ধতিতে ক্রমাগত উন্নতি সাধন করতে হবে। আর এই লক্ষ্য সাধনে অন্যান্য সম্প্রদায়ের সঙ্গে সহযোগিতা করা হবে। এভাবে লীগের আদর্শকে ভারতের জাতীয় কংগ্রেসের অনুকূল করা হয় এবং এর ফলে সাম্প্রদায়িক ঐক্যের পথ প্রশস্ত হয়ে অচিরে দুটি সংগঠনের পক্ষে সম্মিলিত পদক্ষেপ গ্রহণ করাও সম্ভব পর হয়ে উঠে।" (জিন্নাহ্-পাকিস্তান-নতুন ভাবনা পৃষ্ঠা-২০)।

লীগের মার্চের ঐ অধিবেশনে শ্রীমতি নাইডুর সঙ্গে জিন্নাহ্ও বিশেষ আমন্ত্রিত হিসাবে যোগদান করেন। সভাপতি স্যার শফী নতুন সংবিধান উপস্থাপিত করে মন্তব্য করেন, " আমার বন্ধু মাননীয় শ্রীযুক্ত জিন্নাহ্র সঙ্গে আমি এই ব্যাপারে সম্পূর্ণ একমত যে কাউন্সিলে প্রস্তাবিত পন্থার পরিবর্তে অপর যে কোন পন্থা অবলম্বন করা একেবারেই অবিজ্ঞোচিত কাজ হবে।"

জিন্নাহ্র লীগে যোগদান

লীগের বাঁকিপুরে দেয়া তাঁর পরামর্শ মেনে নেয়ায় জাতীয়তাবাদী জিন্নাহ্র পক্ষে মুসলিম লীগের সদস্য পদ গ্রহণে আর বাধা রইলো না। ১০ই অক্টোবর ১৯১৩ সালে তিনি বিধিবদ্ধভাবে মুসলিম লীগের সভ্য হলেন। জিন্নাহ্র মুসলিম লীগে যোগদান করা সম্বন্ধে সরোজিনী নাইডু লিখেছেনঃ "নিজের উদাহরণ দ্বারা জিন্নাহ্ যে নিখিল ভারত মুসলিম লীগের দৃষ্টিভঙ্গি সম্প্রসারিত করার জন্য ইতিমধ্যে এত করেছিলেন, অবশেষে তাতে তিনি আনুষ্ঠানিকভাবে যোগদান করলেন। তাঁর বিশিষ্ট উচ্চকোটির এবং হয়তো বা কিয়ত পরিমাণ উন্মাসিক সন্মানবোধের জন্য ঐ জাতীয় একটা সাদাসিধা অনুষ্ঠানও প্রায় একটা ধর্মীয় অনুষ্ঠানের রূপ নিল। তাঁর নাম সুপারিশকারী দু' জনকে এই মর্মে এক আগাম পবিত্র প্রতিশ্রুতি দিতে হয়েছিল যে, তাঁর মুসলিম লীগ ও মুসলিম স্বার্থের প্রতি আনুগত্য কোন ক্রমেই বা কোন সময়েই যে বৃহত্তর জাতীয় স্বার্থের সাধনে তাঁর জীবন উৎসর্গীত, তার পথে বিন্দুমাত্র বাধক হতে পারবেনা।" (Muhammad Ali Jinnah, Ambassador of Unity Page-11)।

জাতীয়তাবাদী মানসিকতার কোন্ উচ্চস্তরে জিন্নাহ উঠেছিলেন, তার নিদর্শন পাওয়া যায় সরোজিনীর উপরোক্ত উদ্ধৃতিতে।

www.amarboi.org

জিন্নাহ্ মুসলিম লীগে যোগদান করে প্রতিষ্ঠানটিকে কংগ্রেসের কাছাকাছি আনার জন্য আবার সর্বোতভাবে চেষ্টা করতে লাগলেন। সেই বৎসরই আগ্রায় স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানগুলোতে মৌলানা মোহাম্মদ আলীর স্বতন্ত্র নির্বাচন প্রথা আরও এক বৎসরের জন্য স্থগিত রাখার প্রস্তাবে সমর্থন জানালেন কিন্তু অধিকাংশ সদস্যের বিরোধিতায় প্রস্তাব পাস করিতে না পারলেও তাঁরই প্রচেষ্টায় অধিবেশনে নিম্নোক্ত প্রস্তাব স্বীকৃতি লাভ করে।

"নিখিল ভারত মুসলিম লীগ নিজের এই দৃঢ় বিশ্বাসের কথা স্পষ্ট করে ব্যক্ত করতে চায় যে ভারতবর্ষের অধিবাসীদের ভবিষ্যৎ বিকাশ এবং প্রগতি বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে সখ্যতাপূর্ণ সম্পর্ক ও পারস্পরিক সহযোগিতার উপর নির্ভর করে এবং তাই লীগ আশা করে যে উভয় পক্ষ মাঝে মাঝে একত্র হয়ে জনহিতের সঙ্গে সম্পর্কিত বিষয়সমূহ সম্বন্ধে সম্মিলিত ও কার্যকরী পদক্ষেপ নেবার উপায় উদ্ভাবন করবেন।"

(মজুমদার কর্তৃক সমগ্রন্থের ২৩ পৃষ্ঠায় উদ্ধৃত)।

মুসলিম লীগের সাথে যুক্ত হলেও কংগ্রেসের সঙ্গে তাঁর পুর্বের দৃঢ় সম্পর্ক বজায় ছিল। কংগ্রেস ও মুসলিম লীগকে কাছাকাছি এনে ইংরেজদের বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ আন্দোলনে তাঁর প্রয়াস তখন লীগ কংগ্রেসের নেতৃবৃন্দের প্রশংসা অর্জন করে। এতে সরোজিনী নাইডু, গোখলে ও কানাইলাল মুন্সীসহ কংগ্রেস নেতাদের জিন্নাহকে হিন্দু-মুসলমান মিলনের অগ্রদূত হিসাবে আখ্যায়িত করণ যথার্থ যুক্তিযুক্ত বলে প্রমাণিত হলো।

১৯১৩ সনের ২৭শে ডিসেম্বর তিনি করাচী কংগ্রেসে কাউন্সিল অফ ইন্ডিয়ার কার্য্যকলাপের সংস্কার সাধনের প্রস্তাবে দীর্ঘ বক্তৃতা করেন। যে বক্তৃতা বৃটিশ সরকারকে কিছুটা অসন্তুষ্ট করলেও সাধারণ কংগ্রেস সদস্যরা আনন্দের সঙ্গে জিন্নাহকে সমর্থন করেন। নবাব সৈয়দ মোহাম্মদের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত ঐ অধিবেশনে ভুপেন্দ্রনাথ বসু লীগের এই নতুন ভূমিকার প্রশংসা করে একটি প্রস্তাব উত্থাপন করেন এবং জিন্নাহর উদ্যোগে কংগ্রেস ও লীগের বাৎসরিক অধিবেশন ১৯১৫ সালে বোম্বেতে অনুষ্ঠিত হবে স্থির হলো।

১৯১৪ সালে মে মাসে জিন্নাহ ভুপেন্দ্রনাথ বসু, লালা রাজপত রায়, মজহারুল হক প্রভৃতির সঙ্গে দেশের শাসন সংস্কারের উদ্দেশ্যে বৃটিশ সরকারের সঙ্গে কথা বলার জন্য এক প্রতিনিধি দল নিয়ে বিলাত যান এবং কংগ্রেসের দাবি নিয়ে সেখানে অনেক প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে আলাপ করেন। সেখানে তিনি ভারত সচিবের কাউন্সিলে মনোনয়ন দানের পরিবর্তে নির্বাচনের

www.amarboi.org

মাধ্যমে ভারতীয়দের মধ্য থেকে উপযুক্ত প্রতিনিধি নেয়ার সুপারিশ করে অনেক পত্রিকায় বিবৃতি প্রদান করেন। ঐ মাসেই লীগ সম্পাদককে লীগের পরবর্তী অধিবেশন বোম্বেতে আহ্বানের নির্দেশ দেন এবং লীগ কাউন্সিলের কিছু সদস্যের বিরোধিতা সত্ত্বেও তাঁর প্রস্তাব গৃহীত হয়। লন্ডনে থাকাকালীন ৮ই আগস্ট আনন্দ কুমার স্বামী ও সরোজিনী নাইডুর সঙ্গে দক্ষিণ আফ্রিকা থেকে স্থায়ীভাবে দেশে ফেরার পথে গান্ধীর সম্মানে সিমেন হোটেলে অনুষ্ঠিত সংবর্ধনা সভায় দক্ষিণ আফ্রিকায় ভারতবাসীদের বীরত্বপূর্ণ সংগ্রামে নেতার ভূয়সী প্রশংসা করেন। ভারতের বর্তমান শতাব্দীর রাজনৈতিক ইতিহাসে সর্বাপেক্ষা শক্তিমান ও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকার অধিকারী এ দু' ব্যক্তির এটাই প্রথম সাক্ষাৎকার।

১৯১৫ সালের ১৩ই ফেব্রুয়ারী বোম্বের মুসলমান ছাত্র ইউনিয়নের উদ্বোধকের ভাষণে জিন্নাহ্ বলেন যে "শৃঙ্খলাযুক্ত নৈতিক জীবন গড়ে তোলার সঙ্গে তারা যেন রাজনীতিতে আগ্রহশীল হয়। তবে আন্দোলনাত্মক রাজনীতির সংশ্রব যেন তারা এড়িয়ে চলে। ১১ই নভেম্বর মুসলিম নেতা ও জনসাধারণকে তিনি আবেদন জানান তারা যেন হিন্দুদের সঙ্গে চলার উদ্দেশ্যে এক সম্মিলিত ফ্রন্ট গড়ার জন্য নিখিল ভারত মুসলিম লীগের পতাকা তলে সমবেত হন।"

বিগত বছরে কংগ্রেস ও লীগের মধ্যে কাছাকাছি আসার যে প্রবণতা দেখা গিয়েছিল উপরোক্ত ঘটনাগুলোতে তা আরো পুষ্টি লাভ করে। টেন্ডুলকারের মতে "শ্রীযুক্ত মোহাম্মদ আলী জিন্নাহর জন্য প্রধানতঃ এ নতুন ধারার সৃষ্টি হয়। নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটিকে শাসন সংস্কার, গণশিক্ষা প্রভৃতির উপর একটি পরিকল্পনা তৈরি করার সঙ্গে সঙ্গে লীগ ওয়ার্কিং কমিটির সঙ্গে আলোচনা করে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেয়ার অধিকারও ঐ কমিটিকে দেয়া হল। দিন কয়েক পরে পহেলা জানুয়ারী ১৯১৬ সনে ঐ বোম্বাই শহরেই লীগের অধিবেশনে হজরত মোহানীসহ কিছু কট্টর পন্থীদের প্রবল বিরোধিতা সত্ত্বেও জিন্নাহ্ বিপুল হর্ষধ্বনির মধ্যে নিজের পছন্দমত প্রায় সবগুলো প্রস্তাব পাস করাতে সক্ষম হয়েছিলেন।" কংগ্রেসের মত অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে পরামর্শক্রমে শাসন সংস্কারের পরিকল্পনা রচনার জন্য একটি কমিটি গঠন করা হল। সমস্ত রাজনৈতিক দল যেন ব্রিটিশ সরকারের বিরুদ্ধে সংঘবদ্ধ হয় এই আশা ব্যক্ত করা হল। ঘোষণা করা হল যে কংগ্রেস ও লীগ হল ভারত বর্ষের দুই প্রধান প্রতিনিধিত্বমূলক রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান। তাঁর প্রস্তাবক্রমে হিন্দু মুসলমান সমস্যার সমাধান কল্পে লীগ ও কংগ্রেসের একটি যুক্ত কমিটি গঠিত হয়। লীগ

www.amarboi.org

অধিবেশনের সভাপতি মজহারুল হক প্রকাশ্য সভায় জিন্নাহর এই ভূমিকার ভূঁয়সী প্রশংসা করেন। লীগের ঐ অধিবেশনে আরও অনেকের সঙ্গে গান্ধী, মালব্য ও সরোজিনী নাইডু প্রমুখ কংগ্রেস নেতারা যোগ দিয়েছিলেন।

দুই প্রতিষ্ঠানের একই শহরে বার্ষিক অধিবেশন অনুষ্ঠানের এই প্রথম কংগ্রেস ও লীগের রাজনৈতিক দৃষ্টি-কোণকে এত কাছাকাছি নিয়ে আসে যে পরে মৌলানা মোহাম্মদ আলী সে সম্বন্ধে নিম্নোক্ত রসিকতাপূর্ণ মন্তব্য করেছিলেনঃ

"মুসলমানদের প্রগতি এত দ্রুত হয়েছে যে তাঁদের মধ্যে থেকেই এক রসিক সমালোচক এই মন্তব্য করেছেন যে লর্ড সিনহা ... তাঁর বিহারী প্রতিবেশী এবং মুসলিম লীগের অধিবেশনের সভাপতি আইনজীবী ভ্রাতার সঙ্গে একই রেলগাড়ির কামরায় ভ্রমণ করছিলেন এবং তুলনামূলক ভাবে বিচার করার জন্য একে অপরের সভাপতির অভিভাষণ দেখতে গিয়েছিলেন। কিন্তু .... উভয় সভাপতিই তারপর নিজ নিজ অভিভাষণ ফেরত নিতে ভুলে যান। ফলে দৈবের নির্বন্ধে মৌলানা মজহারুল হক তাঁর মুসলমান শ্রোতৃমন্ডলীর সম্মুখে নিজের বলে যে ভাষণ পড়েন তাতে বাঙ্গালী সুলভ তীক্ষ্ণ বাগ্মিতা ছিল। আর অনুরূপ পরিস্থিতিতে কংগ্রেসের প্রতিনিধিদের সামনে লর্ড সিনহা যে অভিভাষণ পাঠ করেন তাতে পাওয়া যায় চিরকালের রাজানুগত মুসলমানদের সতর্কতা ও থেকে থেকে থমকে দাঁড়ানোর সুর" (এম, এইচ, সাঈদ-জিন্নাহ, পৃষ্ঠা-৬৫)।

১৯১৬ সনের প্রথমাবধি ভারতের রাজনৈতিক ক্ষেত্রে যে প্রবল জোয়ার পরিলক্ষিত হয়েছিল তার অন্যতম প্রধান জনক ছিলেন মিঃ মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ। অপর দু'জন ছিলেন শ্রীমতি অ্যানে বেসান্ত ও লোকমান্য তিলক। ঐ বৎসর ২১শে জুন আবার জিন্নাহ ইম্পিরিয়াল কাউন্সিলের সদস্য নির্বাচিত হন। পরবর্তীতে ৭-১০ই আগস্ট পুণার জেলা ম্যাজিস্ট্রেটের আদালতে রাজদ্রোহ মূলক বক্তৃতার অভিযোগে তিলক যখন অভিযুক্ত হন তখন জিন্নাহ কোর্টে তিলকের পক্ষ সমর্থন করেন। ১৯১৫ সালে বোম্বাইতে যখন ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস ও মুসলিম লীগের অধিবেশন হয় তখন জিন্নাহর মনে হিন্দু মুসলমান সমঝোতার কল্পনা প্রথম রূপ নেয়া আরম্ভ করে। ১৯১৬ সনের অক্টোবরে আহমদাবাদে জিন্নাহর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত প্রাদেশিক সম্মেলনে পূর্বের বুঝা পড়া আরও শক্তিশালী হয়। তাঁকে তখন লীগের পরবর্তী বাৎসরিক সম্মেলনের সভাপতি নির্বাচন করা হয়। এসময় তিনি হিন্দুদের কংগ্রেস দলের একটি

www.amarboi.org

সম্মেলনেও সভাপতিত্ব করেন, যে দল কিনা ইতিপূর্বে একান্তভাবে হিন্দু প্রভাবিতই ছিল।

উপরোক্ত ঘটনাগুলো থেকে স্পষ্ট দেখা যায় জিন্নাহ সে সময় হিন্দু-মুসলমান, কংগ্রেস ও লীগের নিকট একই রকম জনপ্রিয় ছিলেন। হিন্দু-মুসলমান, লীগ ও কংগ্রেসকে কাছাকাছি এনে একটা স্থায়ী বুঝা পড়ার ভিতর দিয়ে ভারতের স্বায়ত্তশাসনকে ত্বরান্বিত করা। তাঁর এই প্রচেষ্টা দুই সম্প্রদায়ের কাছেই সমভাবে অভিনন্দিত হচ্ছিল। এখানে লক্ষণীয় জিন্নাহ তখনও ভারতের হিন্দু-মুসলমানকে দুই সম্প্রদায় রূপে অভিহিত করতেন। দুই জাতি বলে অভিহিত করতেন না। তাঁর দৃঢ় বিশ্বাস ছিল হিন্দুরা বা কংগ্রেস একটুখানি উদারতা দেখিয়ে মুসলমানদেরকে কিছু অধিক সুযোগ-সুবিধা দিলে এবং মুসলমানরা ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে মোটামুটি নিশ্চিত হতে পারলে দুই সম্প্রদায়ের মধ্যে স্থায়ী সদ্ভাব ও বুঝাপড়া সম্ভব এবং ঐ লক্ষ্যেই তিনি পরিশ্রম করে যাচ্ছিলেন যার ফলে যৌথ নির্বাচন প্রভৃতির প্রশ্নে তাঁর সম্প্রদায়ের অনেকে অনেক সময় তাঁকে ভুল বুঝতেন।

লক্ষ্ণৌ প্যাক্ট ও জিন্নাহ

হিন্দু-মুসলমান মিলন ও সমঝোতার জন্য জিন্নাহর প্রচেষ্টার চূড়ান্ত রূপ লাভ করে ১৯১৬ সনে বিখ্যাত লক্ষ্ণৌ প্যাক্টের মধ্য দিয়ে। এ প্যাক্টের শর্তগুলোর মাধ্যমেই কংগ্রেস তথা হিন্দুরা মুসলমানদের অনেকগুলো গুরুত্বপূর্ণ দাবী মেনে নিয়ে ভারতে হিন্দু-মুসলিম সম্পর্কের ক্ষেত্রে একটা নতুন পথ রচনা করল। ইংরেজদের ভেদবুদ্ধি নীতির ফলে হিন্দু-মুসলমান ঐক্য ছিন্ন ভিন্ন হয়ে দুই বৃহৎ সম্প্রদায়ের মধ্যে পারস্পরিক রেষারেষি যে ভাবে বৃদ্ধি পাচ্ছিল তাতে লক্ষ্ণৌ প্যাক্টের ফলে এর একত্রে স্থায়ী সমাধান হবে ভারতবাসীর মনে এ আশা জাগলো। এখানে আমরা শৈলেশ বন্দোপাধ্যায়ের 'জিন্নাহ-পাকিস্তান-নূতন ভাবনা' বই থেকে বেশ কিছুটা উদ্ধৃতি দিচ্ছি, যেটা তিনি অর্ধ ডজনের উপর ভারতীয়, পাকিস্তানী ও ইংরেজ লেখকদের বই থেকে সংগ্রহ করেছেন।

"ঐ বৎসর বোম্বের অনুকরণে লক্ষ্ণৌ এ অনুষ্ঠিত প্রথমে কংগ্রেসের (২৬-২৮ ডিসেম্বর) ও পরে (ডিসেম্বর ৩০-৩১) লীগের অধিবেশনকে জিন্নাহর নিজস্ব নেতৃত্বশোভিত অধিবেশন বলা চলে। লক্ষ্ণৌ কংগ্রেসেই সরোজিনী নাইডু মুসলিম ঐক্যের জন্য জিন্নাহর প্রয়াসের ভূঁয়সী প্রশংসা করার সময় তাঁর ভাষণে গোখলের বিখ্যাত উক্তির পুনরাবৃত্তি করেন "হিন্দু-মুসলমান ঐক্যের

www.amarboi.org

সর্বশ্রেষ্ঠ রাজদূত।" সেবারে কংগ্রেস অধিবেশনে সভাপতিত্ব করেন অম্বিকাচরণ মজুমদার। ইতিমধ্যে কংগ্রেস ও লীগের যৌথ কমিটি এলাহাবাদ ও কোলকাতায় মিলিত হয়ে বাংলা ও পাঞ্জাব ছাড়া আর সব প্রদেশের আইন সভায় বিভিন্ন সম্প্রদায়ের প্রতিনিধিত্বের প্রশ্নের একটা সর্বজন মান্য সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছে। সে ব্যাপারেও জিন্নাহর বিশেষ ভূমিকা ছিল। বাকিটুকু লক্ষ্ণৌ-এ সমাধা হল। কংগ্রেস-লীগ সমঝোতাতে শতকরা ২০ জন মনোনীত সদস্যের বিধান থাকলেও প্রশাসকদের আইনসভার অধীন করার সঙ্গে সঙ্গে সাম্প্রদায়িক ভিত্তিতে মুসলমান সংখ্যালঘুদের জন্য আসন বন্টন হল নিম্নহারেঃ

"পাঞ্জাবে নির্বাচিত সদস্যদের অর্ধেক, সংযুক্ত প্রদেশে শতকরা ৩০ ভাগ, বাংলায় শতকরা ৪০ ভাগ, বিহারে শতকরা ২৫ ভাগ, মধ্য প্রদেশে শতকরা ১৫ ভাগ, মাদ্রাজে শতকরা ১৫ ভাগ এবং বোম্বাই প্রদেশে তিন ভাগের এক ভাগ। ইম্পিরিয়াল অথবা প্রাথমিক কোন নির্বাচনেই তাঁরা এই বিশেষ স্বার্থের প্রতিনিধিত্বের কোটার বহির্ভূত আসনের জন্য প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবেন না। এই ব্যবস্থাও রইল যে,... এক অথবা অন্য সম্প্রদায়ের স্বার্থ সংশ্লিষ্ট কোন বিল ... নিয়ে কেবল তখনই আলোচনা হবে যদি সংশ্লিষ্ট আইন সভার সেই সম্প্রদায়ের সদস্যদের অন্ততঃ তিন চতুর্থাংশ সেই বিলের বিরোধিতা না করেন।' ইম্পিরিয়াল কাউন্সিলের .... নির্বাচিত ভারতীয় সদস্যদের এক তৃতীয়াংশ হবেন মুসলমান। তাঁরা নির্বাচিত হবেন মুলমানদের পৃথক নির্বাচন মন্ডলী দ্বারা যার অনুপাত হবে ... যে হারে তাঁরা পৃথক মুসলমান ভোটারদের দ্বারা প্রাদেশিক আইন সভাগুলিতে প্রতিনিধিত্ব প্রাপ্ত।"

পূর্বোক্ত সমঝোতার কয়েকদিন পরেই ঐখানে জিন্নাহর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত লীগের অধিবেশনে ও উপরোক্ত শর্তগুলো গৃহীত হয়। লীগকে দিয়ে ঐ চুক্তি অনুমোদন করিয়ে নেবার জন্য বিশেষ ভূমিকা নেয়া ছাড়াও সভাপতির অভিভাষণে জিন্নাহ বলেন ঃ

"হিন্দুদের প্রতি আমাদের দৃষ্টিভঙ্গি হবে শুভেচ্ছা এবং ভ্রাতৃভাবাপন্ন। আমাদের চালক নীতি হবে দেশের স্বার্থে তাঁদের সঙ্গে সহযোগিতা। দুই ভ্রাতৃপ্রতিম মহৎ সম্প্রদায়ের ভিতর যথার্থ বোঝাপড়া এবং হৃদ্যতাপূর্ণ সম্বন্ধ প্রতিষ্ঠিত হলেই কেবল ভারতবর্ষের যথার্থ প্রগতি সম্ভবপর হবে।"

জিন্নাহর কণ্ঠে এক নতুন সুর যা মুসলিম লীগের মঞ্চে অতীতে কখনো শোনা যায়নিঃ "প্রথমে নিখিল ভারত মুসলিম রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান গঠনের প্রধান ভিত্তি ছিল ভারতবর্ষের রাজনৈতিক বিবর্তনের গতিপথের প্রতিটি বাঁকে

www.amarboi.org

যখন যে কোন সাংবিধানিক ব্যবস্থাপিত করণের অবকাশই আসুক না কেন, মুসলমান সাম্প্রদায়িক বৈশিষ্ট্যকে দৃঢ় এবং অবিকৃত রূপে রেখে দেয়া। এই সম্প্রদায়ের রাজনৈতিক জীবন ও চিন্তা ধারার বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে পূর্বোক্ত নীতিরও বৃদ্ধি ও সম্প্রসারণ ঘটেছে। ভবিষ্যৎ সম্পর্কে সামান্য দৃষ্টিভঙ্গি ও আদর্শের ক্ষেত্রে নিখিল ভারত মুসলিম লীগ ভারতের জাতীয় কংগ্রেসের সঙ্গে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে দন্ডায়মান এবং সামগ্রিক ভাবে ভারতবর্ষের অগ্রগতির উদ্দেশ্যে যে কোন দেশাত্মমূলক প্রয়াসের অংশীদার হতে প্রস্তুত।"

লক্ষ্ণৌ-এর ঐ চুক্তির বৈশিষ্ট্য এই যে কেবল তিলকের মত চরমপন্থী নেতাই তার প্রশংসা করেননি, সুরেন্দ্রনাথ বন্দোপাধ্যায়ের মত নরমপন্থী নেতাও এর সমর্থনে বলেছিলেন, "হিন্দু ও মুসলমানদের মধ্যে ক্রমবর্ধমান ভাবগত ঐক্যের চূড়ান্ত নিদর্শনে আজ মুসলমান সমাজের নেতৃবৃন্দ কংগ্রেসে যোগ দিয়েছেন। তাঁদের আমি ভূয়সী প্রশংসা জানাই, দুই বাহু সম্প্রসারিত করে তাঁরা আমাদের গ্রহণ করেছেন," এর অপর বৈশিষ্ট্য হল এই যে আসন বাঁটোয়ারার ঐ হার পরবর্তীতে মন্টেগু চেমসফোর্ড শাসন সংস্কারের প্রস্তাবেও গৃহীত হয়েছিল।

লক্ষ্ণৌ- এর ঐ বোঝা পড়া এ জন্য সম্ভবপর হয়েছিল যে জিন্নাহ ও অপরাপর মুসলমান নেতৃবৃন্দ এ কথা স্পষ্ট ভাবে জানান যে, পৃথক নির্বাচন ব্যবস্থা ও অন্যান্য রক্ষাকবচ একান্তভাবে সাময়িক ব্যবস্থা। এ কেবল ততদিনের জন্যই যতদিন না মুসলমান সমাজ তার বর্তমান অনগ্রসর অবস্থা কাটিয়ে উঠতে পারছে, ভবিষ্যতে এর প্রয়োজন আর থাকবে না। মন্টেগু চেমসফোর্ড শাসন সংস্কারের প্রস্তাব বিবেচনার জন্য গঠিত পার্লামেন্টারী কমিটির সম্মুখে সাক্ষ্য দেবার সময়ে জিন্নাহ দ্ব্যর্থহীন ভাষায় একথা ঘোষণা করেন। নিম্নে জিন্নাহর সাক্ষ্য থেকে উদ্ধৃতি দেয়া হচ্ছে ঃ

"মেজর অর্মসবি গোর, এম. পি. - আপনি বললেন যে আপনি ভারতবর্ষের দৃষ্টিকোণ থেকে বলছেন। আপনি কি তবে ভারতের জাতীয়তাবাদী হিসাবে বলছেন?

শ্রীযুক্ত জিন্নাহ- আজ্ঞে হ্যাঁ।

মেজর গোর- অর্থাৎ আপনার বক্তব্য হল রাজনৈতিক জীবনে যথাসম্ভব শীঘ্র মুসলমান ও হিন্দুদের মধ্যে পার্থক্য করা বন্ধ হোক-এই আপনি চান।

www.amarboi.org

"শ্রীযুক্ত জিন্নাহ- আজ্ঞে হ্যাঁ। আমার কাছে ঐ শুভ দিনটির থেকে অধিকতর আনন্দদায়ক আর কিছু হতে পারে না।"

এরপর ভারতীয় রাজনৈতিক প্রশাসনিক ব্যাপারে গুরুত্বপূর্ণ দাবি দাওয়া আদায়ের জন্য ইম্পিরিয়াল কাউন্সিলে জিন্নাহ্ যে সব বক্তব্য রাখেন ও শেষদিকে স্বায়ত্তশাসন আদায়ের লক্ষ্যে কিভাবে হোমরুল লীগে যোগদান করেন তার কিছুটা বিবরণ আমরা "পার্টিশান অফ ইন্ডিয়া- লিজেন্ড এন্ড রিয়ালিটি- এইচ, এ, সিরভাই এর বই থেকে পূর্বে উদ্ধৃত করেছি।

১৯১৭ সালে জিন্নাহ্ ইম্পিরিয়াল কাউন্সিলে যে সব গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের উপর বক্তৃতা দিয়েছিলেন, সেগুলো হল ভারতীয়দের সশস্ত্র বাহিনীতে অফিসারের পদ দেয়া, বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা প্রবর্তন, সরকারী চাকরির ভারতীয়করণসহ্ অন্ততঃ আই, সি, এস, দের অর্ধেক পদ ভারতবাসীদের দেয়া, ভারত ও বিলাত উভয় দেশে যুগপৎ ইন্ডিয়ান সিভিল সার্ভিসের পরীক্ষা গ্রহণ, ঢাকা ও পাটনা বিশ্ববিদ্যালয় বিল, ভারতবাসী ও ইউরোপীয়দের মধ্যে সমতা প্রবর্তন ইত্যাদি। এ ছাড়া তিনি এই বছর শ্রীনিবাস শাস্ত্রী তেজবাহাদুর সাপ্রু এবং ওয়াজির হাসানের সঙ্গে কংগ্রেস ও লীগের এক যুক্ত প্রতিনিধি মন্ডলের সদস্য হিসেবে লন্ডনে গিয়েছিলেন লক্ষ্ণৌ চুক্তির ভিত্তিতে শাসন সংস্কারের দাবি নিয়ে। ২৮ শে জুলাই বোম্বেতে হোমরুল লীগের বন্দী নেতৃবৃন্দের মুক্তির দাবিতে লীগ কাউন্সিল ও নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটির সম্মিলিত সভায় সভাপতিত্ব করেছিলেন। ইতিমধ্যে হোমরুল লীগের সভানেত্রী শ্রীমতি বেসান্ত ও তাঁর অন্যান্য সহকর্মীদের অন্তরীণ করার সরকারী আদেশের প্রতিবাদেই যেন তিনি হোমরুল লীগে যোগ দিয়ে তার বোম্বে শাখার সভাপতি হন এবং শ্রীমতী বেসান্তকে পাঠানো এক চিঠিতে লেখেনঃ "মুসলমানদের প্রতি আমার নিবেদন হল এই যে তাঁরা যেন তাদের হিন্দু ভাইদের হাতে হাত মেলান। হিন্দুদের প্রতি আমার নিবেদন হল- আপনারা অনগ্রসর ভাইদের উত্থানের সহায়ক হোন। এই আদর্শ নিয়েই যেন হোমরুল লীগের ভিত্তি স্থাপিত হয় এবং তাহলে আমাদের পক্ষে আর ভয়ের কারণ থাকবেনা।" অক্টোবরের ৬ তারিখে অনুরূপ উদ্দেশ্যে অনুষ্ঠিত লীগ ও কংগ্রেসের সম্মিলিত সভায় যোগদান করেন এবং উক্ত সভার সিদ্ধান্ত অনুসারে এক নিখিল ভারতীয় প্রতিনিধি মন্ডলের সদস্য হিসেবে ২৬শে অক্টোবর বড়লাটের সঙ্গে দেখা করেন। এ ছাড়া জুলাই এ দু'বার ও নভেম্বরে একবার বোম্বেতে এবং অক্টোবরে

www.amarboi.org

একবার এলাহাবাদে হোমরুল লীগের সভায় যোগ দেন এবং শেষোক্ত সভায় বলেন যে ভারতের স্বায়ত্তশাসনের জন্যই তিনি হোমরুল লীগে যোগ দিয়েছেন।

ঐ বৎসর অর্থাৎ ১৯১৭ সনে কংগ্রেস ও লীগের বাৎসরিক অধিবেশন একই সময়ে কোলকাতায় অনুষ্ঠিত হয়। কংগ্রেস সভাপতি ছিলেন অ্যানে বেসান্ত ও লীগের ছিলেন মিঃ জিন্নাহ। উভয় অধিবেশনেই কংগ্রেস-লীগ প্রস্তাব গ্রহণের দাবী উঠলো। লীগ ও কংগ্রেস নেতারা মনোভাবের দিক থেকে এতটা কাছাকাছি এগিয়ে ছিলেন যে লীগের অধিবেশনে গান্ধী, সরোজিনী নাইডু যোগ দিয়ে আলী ভ্রাতৃদ্বয়ের মুক্তির স্বপক্ষে উথাপিত প্রস্তাবের উপর বক্তৃতা দিলেন। কংগ্রেস অধিবেশনে জিন্নাহ লক্ষ্ণৌ প্যাক্টের সমর্থনে বিভিন্ন দিকের উপযোগিতা সম্বন্ধে মনোগ্রাহী যুক্তির অবতারণা করেন। হিন্দুদের অভিসন্ধি সম্পর্কে সংশয়িত লীগের সহকর্মীদের উদ্দেশ্যে জিন্নাহ বলেন, "আপনাদের শত্রুদের সমালোচনায় আতঙ্কিত হয়ে হিন্দুদের সংগে সহযোগিতা করা থেকে বিরত থাকবেন না। কারণ স্বায়ত্ত শাসন প্রাপ্তির জন্য এই সহযোগিতা অপরিহার্য।"

ইতিপূর্বে আমরা উল্লেখ করেছি হোমরুল লীগের দাবীর প্রেক্ষিতে ব্রিটিশ ভারত সচিব মন্টেগু ২০শে আগষ্ট মন্ত্রিসভার পক্ষ থেকে ঘোষণা করেন ভারতবর্ষে ক্রমশঃ দায়িত্বশীল সরকার প্রতিষ্ঠা করে ভারতবাসীদের শাসন ব্যবস্থার সংগে যুক্ত করাই বৃটিশ সরকারের নীতি। একথাও আমরা পূর্বে উল্লেখ করেছি যে ১৯১৪ সনের প্রথম মহাযুদ্ধের প্রতি ভারতীয় দৃষ্টিকোণ কি হবে তা নিয়ে জাতীয়তাবাদীদের মধ্যে আলাপ আলোচনা চলছিল। গান্ধীর মত জিন্নাহ নৈতিক কারণে যুদ্ধ প্রচেষ্টায় নিঃশর্ত সমর্থনের পক্ষপাতি ছিলেন না। জিন্নাহর মত ছিল এই সাহায্যের জন্য ভারতবাসীকে ইউরোপীয়, বৃটিশ নাগরিকদের সংগে এক পর্যায়ের বলে স্বীকার করে নেওয়া প্রয়োজন। জিন্নাহর এই দাবীকে বড়লাট চেমস ফোর্ড দরাদরি বলে ভৎর্সনা করায় জিন্নাহ প্রকাশ্যভাবে তার প্রতিবাদ করে নির্ভীকভাবে বলেনঃ "আমার স্বদেশের সম্রাটের সমান অধিকার সম্পন্ন প্রজা হিসাবে নিজের আত্মসম্মান পরবশ আমি যদি আমার নাগরিকের মুখের উপর বলি যে আজকের বিধি নিষেধ দূর করতেই হবে- তবে তা কি দরাদরি করা? মাই লর্ড, নিজের স্বদেশে আমাকে ইউরোপীয় বৃটিশ নাগরিকের সম মর্যাদা দেয়া হোক দাবী করা কি দর কষাকষি? এর নাম কি দরাদরি?"

www.amarboi.org

এই সব মন্তব্যের থেকে জিন্নাহর চরিত্রের দৃঢ়তা, অকুতোভয়ে কথাবলার সাহস আমরা দেখতে পাই যা সমসাময়িক অন্য কোন নেতাদের অনেকের মধ্যেই পরিদৃষ্ট হত না। অতি উচ্চমানের আত্মসম্মান বোধ থেকে উদ্বুদ্ধ জাতীয়তাবাদী চেতনার অধিকারী হওয়ার কারণে বৃটিশ প্রভুদের করুণা লাভের বিন্দুমাত্র আকাঙ্খা তার ছিল না বলেই বৃটিশ সরকারের মুখের উপর এরূপ কঠিন কথা বলার সাহস তাঁর ছিল।

১৯১৮ সনের এপ্রিল মাসে দিল্লীতে অনুষ্ঠিত বড়লাটের যুদ্ধ সম্মেলনে জিন্নাহর বক্তব্য সরকারী প্রস্তাবের বিরোধী বলে বড়লাট তা বিধি বহির্ভূত বলে বাতিল করায় জিন্নাহ এক তার বার্তায় লর্ড চেমস ফোর্ডকে জানান; "আমাদের স্বদেশের জন্য যে নীতি অস্বীকার করা হয়েছে, তার জন্য আমাদের যুবকদের যুদ্ধ করার জন্য আমরা বলতে পারিনা। ... সাম্রাজ্যকে রক্ষা করার জন্য ভারতবর্ষকে যদি যথেষ্ট আত্মত্যাগ করতে হয় তা'হলে তা সম্ভব সাম্রাজ্যের অংশীদার হিসাবে, তার অধীন হিসাবে নয়।... প্রথম পদক্ষেপ হিসাবে কংগ্রেস-লীগ পরিকল্পনার ভিত্তিতে পার্লামেন্টের অনুমোদনক্রমে নির্ধারিত একটা নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে পূর্ণ দায়িত্বশীল সরকার প্রতিষ্ঠা করা হোক এবং অবিলম্বে এর জন্য পার্লামেন্টে একটি বিল উপস্থাপিত করা হোক।"

অবশেষে ১৯১৮ সনের জুনে মন্টেগু চেমসফোর্ড বা সংক্ষেপে মন্টফোর্ড প্রস্তাব প্রকাশিত হল। এতে যদিও আসন বন্টনের ব্যাপারে কংগ্রেস-লীগের যৌথ প্রস্তাব স্বীকৃতি লাভ করে তথাপি আইন সভার কাছে দায়িত্বশীল মন্ত্রী সভার প্রস্তাব থাকলেও যথার্থ স্বায়ত্তশাসন এবং ব্যক্তি ও সংবাদপত্রের স্বাধীনতার, আইনের চক্ষে ইরেজ ও ভারতীয়দের সমান মর্যাদা ইত্যাদির সুযোগ ছিল না। এ কারণে বোম্বেতে হাসান ইমামের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত কংগ্রেস অধিবেশনে হতাশা প্রকাশ করা হয় এবং একই সময় বোম্বেতে মাহমুদাবাদের রাজার সভাপতিত্বে লীগের অধিবেশনেও একই মনোভাব ব্যক্ত করা হয়। এসব ত্রুটি বিচ্যুতি নিয়ে ও আলী ভ্রাতৃদ্বয়ের মুক্তি, অ্যানে বেসান্ত, মৌলানা আজাদ, বিপিন পাল, তিলক প্রভৃতির গমনাগমনের উপর বিধি নিষেধ আরোপের ব্যাপার নিয়ে জিন্নাহ বড়লাটের সঙ্গে এক প্রতিনিধি দলসহ দেখা করেন। ডিসেম্বরে মদন মোহন মালব্যের সভাপতিত্বে দিল্লীতে কংগ্রেসের বাৎসরিক অধিবেশনে জিন্নাহকে আবার নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটির সদস্য করা হয়।

www.amarboi.org

ইতিমধ্যে প্রথম মহাযুদ্ধের অবসানে মর্লিমিন্টো শাসন সংস্কার প্রবর্তনে ভারত সরকার অগ্রসর হলে কংগ্রেস-লীগ মিলিতভাবে সংস্কারের ত্রুটি বিচ্যুতিগুলো লোক চক্ষে তুলে ধরে কংগ্রেস ও লীগের প্রস্তাবগুলোকে মেনে নেয়ার জন্য সরকারের কাছে দাবি জানান।

খেলাফত আন্দোলন ও জিন্নাহ

লীগের অধিবেশনও ঐ সময় দিল্লীতেই হলো। অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি ছিলেন ডাঃ আনসারী ও মূল সভাপতি ছিলেন এ, কে, ফজলুল হক, উভয়েই কংগ্রেস পন্থী। সেবারকার অধিবেশনে শাসন সংস্কারের ব্যাপারে কংগ্রেসের অনুরূপ প্রস্তাব গ্রহণ ছাড়াও অন্য একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ প্রস্তাব এলো যার সম্বন্ধে আলোচনা প্রয়োজন। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে তুরস্কের পরাজয়ের পর খেলাফত বাতিল হওয়ার সম্ভাবনা দেখা দিল। তুরস্কের খলিফাকে বিশ্বের তাবৎ মুসলমান তাদের ধর্মগুরু বলে মনে মনে বিশ্বাস করতেন বলে খেলাফত বাতিলের সম্ভাবনাকে রোধ করার জন্য বৃটিশ সরকারের উপর চাপ সৃষ্টির দাবী জানানো হলো। মহাযুদ্ধ চলাকালে তুরস্কের খলিফার স্বার্থের কোন প্রকার ক্ষতি হবেনা এ মর্মে বৃটিশ সরকার আশ্বাস দিয়েছিলেন। এখন তার ব্যতিক্রম হচ্ছে দেখে ভারতীয় মুসলমানদের মধ্যে দারুণ ক্ষোভ ও চাঞ্চল্য দেখা দিল।

খেলাফত বজায় রাখা সম্পর্কে লীগ অধিবেশনে প্রস্তাব এলে জিন্নাহ এটা বৃটিশ সরকারের বৈদেশিক নীতির অন্তর্গত, তাই এ সম্পর্কে আলোচনা চলেনা বলে মন্তব্য করলেন। জিন্নাহ ছিলেন পুরোপুরি মনেপ্রাণে সেক্যুলার ও প্যান ইসলাম বিরোধী। রাজনীতির সঙ্গে ধর্মকে জড়ানোর তিনি ঘোরতর বিরোধী ছিলেন। পূর্বেই আমরা উল্লেখ করেছি ধর্মের সঙ্গে রাজনীতিকে জড়ানো ব্যাপার নিয়েই গান্ধীর সঙ্গে তাঁর প্রথম থেকে বিরোধ ছিল। যাই হোক অধিবেশনে অধিকাংশ প্রতিনিধিরা তাঁর মতের বিরোধিতা করায় তিনি তাঁর সমর্থকদের নিয়ে সম্মেলন থেকে বেরিয়ে এলেন।

১৯২০ সনে ভারতের রাজনৈতিক জীবনে একটি অভাবিত পরিবর্তন ঘটিত হল যা জিন্নাহর জীবনে বেশ খানিকটা বিপর্যয়ের সৃষ্টি করলো। পূর্বেই উল্লেখ করেছি দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের অবসানে তুরস্কের খেলাফত সংকট দেখা দেয়ার পর ভারতীয় মুসলমানরা খেলাফত বজায় রাখার জন্য খেলাফত আন্দোলন আরম্ভ করেছিল ও গান্ধী সে আন্দোলনকে সমর্থন জানিয়ে মুসলমানদের মধ্যেও দারুণ জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিলেন। এটাও উল্লেখ করা

www.amarboi.org

হয়েছে যে জিন্নাহ্ যেহেতু সম্পূর্ণ সেক্যুলার মনোভাবাপন্ন ব্যক্তি ছিলেন এবং রাজনীতির সঙ্গে ধর্মকে জড়াবার সম্পূর্ণ বিরোধী ছিলেন তাই নিজেও যেমন খেলাফত আন্দোলন থেকে দূরে ছিলেন তেমনি গান্ধীরও খেলাফত আন্দোলনকে সমর্থন করার সম্পূর্ণ বিরোধী ছিলেন।

১৯২০ সালের জানুয়ারী মাসে যখন ডাঃ আনসারী বড়লাটের কাছ থেকে এবং মৌলানা মোহাম্মদ আলীর নেতৃত্বে একটি প্রতিনিধিদল বিলাতে প্রধানমন্ত্রী লয়েড জর্জের কাছ থেকে খেলাফত বজায় রাখার ব্যাপারে নিরাশ হয়ে ফিরে এলো তখন মুসলমানদের মধ্যে বৃটিশ বিরোধী মনোভাব চরম আকার ধারণ করল। এ সময় যখন হান্টার কমিটির রিপোর্ট প্রকাশিত হল যাতে জালিনওয়ালাবাগের হত্যাকান্ডকে প্রকারান্তরে এক প্রকার সমর্থন জানানো হল তখন ভারতের হিন্দু-মুসলিম নির্বিশেষে সকল সম্প্রদায়ের মধ্যে বৃটিশ বিরোধী মনোভাব চরম আকার ধারণ করলো।

১৪ই মে শেষপর্যন্ত ঘোষিত হলো খেলাফত থাকবে না। ২৮শে মে বোম্বাইয়ে খিলাফত কমিটি ইতিপূর্বে গান্ধীর ঘোষিত অসহযোগ আন্দোলনে যোগ দেয়া ছাড়া পথ নেই এই মর্মে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলো। ৩০শে মে নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটি কলিকাতায় অধিবেশন ডেকে অসহযোগের সিদ্ধান্ত নিল এবং ২রা জুন সর্বদলীয় সম্মেলনের অধিবেশন ডেকে অসহযোগ আন্দোলনের বিস্তৃত কর্মসূচী প্রণয়ন করলো। খেলাফত বিলুপ্তির ব্যাপারে ইংরেজদের ভূমিকায় একান্ত অসন্তুষ্ট হয়ে এদেশকে 'দারুল হারাব' ঘোষণা করে ১৮০০০ মুসলমান আফগানিস্তানকে 'দারুল আমান' অভিহিত করে সেখানে হিজরত করলো। খেলাফতের বিলুপ্তিতে ভারতীয় মুসলমানরা মনেপ্রাণে আঘাত প্রাপ্ত হওয়ায় কিরূপ বৃটিশবিরোধী হয়ে উঠেছিল এর থেকে তার প্রমাণ পাওয়া যায়। এ সময় ভারতব্যাপী হিন্দু-মুসলমান নির্বিশেষে আবালবৃদ্ধবণিতার নিকট গান্ধীর প্রস্তাবিত অসহযোগ আন্দোলন যার প্রস্তুতি তিনি বৎসরখানেক আগে থেকেই নিচ্ছিলেন; তা ছাড়া আর কোন পথ খোলা নেই মনে হলো।

এরূপ পরিস্থিতিতেও সাংবিধানিষ্ট ও অসাম্প্রদায়িক জিন্নাহ্ খিলাফত নিয়ে আন্দোলন ও অসহযোগের বিরোধিতা করলেন প্রবল স্রোতের বিরুদ্ধে অসম সাহসিকতার সঙ্গে। ১৯২০ সনে কোলকাতা কংগ্রেসের বিশেষ অধিবেশনে ৪-৯ই সেপ্টেম্বরে অসযোগ প্রস্তাব পাস হলেও জিন্নাহ ঐ প্রবাহে যোগ দিতে সম্মত হলেন না। এদিকে তিলকের মৃত্যু ঘটায় অ্যানে বেসান্ত, শ্রীনিবাস শাস্ত্রী, দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাস ও বিপিন পালসহ মুষ্টিমেয় দু'চারজন তাঁর সঙ্গে রইলেন।

www.amarboi.org

বিগত কয়েক বৎসরের ন্যায় এবারও একই শহরে একই সময়ে ৭ই সেপ্টেম্বর লীগের অধিবেশন বসেছে। ফেব্রুয়ারী মাসেই জিন্নাহ তার সভাপতি নির্বাচিত হয়েছেন। জিন্নাহ নিজের ভাষণে তুরস্কের প্রতি অবিচারের জন্য ইংরেজদের দোষারোপ করেন। গণতন্ত্রমনা সাংবিধানিষ্ট জিন্নাহ সম্মেলনের সদস্যদের মনোভাব বুঝে এবং কতকটা গান্ধীর প্রতি শ্রদ্ধাবশতঃ তাঁর প্রস্তাবিত অসহযোগ আন্দোলনের বিরোধী মনোভাবাপন্ন হলেও অত্যন্ত কৌশল ও সতর্কতার সাথে বক্তব্য রাখলেন। তৎকালীন প্রথা অনুসারে সেই অধিবেশনে একদিকে যেমন গান্ধী, মতিলাল, লাজপত রায়, দেশ বন্ধু, স্বামী শ্রদ্ধানন্দ ও আবুল কালাম আজাদের মত কংগ্রেস নেতৃবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন তেমনি ছিলেন শওকত আলী, জমির আলী খাঁ, আজমল খাঁ ও ফজলুল হকের মত লীগ নেতৃবৃন্দ। গান্ধীর প্রতি গভীর শ্রদ্ধা নিবেদন করে জিন্নাহ বললেনঃ

"দেশবাসীর সম্মুখে খিলাফত সম্মেলনের সমর্থন নিয়ে মহাত্মা গান্ধী তাঁর অসহযোগের কর্মসূচী উপস্থিত করেছেন। এবারে আপনাদের স্থির করতে হবে যে আপনারা ঐ কর্মসূচীর মুলনীতি অনুমোদন করেন কিনা? আর করলে বিস্তারিত ভাবে এর কার্যক্রম স্বীকার করেন কিনা তাও ভেবে দেখতে হবে। এই পরিকল্পনাকে রূপ দেবার সময় আপনাদের প্রত্যেকের উপর ব্যক্তিগত আঘাত পড়বে। তাই একমাত্র আপনাদের উপরই কোন সিদ্ধান্তে উপনীত হবার পূর্বে নিজ নিজ শক্তির পরিমাপ করার এবং প্রশ্নটির সব দিক নিয়ে চিন্তা করার দায়িত্ব বর্তাচ্ছে। তবে একবার যদি আপনারা সামনের দিকে কুচকাওয়াজ করার সিদ্ধান্ত নেন তাহলে কোন অবস্থাতেই যেন আর পশ্চাদাপসরণ না করেন (না, না, কখনই না) ... আমি আর আপনাদের আটকে রাখতে চাই না। তবে বসে পড়ার পূর্বে কেবল এইটুকু বলতে চাই যে, মনে রাখবেন-সম্মিলিত হলে আমরা খাড়া থাকব আর বিভাজিত হলে ধরাশায়ী হব (সাধু, সাধু এবং করতালি)" (জিন্নাহ-পাকিস্তান-নূতন ভাবনা পৃষ্ঠা-৩৫)।

"প্রথমে এল রাউলাট বিল, তৎসঙ্গে এল পাঞ্জাবের হত্যাকাণ্ড তারপর এল তুর্কী সাম্রাজ্যের ধ্বংসসাধন এবং খিলাফত আন্দোলন যা কিনা আমাদের জন্য জীবন মৃত্যুর প্রশ্ন।

ভারতের রক্ত ও স্বর্ণ দুই'ই চাওয়া হয়েছিল যুদ্ধের জন্য এবং দুর্ভাগ্যবশতঃ উভয়ই ব্যবহৃত হয়েছিল তুর্কী সাম্রাজ্যকে ভেঙ্গে রাউলাটের শৃংখল ক্রয়ের জন্য। মিঃ গান্ধী দেশবাসীর কাছে তার অসহযোগের পরিকল্পনা পেশ করেছেন। এখন আপনাদেরকে স্থির করতে হবে আপনারা এটা অনুমোদন করেন কিনা এবং করলে এটা সম্পূর্ণ ভাবে এবং বিস্তারিতভাবে অনুমোদন

www.amarboi.org

করেন কিনা? দেশের মানুষকে বেপরোয়া হওয়ার মত অবস্থায় ঠেলে না দিতে আমি এখনও সরকারকে অনুরোধ জানাচ্ছি। কারণ এ অবস্থায় মানুষের পক্ষে অসহযোগের নীতি গ্রহণ ছাড়া গত্যন্তর থাকবেনা। যদিও সেটা গান্ধীর অসহযোগ আন্দোলনের পরিকল্পনার অনুরূপ নাও হতে পারে।" জিন্নাহর বক্তব্যটি রাজমোহন গান্ধী তার Understanding the Muslim Mind বইয়ের ১৩৩ পৃষ্ঠায় এভাবে তুলে ধরেছেনঃ

"First came the Rowlatt Bill, accompanied by the Punjab atrocities, and then came the spoilation of the Ottoman Empire and Khilafat, a matter of life and death.

India's blood and India's gold was sought and unfortunately given -given to break Turkey and buy the fetters of the Rowlatt legislation. Mr. Gandhi has placed his programme of non-cooperation before the country. It is now for you to consider whether or not you approve of its principle; and approving of its principle, whether or not you approve of its details. I would still ask the Government not to drive the people of India to desperation, or else there is no other course left open to the people except to inaugurate the policy of non-cooperation, though not necessarily the programme of Mr. Gandhi."

কিন্তু এর সাড়ে তিনমাস পরে ২৮শে ডিসেম্বর নাগপুর কংগ্রেসে জিন্নাহ ভিন্ন মূর্তিতে দেখা দিলেন। দেশবন্ধু অসহযোগ আন্দোলনের বিরোধিতা করবেন বলে দলবলসহ বাংলা থেকে এলেও সম্মেলনে এসে গান্ধীর প্রভাব বলয়ের কাছে আত্মসমর্পণ করলেন। অভিজাত এবং সাংবিধানিষ্ঠ জিন্নাহ তাঁর মুষ্টিমেয় সমর্থকদের নিয়ে অসম সাহসের সহিত বিধিবদ্ধভাবে অসহযোগ প্রস্তাবের বিরোধিতা করলেন।

প্রত্যক্ষদর্শীদের বিবরণ অনুসারে নাগপুর কংগ্রেসে গান্ধী প্লাবন সম্বন্ধে স্পষ্টতঃ উপলব্ধি করলেও জিন্নাহ সাহস ও স্বভাবোচিত ব্যক্তিত্ব সহকারে এককভাবে অসহযোগ প্রস্তাবের বিরোধিতা করেছিলেন। সেই বিরোধিতা অনেক তীব্র, তীক্ষ্ণতায় কুলীশ-কঠোর। জিন্নাহর মতে অসহযোগের কর্মসূচী দেশের পক্ষে কেবল বিপজ্জনকই নয়, এর জনক গান্ধী বরাবরই সংগঠনের

www.amarboi.org

বিভাজন ও বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করেছেন। তাই প্রস্তাবিত কর্মসূচী দেশকে সর্বনাশের অভিমুখে নিয়ে যাবে। মাত্র কয়েকমাস পূর্বে কোলকাতাতে যাঁকে তিনি লক্ষ লক্ষ দেশবাসীর মত "মহাত্মা" অভিধায় সম্বোধন করেছিলেন, এবার তাঁকে কেবল "মিস্টার গান্ধী" রূপে কংগ্রেস প্রতিনিধিদের প্রকাশ্য অধিবেশনে উল্লেখ করলেন। বক্তৃতা প্রসঙ্গে মোহাম্মদ আলীর নামের পূর্বেও তিনি "মৌলানা" যোগ করেননি। প্রতিনিধিরা তাঁর বক্তৃতায় বার বার বাধা দিয়ে গান্ধীজীকে মহাত্মা ও মোহাম্মদ আলীর নামের পূর্বে মৌলানা ব্যবহারের জন্য পীড়াপীড়ি করলেন। কিন্তু জিন্নাহ্ অবিচল। মোহাম্মদ আলী তাঁর সাংবিধানিষ্ঠতাকে তীক্ষ্ণ ব্যঙ্গ বিদ্রুপে বিদ্ধ করে অসহযোগের সমর্থন করলেন। দেশবন্ধু ও লাজপৎ রায় তো গান্ধীর প্রস্তাবের পক্ষে ছিলেনই। অসহযোগের বিরুদ্ধে জিন্নাহ্‌র মন্তব্যে ক্ষিপ্ত মৌলানা শওকত আলী জিন্নাহ্‌র প্রতি কটুক্তি করতে করতে মুষ্টিবদ্ধ হাতে তাঁর দিকে তেড়ে গেলেন, যদিও অন্যেরা বাধা দেয়ায় জিন্নাহ্‌কে আর সর্বজন সমক্ষে প্রহৃত হতে হয়নি। প্রতিনিধিদের সমর্থনের অভাব উপেক্ষা করেও গান্ধী ব্যক্তিত্বের সেই প্রবল প্লাবনের মধ্যেও জিন্নাহ্ নিজের বিশ্বাসের কথা প্রকাশ্যে ঘোষণা করতে দ্বিধাবোধ করেননিঃ "আমার পথই যথার্থ-সাংবিধানিক পথই যথার্থ।"

কংগ্রেসের অসহিষ্ণু প্রতিনিধিদের অপমানজনক ও অগণতান্ত্রিক আচরণে ক্ষুব্ধ অপমানিত জিন্নাহ্ অধিবেশন বর্জন করে সেই রাত্রেই চলে গেলেন। একই স্থানে আহূত মুসলিম লীগ অধিবেশনে তাঁর অভিমতের ভাগ্য কি হবে এটা তিনি অনুমান করতে পেরে অপেক্ষা করার প্রয়োজন বোধ করেননি; কংগ্রেসের সঙ্গে তাঁর ১৭ বৎসরের রাজনীতির এখানেই পরিসমাপ্তি ঘটলো।

প্রথমে কোলকাতা ও পরে নাগপুর অধিবেশনের ফলাফল রাজমোহন গান্ধী তাঁর বইতে এভাবে তুলে ধরেছেনঃ (পৃষ্ঠা-১৩৩)

" Men like Das, Bipin pal, Lajpat Rai and Malaviya were cool toward non-cooperation, but younger figures like Vallabh Bhai Patel, Raja Gopalachari, Rajendraprasad and Jawaharlal Nehru were with Gandhi, as were virtually all the Muslim solidly backed Gandhi. First in Calcutta and then in December, in Nagpur, both Congress and the League resolved in favour of non-cooperation—boycot of the Raj's council and ceremonials, surrender of titles and a

www.amarboi.org

gradual boycot of the Raj's courts and colleges. One by one, all the stalwarts changed their minds and boarded the Gandhi vehicle—all except Jinnah, Annie Besant and the Hindu Leader, Malaviya. "

("চিত্তরঞ্জন দাস, বিপিনপাল, লাজফত রায় এবং মালভ্য প্রভৃতি অসহযোগের প্রতি শীতল মনোভাবাপন্ন হলেও বল্লভ ভাই, প্যাটেল, রাজা গোপাল আচারী, রাজেন্দ্র প্রসাদ ও জওহর লাল প্রভৃতি তরুণরা গান্ধীর পক্ষেই ছিলো, যেমন ছিল বলতে গেলে সমগ্র মুসলমান নেতৃবৃন্দ। সর্বস্তরের জনতার অধিকাংশের মনোভাব বুঝতে পেরে সর্বস্তরের কর্মী নেতৃবৃন্দ সবাই গান্ধীকে অকুণ্ঠ সমর্থন জানালো। প্রথমে কোলকাতায় এবং পরে ডিসেম্বরে নাগপুরে কংগ্রেস এবং লীগ অসহযোগের পক্ষে সমর্থন জানালো। বৃটিশ সরকারের যাবতীয় সভা সমিতি, সম্মেলন ইত্যাদি বর্জনের সিদ্ধান্ত নেয়া হল। এতদ্ব্যতীত সরকারের যাবতীয় উপাধি ও ধীরে ধীরে বৃটিশ সরকারের কোর্ট কাচারি এবং শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো বর্জনের সিদ্ধান্ত নেয়া হল। ধীরে ধীরে দেখা গেল জিন্নাহ্ এ্যানে বেসান্ত ও হিন্দু নেতা মালব্যজী ছাড়া আর সবাই মনোভাব পরিবর্তন করে গান্ধীর যানে উঠে বসলেন")।

জিন্নাহর কংগ্রেস ত্যাগ

কংগ্রেসের প্রথম সারির নেতা জিন্নাহ্ সুখে দুঃখে ১৭ বছর ধরে যে প্রতিষ্ঠানের মধ্যদিয়ে রাজনীতি করে এতটা খ্যাতি অর্জন করেছেন তাঁর পক্ষে সে প্রতিষ্ঠানের সংগে সম্পর্ক ছিন্ন করা এত সহজ ছিল না। গান্ধীর সঙ্গে তাঁর রাজনৈতিক মতাদর্শের পার্থক্য প্রথম থেকেই ছিল। জিন্নাহ্ ছিলেন লিবারেল সাংবিধানিক নেতা। তাঁর নীতি ছিল শাসনতান্ত্রিকভাবে হিন্দু-মুসলমান যৌথ আন্দোলনের ভিতর দিয়ে প্রথমে স্বায়ত্তশাসনের অধিকার অর্জন এবং পরবর্তীতে পূর্ণ স্বাধীনতার জন্য আন্দোলন চালিয়ে যাওয়া। সাধারণ মানুষের ধর্মীয় অনুভূতিতে নাড়া দিয়ে তাকে রাজনৈতিক সচেতন করার তিনি পক্ষপাতি ছিলেন না। কারণ তাঁর ভয় ছিল নিরক্ষর মূর্খ জনগণকে রাজনীতিতে টেনে এনে অহিংস আইন অমান্য আন্দোলন করতে গেলে তা শেষ পর্যন্ত আর অহিংস থাকেনা-হিংসায় পর্যবসিত হতে বাধ্য। চৌরীচেরার ঘটনাই এর প্রমাণ- যেখানে উন্মত্ত জনতা একটি পুলিশ ফাঁড়ি দখল করে কয়েকজন পুলিশকে পুড়িয়ে মেরেছিল এবং যার ফলে দেশ এখনও প্রস্তুত নয় এবং তিনি

www.amarboi.org

হিমালয় সদৃশ ভুল করেছেন এ কথা বলে শেষ পর্যন্ত গান্ধীকে মধ্যপথে সমগ্র আন্দোলন প্রত্যাহার করে নিতে হয়েছিল।

এছাড়া দু'জনের জীবন যাত্রার ধরনও ছিল সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। একজন ছিলেন সম্পূর্ণ সাহেবী কেতাদুরস্ত ব্যক্তি, বিলাসবহুল জীবনে অভ্যস্ত, অন্যজন ছিলেন সাধারণ লোকের খুব কাছের মানুষ, গ্রাম্য চাষীদের মত কাপড় পরে গ্রামে একটা ছোট খাট কুটিরে বাস করতেন। তাই জীবন দর্শনও মেজাজের দিক থেকে দু'জন ছিলেন সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। জিন্নাহ্ ছিলেন ভাবাবেগবর্জিত সম্পূর্ণ বাস্তববাদী মানুষ। গান্ধী ছিলেন ধর্মীয় অনুভূতিপ্রবণ, অনেক সময় অন্তরের নির্দেশে পরিচালিত হতেন। যার ফলে তাঁর কথাবার্তা, আচরণ অনেক সময় রহস্যময় মনে হতো। তবে এক জায়গায় দু'জনের গভীর মিল ছিল যেটা হল দেশ প্রেম। দু'জনেই যে দেশের মুক্তির জন্য সংগ্রাম করে যাচ্ছেন এটা উভয়েই কিন্তু অকপটে বিশ্বাস করতেন।

যাই হোক, আমরা এও দেখেছি যে জিন্নাহ্‌র মত এত দিনকার অসাম্প্রদায়িক কংগ্রেস নেতার স্থলে ধর্মীয় ও সাম্প্রদায়িক ভিত্তিক সংবিধান বহির্ভূত আন্দোলনের প্রশ্নে গান্ধীজী মৌলানা মোহাম্মদ আলী শওকত আলীকে বেশী প্রাধান্য দেয়ায় জিন্নাহ্ স্বভাবতই অতিমাত্রায় ক্ষুব্ধ হয়েছিলেন। সেই থেকে জিন্নাহ্‌র মনে গান্ধী বিরোধী একটা মনোভাব দানা বাঁধতে আরম্ভ করলো। এছাড়া নেতৃত্বের দ্বন্দ্বতো ছিলই। গান্ধীজীর রাজনীতি ধর্মীয় উপাদানে অনেকটা পুষ্ট বলে সেটা শেষ পর্যন্ত হিন্দু-মুসলমানদের মিলনের সহায়ক না হয়ে বিভেদই বেশী সৃষ্টি করবে এই ধারণায় গান্ধীর প্রতি একটা বিদ্বেষমূলক মনোভাব জিন্নাহ্‌র মনে জন্মাতে থাকে। এছাড়া নাগপুরের ঘটনার কয়েক দিন পূর্বে হোমরুল লীগের ব্যাপার নিয়ে জিন্নাহ্-গান্ধীর মধ্যে যথেষ্ট মতপার্থক্য সৃষ্টি হয়। অসাংবিধানিক উপায়ে সভাপতি হিসাবে গান্ধীজী হোমরুলের মূলনীতির যে ভাবে পরিবর্তন করেছিলেন, যার কথা পূর্বে বর্ণিত হয়েছে, তাতে গান্ধীর প্রতি জিন্নাহ্‌র মনোভাব এমনিতেই তিক্ত হয়ে উঠেছিল। এবার নাগপুরের ঘটনা তাতে ঘৃতাহুতি দিল। এর পর থেকে জিন্নাহ্ প্রবলভাবে গান্ধী বিরোধী হয়ে উঠলেন।

জিন্নাহ্ কংগ্রেস ছেড়ে চলে গেলেও ভারতের রাজনীতি থেকে বিদায় নেননি। গান্ধী ও তার নেতৃত্বাধীন কংগ্রেসের প্রতি বিরূপ হলেও রাজনৈতিক ও সামাজিক কর্মকাণ্ডে যখনই সুযোগ এসেছে তাতে যোগ দিয়ে তিনি দেশের সেবা করার প্রয়াস পেয়েছেন। অসহযোগ পরবর্তী অচল অবস্থা দূরীকরণের

www.amarboi.org

জন্য ১৯২২ সনে মালব্যজী ও জয়াকর প্রভৃতি কর্তৃক আহূত বোম্বের সর্বদলীয় সম্মেলনের প্রস্তাবাবলী (আন্দোলন প্রত্যাহার ও দায়িত্বশীল সরকার প্রতিষ্ঠার উপায় উদ্ভাবনের জন্য গোলটেবিল বৈঠক) নিয়ে অপর দুই সম্পাদক সহ জিন্নাহ বড়লাটের সঙ্গে বার বার পত্র ও তার বার্তা বিনিময় করেন। ঐ সম্মেলনের তরফ থেকে ১৯২২ সনের ২রা ফেব্রুয়ারী তিনি সম্পাদক গান্ধীজীকে যে পত্র লেখেন দরখাস্তকারীদের মধ্যে জিন্নাহ সাহেবের নাম ছিল তাতে প্রথম এবং এ পত্রে গান্ধীজীকে মহাত্মারূপে উল্লেখ করা হয়।

কংগ্রেস সম্পর্কে মুসলমানদের মনোভাবের পরিবর্তনের সূচনা

ভারতে ইতিমধ্যে রাজনৈতিক জীবনে হিন্দু মুসলমান সম্পর্কের ক্ষেত্রে বেশ খানিকটা পরিবর্তন দেখা দিয়েছে। হিন্দুরা খিলাফতের ব্যাপারে ইংরেজদের উপর চাপ সৃষ্টির ক্ষেত্রে তেমন আগ্রহী নয়, তারা স্বরাজ সম্পর্কিত আন্দোলনের ব্যাপারে বেশি আগ্রহী এই ধারণার বশবর্তী হয়ে মুসলমানদের মনোভাব হিন্দুদের প্রতি ক্রমান্বয়ে বিরূপ হয়ে উঠতে লাগলো। ১৯২১ সনে খিলাফত ও অসহযোগ আন্দোলনের প্রবল উদ্দীপনায় মুসলমানগণ হিন্দুদের মনোভাবের প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শণার্থে ঈদের সময় বহু জায়গায় গরু কোরবানী বন্ধ রেখেছিল এবং অসহযোগী নেতা হিন্দু সন্নাসী স্বামী শ্রদ্ধানন্দকে দিল্লীর জুম্মা মসজিদে আমন্ত্রণ করে সমবেত মুসলমানদের সামনে তাকে বক্তৃতা করার সুযোগ দেয়া হয়েছিল। মুসলমানদের এতখানি উৎসাহ উদ্দীপনা ও ত্যাগের বিনিময়ে যখন তারা দেখলো খিলাফত বজায় রাখার আন্দোলন ও উপযুক্ত চাপ সৃষ্টির ব্যাপারে কংগ্রেস তেমন আগ্রহী নয় তখনই অসহযোগ আন্দোলনের প্রতি মুসলমানদের উৎসাহে ভাটা দেখা দিল। মুসলমানদের ধারণা হল গান্ধীজী তাদের সঙ্গে প্রতারণা করেছেন। ফলে দুই সম্প্রদায়ের মনোভাবে তিক্ততা দেখা দিল এবং বেশ কয়েকস্থানে এই ভুল বুঝাবুঝি সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার আকারে আত্মপ্রকাশ করল। ১৯২১ সনের আগস্ট মাসে কেরালার খিলাফতপন্থী মোপলা মুসলমানরা প্রশাসনের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করার সঙ্গে সঙ্গে সন্দেহ পরবশ হয়ে প্রতিবেশী বেশ কিছু হিন্দুদের গৃহে লুন্ঠন ও অগ্নিসংযোগ করে। হজরত মোহানীর মত জাতীয়তাবাদী নেতা না কি মোপলা বিদ্রোহে হিন্দুদের উপর অত্যাচারকে নানা অজুহাত দেখিয়ে সমর্থন জানিয়েছিলেন। এর প্রতিক্রিয়া হয়েছিল মারাত্মক।

মুসলমানদের খিলাফত আন্দোলন ও গান্ধীর অসহযোগ আন্দোলনকে কেন্দ্র করে ভারতব্যাপী যে হিন্দু মুসলিম ঐক্য গড়ে উঠেছিল, হিন্দুরা

www.amarboi.org

মুসলমানদের আশা আকাঙ্খার সঙ্গে একাত্মতা প্রকাশ করছে দেখে যে মুসলমানরা ভাবাবেগে আপ্লুত হয়ে স্বতঃ প্রবৃত্ত হয়ে ঈদে গরু কোরবানী বন্ধ রেখেছিল, শ্রদ্ধানন্দকে দিল্লীর শাহী মসজিদ থেকে ভাষণ দিতে দিয়েছিল সে ঐক্য এখন খান খান হয়ে ভেঙ্গে পড়লো। ফলে দেখা গেল যে শ্রদ্ধানন্দ জেল থেকে বেরিয়ে এসে মুসলমানদের হিন্দু ধর্মে দীক্ষিত করার জন্য শুদ্ধি আন্দোলন আরম্ভ করেছে এবং মুসলমানদের প্রতিরোধ করার জন্য পন্ডিত মালব্য আরম্ভ করেছেন হিন্দু সংগঠন আন্দোলন। হিন্দুদের এবংবিধ কাজের প্রতিবাদে মুসলমানরাও আরম্ভ করলো 'তবলীগ' ও 'তাঞ্জীম' আন্দোলন।

এই প্রবন্ধের প্রথমেই আমরা বলেছি যে গভীর বাস্তব দৃষ্টিকোণ থেকে রাজনীতি ও ধর্মকে একত্রে জড়াবার গান্ধী নীতির জিন্নাহ্ বরাবরই বিরুদ্ধে ছিলেন এবং দেশবাসীকে এর ভবিষ্যৎ বিপদ সম্পর্কে তিনি সাবধান করে দিয়ে ছিলেন। পূর্ববর্তী অধ্যায়ে আমরা দেখেছি কংগ্রেসী নেতা কানাইলাল মুন্সীও জিন্নাহ্‌কে এ ব্যাপারে সুস্পষ্টভাবে সমর্থন জানিয়ে ছিলেন। এর পর সমগ্র ২২/২৩ সাল ধরে ভারতের বিভিন্নস্থানে হিন্দু মুসলমান দাঙ্গা ছড়িয়ে পড়তে লাগল। ফলে ১৯০৬ সন থেকে ১৯২০ সন পর্যন্ত জিন্নাহ্ সাহেবের ধারণায় ভারতের স্বাধীনতাকে ত্বরান্বিত করার জন্য যে হিন্দু-মুসলিম ঐক্য একান্ত প্রয়োজন তাঁর সে আজন্ম লালিত স্বপ্ন ক্রমে শূন্যে মিলিয়ে যেতে লাগল। গান্ধীর জনগণকে ধর্মীয় অনুভূতিতে জাগ্রত করে রাজনৈতিক সচেতনতা সৃষ্টির পরিকল্পনার যে আরেকটা শুভ ও মঙ্গলকর দিক রয়েছে সেটাও একেবারে অস্বীকার করা যায় না। বৃটিশ বিরোধী আন্দোলনকে জোরদার করার জন্য তিনি ভারতের শিক্ষিত চাষী মজুর সবাইর সাহায্য সহযোগিতা নিয়ে একটা বিরাট গণজোয়ারের সৃষ্টি করতে চেয়েছিলেন যাতে আন্দোলনের ভিতর দিয়ে সাধারণ মানুষের রাজনৈতিক চেতনা ও মানসিক শক্তির শীঘ্র উন্মেষ ঘটে। বৃটিশ রাজের ভিত্তিকে টলিয়ে দেয়ার জন্য এ শক্তির যে একটা কার্যকরী ভূমিকা রয়েছে জিন্নাহ সাহেব এটা উপলব্ধি যে না করতেন তা নয়। তবে তিনি তীক্ষ্ণ দিব্য দৃষ্টি দিয়ে বুঝতে পেরেছিলেন যে এর শুভদিকের চাইতে অশুভ দিকটাই শেষ পর্যন্ত অধিকতর ক্ষতির কারণ হয়ে দাঁড়াবে।

মুসলমান আর হিন্দুদের ধর্মীয় অনুভূতি প্রায় সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। রাজনীতি ও ধর্মকে জিন্নাহ্ সাহেব সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র ব্যাপার মনে করতেন। দেশের স্বাধীনতা আন্দোলনের সঙ্গে সম্পর্কিত অনুভূতি, ক্রিয়াকর্ম হল হিন্দু-মুসলমানের স্বার্থের প্রেক্ষিতে সার্বজনীন কিন্তু ধর্ম হচ্ছে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র ও ব্যক্তিগত ব্যাপার। এখানে

www.amarboi.org

জীবন যাত্রার প্রণালী, খাওয়া-দাওয়া, ছোঁয়া ছোঁয়ি অনেক ব্যাপারেই হিন্দু মুসলমানের অনুভূতি সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র এবং বলতে গেলে প্রায় ক্ষেত্রে সম্পূর্ণ পরস্পর বিরোধী। এ অবস্থায় ধর্ম ও রাজনীতিকে একত্রে জড়ালে আন্দোলনের কোন পর্যায় হতাশা ও পারস্পরিক সন্দেহ দেখা দিলে তা হিন্দু মুসলমান কর্মী ও জনতার মধ্যে সংঘর্ষের রূপ নিতে বাধ্য বলে জিন্নাহ মনে করতেন। তাই তিনি গান্ধীর রাজনীতিতে মূর্খ ও অশিক্ষিত জনগণকে টেনে আনার যেমন বিরোধী ছিলেন তেমনি তাদের ধর্মীয় অনুভূতিকে (গোমাতার পূজা-রাম রাজত্ব প্রতিষ্ঠার স্বপ্ন) জাগিয়ে তুলে রাজনৈতিক সচেতনতা সৃষ্টির নীতিরও বিরোধী ছিলেন। এ কারণেই অন্ধ, অযৌক্তিক খিলাফত আন্দোলনে মূর্খ অশিক্ষিত মুসলমানদের ধর্মীয় চেতনায় সুড়সুড়ি দিয়ে তাদেরকে রাজনৈতিক আন্দোলনে টেনে আনার তিনি বিপক্ষে ছিলেন। জিন্নাহ মনে করতেন মূর্খ সাধারণ লোকের সহযোগিতা ছাড়াই সাংবিধানিক আন্দোলন হিন্দু মুসলমান শিক্ষিত ও রাজনৈতিক সচেতন গোষ্ঠির নেতৃত্বে যেভাবে চলছে তাতে প্রথমে স্বায়ত্তশাসন ও পরে স্বাধীনতা এমনিতেই দু'দিন আগে হোক পরে হোক আসবে কিন্তু গান্ধীর গৃহীত নীতি ভবিষ্যতের জন্য হবে অতীব মারাত্মক যেটা হিন্দু-মুসলমান পারস্পরিক ঘৃণা ও বিদ্বেষকে অনেক বাড়িয়ে তুলতে সাহায্য করবে।

খিলাফত আন্দোলনে হিন্দুদের তেমন মনেপ্রাণে সহযোগিতার অভাবকে মুসলমানরা তাদের প্রতি অপর সম্প্রদায়ের বিশ্বাসঘাতকতা মনে করে গান্ধী তাদের সঙ্গে প্রতারণা করেছে ভেবে কংগ্রেস ও হিন্দু বিদ্বেষী হয়ে উঠলো। ফলে উভয় পক্ষের মধ্যে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার ভিতর দিয়ে বিভেদ আরো গভীরতর হল। সাধারণ মানুষের মধ্যে রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে ধর্মীয় উন্মাদনা সৃষ্টির যে কুফল আজ বিজেপির নেতৃত্বে ভারতে ঘটছে এটা তৎকালীন গান্ধীর অনুসৃত নীতির শেষ পরিণতি বলা যেতে পারে।

১৯২৩ সনে জিন্নাহ বোম্বের মুসলিম আসন থেকে বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় পুনরায় কেন্দ্রীয় পরিষদে নির্বাচিত হন নির্দলীয় প্রার্থীরূপে। রাউলাট আইনের প্রতিবাদে পদত্যাগের পর এই প্রথম তাঁর সংসদীয় কার্যকলাপে যোগদান করা। নবগঠিত পরিষদে যোগ দিয়েই নির্দলীয় সদস্যদের নিয়ে একটি গোষ্ঠী নিজের নেতৃত্বে গঠন করেন। তারপর মতিলাল ও দেশবন্ধু স্বরাজী দলের ৪২ জন সদস্যের সম্মিলিত সহযোগিতায় এক জাতীয়তাবাদী দল গঠন করে যখনই দেশের স্বার্থ বিরোধী কোন বিল আসতো তাকে পরাজিত করে বৃটিশ

www.amarboi.org

সরকারকে ব্যতিব্যস্ত করে তুলতেন। আবার যখন দেখতেন কংগ্রেস দল শুধু বিরোধিতার খাতিরেই কোন বিলের বিরোধিতা করছে তখন সরকারকে সমর্থন জানাতেন। নচেৎ তাঁর দলের ভূমিকা ছিল মূলতঃ বিরোধীদলের ভূমিকা। এব্যাপারে তাঁর অন্য সহযোগীরা ছিলেন পন্ডিত মালব্য, বিপিন চন্দ্র পাল, পুরুষোত্তম ঠাকুর, ক্ষিতিশ নিয়োগী, এন সি কেলেকার, দেশবন্ধু প্রমুখ তৎকালীন বিখ্যাত নেতারা।

হিন্দু মুসলিম সমস্যা সম্পর্কে সি. আর. দাস ও বেঙ্গল প্যাক্ট

অন্যান্য কংগ্রেসী হিন্দু নেতাদের মধ্যে একমাত্র স্বরাজ্য দলের দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাসই ভারতের হিন্দু-মুসলমান সমস্যার প্রকৃত স্বরূপটা অনুধাবন করতে পেরেছিলেন। সংখ্যালঘুদের নিরাপত্তার জন্য রক্ষাকবচের প্রয়োজনীয়তার অপরিহার্য্যতা যে কতটা বাস্তব সম্মত ব্যাপার সেটা তিনি পরিষ্কার বুঝতে পেরেছিলেন। তাই তিনি জিন্নাহকে অত্যন্ত বাস্তববাদী; সমস্যার মূল চিহ্নিত করে লক্ষ্য অর্জনে আগ্রহী নেতা হিসাবে অত্যন্ত শ্রদ্ধা করতেন। সর্বভারতীয় পর্যায়ে মুসলমানদের ন্যায্য দাবী অন্যান্য প্রদেশের কংগ্রেস নেতারা মেনে না নিলেও তিনি বাংলার মুসলমানদের সঙ্গে সম্প্রীতি গড়ে তোলার জন্য চাকরি-বাকরি ও অন্যান্য ক্ষেত্রে মুসলমানদের দাবি মেনে নিয়ে বাংলার স্যার আবদুর রহিম, মৌলভী আবদুল করিম, মৌলভী মুজিবুর রহমান, মৌলানা আকরাম খাঁ ও মৌলানা মনিরুজ্জামান ইসলামাবাদী প্রভৃতি মুসলমান নেতৃবৃন্দ এবং মিঃ জে, এম, সেন গুপ্ত, মিঃ শরৎবোস, মিঃ জে, এম, দাস ও ডাঃ বিধান চন্দ্র রায় প্রভৃতি হিন্দু নেতার সহযোগিতায় ১৯২৩ এর এপ্রিলে ঐতিহাসিক "বেঙ্গল প্যাক্ট" নামে হিন্দু-মুসলিম এক চুক্তিনামা রচনা করেন। তিনি স্বরাজ্য পার্টি ও বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটিকে দিয়ে ঐ প্যাক্ট মঞ্জুর করিয়ে নিয়ে ছিলেন।

এই প্যাক্টে ব্যবস্থা করা হয় যে সরকারী চাকরি-বাকরিতে মুসলমানরা জনসংখ্যা অনুপাতে চাকরি পাবে এবং যতদিন ঐ সংখ্যানুপাতে (তৎকালে শতকরা ৫৪) না পৌঁছবে ততদিন নতুন চাকরিতে নিয়োগের শতকরা ৮০টি মুসলমানদের দিতে হবে। সরকারী চাকরি ছাড়াও স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানে যথা কোলকাতা করপোরেশন, সমস্ত মিউনিসিপালিটি এবং ডিস্ট্রিক্ট ও লোকাল বোর্ডসমূহে মুসলমানেরা ঐ হারে চাকরি পাবে। প্যাক্টের বিরোধী হিন্দু নেতারা বলতে লাগলেন যে দেশবন্ধু স্বরাজ্য দলে ও কংগ্রেস কমিটিতে প্যাক্ট পাস

www.amarboi.org

করাতে পারলেও কংগ্রেসের প্রকাশ্য সম্মেলনীতে পারবেন না। তাই সাম্প্রদায়িক গোঁড়া হিন্দু নেতারা আনন্দ বাজার ও অন্যান্য বহুল প্রচারিত পত্রিকা মারফত বলতে লাগলেন যে দেশবন্ধু বাংলাদেশ মুসলমানদের কাছে বেচে দিয়েছেন। এই প্যাক্টের আরেক শর্ত ছিল যেবার কোলকাতা করপোরেশনে হিন্দু মেয়র হবে সেবার ডিপুটি মেয়র হবে মুসলমান এবং পরের বার হবে এর বিপরীত।

হিন্দু সাম্প্রদায়িকতাবাদী বিরোধীদলের সংঘবদ্ধ প্রতিরোধ সত্ত্বেও দেশবন্ধু জনপ্রিয়তা ও সত্যনিষ্ঠার বলে ১৯২৪ সনের এপ্রিলে কর্পোরেশনের সাধারণ নির্বাচনে জয়ী হয়েছিলেন। নিজে মেয়র হলেন এবং তরুণ প্রতিভাবান মুসলিম নেতা হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দীকে ডেপুটি মেয়র করলেন। সুভাষ বাবুকে চীফ এক্সিকিউটিভ অফিসার ও হাজী আবদুর রশীদকে ডেপুটি এক্সিকিউটিভ অফিসার করলেন এবং অনেক মুসলমান গ্রাজুয়েট, এম, এ, কে রাতারাতি কর্পোরেশনে মোটা বেতনের চাকরি দিলেন। কোলকাতা কর্পোরেশনের মত হিন্দু প্রধান প্রতিষ্ঠানে মুসলমানদের পক্ষে রাতারাতি এত বড় চাকরি পাওয়া কল্পনারও অতীত ছিল। কাজেই সাম্প্রদায়িক হিন্দুরা দেশবন্ধুর আয়োজিত সিরাজগঞ্জ কনফারেন্স পন্ড করার জন্য সর্বোতভাবে চেষ্টা আরম্ভ করল। ঐ সম্মেলনে সভাপতি ছিলেন মৌলানা আকরাম খান। কতগুলো স্থানীয় কংগ্রেস বিরোধী মুসলমান ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান ও সিরাজগঞ্জ কনফারেন্সের বিরুদ্ধে ছিল। তথাপি তখনকার তরুণ কংগ্রেস ও প্রজাপার্টির নেতা প্রখ্যাত সাহিত্যিক ও সাংবাদিক আবুল মনসুর আহমেদ, মনিরুজ্জামান ইসলামাবাদী; করটিয়ার জমিদার ওয়াজেদ আলী খান পন্নী (চান মিয়া সাহেব) প্রভৃতির চেষ্টায় ও ইসমাইল হোসেন সিরাজী সাহেবের সহযোগিতায় বিরাট সাফল্যের সাথে অধিবেশন সমাপ্ত হল এবং বেঙ্গল প্যাক্ট সর্বসম্মতিক্রমে বিপুল ভোটে পাস হয়ে গেল। প্রায় ১৫০০০ ডেলিগেট সম্মেলনে যোগ দিয়েছিলেন। দর্শকের সংখ্যা ছিল কয়েক লক্ষ। সেদিনকার দেশবন্ধুর প্রাণস্পর্শী বক্তৃতা সবাইর অন্তরকে স্পর্শ করেছিল। তিনি উদাত্ত কণ্ঠে বলেছিলেনঃ

"হিন্দুরা যদি উদারতা দ্বারা মুসলমানদের মনে আস্থা সৃষ্টি করতে না পরে তবে হিন্দু মুসলমান ঐক্য আসবে না। হিন্দু-মুসলিম ঐক্য ব্যতীত আমাদের স্বরাজের দাবি চিরকাল কল্পনার বস্তুই থেকে যাবে। দেশবন্ধুর কল্পিত হিন্দু মুসলমান ঐক্যের বাস্তবরূপ সম্পর্কে তিনি তার সিরাজগঞ্জের বক্তৃতায়

www.amarboi.org

বলেছিলেন হিন্দু ও মুসলমান তাদের সাম্প্রদায়িক স্বতন্ত্র স্বত্তা বিলোপ করে একই সম্প্রদায়ে পরিণত হবে, আমার হিন্দু-মুসলমান ঐক্যের রূপ তা নয়। এরূপ স্বত্তা বিসর্জন কল্পনাতীত।"

দেশবন্ধুর এই বাস্তবধর্মী মত পোষণ করার পিছনে ছিল অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে হিন্দু মুসলমান দুই সম্প্রদায়ের একেবারে পরস্পর বিরোধী স্বত্বা সম্পর্কে তার সঠিক উপলব্ধি। ধর্ম ও কৃষ্টির ক্ষেত্রে দু'টি স্বতন্ত্র সমাজ আগে থেকেই ছিল। কিন্তু সিপাহী বিদ্রোহের পর অর্থনৈতিতে মুসলমানদের এই অধঃপতনে জীবনের সর্বক্ষেত্রে মুসলমানেরা হিন্দুদের কাছে তাচ্ছিল্যপূর্ণ, কোন কোন ক্ষেত্রে ঘৃণ্য ব্যবহার পেতে পেতে জীবনের সর্বস্তরে হিন্দু ও মুসলমান সম্পর্ক সুস্পষ্ট দৃশ্যমান দু'টি আলাদা জাতিতে পরিণত হয়ে গেল। অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে উভয় সম্প্রদায়ের বৈপরীত্য কোথায় গিয়ে দাঁড়িয়েছিল সেটা তিনি অনুধাবন করলেন যখন দেখলেন বাংলার জমিদার হিন্দু, প্রজা মুসলমান, বাংলার মহাজন হিন্দু, খাতক মুসলমান, উকিল হিন্দু, মক্কেল মুসলমান, ডাক্তার হিন্দু, রুগী মুসলমান, হাকিম হিন্দু, আসামী মুসলমান, খেলোয়াড় হিন্দু, দর্শক মুসলমান, জেইলার হিন্দু, কয়েদী মুসলমান। (আবুল মনসুর আহমেদের রাজনীতিতে পঞ্চাশ বছর থেকে নেয়া) হিন্দু ও মুসলমান সমাজের এই বাস্তব অবস্থার কারণে অন্যান্য প্রদেশে কংগ্রেস নেতারা যেভাবে হিন্দু মুসলিম মিলনের ভিতর দিয়ে একজাতিতে পরিণত হওয়ার কথা চিন্তা করতেন দেশবন্ধু সেটা অসম্ভব ও অবাস্তব জেনেই তার হিন্দু-মুসলিম ঐক্যের স্বতন্ত্র রূপের কথা বলেছিলেন।

কংগ্রেসের অধিকাংশ নেতাকে জিন্নাহ সাহেব হিন্দু-মুসলমান পার্থক্যের এই মৌলিক দিকটি বোঝাতে চেষ্টা করেছিলেন এবং ঐ কারণেই সাংবিধানিক রক্ষা কবচের গুরুত্বের কথা বারে বারে উল্লেখ করেছিলেন কিন্তু কংগ্রেস নেতারা জিন্নাহর পরামর্শকে গুরুত্বই দিলনা যার পরিণতিতে শেষ পর্যন্ত দেশ বিভাগ অনিবার্য হয়ে পড়ল।

এখানে উল্লেখযোগ্য যে ১৯২৫ সনের ১৫ই জুন দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাসের আকস্মিক মৃত্যুর পর পরই বাংলার হিন্দু নেতারা বেঙ্গল প্যাক্টকে উড়িয়ে দিয়েছিল। সর্বভারতীয় ক্ষেত্রে ১৯১৬ সনের লক্ষ্ণৌ প্যাক্টকে কংগ্রেসী নেতারা পরবর্তীতে যে ভাবে অস্বীকার করেছিল বাংলাতেও দেশবন্ধুর মৃত্যুর পর পরই বাংলাদেশের কংগ্রেসী নেতারা একই ভাবে বেঙ্গল প্যাক্টকে অস্বীকার করে দেশবন্ধুর হিন্দু মুসলমান ঐক্যের সদ্যরূপ দেয়া স্বপ্নকে ধ্বংস করে দিয়েছিল।

www.amarboi.org

বাংলার সাম্প্রদায়িক কলুষিত আবহাওয়াকে বেশ খানিকটা নির্মল করে হিন্দু মুসলমান সত্যিকারের মিলন ও স্থায়ী বোঝাপড়ার জন্য দেশবন্ধু যে বেঙ্গল প্যাক্ট করেছিলেন এবং যার সুফল ও কিছুটা ফলতে আরম্ভ করেছিল, কিন্তু তাঁর আকস্মিক মৃত্যুর পরেই বাংলার আকাশে পুনরায় যে দুর্যোগের কালো মেঘ দেখা দিল সে সম্পর্কে মরহুম আবুল মনসুর আহমেদের লেখা রাজনীতির পঞ্চাশ বছর বই থেকে অনেক তথ্য জানা যায়। শ্রদ্ধেয় আবুল মনসুর সাহেবের বক্তব্য থেকে দেখা যাবে হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে শিক্ষিত ব্যক্তিরাই সাধারণত নিজেদের রাজনৈতিক স্বার্থে সাম্প্রদায়িকতা ছড়াতেন। আবুল মনসুর আহমেদের লেখাতে আমরা আরো দেখতে পাই 'নাইট' 'নবাব' যারা বরাবরই সংগ্রাম বিমুখ ছিল এবং বৃটিশদের দয়ার উপরই নিজেদের অস্তিত্ব নির্ভর করছে ভাবতো তাদের হাত থেকে মুসলিম লীগকে উদ্ধার করে কংগ্রেসের পাশাপাশি স্বাধীনতার জন্য একটি সংগ্রামী প্রতিষ্ঠানে লীগকে দাঁড় করাতে জিন্নাহ সাহেব চেয়েছিলেন। এই প্রগতিশীল আন্দোলন হতে জিন্নাহ সাহেবকে নিবৃত্ত করার জন্য নাইট নবাবদের কেউ কেউ তাঁকে লীগ নেতৃত্ব থেকে সরাতে চেয়েছিলেন। আবুল মনসুর আহম্মদ লিখেছেনঃ

বেঙ্গল প্যাক্টের বিলুপ্তি সম্পর্কে
আবুল মনসুর আহম্মদ

"১৯২৫ সালের ১৬ই জুন দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাস নিতান্ত আকস্মিক ভাবে পরলোক গমন করেন। বাংলার কপালে দুর্ভাগ্যের দিন শুরু হয়। ঐ সালের শেষ দিকে মুসলিম লীগের আলীগড় বৈঠকে সভাপতিরূপে স্যার আবদুর রহিম হিন্দুদের সাম্প্রদায়িক মনোভাবের নিন্দা করিয়া ভাষণ দেন। তাতে হিন্দু নেতাদের অনেকে এবং হিন্দু সংবাদপত্র সমূহ সাধারণভাবে সার আবদুর রহিমের উপর খুব চটিয়া যান। হিন্দুদের এই আব্দুর রহিম বিদ্বেষ এতদূর তীব্র হইয়া উঠে যে ১৯২৬ সালের গোড়ার দিকে লাট সাহেব যখন সার আবদুর রহিমকে মন্ত্রী নিয়োগ করেন, তখন কোন হিন্দু নেতাই স্যার আবদুর রহিমের সহিত মন্ত্রীত্ব করিতে রাজি হন না। ফলে স্যার আবদুর রহিম পদত্যাগ করিতে বাধ্য হন। সার আবদুর রহিমের স্থলে স্যার আবদুল হালিম গযনবীর সাথে মন্ত্রিত্ব করিতে হিন্দু নেতারা রাজি হন। তাতে সার আবদুল হালিম গযনবী ও স্যার ব্যোমকেশ চক্রবর্তী মন্ত্রী নিযুক্ত হন। এই ঘটনায় সাম্প্রদায়িক তিক্ততা বাড়িয়া যায়। মুসলমানরা এই মন্ত্রীদ্বয়কে 'গজচক্র' মন্ত্রিত্ব বলিয়া অভিহিত করে। আমি এই সময় জনাব মৌলভী মুজিবুর রহমান সাহেবের সম্পাদিত 'দি

www.amarboi.org

মুসলমানের' সহকারী সম্পাদকের কাজ করি। আমাদের কাগজ-সহ সব কয়টি মুসলমান সাপ্তাহিক (মুসলমান-পরিচালিত কোনও দৈনিক তখন ছিল না) একযোগে গজচক্র-মন্ত্রিত্বের বিরুদ্ধে কলম চালাইলাম। মুসলমান ছাত্ররা আন্দোলনে অংশ গ্রহণ করে। অল্পদিনেই গজচক্র-মন্ত্রিদ্বয় পদত্যাগ করিতে বাধ্য হন। স্যার আবদুল হালিম গযনবী মন্ত্রীত্ব হারাইয়া মসজিদের সামনে বাজনার বিরুদ্ধে আন্দোলন শুরু করেন। এই সময় রাজ-রাজেশ্বরী মিছিলের বাজনা লইয়া কলিকাতায় তৎকালের বৃহত্তম সাম্প্রদায়িক দাংগা হয়। উভয় পক্ষে এগার শত লোক হতাহত হয়। মসজিদের সামনে বাজনার দাবিতে বরিশালের জনপ্রিয় হিন্দু নেতা শ্রীযুক্ত সতীন সেন প্রসেশন করিতে যান। কুলকাঠি থানার পোনাবালিয়া গ্রামে পুলিশ-মুসলমানে সংঘর্ষ হয়। জিলা ম্যাজিস্ট্রেট ব্ল্যার্ডির নির্দেশে মুসলমানদের উপর গুলি করা হয়। অনেক লোক হতাহত হয়। হিন্দু-মুসলিম সম্পর্কের দ্রুত অবনতি ঘটে।

এই তিক্ত আবহাওয়ায় সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি রক্ষার জন্য চেষ্টা করিতেছিল একমাত্র জিন্নাহর নেতৃত্বে মুসলিম লীগই। এটা কংগ্রেসেরও অন্যতম প্রধান কাজ হওয়া সত্ত্বেও এ ব্যাপারে কার্যতঃ কংগ্রেস সম্পূর্ণ নিরুপায় হইয়া পড়িয়াছিল। মুসলিম সমাজে কংগ্রেসের প্রভাব কমিয়া গিয়াছিল অথচ শুধু হিন্দুদের পক্ষে কথা বলায়ও তাঁদের আপত্তি ছিল। ফলে তাঁদের হিন্দু মুসলিম ঐক্যের কথা কার্য্যতঃ অর্থহীন দার্শনিক আপ্তব্যক্যে পর্যবসিত হইয়াছিল। সে অবস্থায় জিন্নাহর নেতৃত্বে মুসলিম লীগই হিন্দু মুসলিম ঐক্যের প্রশ্নে বাস্তববাদী ছিল। রাজনৈতিক দাবী-দাওয়ায় বৃটিশ সরকারের মোকাবেলায়ও মুসলিম লীগই ছিল কংগ্রেসের নিকটতম সহ-পথিক। ভারতবাসীর স্বায়ত্তশাসন দাবির কার্যকারিতা পরখের জন্য 'অল্ হোয়াইট' সাইমন কমিশন পাঠাইবার কথাও পার্লামেন্টে এই সময় উঠিয়াছিল। সাম্প্রদায়িক তিক্ততার সুযোগে ইংরাজের খায়েরখাহ্ নাইট-নবাবরা জিন্নাহ্ সাহেবকে মুসলিম লীগ নেতৃত্ব হইতে অপসারণ করার জন্য কোমর বাঁধিয়া লাগিয়া যান। পাঞ্জাবের স্যার মিয়া মোহাম্মদ শফী এই জিন্নাহ্ বিরোধী ষড়যন্ত্রের নেতৃত্ব গ্রহণ করেন। বাংলার স্যার আবদুর রহিম বাদে আর সব নাইট-নবাবরা তাতে যোগ দেন। এই পরিবেশে ১৯২৭ সালে কলিকাতা টাউন হলে নিখিল ভারত মুসলিম লীগের বার্ষিক অধিবেশন হয়। বরাবর কংগ্রেস ও লীগের বৈঠক একই সময়ে একই শহরে প্রায় একই প্যান্ডেলের নিচে হইত। ১৯১৬ সালের লক্ষ্ণৌ প্যাক্টের সময় হইতেই এই নিয়ম চলিয়া আসিতেছিল। তবু সাম্প্রদায়িক পরিস্থিতি ও

www.amarboi.org

নাইট—নবাবদের ষড়যন্ত্রের বিরুদ্ধে সাবধানতা হিসাবেই ১৯২৭ সালের মুসলিম লীগের বৈঠক ঐ সালের কংগ্রেস বৈঠকের সাথে মাদ্রাজে না করিয়া কলিকাতায় করা হয়। জিন্নাহ সাহেবের অন্তরংগ বন্ধু ডাঃ আনসারী মাদ্রাজ কংগ্রেসের সভাপতি। তবু মিঃ জিন্নাহ মুসলিম লীগকে কংগ্রেসের সংস্পর্শ হইতে দূরে রাখিলেন। জিন্নাহ বিরোধী নাইট-নবাবরা লাহোরে এক প্রতিদ্বন্দ্বী মুসলিম লীগ সম্মিলনীর আয়োজন করিলেন। স্যার শফী তাতে সভাপতিত্ব করিলেন। বাংলার দু'চারজন নবাব-নাইট জনমত অগ্রাহ্য করিয়া একরূপ গোপনে লাহোর সম্মিলনীতে অংশগ্রহণ করিলেন।

কলিকাতা মুসলিম লীগ সম্মিলনী খুব ধুমধামের সাথে অনুষ্ঠিত হইল। আমার নেতা ও মনিব মৌলাবী মুজিবুর রহমান অভ্যর্থনা সমিতির চেয়ারম্যান, ডাঃ আবু আহমদ সেক্রেটারী। চেয়ারম্যানের ইচ্ছানুসারে আমাকে অভ্যর্থনা সমিতির অন্যতম সহকারী সেক্রেটারী করা হল। আমি জীবনের প্রথম এই নিখিল ভারতীয় কনফারেন্সের কাজ ঘনিষ্টভাবে দেখিবার সুযোগ পাইলাম। মৌঃ মোহাম্মদ ইয়াকুব (পরে স্যার) এই সম্মিলনীতে সভাপতিত্ব করেন। সস্ত্রীক জিন্নাহ সাহেব এই সম্মিলনীতে যোগ দেন। আমি মিসেস রতন বাই জিন্নাহকে অত কাছে হইতে এই প্রথম ও শেষবারের মত দেখিতে পাই।

মিঃ জিন্নাহ ও মওলানা মোহাম্মদ আলীর ব্যক্তিগত বিরোধের সুযোগ লইয়া নাইট-নবাবরা অতঃপর মুসলিম লীগ কাউন্সিলে জিন্নাহ সাহেবের উপর অনাস্থা দিবার চেষ্টা করেন। দিল্লীতে লীগ কাউন্সিলের সভা মৌলবী মুজিবুর রহমান ও মৌলানা আকরাম খাঁর নেতৃত্বে বাংলার কাউন্সিলারগণ দলবদ্ধভাবে দিল্লী গেলাম জিন্নাহ-নেতৃত্বকে নাইট-নবাবদের হামলা হইতে বাঁচাইতে। বাংলার প্রতিনিধিরা আমরা কংগ্রেস প্রেসিডেন্ট ডাঃ আনসারীর মেহমান হই। ডাঃ আনসারীর যমুনার পাড়স্থ দরিয়াগঞ্জের সুবৃহৎ প্রাসাদতুল্য বাড়ির গোটাটাই আমাদের জন্য ছাড়িয়া দেয়া হয়। আমাদের খাওয়ার ব্যবস্থাও ডাঃ সাহেবই করেন।

জিন্নাহ বিরোধী উপদলও খুব তোড়জোড় করে। দিল্লীর বিল্লিমারন রোডে এক বিশাল ভবনে কাউন্সিলের সভা শুরু হয়। কিন্তু ডাঃ আনসারীর উদ্যোগে নেতৃবৃন্দের চেষ্টায় কাউন্সিল বৈঠকের আগেই জিন্নাহ সাহেব ও মৌলানা মোহাম্মদ আলীর মধ্যেকার বিরোধ মিটিয়া যায়। কাউন্সিল বৈঠকের শুরুতে উভয় নেতার মধ্যে কোলাকোলি হয়। আমরা হর্ষধ্বনি ও করতালি দিয়া তাঁদের

www.amarboi.org

অভিনন্দন জানাই। জিন্নাহ বিরোধীরা একদম চুপ মারিয়া যান। শান্তিপূর্ণ ভাবে কাউন্সিলের কাজ শেষ হয়।কাউন্সিল জিন্নাহর নেতৃত্বে আস্থা পুনরাবৃত্তি করিয়া এবং সাম্প্রদায়িক ঐক্যের ভিত্তিস্বরূপ মুসলিম দাবি দাওয়া সম্বন্ধে এবং অল্ হোয়াইট কমিশন সম্পর্কে জিন্নাহ সাহেবকে সর্বময় ক্ষমতা দিয়া সভার কাজ সমাপ্ত হয়।"

পরের বছর (১৯২৮) ডিসেম্বর মাসে কলিকাতায় কংগ্রেস ও মুসলিম লীগের বার্ষিক অধিবেশন। ১৯২৭ সালের কংগ্রেস প্রেসিডেন্ট ডাঃ আনসারীর উদ্যোগে স্বায়ত্তশাসিত ভারতের শাসনতান্ত্রিক বিধানের সুপারিশ করার উদ্দেশ্যে পন্ডিত মতিলালের নেতৃত্বে নেহরু কমিটি গঠিত হইয়াছিল। এই কমিটি যে রিপোর্ট দিয়াছিল তাতে হিন্দু মুসলিম সমস্যার সমাধানের জন্য নয়া ফরমুলা দেয়া হইয়াছিল। ঐ রিপোর্ট রচয়িতা পন্ডিত মতিলাল নেহরু স্বয়ং কলিকাতা কংগ্রেসের প্রেসিডেন্ট। পক্ষান্তরে জিন্নাহ সাহেবের পরম ভক্ত উদার মতাবলম্বী মাহমুদাবাদের রাজা সাহেব (বর্তমান রাজা সাহেবের পিতা) মুসলিম লীগ সেশনের সভাপতি। কাজেই সকলেই আশা করিতেছিল এবার কংগ্রেস ও মুসলিমলীগের সমঝোতায় হিন্দু-মুসলিম সমস্যার সমাধান হইয়া যাইবে। সাইমন কমিশনের গঠন সম্পর্কে সরকারের অনমনীয় মনোভাবও উভয় প্রতিষ্ঠানের সমঝোতার রাস্তা পরিষ্কার করিয়া দিয়াছিল।

বাংলায় এই দুই প্রতিষ্ঠানের অধিবেশন হইতেছে। সুতরাং বাংলার হিন্দু-মুসলিম নেতৃবৃন্দের এদিককার দায়িত্বই সব চেয়ে বেশি। অতএব কংগ্রেস ও মুসলিম লীগের অধিবেশনের তারিখের বেশ কিছুদিন আগে 'দি মুসলমান' অফিসে বাংলার হিন্দু-মুসলিম নেতৃবৃন্দের এক আলোচনা সভা হয়। হিন্দু পক্ষ হইতে মিঃ জে, এম, সেন গুপ্ত, মিঃ শরৎচন্দ্র বসু, ডাঃ বিধান চন্দ্র রায়, মিঃ জে, এম, দাশ গুপ্ত, মিঃ জে, সি গুপ্ত, ডাঃ ললিত চন্দ্র দাস, মিঃ নলিনী রঞ্জন সরকার ও আরও দু একজন উপস্থিত হন। মুসলিম পক্ষে স্যার আবদুর রহিম, মৌঃ মুজিবুর রহমান, মৌলানা আকরাম খাঁ, মওলানা ইসলামাবাদী এবং আরও কয়েকজন এই আলোচনায় শরিক হন। নেতাদের ফুট-ফরমায়েশ করিবার জন্য মৌঃ মুজিবুর রহমানের কথামত আমিও এই সভায় উপস্থিত থাকিবার অনুমতি পাই। দেশবন্ধুর বেংগল প্যাক্ট তখন কাগজে কলমে বাঁচিয়া আছে। কাজেই আলোচনা প্রধানতঃ এই প্যাক্টের উপরেই চলিল। হিন্দু-মুসলিম বিরোধ মীমাংসার সব আলোচনার ভাগ্যে যা হইয়াছে, এই আলোচনা বৈঠকের বরাতেও অবিকল তাই হইল। কিন্তু এ বৈঠকে আমি স্যার আবদুর রহিমের

www.amarboi.org

মুখে যে একটি কথা শুনিয়াছিলাম প্রধানতঃ সেইটি লিপিবদ্ধ করার জন্যই এই ঘটনার অবতারণা করিয়াছি। মুসলমানদের দাবি দাওয়া সম্পর্কে নেতাদের বিভিন্ন যুক্তির উত্তরে ডাঃ বিধান রায় তাঁর কাট-খোট্টা ভাষায় বলিলেনঃ তাহলে মুসলমানদের কথা এই, 'স্বাধীনতা সংগ্রামে যাব না, কিন্তু চাকরিতে অংশ দাও।' পাল্টা জবাবে স্যার আবদুর রহিম সংগে-সংগে উত্তর দিলেনঃ তাহলে হিন্দুদের কথা এই, 'চাকরিতে অংশ দিবনা, স্বাধীনতা সংগ্রামে আস।' সবাই হাসিয়া উঠিলেন। অতঃপর স্যার আবদুর রহিম সিরিয়াস হইয়া বলিলেন; 'লুক হিয়ার ডাঃ রায়, ইউ ফরগেট দ্যাট ইউ হিন্দুয হ্যাভ গট অনলি ওয়ান এনিমি দি বৃটিশার্স টু ফাইট, হুয়ার এজ উই মুসলিম হ্যাভ গট-টু ফাইট থ্রি এনিমিজঃ দি বৃটিশার্স অনদি ফ্রন্ট, দি হিন্দুয অনদি রাইট এন্ড দি মোল্লায অনদি লেফ্‌ট।' কথাটা আমি জীবনে ভুলিতে পারি নাই।

বরাবরের মতই এবার হিন্দু-মুসলিম সমস্যার সমাধান ব্যর্থ হয়। বিরোধ আরও বাড়িয়া যায়। ১৯২৮ সালের প্রজা স্বত্ব আইনের প্রশ্নে দল-নির্বিশেষে সব হিন্দু মেম্বার জমিদার পক্ষে এবং দল-নির্বিশেষে সব মুসলিম মেম্বাররা প্রজার পক্ষে ভোট দেন। আইন সভা স্পষ্টতঃ সাম্প্রদায়িক ভাগে বিভক্ত হয়। পর বৎসর সুভাষ বাবুর নেতৃত্বে কৃষ্ণনগর কংগ্রেস সম্মিলনীতে দেশবন্ধুর বেংগল প্যাক্ট বাতিল করা হয়। কি মুসলমানের স্বার্থের দিক দিয়া, কি প্রজার স্বার্থের দিক দিয়া কোন দিক দিয়াই কংগ্রেসের উপর নির্ভর করিয়া চলা আর সম্ভব থাকিলনা"।

(রাজনীতির পঞ্চাশ বছর- আবুল মনসুর আহম্মদ)

জিন্নাহর পরবর্তী কার্যকলাপ

১৯২৩ সনে কেন্দ্রীয় পরিষদে পুনরায় নির্বাচিত হওয়ার পর থেকে জিন্নাহর সংসদীয় কার্য্যকলাপের উল্লেখযোগ্য অবদান ছিল সৈন্য বাহিনীর ভারতীয় করণ, ভারতীয় মুদ্রায় সরকারের জন্য প্রয়োজনীয় বিলাতি পণ্য কেনার প্রস্তাব এবং বিপিন পালের ভারতকে পূর্ণ স্বায়ত্তশাসিত উপনিবেশের মর্যাদা দেয়ার প্রস্তাবের জোরাল সমর্থন। মে মাসের ২৪-২৫ তারিখে লাহোরে লীগের বিশেষ অধিবেশনে তিনি সভাপতিত্ব করেন এবং তাঁকে পরবর্তী তিন বৎসরের জন্য সর্বসম্মতিক্রমে সভাপতি নির্বাচন করা হয়।

মুসলমানদের জন্য প্রথমবারের মত পৃথক নির্বাচন সমর্থন করায় সেবারের কংগ্রেস প্রেসিডেন্ট মাওলানা মোহাম্মদ আলী জিন্নাহর সমালোচনা করায়

www.amarboi.org

জিন্নাহ সংযত ভাষায় উত্তর দেনঃ "সবাই ভালভাবে জানেন যে আমি পৃথক নির্বাচন-প্রথা ও সাম্প্রদয়িক প্রতিনিধিত্ব-ব্যবস্থার প্রেমীদের দলে নই। কিন্তু হয়ত অন্ততঃ সাময়িকভাবে একে অপরিবর্তনীয় সত্য বলে স্বীকার করে নিতে হবে। এর ভিত্তিতে মুসলমানরা যেখানে যেখানে সংখ্যালঘু সেখানে তাঁদের যথেষ্ট এবং কার্যকরী প্রতিনিধিত্ব দিতে হবে। আমি তাই আশা করি যে হিন্দুরা আমাকে ভুল বুঝবেন না, কারণ আজও আমি পোড় খাওয়া জাতীয়তাবাদী এবং মুসলমানদের যদি সংগঠিত করতেই হয় তাহলে জাতীয় অগ্রগতির বা স্বার্থের বিনিময়ে হবে না। পক্ষান্তরে এ হবে তাঁদের অন্যান্য ভারতবাসীদের সমপর্যায়ে আনার উদ্দেশ্যে (জিন্নাহ-পাকিস্তান-নতুন ভাবনা পৃষ্ঠা-৪৬)।

১৯২৫ ও ২৬ সনে জিন্নাহ ভারতের বিভিন্ন স্থানে কংগ্রেসের উদ্যোগে হোক বা মুসলিম লীগের উদ্যোগে হোক সকল রাজনৈতিক সম্মেলনে যোগ দিয়ে হিন্দু মুসলিম ঐক্যকে জোরদার করার প্রচেষ্টা চালাবার প্রয়াস পাচ্ছিলেন এবং সর্বত্র মুসলমানদের সংখ্যানুপাতে চাকরি-বাকরি এবং সংবিধানে মুসলমানদের জন্য উপযুক্ত রক্ষাকবচের ব্যবস্থা রাখার প্রয়োজনীয়তার কথা বলে যাচ্ছিলেন। এর পূর্বে ১৯২০ সনের শেষ দিকে কেন্দ্রীয় পরিষদের সদস্যদের নিয়ে ইন্ডিপেন্ডেন্ট পার্টি নামে জাতীয়তাবাদীদের এক নতুন গোষ্ঠির জন্ম হয় এবং জিন্নাহ সে পার্টির নেতা নির্বাচিত হন।

১৯২৫ সনে ২৮শে জানুয়ারী জিন্নাহ্ কেন্দ্রীয় পরিষদে বাংলার বিগত বছর অক্টোবরে জারি করা অর্ডিন্যান্সের এবং বিপ্লবীদের প্রতি সরকারী নীতির বিরোধিতা করলেন এবং পরবর্তীতে অর্ডিন্যান্সকে আইনে পরিণত করার সরকারী প্রচেষ্টাকে স্ব-উদ্যোগে অধিকাংশ সদস্যদের ভোটে বাতিল করে দিলেন। এতে স্পষ্ট প্রতীয়মান হয় বাংলার সন্ত্রাসীরা যে সব কাজ কর্ম করছিল তার প্রতি তাঁর মৌন সহানুভুতি ছিল। বৃটিশ বিরোধী যে কোন আন্দোলনের প্রতিই তাঁর আন্তরিক সমর্থন ছিল তাতে কোন সন্দেহ নেই। এটাই প্রমাণ করে তিনি কত বড় জাতীয়তাবাদী দেশ প্রেমিক ছিলেন।

ঐ বৎসর দিল্লীতে জানুয়ারী মাসে গান্ধীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সর্বদলীয় সম্মেলনে হিন্দু- মুসলমান ঐক্য এবং মুসলমানরা যে সব প্রদেশে সংখ্যালঘু সেখানে তাদের স্বার্থ রক্ষার প্রয়োজনীয়তার কথা জিন্নাহ পুনরায় উল্লেখ করেন। সম্মেলনে মোতিলাল, আলী ভ্রাতৃদ্বয়, আজাদ, শ্রীমতি বেসান্ত, সরোজিনী নাইডু, শ্রদ্ধানন্দ, কুঞ্জরু, চিন্তামনি ও জয়াকর প্রমুখ নেতারা অংশগ্রহণ করেন। ডিসেম্বরের ৩০-৩১ তারিখে আলীগড়ে অনুষ্ঠিত মুসলিম লীগের বাৎসরিক

www.amarboi.org

অধিবেশনে আলী ভ্রাতৃদ্বয়, ডাঃ সাইফুদ্দিন কিচলু ও আসফ আলীর মত কতিপয় প্রখ্যাত কংগ্রেস নেতা যোগদান করেন। লীগের ঐ অধিবেশনে বহুবিধ রক্ষা কবচসহ স্বায়ত্তশাসনের প্রস্তাব গৃহীত হয়। জিন্নাহ ঐ অধিবেশনে মুসলমানদের জন্য রক্ষা কবচের ব্যবস্থায় গান্ধীর স্বরাজ্য দলের বাধা সৃষ্টিকারী-ভূমিকা ও আইন অমান্য আন্দোলনের তীব্র সমালোচনা করেন।

১৯২৬ সনে তাঁর সংসদীয় ক্রিয়া কলাপের মধ্যে ছিল ভারতীয় শ্রমিক সংগঠন, রাজবন্দীদের মুক্তি, দক্ষিণ আফ্রিকায় ভারতীয় সমস্যা, মধ্যবিত্তদের কর্মহীনতা, উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশে শাসন সংস্কারের যৌক্তিকতার উপর বক্তব্য রাখা। এ ছাড়া ভারতে শাসন সংস্কারের জন্য রাজকীয় কমিশন নিয়োগের পুনরায় দাবি জানিয়ে বলেন সে কমিশনের মেম্বারগণ যাতে ভারতীয়দের আস্থাভাজন হয় সে ভাবে কমিশন নিয়োগ করতে হবে। সে বছর তিনি বোম্বেতে আহুত ইন্ডিয়ান ন্যাশনাল পার্টির সভায় যেখানে সাম্প্রদায়িক সমস্যা সম্বন্ধে আলোচনা হয় তাতে যোগদান করেন ও ডিসেম্বরের শেষ দিকে দিল্লীতে অনুষ্ঠিত মুসলিম লীগের অধিবেশনে যোগদান করেন। ঐ বৎসর নভেম্বরে মুসলমান সীট থেকে তিনি পুনরায় কেন্দ্রীয় পরিষদের মেম্বার নির্বাচিত হন।

দিল্লী-মুসলিম প্রস্তাব

১৯২৭ সালের ২০শে মার্চ দিল্লীতে মুসলিম সম্মেলনের সভাপতিত্ব করেন যেখানে মুসলমানদের দাবিসমূহের চূড়ান্ত রূপ দেয়া হয়। রাজনৈতিক ক্ষেত্রে এর জনপ্রিয় নাম "মুসলিম প্রস্তাব।" ২৯শে মার্চ পূর্বোক্ত প্রস্তাবের কথা সংবাদপত্রে উল্লেখ করতে গিয়ে তিনি দুঃখ করে বলেন যে হিন্দু বা মুসলমান কোন পক্ষই তাঁর ও তাঁর সমর্থক লীগ নেতাদের যৌথ নির্বাচন প্রথা যে প্রথায় একজন প্রার্থীকে হিন্দু-মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের ভোটারদের কাছে যেতে বাধ্য করে বলে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি করে এর তাৎপর্য অনুধাবন করতে পারছে না। যাই হোক, সে বৎসরই মে মাসে বোম্বেতে নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটি দিল্লীর মুসলিম প্রস্তাবসমূহ অনুমোদন করে (সীতারামইয়া সমগ্রন্থ-১ম খণ্ড পৃষ্ঠা ৫২৮-৫২৯)।

এই প্রস্তাবের সারমর্ম হল 'এই শর্তে তারা কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক পরিষদসমূহে যৌথ নির্বাচন প্রথায় রাজি যে (ক) সিন্ধুকে এক পৃথক প্রদেশে পরিণত করতে হবে; (খ) উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ এবং বেলুচিস্তানকে অন্যান্য প্রদেশের সমমর্যাদা দেয়া হবে, (গ) পাঞ্জাব ও বঙ্গে মুসলমানদের

www.amarboi.org

প্রতিনিধিত্ব মোট সংখ্যার এক-তৃতীয়াংশের কম হবে না।" চৌধুরী খালেকুজ্জামান বলেছিলেন যে জিন্নাহর যৌথ নির্বাচন প্রথা মেনে নেয়ায় পাঞ্জাবের মুসলিম লীগ নেতা স্যার শফী অত্যন্ত বিস্মিত হয়ে ছিলেন এবং পরবর্তীতে তিনি পাঞ্জাবে আলাদাভাবে শফী লীগ প্রতিষ্ঠা করেন।

সাইমন কমিশন বয়কট

৩১ শে অক্টোবর জিন্নাহ বড়লাটকে শাসন সংস্কার কমিশনে অন্ততঃ দু'জন ভারতীয়কে অন্তর্ভুক্ত করার অনুরোধ জানান কিন্তু নভেম্বরে যখন সাইমন কমিশন ঘোষণা হল দেখা গেল সদস্যরা সবাই শ্বেতাঙ্গ। তাই প্রতিবাদ স্বরূপ এই কমিশনকে জিন্নাহ বয়কট করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলেন এবং টেলিগ্রাম করে ইংল্যান্ডের শ্রমিক দলকে তাঁর সিদ্ধান্তের কথা জানিয়ে দিলেন। কংগ্রেসের সঙ্গে একযোগে সাইমন কমিশন বয়কটের সিদ্ধান্তে তদানীন্তন ভারত সচিব লর্ড বার্কেন হেড অত্যন্ত অসন্তুষ্ট হয়ে লর্ড উইলিংডন ও স্যার সাইমনকে উপদেশ দেন যেন সুযোগ পেলে জিন্নাহকে যেন উচিত শিক্ষা দেয়া হয়। সে বৎসর ডিসেম্বরের ৩০/৩১ ও পরবর্তী পহেলা জানুয়ারী কোলকাতায় অনুষ্ঠিত লীগের ১৯তম বাৎসরিক অধিবেশনে লীগ যাতে সাইমন কমিশন বর্জন করে তার জন্য পরামর্শ দিলেন এবং লীগ শেষ পর্যন্ত তাঁর পরামর্শ গ্রহণ করে। জিন্নাহর উদ্যোগে লীগের ঐ অধিবেশনে ভারতের ভবিষ্যৎ সংবিধান রচনার জন্য কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির সঙ্গে আলোচনা করে ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য লীগ কাউন্সিল কর্তৃক একটি সাব কমিটি গঠন করার প্রস্তাবও গৃহীত হয়। লীগের অধিবেশনে স্যার আলী ইমাম বলেন যে মুসলমানরা ভারতের সংবিধান রচনার ব্যাপারে হিন্দুদের সঙ্গে সমানাধিকার ভিত্তিতে অংশগ্রহণ করতে চায়। লীগের ঐ অধিবেশনে দিল্লী মুসলিম প্রস্তাবও অনুমোদিত হয় যাতে যৌথ নির্বাচনের স্বীকৃতি ছিল। সে অধিবেশনে শফীর এ ব্যাপারে স্বতন্ত্র দৃষ্টিভঙ্গীর নিন্দা করা হয়।

লীগের এ অধিবেশনে সরোজিনী নাইডু ও অ্যানে বেসান্ত সম্মানিত অতিথি রূপে যোগ দিয়েছিলেন। সভাপতির ভাষণে জিন্নাহ বলেন "পন্ডিত মালব্যকে আমি স্বাগত জানাই এবং কংগ্রেস ও হিন্দু মহাসভার মঞ্চ থেকে হিন্দু নেতারা আমাদের প্রতি যে সহযোগিতার হস্ত প্রসারিত করেছেন তা আমি পরম সমাদরে গ্রহণ করছি। আমার কাছে তাঁর এই প্রস্তাব বৃটিশ সরকারের দেয়া যাবতীয় সুযোগ-সুবিধার চেয়ে অধিক মূল্যবান। সুতরাং তাদের বন্ধুত্বের হাত

www.amarboi.org

যেন আমরা গ্রহণ করি। এই ভাবে জিন্নাহ্‌র নেতৃত্বে লীগ পুনরায় জাতীয়তাবাদী দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণ করে কংগ্রেসের কাছাকাছি চলে আসে।

১৯২৮ সনের প্রথম থেকেই জিন্নাহ্ সাইমন কমিশন বয়কটের ব্যাপারটিকে পুরোপুরি সফল করার জন্য কার্যক্ষেত্রে নেমে পড়েন। বোম্বেতেই সাইমন কমিশনের প্রথম পদার্পণ করার কথা, তাই বোম্বে তার প্রধান কর্মক্ষেত্র হয়ে দাঁড়াল। জিন্নাহ্ যে কাজেই হাত দিলেন বা যে সিদ্ধান্ত নিতেন তা যে কি নিষ্ঠা ও আন্তরিকতার সঙ্গে সম্পন্ন করতে চাইতেন জিন্নাহ্‌র শিষ্য ও সহযোগী আবদুল করিম চাগলার বয়ান থেকে তার কিছুটা পরিচয় পাওয়া যায়। চাগলা বলেন, " বোম্বেতে আমরা একটি কমিটি গঠন করে ছিলাম, যার সম্পাদক ছিলাম আমি এবং জিন্নাহ্ ছিলেন সভাপতি আর আমাকে এ কথা বলতেই হবে যে কমিশনকে বয়কটের ব্যাপারে জিন্নাহ্ ছিলেন পাথরের মতোই দৃঢ়। কেউ কেউ প্রস্তাব করেছিলেন যে বয়কট কেবল রাজনৈতিক ক্ষেত্রেই হবে, সামাজিক ক্ষেত্রে নয়। জিন্নাহ্ এতে রাজি হননি এবং নিজের ভূমিকা থেকে তিলমাত্র বিচ্ছুত হননি। তিনি বলেছিলেন বয়কট মানে বয়কট এবং একে সর্বাত্মক হতে হবে। বয়কট প্রচারে আমরা বহু সভা করেছিলাম" (চাগলা সমগ্রন্থ - ৯৪ পৃষ্ঠা)।

স্যার সাইমন ৩রা ফেব্রুয়ারী সদলবলে বোম্বেতে এসে সর্বাঙ্গীন বয়কটের সম্মুখীন হন। এ প্রসঙ্গে মহাত্মা গান্ধী তার ইয়ং ইন্ডিয়া পত্রিকায় লেখেন, 'সংগঠকদের এই বিপুল সাফল্যে আমি আমার অভিনন্দন জানাই ... এ ব্যাপারে লিবারেল, নির্দলীয় এবং কংগ্রেসীরা একই মঞ্চে সম্মিলিত হয়েছেন দেখে আমার আত্মা শান্তি পেয়েছে।"

নেহরু রিপোর্ট

তবে ঐ বছরে সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক ঘটনা হল নেহেরু রিপোর্টের প্রণয়ন ও তা বিবেচনার জন্য সর্বদলীয় সম্মেলন আহবান। এদেশবাসীর শাসন সংস্কার প্রসঙ্গে বিভিন্ন দলের গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিদের মতভেদের কথা ইংরেজদের জানা ছিল। সাইমন কমিশনের বয়কট ও পরবর্তী ঘটনা প্রবাহ দৃষ্টে তদানীন্তন ভারত সচিব লর্ড বার্কন হেড ভারতীয় নেতৃবৃন্দকে খোলাখুলি চ্যালেঞ্জ জানালেন যে যদি সম্ভব হয় তারা যেন ভারতের জন্য একটা সর্বসম্মত শাসনতন্ত্র রচনা করেন। এর জবাবে ১৯২৭ সালে মাদ্রাজ কংগ্রেসে দেশের জন্য একটা সংবিধান রচনার জন্য ডাঃ আনসারীর

www.amarboi.org

সম্মেলনে একটি সর্বদলীয় সম্মেলন আহ্বান করার সিদ্ধান্ত নেয়া হয়। ১৯২৮ সনে ফেব্রুয়ারীতে দিল্লীতে সর্বপ্রথম ঐ সম্মেলনের অধিবেশন বসে। জিন্নাহ ঐ সম্মেলনে যোগ দিয়ে লক্ষ্য করেন যে জয়াকর, মালব্য ও লাজপতরায় প্রমুখের প্রভাবে সম্মেলন কংগ্রেস কর্তৃক পূর্বে স্বীকৃত দিল্লীর মুসলিম প্রস্তাবের প্রতিকূল ভূমিকা গ্রহণ করতে যাচ্ছে। এই প্রতিকূল ভূমিকা গ্রহণের কারণ হল কিছু চরম পন্থী ও হিন্দু মহাসভা গোষ্ঠির অনবরত চাপের ফলে।

সম্মেলনের শেষে দশদিন ধরে জিন্নাহ চেষ্টা করলেন একটা বুঝাপড়ার জন্য যাতে দিল্লীর মুসলিম প্রস্তাবের গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলো সম্মেলনের প্রস্তাবে রক্ষিত হয়। কিন্তু তার সর্বচেষ্টা বিফল হয়। মার্চে তাই তাঁর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত মুসলিম লীগ কাউন্সিলের সভায় এই বলে দুঃখ প্রকাশ করা হয় যে হিন্দু মহাসভা লীগের প্রস্তাবকে কার্যতঃ বাতিল করে দিয়েছে।

পরবর্তীতে ১৯শে মে বোম্বেতে অনুষ্ঠিত সম্মেলনের তৃতীয় বৈঠকে ২৯টি রাজনৈতিক দলের প্রতিনিধিদের সম্মতিক্রমে মতিলাল নেহরুর সভাপতিত্বে ১লা জুলাইয়ের মধ্যে সংবিধানের মূলনীতির খসড়া রচনার উদ্দেশ্যে একটি কমিটি গঠন করা হয়। জিন্নাহ তখন স্ত্রী রতির চিকিৎসা উপলক্ষে বিদেশগামী বলে সম্মেলনে যোগ দিতে পারেননি এবং অবস্থাদৃষ্টে হতাশ হয়ে অন্য কোন মুসলিম লীগ প্রতিনিধিও সম্মেলনে যোগ দেননি। নানা দৃষ্টিভঙ্গি ও নানা স্বার্থের পরিপোষক বিশিষ্ট নেতাদের সংগে আলাপ আলোচনার পর কমিটি তার রিপোর্ট প্রস্তুত করেন। এই নেহরু রিপোর্ট সম্বন্ধে আরো বিস্তারিত আলোচনা ও জনমত সংগ্রহের জন্য সে বৎসরের ২২ শে ডিসেম্বর কোলকাতায় এক সর্বদলীয় জাতীয় সম্মেলনের আহবানের সিদ্ধান্ত নেয়া হয়। এ ছাড়া কংগ্রেস ও লীগের পারস্পরিক আলোচনার ভিত্তিতে যাতে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেয়া যায় তজ্জন্য উভয় প্রতিষ্ঠানের বাৎসরিক অধিবেশন কোলকাতাতেই অনুষ্ঠানের সিদ্ধান্ত নেয়া হয়।

নেহরু রিপোর্টের প্রধান প্রধান সুপারিশ ছিল ভারতের সর্বত্র পৃথক নির্বাচনের পরিবর্তে যৌথ ও মিশ্র নির্বাচন হবে। মুসলমানদের জন্য কেন্দ্রীয় পরিষদে কোন সংরক্ষিত আসন থাকবে না। মুসলমান সংখ্যাগরিষ্ঠ প্রদেশগুলোতে এবং উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশে যেখানে হিন্দুরা সংখ্যালঘু শুধু সে সব প্রদেশে আসন সংরক্ষণ নীতি বজায় থাকবে। এসব প্রদেশে সংখ্যালঘুরা তাদের সংরক্ষিত আসনের চাইতে অতিরিক্ত আসনেও প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে পারবেন। পাঞ্জাব ও বাংলাদেশ যেখানে মুসলমানরা শেষ লোকগণনায়

www.amarboi.org

সংখ্যাধিক্য অর্জন করেছে সেখানে মুসলমানদের জন্য কোন সংরক্ষিত আসন থাকবেনা। সংখ্যালঘু প্রদেশগুলোতে এই আসন সংরক্ষণ ব্যবস্থা দশ বৎসরের জন্য স্থায়ী হবে। আর্থিক ব্যাপারে প্রয়োজনীয় তদন্তের পর সিন্ধুকে বোম্বাই থেকে পৃথক করে একটি আলাদা প্রদেশে পরিণত ক া হবে।

ভালভাবে লক্ষ্য করলে এটা যে কারো কাছে স্পষ্ট হয়ে উঠবে যে নেহরু রিপোর্টের সুপারিশের সংগে পূর্বে বর্ণিত দিল্লীর মুসলিম প্রস্তাবের (মার্চ-১৯২৭) মৌলিক পার্থক্য বিদ্যমান। অথচ ঐ মুসলিম প্রস্তাব কংগ্রেস গ্রহণ করেছিল এবং ঐ প্রস্তাবের ভিত্তিতেই মুসলিম লীগ কংগ্রেসের আহবানে সর্বদলীয় সম্মেলনে যোগ দিয়ে ছিল। সুতরাং এই অল্প সময়ের ব্যবধানে কংগ্রেসের দৃষ্টিভঙ্গির এই পরিবর্তনে মুসলিম লীগ নেতা ও মুসলিম জনসাধারণ কংগ্রেসের সততা ও প্রতিশ্রুতির প্রতি সম্পূর্ণ আস্থাহীন হয়ে পড়ে। ফলে উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে ক্ষোভ, সন্দেহ ও বিতৃষ্ণা বৃদ্ধি পেতে থাকল।

সর্বদলীয় সম্মেলনে কংগ্রেসের এ ভূমিকার কারণ বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় খিলাফত আন্দোলনের ব্যর্থতা ও অসহযোগ আন্দোলনকে কেন্দ্র করে ১৯২১ সন থেকে দেশের বিভিন্ন স্থানে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার ফলে কংগ্রেস, মুসলিম লীগ ও খিলাফত কমিটি দেশব্যাপি অসাম্প্রদায়িক মনোভাব তৈরির মারফত হিন্দু-মুসলিম সম্প্রীতি সৃষ্টির শুভ প্রচেষ্টা জনসাধারণ ও ভোটারদের মধ্যে তেমন উৎসাহ সৃষ্টি করতে পারেনি। মাঝখান থেকে হিন্দু মহাসভা ও ধর্মীয় সংগঠনগুলো বেশ খানিকটা জনমনে স্থান করে নিয়ে ছিল। ১৯২৬ সনের নির্বাচনে মুসলিম লীগ ও কংগ্রেস ১৯২৩ সনের তুলনায় অনেকাংশে জন সমর্থন হারিয়ে ছিল। এ সমস্ত কারণে ১৯২৮ সনের সর্বদলীয় সম্মেলনে এ মধ্য শক্তি সঞ্চয়কারী হিন্দু মহাসভা, শিখলীগ প্রভৃতির চাপে কংগ্রেস মুসলমানদের দিল্লী মুসলিম প্রস্তাব থেকে সরে গিয়ে অন্যদল ও সম্প্রদায়গুলোকে সন্তুষ্ট করতে সচেষ্ট হয়।

এই পটভূমিতে দিল্লীতে অনুষ্ঠিত ফেব্রুয়ারী মাসের সর্বদলীয় সম্মেলনে মুসলমানরা যখন দেখল তাদের দিল্লী মুসলিম প্রস্তাব বিতর্কের বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে এবং মানার কোন লক্ষণ দেখা যাচ্ছেনা তখন মুসলিম লীগ প্রতিনিধিরা সম্মেলন বর্জনের সিদ্ধান্ত নিলেন। লীগ প্রতিনিধিরা সম্মেলন থেকে বেরিয়ে যাওয়ার পর যে দু'জন মুসলমান কংগ্রেসী সদস্য রইলেন স্যার আলী ইমাম ও শোয়েব কোরাইশী তারাও পরে অসুস্থতা প্রভৃতি কারণে সম্মেলনে

www.amarboi.org

যোগ দিলেন না। বাংলাদেশ ও পাঞ্জাবের মুসলমান আসন সংরক্ষণের বিরোধিতা করেছিল হিন্দু ও শিখ প্রতিনিধিরা এ কারণে যে উক্ত দুইটি প্রদেশেই মুসলমানরা সংখ্যা গরিষ্ঠ। যাই হোক, শেষ পর্যন্ত দেখা গেল নেহরু রিপোর্ট সমস্যার সমাধান করতে ব্যর্থ হয়েছে।

নেহরু রিপোর্ট সংশোধনে জিন্নাহর ব্যর্থতা ও অশ্রু সজল চোখে কোলকাতা ত্যাগ

জিন্নাহ নেহরু রিপোর্ট রচনার প্রক্রিয়ার সঙ্গে যুক্ত ছিলেন না। দিল্লীতে সর্বদলীয় সম্মেলনে (মার্চ) যোগ দেয়ার পর ৩রা এপ্রিল তিনি ইংল্যান্ড রওয়ানা হয়ে যান। ইতিমধ্যে তাঁর স্ত্রী তাঁকে ত্যাগ করে মায়ের সঙ্গে ইউরোপ চলে গেছেন। বিদেশে থাকাকালীন গুরুতর রূপে অসুস্থ স্ত্রী রতির চিকিৎসা ও সেবা শুশ্রূষার জন্য যথা সাধ্য ব্যবস্থা করে ইউরোপের কয়েকটি দেশ ভ্রমণের পর ২৬শে অক্টোবর তিনি স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করেন। দেশে ফেরার পর তিনি নেহরু রিপোর্ট সম্বন্ধে বিস্তারিত জানতে পেরে মর্মাহত হলেন। শফী লীগ ও জিন্নাহ লীগ উভয় অংশই এই রিপোর্টে অসন্তোষ প্রকাশ করে। সাম্প্রদায়িক সমস্যা সমাধানের দিক থেকে নেহরু রিপোর্টের অসামান্য গুরুত্ব ছিল বলে ২৪ জন প্রতিনিধি নিয়ে জিন্নাহ কলিকাতা সর্বদলীয় জাতীয় সম্মেলনে যোগ দিয়ে নিম্নোক্ত প্রস্তাব পেশ করেন। "(১) কেন্দ্রীয় ব্যবস্থা পরিষদে মুসলমানদের প্রতিনিধিত্ব এক তৃতীয়াংশের কম হবেনা; (২) নেহরু রিপোর্টে প্রস্তাবিত প্রাপ্ত বয়স্কদের ভোটাধিকার স্বীকৃত না হলে পাঞ্জাব ও বঙ্গ প্রদেশ জনসংখ্যার ভিত্তিতে আসন পাবে এবং তার থেকে বেশী নয়। তবে দশ বছর পর এর পুনর্বিচার করা যেতে পারে; (৩) বাদবাকী সব ক্ষমতা থাকবে প্রদেশগুলোর হাতে, কেন্দ্রের হাতে নয়।"

১৯০৯ সন থেকে মুসলমানরা পৃথক নির্বাচনের সুবিধা পাওয়ার ফলে হিন্দু-মুসলমানদের মধ্যে যে মানসিক বিভেদ ক্রমাগত বৃদ্ধি পেয়ে চলেছিল। ১৯২৮ সনের মার্চে দিল্লীর মুসলিম প্রস্তাবের মাধ্যমে জিন্নাহ বহু কষ্টে যৌথ নির্বাচনের যে স্বীকৃতি আদায় করেছিলেন এবং পরবর্তীতে কংগ্রেসকে দিয়েও স্বীকার করিয়ে নিয়ে সে বিভেদ বিলোপের যে একটি পথ জিন্নাহ বের করেছিলেন তা অনুসরণ করলে কংগ্রেস ও লীগ উভয় প্রতিষ্ঠানই ভবিষ্যতে বৃহত্তর বিপদ এড়াতে পারতো। একথা মনে রেখেই জিন্নাহ অত্যন্ত আবেগের সঙ্গে সম্মেলনের সদস্যদের কাছে ব্যাকুল মিনতি জানালেন। তিনি বললেনঃ

www.amarboi.org

"আমরা যা চাই তা হল- আমাদের লক্ষ্য সাধিত না হওয়া পর্যন্ত হিন্দু ও মুসলমানেরা সম্মিলিতভাবে পথ পরিক্রম করবে। সুতরাং দেখা জরুরী যে আপনারা কেবল মুসলিম লীগকেই সঙ্গে পাননি, ভারতবর্ষের মুসলমানদেরও সহযোগীরূপে পেয়েছেন এবং এ কথা আমি মুসলমান হিসাবে বলছিনা, বলছি একজন ভারতবাসীরূপে। আর আমি এটা দেখতে চাই যে স্বাধীনতা সংগ্রামে আমাদের সঙ্গে সাত কোটি মুসলমান যেন সমান তালে পা ফেলে চলেন। আপনারা কি জনাকয়েকের সহযোগিতাতেই তুষ্ট হবেন? আপনারা কি আমার এ জাতীয় কথা শুনে সন্তুষ্ট হতে পারেন যে কেবল আমি আপনাদের সঙ্গে আছি? ভারতবর্ষের মুসলমানরা আপনাদের সঙ্গে এক সাথে চলেন-এ আপনারা চান কি চান না? শিখ, খ্রীস্টান ও পার্সি কোন সম্প্রদায়ের প্রতি বিন্দু মাত্র অসম্মান না করে আমি বলতে চাই যে আপনাদের এ কথা মনে রাখতে হবে ভারতবর্ষে প্রধান দুইটি সম্প্রদায় হল হিন্দু ও মুসলমান। তাই এই দুই সম্প্রদায়কে পরস্পরের প্রতি সদ্ভাব সম্পন্ন ঐক্যবদ্ধ হতে হবে - তাদের বুঝতে হবে যে তাদের মধ্যে কোন স্বার্থ সংঘাত নেই এবং তারা এক সার্বজনীন মঙ্গলের অভিমুখে সম্মিলিতভাবে মার্চ করে এগিয়ে চলেছেন। .... তাই আমি চাই যে আপনারা স্যার তেজবাহাদুর সাপরু বর্ণিত দূরদর্শী রাষ্ট্রনায়কবৃত্তির উচ্চশিখরে উঠুন। সংখ্যালঘুরা সংখ্যাগুরুদের কোন কিছু দিতে সমর্থ নয়। সুতরাং আমি যেন আপনাদের ভাষায় যাকে এই সব ছোট খাট ব্যাপার বলছেন তার জন্য দাবি না করি- এ সব কথা আমাকে বলে কোন লাভ নেই। এসব যদি ছোট খাট ব্যাপারই হয় তাহলে মেনে নিতে দোষ কি?"

একাধিক দেশের সংবিধানের নজির উল্লেখ করে তিনি বললেন যে সংখ্যালঘুরা সর্বদা সংখ্যাগুরুদের আতঙ্কে দিন যাপন করে। ধর্মীয় সংখ্যাগুরুরা তার মতে সচরাচর নিপীড়ক ও অত্যাচারী হয়। সুতরাং সংখ্যালঘুদের নিরাপত্তা দাবি করার অধিকার সর্বদাই আছে। অতঃপর তিনি বলেনঃ

"এসব বড় বড় প্রশ্নের সমাধান করতে হলে উচ্চস্তরের রাষ্ট্রনায়ক সুলভ মানসিকতা ও রাজনৈতিক প্রজ্ঞার প্রয়োজন। আবার আমি তাই আপনাদের অনুরোধ জানাচ্ছি যে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেয়ার পূর্বে আপনারা এ ব্যাপারে ভাল করে খুঁটিয়ে বিচার করুন। আমি যা বলছি তাতে কোন পক্ষকে কোন রকম শাসানি দেয়া হয়েছে বলে যেন দয়া করে মনে না করেন এবং আমি আশা করি যে আমাকে ভুল বুঝা হবেনা। আজ যদি আপনারা এ প্রশ্নের সমাধান না করেন, তবে আগামীকাল তা করতে হবে এবং ইতিমধ্যে আমাদের জাতীয় স্বার্থ ব্যাহত হবে। আমরা সবাই এদেশের সন্তান। আমাদের সম্মিলিতভাবে

www.amarboi.org

থাকতে হবে, মিলেমিশে কাজ করতে হবে। আমাদের মধ্যে যে বিষয়ে মতভেদ থাকুক না কেন, আমরা যেন তার অধিক আর পারস্পরিক দ্বেষ সৃষ্টি না করি। যদি আমরা সহমত হতে না পারি, আমরা যেন ভিন্ন মত পোষণ করার ব্যাপারে একমত হতে পারি এবং যেন বন্ধু হিসাবে এখান থেকে যেতে পারি। আমার কথা বিশ্বাস করেন যে হিন্দু-মুসলমানরা মিলিত হতে না পারলে ভারতবর্ষের অগ্রগতি হবে না। তাই একটা আপোষ নিষ্পত্তি করার ব্যাপারে কোন রকম যুক্তিতর্ক, দর্শন অথবা বাদ বিবাদ যেন বাধা হয়ে না দাঁড়ায়। হিন্দু-মুসলমানের ঐক্য প্রত্যক্ষ করার চেয়ে আর কিছু আমাকে তেমন খুশি করতে পারবে না।"

(এম, এইচ, সাঈদ "জিন্নাহ-পৃষ্ঠা-৪৩৩-৪৩৫" জিন্নাহ-পাকিস্তান নতুন ভাবনা বই থেকে নেয়া)

এখানে লক্ষণীয় যে মুসলিম দাবির সমর্থনে বক্তব্য রাখলেও জিন্নাহ্ তখনও জাতীয়তাবাদী এবং হিন্দু-মুসলিম ঐক্যের প্রবক্তা। কিন্তু সম্মেলনের অপর তিন প্রধান বক্তার মধ্যে কংগ্রেসের প্রতিনিধি মোহাম্মদ আলী তাঁর স্বভাবসিদ্ধ উগ্র ও ওজস্বিনী ভাষায় নেহরু রিপোর্টের বিরুদ্ধে এবং মুসলিম দাবির স্বপক্ষে বক্তব্য পেশ করেন। প্রসঙ্গতঃ বলা যায় যে ১৯২০ খৃস্টাব্দের পর এই প্রথম জিন্নাহ ও মোহাম্মদ আলী একই মঞ্চ থেকে নিজ নিজ ভঙ্গি ও ভাষায় একই দাবি উত্থাপন করেন। দ্বিতীয় বক্তা তেজ বাহাদুর সাপরু জিন্নাহর প্রস্তাব মেনে নেবার সুপারিশ করলেও তৃতীয় জন অর্থাৎ হিন্দু স্বার্থের প্রতিনিধি জয়াকর এর তীব্র বিরোধিতা করলেন। সম্মেলনের কংগ্রেসী প্রতিনিধিদের একাংশ ও তাঁর সঙ্গে সদ্ব্যবহার করননি এবং কি মানসিক চাপ ও উদ্বেগের মধ্যে জিন্নাহকে তাঁর ভূমিকা পালন করতে হচ্ছে তা অনুধাবন করার পরিবর্তে তারা চিৎকার করতে থাকেন যে জিন্নাহ্ মুষ্টিমেয় সাম্প্রদায়িক মনোভাবাপন্ন মুসলমানদের প্রতিনিধি এবং তাই তাঁকে মাত্রাতিরিক্ত গুরুত্ব দেয়া উচিত নয়। গভীর রাত্রি পর্যন্ত আলোচনার পরও জিন্নাহর একটি সংশোধনী প্রস্তাবও গৃহীত হল না। সম্ভবতঃ অমুসলমানদের প্রতিক্রিয়া অনুধাবন করার কারণে লীগ ও খিলাফত কমিটির প্রতিনিধিরা জিন্নাহর সংশোধনী প্রস্তাবের সপক্ষে বা বিপক্ষে ভোট দেয়া থেকে বিরত থাকেন, যদিও আহমদীয়া মুসলমান প্রতিনিধিরা সংশোধনী প্রস্তাবের সপক্ষে ভোট দিয়ে ছিলেন। আহত হৃদয়ে জিন্নাহ্ সম্মেলন থেকে বিদায় নিলেন। ঘটনার প্রত্যক্ষদর্শী জিন্নাহর জনৈক পার্সি সুহৃদ পরদিন

www.amarboi.org

যখন রেলস্টেশনে জিন্নাহকে দিল্লীতে রওয়ানা করে দিতে গেলেন তখন তাঁর হাত ধরে সজল চক্ষে জিন্নাহ্ বললেন, "জামসেদ, এবার আমাদের পথ আলাদা হয়ে গেল।" প্রকাশ্যে জিন্নাহর চোখে জল আসার যে বিরল সংখ্যক ঘটনার উল্লেখ পাওয়া যায় এ তার অন্যতম।

কোলকাতা সর্বদলীয় সম্মেলনে জিন্নাহর উপস্থিতি কংগ্রেস নেতৃবৃন্দকে তাঁর সংশোধনী গ্রহণের জন্য অনুনয় বিনয় ও সর্বশেষে ব্যর্থতা রাজমোহন গান্ধী তাঁর Understanding the Muslsim Mind বইতে ১৩৮-১৩৯ পৃষ্ঠায় এভাবে বর্ণনা করেছেনঃ

"Two months after his return, Jinnah went to Calcutta urge Congress to amend the Report and accept the Delhi package. "Majorities are apt to be oppressive and tyrannical," he said, "and minorities always dread and fear that their interests and rights, unless clearly definitely safeguarded by statutory provisions, would suffer. "And he warned that the alternative to a settelment might be "revolution and civil war."

According to K. M. Munshi, who in 1920 had left the Home Rule League along with Jinnah, Jinnah arrived in Calcutta " with the air of a conquering hero" and "in a trueulent mood." Calling Jinnah " a spoilt child, a naughty child," Sapru, the Hindu Liberal, nonetheless asked Congress to give him what he wanted " and be finished with it." However, Congress was not minded to do so; it feared a Hindu back-lash, and it was not sure that a pact with Jinnah would be a pact with the Muslims as a whole.

The occasion has been recalled by one of Jinnah's friends, a parsi called Jamsed Nusser Wanjee, who later became Mayor of Karachi:

Mr. Jinnah stood up, wearing the fashionable clothes he had brought back from England, and he pleaded .... His

www.amarboi.org

demands were rejected. One man said that Mr. Jinnah had no right to speak on behalf of the Muslims- that he did not represent them. He was sadly humbled, and he went back to his hotel.

Next morning he left Calcutta by train, and I went to see him off. He was standing at the door of his first class coupe compartment, and he took my hand. He had tears in his eyes as he said "Jamshed, this is the parting of the ways." His hurt was understandable. He had imagined that his exertions had brought him close to re-enacting his 1916 Lucknow triumph, forging a Hindu-Muslim pact and occupying a spot from which he could steer not just the qaum but india-as- a-whole. Calcutta shattered this picture, and Jinnah knew that he would not look at it again.

Confirming Nusser Wanjee's account, some spoke of Calcutta 1928 as a watershed. There, according to Khaliquzzaman, "the fate of the country was sealed." Even at the time Sapru said that failure to agree would lead to "a great damage from which India would not recover for a quarter of a century." It is a fact that after Calcutta no Muslim outside Congress spoke again of joint electorates.

বিলাত থেকে ফিরে আসার পর জিন্নাহ্ নেহেরু রিপোর্ট সংশোধন ও দিল্লীর মুসলিম প্রস্তাব গ্রহণের অনুরোধ জানানোর উদ্দেশ্যে কোলকাতা গেলেন। তিনি বললেন সংখ্যাগুরুরা সাধারণতঃ অত্যাচারী হয় এবং সংখ্যালঘুরা সব সময় ভয় করে যে, তাদের স্বার্থ ও অধিকার যদি সংবিধানে আইনের দ্বারা পরিষ্কার ও সুষ্ঠুভাবে রক্ষিত না হয় তবে তারা দারুণভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হবে। এবং তিনি এক সাবধান বাণীও উচ্চারণ করলেন যে, কোন রকমের আপোষের বিকল্প হলো বিপ্লব ও গৃহযুদ্ধ।

কে, এল, মুন্সী যিনি জিন্নাহ্র সঙ্গে হোমরুল লীগ ত্যাগ করে ছিলেন তিনি বলেন, জিন্নাহ্ বিজয়ী বীরের মত সন্ধির মেজাজ নিয়ে কোলকাতা আসলেন। হিন্দু লিবারেল নেতা সাপরু জিন্নাহ্কে একটি নষ্ট ও দূরন্ত শিশুরূপে আখ্যায়িত করে কংগ্রেসকে সে যা চায় তাই তাকে দিয়ে ব্যাপারটা নিষ্পত্তি করে ফেলার অনুরোধ জানালেন। কিন্তু কংগ্রেস হিন্দুদের প্রতিক্রিয়ার ভয়ে তা

www.amarboi.org

করতে রাজি হল না। এ ছাড়া জিন্নাহর সঙ্গে আপোষের অর্থ যে সমগ্র মুসলমান সম্প্রদায়ের সঙ্গে আপোষ এ সম্বন্ধেও কংগ্রেস নিশ্চিত ছিল না।

"জামশেদ নওরোজী নামে জিন্নাহর এক পার্সি বন্ধু যিনি পরবর্তীকালে কারাচীর মেয়র হয়েছিলেন তিনি ঘটনার বর্ণনা এভাবে দিয়েছিলেনঃ

"জিন্নাহ্ সাম্প্রতিক কালের বিলেত থেকে আনা চটকদার পরিচ্ছদে ভূষিত হয়ে উঠে দাঁড়ালেন এবং বক্তব্য রাখলেন ... । তাঁর দাবিগুলো বাতিল হয়ে গেল। একজন চিৎকার করে বলল, মুসলমানদের পক্ষ থেকে কথা বলার জিন্নাহ্র কোন অধিকার নাই সে তাদের প্রতিনিধিত্ব করেনা। তাঁকে অত্যন্ত দুঃখজনকভাবে অপমানিত করা হলো। তিনি হোটেলে ফিরে গেলেন।

পরদিন ভোরে তিনি ট্রেনে কোলকাতা ত্যাগ করলেন। আমি তাঁকে স্টেশনে বিদায় দিতে গেলাম তিনি তাঁর ফার্স্ট ক্লাস কম্পার্টমেন্টের দরজায় দাঁড়িয়ে আমার হাতখানা নিয়ে অশ্রুপূর্ণ নয়নে বললেন, "জামশেদ এবার আমাদের পথ সম্পূর্ণ আলাদা হয়ে গেল।

তাঁর আঘাতের গভীরতা অনুমেয়। তিনি আশা করেছিলেন, ১৯১৬ সালের লক্ষ্মৌ প্যাক্ট তাঁকে যে গৌরব এনে দিয়েছিল এবারকার প্রচেষ্টাও তাঁকে তেমনি সাফল্য এনে দেবে এবং তিনি এমন একটি অবস্থানে উন্নীত হবেন যেখান থেকে তিনি শুধু নিজের সম্প্রদায়কে নয়, সমগ্র ভারতকে পরিচালনা করতে পারবেন। কোলকাতা তাঁর সেই স্বপ্নকে ভেঙ্গে গুঁড়িয়ে দিল যে স্বপ্নের দিকে তিনি আর কখনও পেছন ফিরে তাকাননি।"

নওরজীর বর্ণনাকে সমর্থন করে কেউ কেউ কোলকাতার ১৯২৮ সালের ঘটনাকে এইরূপে বর্ণনা করেছেন। খালিকুজ্জামানের মতে, সেইদিন দেশের ভবিষ্যত স্থিরিকৃত হয়ে গিয়েছিল। হিন্দু রাজনীতিবিদদের সংকীর্ণ দৃষ্টিভঙ্গির তুলনা হয়না। এমনকি সাপরু পর্যন্ত সে সময় বলেছিলেন, একমত হতে না পারার ব্যর্থতা সমগ্র দেশকে এরূপ ক্ষতির সম্মুখীন করে দেবে যেটা ২৫ বৎসরেও পূরণ হবে না। এটা সত্য যে কোলকাতার ঘটনার পর কোন মুসলমান আর যৌথ নির্বাচনের কথা বলেনি।

কোলকাতার সর্বদলীয় সম্মেলনে কংগ্রেস মুসলমানদের পূর্বে দেয়া প্রতিশ্রুতি ভঙ্গের কারণ হল পাঞ্জাবের হিন্দু ও শিখদের প্রবল বিরোধিতা। পাঞ্জাবে মুসলিম গরিষ্ঠতার কারণে পৃথক নির্বাচনে তাদের স্বার্থহানির সম্ভাবনার ভয়ে হিন্দু ও শিখ প্রতিনিধিরা জিন্নাহর সংশোধনী প্রস্তাবের যখন

www.amarboi.org

[illegible] বিরোধিতা করল তখন কংগ্রেস নেতৃবৃন্দ মুসলমানদের স্বার্থ বিসর্জন দিয়ে পাঞ্জাবের হিন্দু শিখদের তুষ্ট করার নীতিই শেষ পর্যন্ত মেনে নিল।

নেহরু রিপোর্টের ব্যর্থতা প্রসঙ্গে বলতে গিয়ে তদানীন্তন কংগ্রেস লীগ নেতা এবং পরবর্তীকালে পাকিস্তানের অন্যতম প্রবক্তা খালিকুজ্জামান খাঁন মন্তব্য করেছেনঃ

"হিন্দু নেতৃত্ব তাদের প্রিয় বিষয় যৌথ নির্বাচন প্রবর্তনের সুযোগ হারাল যার প্রতি শ্রীযুক্ত জিন্নাহর নেতৃত্বাধীন মুসলিম লীগ প্রথমে ১৯২৭ সালের ২০ শে মার্চ আনুগত্য প্রকাশ করেছিল ও পরবর্তীকালে কোলকাতায় অনুষ্ঠিত নিখিল ভারত মুসলিম লীগের অধিবেশনেও মেনে নিয়েছিল। ভারতবর্ষের হিন্দু পাঠকরা যেন মুসলমানদের ভারত বিভাজনের জন্য দায়ী করার পূর্বে তাঁদের সেই সময়কার নেতৃবৃন্দের এই বিরাট ভ্রান্তি সম্বন্ধে চিন্তা করেন।

রাজেন্দ্র প্রসাদ এই ঘটনা সম্বন্ধে বলতে গিয়ে মন্তব্য করেছেন,

"এটা স্পষ্ট হয়ে গেল যে, মুসলমানদের সঙ্গে বোঝাপড়া হল না। এর ফলে সম্মেলন শেষ হবার পরই মুসলমানদের এক সর্বদলীয় সম্মেলন হল যাতে অল্পসংখ্যক কংগ্রেসী মুসলমানও যোগ দেন। .... এর পর মুসলমানদের এক প্রভাবশালী দল স্পষ্টতঃ কংগ্রেস থেকে পৃথক হয়ে গেল। এই ভাবে যে সমস্যার সমাধানের জন্য ঐ সম্মেলন তা সফল হবার বদলে আরও জটিল হয়ে উঠল এবং এর কু-পরিণাম পরে দৃষ্টিগোচর হল।"

লীগের বাৎসরিক অধিবেশনও ঐ সময় কোলকাতাতেই অনুষ্ঠিত হচ্ছিল। সর্বদলীয় জাতীয় সম্মেলনে যোগদানকারী মাহমুদাবাদের রাজা, জিন্নাহ, ডাঃ কিচলু, চাগলা, লিয়াকত আলী, খালিকুজ্জামান খান, আকরাম খাঁ প্রমুখ লীগের প্রতিনিধিদের চেষ্টার ফলাফল লীগের কাছে জানাবার কথা ছিল। জাতীয় সম্মেলন থেকে শূন্য হাতে ফিরে এসে পূর্বোক্ত প্রতিনিধিরা ২৯শে ডিসেম্বর সন্ধ্যায় লীগের বিষয় নির্বাচনী সভায় যোগ দিয়ে দেখলেন শর্তসাপেক্ষে নেহরু রিপোর্ট গ্রহণ করা, একেবারেই বাতিল করা এবং দু'চারটি শব্দের সংশোধন করার পর গ্রহণ করা এই তিন মতে বিভক্ত হয়ে বিষয় নির্বাচনী সভা। সদস্যরা দারুণ উত্তেজনার সঙ্গে তর্কবিতর্কে নিমগ্ন। পরদিন ভোর রাত পর্যন্ত কোন সিদ্ধান্তে আসা গেল না। ৩০শে ডিসেম্বর বেলা দশটায় লীগের প্রকাশ্য অধিবেশনে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেয়া হবে স্থির হলেও নেহরু রিপোর্টকে কেন্দ্র করে বাদবিবাদের ফলে এমন হতাশা ও বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি হয়েছিল যে

www.amarboi.org

প্রকাশ্য অধিবেশনে উপস্থিতি অত্যন্ত ক্ষীণ হওয়ায় জিন্নাহ বাৎসরিক অধিবেশন স্থগিত বলে ঘোষণা করলেন।

রতন বাঈ-এর মৃত্যু ও জিন্নাহ

কোলকাতায় সর্বদলীয় সম্মেলনে জিন্নাহর ব্যর্থতার পর পরই তাঁর জীবনে আর একটি সাংঘাতিক দুর্ঘটনা ঘটলো যেটি হলো তাঁর স্ত্রী রতন বাঈ-এর মৃত্যু। দাম্পত্য জীবনে ব্যর্থ হয়ে রতনবাঈ মানসিক হতাশা ও তজ্জনিত বিবিধ রোগে ভুগছিল। জিন্নাহর সঙ্গে সাময়িক ছাড়াছাড়ি, বন্ধুবান্ধবদের সহায়তায় আবার মিলন, আবার ছাড়াছাড়ি, শেষ পর্যন্ত রতির মৃত্যুও জিন্নাহ সাহেবের মনের উপর তার প্রতিক্রিয়া-এই ঘটনাগুলো রাজমোহন গান্ধী তাঁর বইতে অত্যন্ত সুন্দর ভাবে তুলে ধরেছেন যার থেকে বাহ্যতঃ ভাবাবেগ বর্জিত এই মহান রাজনীতিকের মনের আর একটা বিশেষ দিকের পরিচয় পাওয়া যায়। স্নেহ মমতা ভালবাসা অনুভূতি তাঁর মধ্যে ছিল না এমন নয় কিন্তু কর্তব্য ও স্বদেশবাসীর কল্যাণের সঙ্গে জড়িত ক্রিয়া কর্মকে তিনি সব সময় ব্যক্তিগত আনন্দ ও সুখ ভোগের উপর স্থান দিতেন।

রাজমোহন গান্ধী 'মুসলিম মাইন্ড' বইতে কথাগুলো এই ভাবে বলেছেনঃ

The Calcutta disapointment hit Jinnah when another wound was still fresh, the failure of his marriage. Early in 1928 Ruttie had moved from the Mount pleasant Road house to a room in the Tajmahal Hotel. Jinnah told a Parsi friend who tried to reconcile him and Ruttie: "We both need some sort of understanding we can not give." Then Ruttie left for Europe, with her parents. Jinnah followed later, in April 1928. While visiting Ireland he learned that Ruttie was seriously ill in Paris. He went to Paris. Emerging from her hospital room, he told Chaman Lall, who was also in Paris: "I think we can save her. We will change the doctor and take her to another hospital." Chaman Lall has recalled:

"Ruttie Jinnah recovered, and I left Paris soon afterwards, believeing they were reconciled. Some weeks

www.amarboi.org

passed and I was in Paris again. I spent a day with Jinnah, wondering why he was alone. In the evening I said to Jinnah, "Where is Ruttie?" He answered, "we quarrelled: she has gone back to Bombay." He said with such finality that I dared not ask any more questions.

When Jinnah was in Calcutta, urging Congress to accept the Dehli proposals, Ruttie was dangerously ill again, in the Taj room in Bombay. Two months later, her separated husband not in town, the 28-year old Ruttie died. Jinnah came back for the burial in a Muslim cemetery. During the service he talked "of his political worries" with another of his Hindu friend, Kanji Dwarkadas. When, says Dwarkadas, the body was lowered into the grave, Jinnah, 52 at the time, "bowed his head and sobbed."

Then Jinnah recalled his will-power, when an old friend called on him, intending to describe Ruttie's last hours, he saw that Jinnah had ensured that he would not weaken again. "Every photograph, every souvenir of the desperate years was removed." On Jinnah's sleeve was the correct black band of mourning on his face a resolve not to talk about Ruttie. The friend did not refer to her last hours.

Another picture is painted by Muhammad Azad, Jinnah's chauffeur. According to Azad:

You know, servents in a household come to know everything .... Sometimes, more than twelve years after Begum Jinnah's death, the boss would order at dead of night a huge ancient wooden chest to be opened, in which were stored clothes of his dead wife .... He would gaze at them for long .... then his eyes would moisten."

"ওঁার বিবাহিত জীবনের ব্যর্থতার ক্ষত যখন তাঁর মনের মধ্যে রয়েছে দগদগে ঠিক এসময় কোলকাতা ঘটনার ব্যর্থতা সে ঘায়ের উপর নতুন করে আঘাত হানল। '২৮ সালের প্রথমদিকেই রতি জিন্নাহর মাউন্টপ্লিজেন্ট রোডের

www.amarboi.org

বাড়ী ছেড়ে তাজমহল হোটেলের এক কামরায় আশ্রয় নিয়েছিল। জিন্নাহ্ তাঁর এক পার্শী বন্ধুকে বলেছিলেন যিনি জিন্নাহ্ ও রতির মধ্যে সম্প্রীতি স্থাপনের চেষ্টা করেছিলেন "আমাদের দু'জনের মধ্যে কোন এক প্রকার বুঝাপড়া দরকার যা আমরা পারছিনা।" এরপর রতি তার বাবা মায়ের সঙ্গে ইউরোপ চলে গেলেন। জিন্নাহ্ তার পর পরেই ২৮ সালের এপ্রিলে সেখানে গেলেন। আয়ারল্যান্ড ভ্রমণের সময় জিন্নাহ্ জানতে পারলেন যে প্যারিসে রতি খুব অসুস্থ, জিন্নাহ্ প্যারিসে গেলেন। হাসপাতালের কামরা থেকে বেরিয়ে এসে জিন্নাহ বন্ধু চেমন লাল যিনি তখন প্যারিসে ছিলেন বললেন, "আমার মনে হয় আমরা তাকে বাঁচাতে পারি। আমরা ডাক্তার পরিবর্তন করে ওকে অন্য হাসপাতালে নিয়ে যাব।" চেমন লাল পরে বলেছিলেনঃ রতি জিন্নাহ্ সুস্থ্ হলো এবং আমি তার পরে পরেই প্যারিস ত্যাগ করি এই ধারণা নিয়ে যে তাদের মধ্যে মনের মিল হয়ে গেছে। কয়েক সপ্তাহ পরে আমি আবার প্যারিসে এলাম। একটা পুরোদিন আমি জিন্নাহ্র সঙ্গে কাটালাম এবং আমি আশ্চর্য হলাম জিন্নাহ্ একা কেন ? সন্ধ্যার সময় আমি জিন্নাহ্কে জিজ্ঞাসা করলাম রতি কোথায়? তিনি উত্তর দিলেন " আমরা ঝগড়া করেছিলাম সে বোম্বেতে ফিরে গেছে।" তিনি এমনই নিঃসংশয়ে কথাগুলো উচ্চারণ করলেন যে আমি আর তাঁকে কোন প্রশ্ন করতে সাহস করলাম না।

জিন্নাহ যখন কোলকাতায় কংগ্রেসকে দিল্লী প্রস্তাব গ্রহণ করার জন্য অনুরোধ জানাচ্ছিলেন তখন রতি আবার মারাত্মকভাবে অসুস্থ্ হয়ে পড়েছিল বোম্বের তাজমহল হোটেলের কামরায়। দু'মাস পরে তার বিচ্ছিন্ন স্বামী যখন শহরে ছিল না এসময় ২৮ বৎসর বয়স্কা রতি প্রাণ ত্যাগ করলো। জিন্নাহ্ একটি মুসলিম কবরস্থানে স্ত্রীকে কবর দেয়ার জন্য ফিরে এলেন। কবরস্থ্ করার অনুষ্ঠান যখন চলছিল তখন জিন্নাহ্ কাঞ্জি দ্বারকা দাস নামে তাঁর এক বন্ধুর সঙ্গে নিজের রাজনৈতিক দুশ্চিন্তার বিষয় নিয়ে আলাপ করছিলেন। দ্বারকা দাস বলেন, যখন রতির মৃত দেহ কবরে নামান হল তখন ৫২ বৎসর বয়স্ক জিন্নাহ্ মস্তক অবনত করে নীরবে অশ্রুবর্ষণ করছিলেন।

তারপরই জিন্নাহ্ পুরোপুরিভাবে মনোবল ফিরিয়ে আনলেন। রতির শেষ মুহূর্তগুলো কি ভাবে কেটেছে এর বিবরণ দেয়ার জন্য জনৈক বন্ধু জিন্নাহ্র সমীপে গিয়ে দেখলেন যে তিনি আর নিজেকে কোনভাবে দুর্বল করবেন না ঠিক করে ফেলেছেন। কষ্টকর ঐ কয় বৎসরের নিদর্শন হিসাবে প্রত্যেক ছবি, প্রত্যেক স্যুভিনর সবকিছু সরিয়ে ফেলা হয়েছে। সার্টের হাতায় যদিও সঠিক

www.amarboi.org

শোক চিহ্ন প্রকাশ পাচ্ছিল তথাপি মুখের উপরে রতির সম্বন্ধে কোন প্রকার আলোচনা না করার দৃঢ় সংকল্পের চিহ্ন সুস্পষ্ট ভাবে দেখা যাচ্ছিল। বন্ধুটি রতির শেষ মুহূর্তগুলোর বিবরণ দিতে আর আগ্রহ করলনা।

জিন্নাহর ড্রাইভার আজাদের কাছ থেকে আর একটি ঘটনা জানা যায়, যা খুবই মর্মান্তিক এবং জিন্নাহর চরিত্রের এক বিশেষ দিকে আলোকপাত করে। আজাদ বলে, "আপনারা জানেন, বাসার চাকরদের অনেক কিছুই জানার সুযোগ ঘটে। বেগম জিন্নাহর মৃত্যুর বার বৎসর পর মাঝে মাঝে মনিব গভীর রাতে একটি পুরান কাঠের সিন্দুক খুলতে বলতেন যাতে তাঁর মৃত স্ত্রীর কাপড়চোপড় রক্ষিত ছিল। অনেকক্ষণ ধরে তিনি সেগুলোর দিকে তাকিয়ে থাকতেন। পরে তাঁর চোখ সজল হয়ে উঠতো।"

ইতিপূর্বে আমরা উল্লেখ করেছি যে নেহেরু রিপোর্টের সমর্থন ও বিরোধিতায় মুসলিম লীগ তখন পর্যুদস্ত। স্যার শফী ও জিন্নাহ বিরোধী অন্যান্য মুসলিম নেতা দিল্লীতে সর্বদলীয় মুসলিম সম্মেলন আহবান করেও মুসলমানদের মধ্যে বিশেষ উৎসাহ সৃষ্টি করতে সক্ষম হয়নি। ফলে শফী লীগের অনেকে আবার জিন্নাহ লীগে ফিরে আসে। এভাবে লীগের বিভিন্ন [illegible] জিন্নাহর সভাপতিত্বে একটি সভা করে মুসলিম দাবি সম্পর্কে একটি খসড়া প্রস্তাব তৈরি করে লীগের আগামী অধিবেশনে পেশ করার জন্য জিন্নাহকে দায়িত্ব দিলেন।

জিন্নাহর ঐতিহাসিক চৌদ্দ দফা

এদিকে মার্চ ১৯২৯ সালের দিল্লীতে লীগের ঐ প্রকাশ্য অধিবেশন আহূত হয়েছিল। নানা পন্থী বিরোধের এই মানসিক অবস্থার মধ্যে মুসলিম রাজনীতির বিদ্যমান বিভিন্ন গোষ্ঠীর সঙ্গে আলোচনা করে এত অল্প সময়ের মধ্যে সর্বজন গ্রাহ্য একটা কর্মসূচী উদ্ভাবন করা একটা অসাধ্য সাধন ও কৃতিত্বের ব্যাপার ছিল। কিন্তু অসাধারণ প্রতিভা ও মনোবলের অধিকারী জিন্নাহর পক্ষে তা সম্ভব হয়েছিল। ভবিষ্যত সংবিধান রচনা প্রসঙ্গে মুসলিম স্বার্থ রক্ষা কল্পে জিন্নাহর বিখ্যাত চৌদ্দ দফা নামে একটি প্রস্তাব লীগের ঐ অধিবেশনে উপস্থাপিত হলো দফাগুলো ছিল নিম্নরূপঃ

১. ভবিষ্যৎ সংবিধান ফেডারেল ধরনের হবে এবং বাদবাকী(Residual) ক্ষমতা প্রদেশগুলোর হাতে থাকবে। সংবিধানে নির্দেশিতব্য কয়েকটি সাধারণ স্বার্থসংশ্লিষ্ট ব্যাপারের উপরই মাত্র কেন্দ্রীয় সরকারের নিয়ন্ত্রণ থাকবে।

www.amarboi.org

২. সকল প্রদেশকে একই ধরনের স্বায়ত্তশাসনের অধিকার দেয়া হবে।

৩. দেশের যাবতীয় আইন সভা এবং নির্বাচিত প্রতিষ্ঠানসমূহকে এই জাতীয় এক সুনির্দিষ্ট নীতির আধারে পুনর্গঠিত করতে হবে যাতে প্রতিটি প্রদেশের সংখ্যালঘুরা যথেষ্ট ও কার্যকরী প্রতিনিধিত্ব পান অথচ কোন প্রদেশের সংখ্যাগুরু যেন সংখ্যালঘু অথবা এমনকি সম-মর্যাদা সম্পন্ন গোষ্ঠিতে পরিণত না হয়।

৪. কেন্দ্রীয় আইন সভায় মুসলমানদের প্রতিনিধিত্ব মোট সদস্য সংখ্যার এক-তৃতীয়াংশের কম হবে না।

৫. সাম্প্রদায়িক গোষ্ঠিগুলোর প্রতিনিধিত্ব বর্তমানের মতই পৃথক নির্বাচন-ব্যবস্থার মাধ্যমে হতে থাকবে তবে যে কোন সম্প্রদায়ের যে কোন সময়ে পৃথক নির্বাচনের ব্যবস্থার বদলে যৌথ নির্বাচন ব্যবস্থা গ্রহণ করার অধিকার থাকবে।

৬. ভবিষ্যতে প্রদেশগুলোর সীমার কোনরকম পরিবর্তন করার প্রয়োজন দেখা দিলে তা এমনভাবে করা হবে যাতে পাঞ্জাব, বঙ্গ ও উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশের মুসলমান সংখ্যাগরিষ্ঠতা ব্যাহত না হয়।

৭. সকল সম্প্রদায়কে পরিপূর্ণ ধর্মীয় স্বাধীনতার অর্থাৎ ধর্মীয় বিশ্বাস, উপাসনা, আচার-অনুষ্ঠান পালন, প্রচার, সভা-সম্মেলন ও শিক্ষার নিশ্চয়তা দিতে হবে।

৮. কোন আইন সভা বা নির্বাচিত প্রতিষ্ঠানের সংশ্লিষ্ট সম্প্রদায়ের মোট সদস্যদের তিন-চতুর্থাংশ যদি এই কারণে কোন বিল, প্রস্তাব বা তার অংশ বিশেষের বিরোধিতা করেন যে তা সংশ্লিষ্ট সম্প্রদায়ের স্বার্থের প্রতিকূল, তাহলে তা স্বীকৃত হবে না। এ সম্বন্ধে নিশ্চয়তা দেবার জন্য অবশ্য আবার কোন কার্যকরী উপযুক্ত বিকল্প ব্যবস্থার উদ্ভাবন করা যেতে পারে।

৯. সিন্ধুকে বোম্বাই প্রেসিডেন্সী থেকে পৃথক করা হবে।

১০. উত্তর-পশ্চিম সীমান্তপ্রদেশ ও বেলুচিস্তানে অন্যান্য প্রদেশের মত শাসন সংস্কার প্রবর্তন করতে হবে।

www.amarboi.org

১১. যাবতীয় সরকারী এবং স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানের চাকরিতে অন্যান্য ভারতবাসীর সঙ্গে সঙ্গে মুসলমানদেরও উপযুক্ত অংশ দেবার নির্দেশ সংবিধানে রাখতে হবে, অবশ্য এ ক্ষেত্রে তাদের কাজের যোগ্যতার প্রতিও উপযুক্ত দৃষ্টি রাখতে হবে।

১২. মুসলিম ধর্ম, সংস্কৃতি ও ব্যক্তিগত (Personal) আইন সংরক্ষণের জন্য সংবিধানে ব্যবস্থা থাকবে। এছাড়া মুসলিম শিক্ষা ব্যবস্থা, ভাষা, ব্যক্তিগত আইন, দাতব্য প্রতিষ্ঠান সমূহের বিকাশের ও উপযুক্ত ব্যবস্থা থাকা চাই এবং ঐ সব প্রতিষ্ঠান সরকার ও স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠান সমূহ থেকে সাহায্যের উপযুক্ত অংশ পাবে।

১৩. কেন্দ্রে অথবা প্রদেশে এমন কোন মন্ত্রীমণ্ডল গঠিত হবে না যার অন্ততঃ এক তৃতীয়াংশ সদস্য মুসলমান নন।

১৪. ভারতীয় ফেডারেশনের সদস্য অঙ্গরাজ্যগুলোর সম্মতি ব্যতিরেকে কেন্দ্রীয় আইন সভা সংবিধানের কোন পরিবর্তন করবেনা।

জিন্নাহর রাজনৈতিক জীবন ও আধুনিক ভারতের ইতিহাসে চৌদ্দ দফার স্থান অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এর প্রধান বৈশিষ্ট্য হল যৌথ নির্বাচন প্রশ্নের চির সমাধি। এর পর জিন্নাহ বা মুসলিম লীগ কখনো যৌথ নির্বাচনের সপক্ষে কোন কথা বলেনি। ১৯২৩ সালে নাগপুর অধিবেশনের শেষে কংগ্রেস ছাড়ার পর অসাম্প্রদায়িক ও জাতীয়তাবাদী জিন্নাহর ভূমিকায় ক্রমশঃ পরিবর্তন দেখা দিতে আরম্ভ করেছিল। ১৯০৬ সাল থেকে কংগ্রেসের প্রথম সারির নেতা হিসাবে সুদীর্ঘ ১৭ বৎসর যাবত হিন্দু-মুসলিম মিলনের জন্য তিনি আপ্রাণ চেষ্টা চালিয়ে গেছেন। তাঁরই চেষ্টায় লীগ কংগ্রেস অনেক কাছাকাছি এসেছিল এবং লক্ষ্ণৌ প্যাক্টের পর থেকে লীগ কংগ্রেসের অধিবেশন একই শহরে একই সময়ে এবং মাঝে মাঝে একই প্যান্ডেলের নিচে বসতে আরম্ভ করলো। এসবই হয়েছিল জিন্নাহর প্রচেষ্টায়। ১৯০৬ সালে মুসলিম লীগের জন্মের পর থেকে তাঁর যে নীতি ছিল ইংরেজদের তোষণ করে মুসলিমদের জন্য কিছুটা রাজনৈতিক সুবিধা আদায় এটা তাঁর মনঃপুত ছিল না। তিনি চাইতেন দেশের স্বাধীনতা অর্জনের জন্য মুসলমানরা আন্দোলনের ভিতর দিয়ে হিন্দুদের পাশাপাশি এগিয়ে যাক এবং তোষণের পরিবর্তে আন্দোলনের ভিতর দিয়ে তাদের দাবী দাওয়া আদায় করুক। তিনি অন্তরের সঙ্গে বিশ্বাস করতেন যে

www.amarboi.org

হিন্দু-মুসলিম মিলন ব্যতীত দেশের স্বাধীনতা আসবেনা। তাই এই দুই সম্প্রদায়কে কাছাকাছি আনার জন্য ঐ ১৭ বৎসর যাবৎ চেষ্টা করে যাচ্ছিলেন। স্বতন্ত্র নির্বাচন দুই সম্প্রদায়ের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টিতে সহায়তা করে এবং যৌথ নির্বাচনে প্রার্থীকে উভয় সম্প্রদায়ের ভোটারদের আস্থা অর্জন করতে হয়, তাই দুই সম্প্রদায়ের মধ্যে সম্প্রীতি স্থাপনে সাহায্য করে এ বিশ্বাসে তিনি প্রথম থেকেই যৌথ নির্বাচনের পক্ষে ছিলেন। তবে সংখ্যাগুরুরা যে রাজনৈতিক স্বার্থের কারণে অনেক সময় স্বেচ্ছাচারী হয়ে সংখ্যালঘুদের উপর অত্যাচার করার সম্ভাবনা রয়েছে এ সত্য তিনি স্বীকার করতেন বলেই সংবিধানে সংখ্যালঘুদের জন্য বিশেষ রক্ষাকবচের কথা বলতেন। এ রক্ষা কবচ থাকলে সংবিধানে আইনের মারফত স্বীকৃতি পেলে মুসলমান সংখ্যালঘুদের আর ভয় থাকবেনা, তখন তারা নির্ভয়ে হিন্দুদের সঙ্গে পাশাপাশি দাঁড়িয়ে একমঞ্চ থেকে বৃটিশ বিরোধী সংগ্রামে অংশ গ্রহণ করতে দ্বিধা করবেনা এই ছিল তাঁর বিশ্বাস।

জিন্নাহ সাহেবের এই প্রচেষ্টা দু'বার কংগ্রেস নেতাদের স্বীকৃতি পেয়েছিল, একবার ১৯১৬ সালের ডিসেম্বরে লক্ষ্ণৌ প্যাক্টে এবং দ্বিতীয়বার ১৯২৭ সালের মার্চে দিল্লীর প্রস্তাব গ্রহণের মাধ্যমে। মুসলিম সদস্যদের জন্য কেন্দ্রে এক তৃতীয়াংশ সীট ও প্রদেশগুলোতে মুসলিম স্বার্থ রক্ষার জন্য বিশেষ রক্ষাকবচের প্রয়োজনীয়তা স্বীকার করে কংগ্রেস লীগের প্রস্তাব অনুমোদন করে। জিন্নাহর এ প্রচেষ্টা ও সাফল্যের জন্য সরোজিনী নাইডু তাঁকে বহুবার হিন্দু-মুসলিম মিলনের অগ্রদূত বলে অভিহিত করেন যদিও এ অভিধা প্রথম এসেছিল বিশিষ্ট দেশ প্রেমিক, অসাম্প্রদায়িক কংগ্রেস নেতা গোপালকৃষ্ণ গোখলের কাছ থেকে। দুঃখের বিষয় মুসলিম লীগের দাবী কংগ্রেস প্রথমে মেনে নিলেও পরবর্তীতে তা নাকচ করে দেয়। এ ঘটনা শেষবার ঘটলো নেহরু রিপোর্ট গ্রহণের ভিতর দিয়ে। ঘটনা পরম্পরায় কংগ্রেস নেতাদের আন্তরিকতা ও সততায় জিন্নাহর মনে ঘোরতর সন্দেহ দেখা দিল। তাঁর দৃঢ় ধারণা জন্মাল যে কংগ্রেস হিন্দু প্রভাবিত প্রতিষ্ঠান এবং মুসলমানদের ন্যায্য দাবী তারা কোনদিনই মানবেনা। তাই নিজেদের দাবী আদায়ের জন্য মুসলমানদেরকে মুসলিম লীগের পতাকাতলে একতাবদ্ধ করে প্রতিষ্ঠানকে শক্তিশালী করতে তিনি দৃঢ় প্রতিজ্ঞ হলেন। এই উপলব্ধি থেকেই এক কালের জাতীয়তাবাদী হিন্দু-মুসলিম নেতা জিন্নাহ এখন থেকে শুধুমাত্র মুসলমানদের নেতা হিসাবে আবির্ভূত হতে মানসিক প্রস্তুতি নিলেন।

www.amarboi.org

জিন্নাহর চৌদ্দ দফাকে খুঁটিয়ে দেখলে দেখা যাবে এতে অন্যায় দাবী কোনটাই ছিলনা। তৎকালে ভারতের লোকসংখ্যার এক তৃতীয়াংশ ছিল মুসলমান, তাই দাবীগুলোতে সর্বত্র যে কথা বলা হয়েছিল সেটা ছিল জন সংখ্যানুসারে তাদের চাকরি-বাকরি দেয়ার নির্দেশ সংবিধানে থাকবে, মুসলিম সংখ্যালঘু প্রদেশগুলোতে একতৃতীয়াংশ মুসলমান সদস্য নিতে হবে। কংগ্রেস নেতাদের বৃটিশ গণতন্ত্রের ধারণা অনুযায়ী-সব কিছুই সিম্পল মেজরিটি বা সাধারণ সংখ্যাগরিষ্ঠ ভোটে সিদ্ধান্ত নেয়ার দাবী যে ভারতের দুই বৃহৎ সম্প্রদায়ের রাজনৈতিক, সামাজিক ও অর্থনৈতিক অবস্থার প্রেক্ষিতে বাস্তবধর্মী নয় এ সত্যটি কংগ্রেস নেতারা উপলব্ধি করতে চাইতেন না। তারা বরাবরই সিম্পল মেজরিটিতে সিদ্ধান্তের পক্ষপাতি ছিলেন। কিন্তু মুসলমানেরা যেহেতু স্থায়ী-সংখ্যালগিষ্ঠ এবং সর্বভারতীয় ক্ষেত্রে কোন কালেই সংখ্যাগরিষ্ঠ হওয়ার কোন সম্ভাবনা নেই তাই তাদের ভয় ছিল ঐ পদ্ধতিতে সিদ্ধান্ত নিতে গেলে তাদের স্বার্থ ও অধিকার সব সময় ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার সম্ভাবনা থাকবে। তাই চৌদ্দ দফার আট নম্বর দফায় এ রক্ষাকবচের দাবী করা হয়েছে যে মুসলমানদের ধর্মীয় বা স্বার্থসংশ্লিষ্ট কোন আইন পাশের জন্য মুসলমান সদস্যদের দুই-তৃতীয়াংশের সম্মতির প্রয়োজন হবে। জিন্নাহর এই চৌদ্দ দফা অত্যন্ত ন্যায্য ও বাস্তব সম্মত ছিল যেটা মেনে নিলে পরবর্তীকালে লাহোর প্রস্তাবও আর আসতনা, দেশ বিভাগেরও প্রয়োজন হত না। ১৯২৯ সালের ২৮শে মার্চ দিল্লীতে লীগের প্রকাশ্য অধিবেশনে ভবিষ্যত সংবিধান রচনার ব্যাপারে মুসলিম স্বার্থ রক্ষাকল্পে জিন্নাহর বিখ্যাত চৌদ্দদফা অনুমোদিত হয়। এখানে উল্লেখযোগ্য যে পরবর্তীতে ম্যাকডোনাল্ড সাম্প্রদায়িক রোয়েদাদে চৌদ্দ দফার দাবীগুলোর অনেকগুলো স্বীকৃতি লাভ করেছিল।

যা'হোক ১৯২৯ সালের মার্চে লীগের দিল্লী অধিবেশনে চৌদ্দ দফা পাশের পরও বিচ্ছিন্নভাবে এখানে ওখানে হিন্দু-মুসলিম সমস্যা নিয়ে আলোচনা ও মিটমাটের চেষ্টা চলতে থাকে। ১৯২৯ সালের জুলাই মাসে জাতীয়তাবাদী মুসলিম নেতৃবৃন্দ এলাহাবাদে একত্র হয়ে মুসলিম ন্যাশনালিস্ট পার্টি গঠন করেন যার সভাপতি ছিলেন ডাঃ আনসারী এবং সেক্রেটারী ছিলেন চৌধুরী খালিকুজ্জামান, কিন্তু দুঃখের বিষয় জন্মের পর পরই প্রতিষ্ঠানটির অপমৃত্যু ঘটে। এর পর বোম্বেতে সরোজিনী নাইডুর উদ্যোগে আলী ভ্রাতৃদ্বয়ের সঙ্গে গান্ধীর এক বৈঠক হয় কিন্তু তাও ফলপ্রসূ হয়নি।

www.amarboi.org

ইতিমধ্যে চাগলাও কংগ্রেস সভাপতি মোতিলাল নেহরুর সঙ্গে দেখা করার প্রস্তাব দিয়ে জিন্নাহকে এক পত্র দেন যার উত্তরে জিন্নাহ লেখেন,-

"আমার আশঙ্কা হিন্দু-মুসলমান সমস্যা নামে পরিচিত প্রশ্নটির সমাধান ততদিন পর্যন্ত সম্ভবপর হবে না, যতদিন না আমরা সবাই যারা ভারতবর্ষের স্বাধীনতার জন্য কাজ করছি তাঁরা এই কথা উপলব্ধি করি যে এটি এক জাতীয় সমস্যা এবং নিছক সাম্প্রদায়িক বিবাদ নয়। সংখ্যাগরিষ্ঠ সম্প্রদায় ও নেতারা যতক্ষণ পর্যন্ত না এই মোদ্দাকথাটা বুঝতে পারছেন এবং এই দৃষ্টিকোণ থেকে ব্যাপারটি সমাধানের জন্য ব্রতী হচ্ছেন ততদিন সংখ্যালঘু সম্প্রদায়কে কোন জাতীয় কর্মসূচীর সঙ্গে যুক্ত করা সম্ভবপর হবে না।"

উপরোক্ত চিঠিতে হিন্দু মুসলিম সমস্যার প্রকৃত রূপটি হিন্দু নেতারা বুঝতে পারছেন না বলে জিন্নাহ অভিযোগ করেছেন। এটা সাম্প্রদায়িক সমস্যার মত সামান্য ব্যাপার নয়, এটা জাতীয় সমস্যার মত গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার এবং এর সমাধান ব্যতীত হিন্দু-মুসলিম সমস্যার সমাধান কখনো হবে না। এ ব্যাপারে জিন্নাহর দৃঢ় প্রত্যয় আমরা জানতে পারি। জিন্নাহর মনোভাবের ক্রম পরিবর্তনের কারণও আমরা এর থেকে বুঝতে পারি।

এর মধ্যে সাইমন কমিশনের কাজ শেষ হওয়ার পর পরই বিলাতে সরকারের পরিবর্তন ঘটে। টোরি দলের স্থানে শ্রমিকদলের র‍্যামজেম্যাকডোনাল্ড ইংল্যান্ডের প্রধানমন্ত্রী হয়ে শাসন সংস্কারের ব্যাপারে আলোচনার জন্য ভাইসরয় লর্ড আরউইনকে ডেকে পাঠান। দীর্ঘ আলোচনার পর আরউইন ভারতে ফিরে এসে ঘোষণা করেন যে সাইমন কমিশনের প্রতিবেদন নিয়ে আলাপ-আলোচনার জন্য বৃটিশ সরকার দেশীয় রাজ্যের প্রতিনিধিসহ ভারতীয় নেতাদের নিয়ে লন্ডনে এক গোলটেবিল বৈঠক আহবান করতে মনস্থ করেছে। বড় লাটের ঘোষণা পত্রে ভারতকে ঔপনিবেশিক স্বায়ত্তশাসনের মর্যাদা দেয়াই যে বৃটিশ সরকারের লক্ষ্য একথা অনেক স্থানে বলা হয়েছিল। কংগ্রেস, লীগ ও অন্যান্য লিবারেল নেতারা এ ঘোষণাকে স্বাগত জানালো।

প্রথম ও দ্বিতীয় গোলটেবিল বৈঠক

কংগ্রেস কিন্তু শেষ পর্যন্ত গোলটেবিল বৈঠকে যোগ দিল না। গান্ধী, মালব্য, সাপ্রু প্রভৃতি বললেন গোলটেবিল বৈঠকে বসার শর্ত ঔপনিবেশিক স্বায়ত্তশাসন আলোচনার ভিত্তি হবে এটা বৃটিশ সরকারকে পূর্বাহ্নে প্রতিশ্রুতি

www.amarboi.org

দিতে হবে। কিন্তু ভারত সরকার পূর্বাহ্নে এরূপ কোন প্রতিশ্রুতি দিতে অক্ষমতা জানালেন। ফলে লর্ড আরউইনের সঙ্গে কংগ্রেস নেতাদের আলোচনা ভেঙ্গে গেল এবং তারা গোলটেবিল বৈঠক বর্জনের সিদ্ধান্ত নিলেন। এর পর পরই কংগ্রেস সুভাষ বোস, জওহরলাল প্রমুখ তরুণ জঙ্গী নেতাদের চাপে ঔপনিবেশিক স্বায়ত্তশাসনের বদলে পূর্ণ স্বাধীনতার দাবী উথাপন করল। নেহরু রিপোর্ট যেটা স্বায়ত্তশাসনের পটভূমিকায় রচিত হয়েছিল সেটা কয়েকদিন পরেই লাহোরে রাবীর জলে বিসর্জন দেয়ার সিদ্ধান্ত নেয়া হল। স্বাধীনতাকে লক্ষ্য হিসাবে প্রাপ্তির জন্য কংগ্রেস সদস্য ও কর্মীরা আইন সভার সদস্যপদ বর্জন করে আইন অমান্য, কর দেয়া বন্ধ করা প্রভৃতি অহিংস আন্দোলন আরম্ভ করার সিদ্ধান্ত নিল।

কংগ্রেসের আইন সভা বর্জন ও আইন অমান্যের সিদ্ধান্তে ভারতবর্ষের মুসলমানদের মধ্যে মিশ্র প্রতিক্রিয়া দেখা দিল। খালিকুজ্জামান, ডাঃ আনসারী প্রমুখ যারা তখন পর্যন্ত কংগ্রেস ও লীগ উভয় প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন তারা কংগ্রেস অধিবেশন থেকে ফেরার পথে প্রস্তাবিত আন্দোলন থেকে দূরে থাকার সিদ্ধান্ত নিলেন। মুসলমানরা এ আন্দোলনকে হিন্দু-মুসলমানের মিলিত লড়াই মনে না করে হিন্দুদের একার সংগ্রাম বলে বিবেচনা করতে লাগল।

মওলানা মোহাম্মদ আলীও এই আইন অমান্য আন্দোলন থেকে মুসলমানদেরকে দূরে সরে থাকার পরামর্শ দিয়ে বললেন শ্রীযুক্ত গান্ধী সাম্প্রদায়িকতাবাদী হিন্দু মহাসভা পন্থীদের দ্বারা প্রভাবিত হয়েছেন। স্বাধীনতা মানে তৃতীয় পক্ষ বৃটিশ শক্তির অপসারণ। তাদের মধ্যস্থতা ছাড়া বিবাদমান গোষ্ঠিগুলো নিজেদের চেষ্টায় একটা আপস রফায় আসতে পারবে কিনা সে বিষয়ে মুসলিম নেতৃবৃন্দের যথেষ্ট সন্দেহ ছিল। মুসলমানদের অধিকার সংরক্ষণের উপযুক্ত ব্যবস্থা না করে বৃটিশ স্বাধীনতা দিয়ে দিলে সংখ্যাগরিষ্ঠ হিন্দুদের হাতে ক্ষমতা চলে গেলে মুসলমানরা দারুণ বিপর্যয়ের সম্মুখীন হবে। এই আশঙ্কায় মুসলমানেরা বৃটিশের উপস্থিতির সমর্থক এবং একই কারণে সাময়িকভাবে স্বাধীনতার বিরোধী হয়ে উঠল।

লিবারেল ও সাংবিধানিষ্ট জিন্নাহ কংগ্রেসের এ আন্দোলনকে ভাল চোখে দেখল না। আলাপ আলোচনার মাধ্যমে শাসন সংস্কারের দিকে অগ্রসর হওয়ার উদ্যোগ নেয়ার জন্য গত কয়েক মাস যাবৎ যে পরিশ্রম তিনি করছিলেন তা

www.amarboi.org

ব্যর্থ হওয়ায় একে তিনি তাঁর ব্যক্তিগত পরাজয় বলে মনে করলেন। কংগ্রেসের স্বাধীনতার প্রস্তাবকে তিনি 'রাজনৈতিক হিস্ট্রিরিয়া' আখ্যা দিয়ে তীব্রভাবে গান্ধীর সমালোচনা করলেন। গান্ধীর অসহযোগ আন্দোলনকে নিষ্ঠাবান অনেক কংগ্রেসী নেতা ও কর্মী বিশেষভাবে সীমান্ত প্রদেশে খান আবদুল গফুর খান ও তদীয় ভ্রাতা ডাঃ খান সাহেবের নেতৃত্বে অনেক মুসলমান নেতা যোগ দিলেও সত্যিকারভাবে বলতে গেলে শিক্ষিত মুসলমান ও মুসলিম সম্প্রদায়ের সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশ এ আন্দোলন থেকে দূরে সরে রইল।

অতঃপর ১২ই নভেম্বর লন্ডনে প্রথম গোলটেবিল বৈঠক আহূত হয়ে '৩১শে জানুয়ারীতে শেষ হল। কংগ্রেস এতে যোগ না দেয়াতে ১০ সপ্তাহ ধরে আলাপ চলার পর কোন সিদ্ধান্ত ছাড়াই সম্মেলন শেষ হল। বৃটিশ ভারত থেকে বড়লাট কর্তৃক মনোনীত ৫৮ জন প্রতিনিধির মাঝে জিন্নাহও ছিলেন। মনোনীত জমিদার গোষ্ঠি, শিল্পপতি, ব্যবসায়ী, সাম্প্রদায়িক নেতৃবৃন্দ এবং লিবারেলদের মধ্যে সপরু, জয়াকর, শ্রীনিবাস শাস্ত্রী ছাড়াও আগা খাঁন, স্যার শফী, আলী ভ্রাতৃদ্বয়, ডাক্তার আম্বেদকর ও ডাঃ মুঞ্জে প্রভৃতি প্রতিনিধি দলে ছিলেন। এছাড়া দেশীয় রাজন্যবর্গের ১৬জন এবং ইংল্যান্ডের রাজনৈতিক দলসমূহের ১৩ জন প্রতিনিধিও বৈঠকে অংশগ্রহণ করেন।

বৈঠকের সাধারণ সভায় ঔপনিবেশিক স্বায়ত্তশাসনের স্বপক্ষে বলা ছাড়াও জিন্নাহ বৃটিশ ও ভারত সরকারের ক্রুটি বিচ্যুতির কথা তুলে ধরার সঙ্গে সঙ্গে বৈঠককে সফল করার জন্য প্রয়োজনীয় সহযোগিতা দানের প্রতিশ্রুতি দিলেন। অনেক আলাপ-আলোচনা সত্ত্বেও বৈঠকে নিশ্চিত কোন সিদ্ধান্ত নেয়া সম্ভব হলো না। সম্ভবতঃ কংগ্রেসের মত জন সমর্থনপুষ্ট রাজনৈতিক দল অংশগ্রহণ না করায় বৃটিশ সরকার কোন সিদ্ধান্ত নিতে সাহস করলনা। সম্মেলনের সমাপ্তি ঘোষণা করে প্রধানমন্ত্রী ম্যাকডোনাল্ড ভবিষ্যৎ সংবিধান সম্পর্কে এক ভাসা ভাসা বিবৃতি দিলেনঃ যার পরিশিষ্ট ছিল "যারা বর্তমানে আইন অমান্য আন্দোলনে ব্যাপৃত তাদের কাছ থেকে যদি ইতিমধ্যে বড়লাটের আবেদনে সাড়া আসে তাহলে তাদের সাহায্য নেয়ারও ব্যবস্থা করা হবে। এর সূত্র ধরে বড়লাট ১৯১৩ সালের ২৬শে জানুয়ারী এক বিবৃতি দিয়ে গান্ধীসহ আইন অমান্য আন্দোলনে গ্রেফতারকৃত নেতাদের নিঃশর্তে মুক্তি দিয়ে কংগ্রেসের উপর থেকে নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার করে নিয়ে ঐ প্রতিষ্ঠানের নেতাদের বৃটিশ

www.amarboi.org

সরকারের প্রস্তাব বিবেচনার জন্য অনুরোধ জানালেন। অতঃপর গান্ধী-আরউইন চুক্তি সম্পাদিত হলো এবং মার্চের করাচী কংগ্রেসে স্থির হল গান্ধী কংগ্রেসের একক প্রতিনিধি হিসাবে দ্বিতীয় গোলটেবিল বৈঠকে যোগদান করবেন। জাতীয়তাবাদী মুসলমানদের তরফ থেকে ডাঃ আনসারীকে প্রতিনিধি হিসাবে নেয়ার প্রস্তাব বৃটিশ সরকার প্রত্যাখ্যান করলো। ১৪ই সেপ্টেম্বর গান্ধী দ্বিতীয় গোলটেবিল বৈঠকে যোগ দিলেন।

জিন্নাহ্ কিন্তু গোলটেবিল বৈঠক সমাপ্ত হওয়ার পর ভারতে প্রত্যাবর্তন করেননি। মনে মনে ইংল্যান্ডে স্থায়ীভাবে থাকার মনোভাব নিয়ে সেবার তিনি বিলাত গিয়েছিলেন এবং বৈঠক সমাপ্ত হওয়ার পর তার জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছিলেন শফী লীগের সঙ্গে অভ্যন্তরীণ বিবাদ মিটে গেলেও স্বদেশের রাজনৈতিক পরিস্থিতি তাঁর কাছে শ্বাসরুদ্ধকর মনে হচ্ছিল। একই কারণে গোলটেবিল বৈঠকেও তিনি নিঃসঙ্গবোধ করছিলেন এবং মুসলমান সদস্যদের সঙ্গে অনেক সময় একমত হতে পারছিলেন না। প্রথম গোলটেবিল বৈঠক সম্পর্কে জিন্নাহর ভূমিকা সম্পর্কে বলতে গিয়ে বিখ্যাত কংগ্রেস নেতা রাম গোপাল বলেছেন, "মুসলমান প্রতিনিধিদের যৌথ নির্বাচনের ভিত্তিতে একটা বোঝাপড়ায় উপনীত হওয়ার জন্য আলোচনা করতে প্রস্তুত ছিলেন। প্রথম গোলটেবিল বৈঠকের ব্যর্থতার জন্য ভারতীয় হিন্দু-মুসলিম নেতৃত্বের আচরণের সমালোচনা করে অক্সফোর্ডের জনৈক মুসলিম ছাত্রকে জিন্নাহ্ বলেন, " The Hindus are short-sighted and I think incorrigible. The Muslim camp is full of spineless people who will consult the Deputy Commissioner about what they should do. Where, between these two groups, in any place for a man like me?"

"হিন্দুরা হল স্বল্প দৃষ্টিসম্পন্ন তাই সংশোধনের অতীত। মুসলমানরা হল মেরুদন্ডহীন মানুষ যারা তাদের কি করা উচিত সে সম্পর্কে ডিপুটি কমিশনারের পরামর্শ নেয়। আমার মত লোকের এই দুই দলের মধ্যে স্থান কোথায় ?"

(রাজমোহন গান্ধী ঃ Understanding Muslim Mind page - ১৪১)

রাজমোহন গান্ধী আরও লিখেছেন, জিন্নাহ্ বলেনঃ

" I felt so disappointed that I decided to settle down in London. Not that I did not love India, but I felt so utterly helpless. " A factor behind the feeling of helplessness was

www.amarboi.org

that in 1930, as in 1920, Congress had placed itself in Gandhi's hands.

জিন্নাহর লন্ডনে বসবাসের সিদ্ধান্ত

" আমি এত নিরাশ হয়ে গিয়েছিলাম যে আমি লন্ডনে স্থায়ীভাবে বসবাসের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করি। এ সিদ্ধান্ত নেয়ার কারণ এজন্য নয় যে ভারতবর্ষকে আমি ভালবাসি না, কারণ হলো আমি নিজেকে সম্পূর্ণ অসহায় বোধ করছিলাম।" রাজ মোহন গান্ধীর মতে জিন্নাহর এরূপ অসহায়বোধ করার কারণ সম্ভবতঃ ১৯২০ সনের মত ১৯৩০ সনেও কংগ্রেসকে সম্পূর্ণভাবে গান্ধীর হাতে সমর্পণ। বিলাতে থাকা স্থির করে এ সময় তিনি তাঁর আসামের জনৈক ভক্ত আবদুল মতিন চৌধুরীকে তাঁর সিদ্ধান্তের কথা জানিয়ে লেখেন " .... পরবর্তী দুই তিন বৎসর লন্ডন ভারতের শাসন সংস্কারের নাটকের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ পটভূমি হতে চলেছে।" প্রিভি-কাউন্সিলে আইন ব্যবসা করার পাকা ব্যবস্থা করে স্থায়ীভাবে বসবাসের জন্য জুন মাসে ভগ্নি ফাতিমা ও কন্যা দীনাকে বিলাতে আনার ব্যবস্থা করলেন এবং লন্ডনের ভাড়াটিয়া বাড়ী ছেড়ে দিয়ে হ্যাম্পস্টেডে একটি বাড়ী কিনে নিলেন।

প্রিভি কাউন্সিলে আইন ব্যবসা করার সাথে সাথে জিন্নাহ ভারতের রাজনীতির সঙ্গেও যোগাযোগ রেখেছিলেন। এ সময়ে ভারতের নতুন বড়লাট লর্ড উইলিংডন (যিনি বোম্বের ছোট লাট থাকাকালীন জিন্নাহর সঙ্গে সংঘর্ষ হয়েছিল এবং জিন্নাহ যার নাগরিক সংবর্ধনা পন্ড করে দিয়েছিলেন) পুরাতন বিবাদের কথা ভুলে গিয়ে ২১শে মার্চ লন্ডনে জিন্নাহর বাড়ী গিয়ে তাঁর সঙ্গে দেখা করেন। এ থেকেই জিন্নাহর ব্যক্তিত্ব ও তাঁর প্রভাবের গভীরতা উপলব্ধি করা যায়। জিন্নাহর সংস্পর্শে যারাই এসেছে তারাই তাঁর শক্তিশালী ব্যক্তিত্বে প্রভাবিত হয়েছিল। প্রথম গোলটেবিল বৈঠকের প্রস্তুতি পর্বের সময় বড় লাট লর্ড আরউইন প্রধানমন্ত্রী বল্ডুইনকে জিন্নাহ সম্পর্কে লেখেন " আমি এরূপ তীক্ষ্ণ বুদ্ধি ও স্বাধীন দৃষ্টিভঙ্গির লোক ভারতীয়দের মধ্যে খুবই কম দেখেছি"। এর পূর্বে মন্টেগু যখন ভারতবর্ষে এসে বিভিন্ন নেতৃবৃন্দের সঙ্গে আলাপ আলোচনা করেন তখন তার ডায়েরীতে বিভিন্ন লোক সম্বন্ধে তার মতামত লিপিবদ্ধ করেছিলেন। জিন্নাহ সম্বন্ধে তিনি তার ডায়েরীতে লিখেন "জিন্নাহর আচার-আচরণ ছিল খুবই ভদ্র, তবে খুবই চালাক কিন্তু অত্যন্ত ব্যক্তিত্বসম্পন্ন

www.amarboi.org

ব্যক্তি ও পায়ের নখ থেকে মাথার চুল পর্যন্ত আগাগোড়া যুক্তিবাদী মানুষ।" মন্টেগু আরও বলেছিলেন যে "এটা অতীব দুঃখের বিষয় যে স্বদেশের শাসন ব্যবস্থা পরিচালনার ব্যাপারে এরূপ লোকের কোন সুযোগ নেই।"

পূর্বেই বলা হয়েছে প্রিভি কাউন্সিলে প্র্যাকটিস করার সময় জিন্নাহ্ ভারতীয় রাজনীতির সঙ্গে যোগাযোগ রেখেছিলেন। ১৯৩৬ সনের আগস্ট মাসে একটি মোকদ্দমা উপলক্ষে তিনি ভারতবর্ষে গিয়েছিলেন। সে সময় লক্ষ্ণৌ বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্রদের সামনে বক্তৃতা প্রসঙ্গে গোলটেবিলের ব্যর্থতা ও তাতে অংশগ্রহণকারী হিন্দু নেতাদের আচরণে তাঁর হতাশার কথা তিনি ব্যক্ত করেন। সিমলাতে গিয়ে কেন্দ্রীয় পরিষদের সহকর্মীদের সঙ্গে দেখা করেন। তাঁর অনুপস্থিতিতে দেশের মুসলিম নেতৃত্বে যে শূন্যতার সৃষ্টি হয়েছে তার কথা তাঁর ভূতপূর্ব সহকর্মীরা জানান। ইংল্যান্ডে ফিরে যাওয়ার মুখে বোম্বের মুসলিম স্টুডেন্টস ইউনিয়নের সংবর্ধনার উত্তরে জিন্নাহ্ এক বক্তৃতায় সমগ্র হিন্দু সমাজকে বুদ্ধিহীন আখ্যা দিয়ে ধিকৃত করেন। তিনি বলেন "আমি প্রথমে ভারতীয় তারপর মুসলমান এর সঙ্গে সঙ্গে আমি এ কথা বিশ্বাস করি যে মুসলমানদের স্বার্থ উপেক্ষা করে কোন ভারতবাসী কখনো তার স্বদেশের সেবা করতে পারবেন না। ..... এ কথা আমি প্রকাশ্যে বলেছি। কোন দল বিশেষের প্রতি আমার নজর নেই। জনপ্রিয়তার প্রতি আমার কোন আকাঙ্খাও নেই। খোলাখুলি ভাবে আমি আপনাদের বলছি যে হিন্দুরা মুর্খ তারা যে দৃষ্টিভঙ্গি আজ গ্রহণ করেছে তার পরিপ্রেক্ষিতে বলবো যে তারা একেবারেই মূর্খ। অধিকাংশ হিন্দুরই নিজেদের মস্তিষ্ক ও মনের উপর নিয়ন্ত্রণ নেই– আপনারা এ কথা না জানলেও আমি এ কথা জানি। আমি আপনাদের বলতে পারি যে হিন্দুদের মধ্যে সাহস ও বিশ্বাসের সৃষ্টি না হলে (তারা মুসলমানদের ভয়ে ভীত) এই ভারতবর্ষ কোনদিনই স্বরাজ পাবে না। ব্যাপারটা যৌথ বা পৃথক নির্বাচন ব্যবস্থা অথবা পাঁচ দশটা আসনের নয়। হিন্দুদের প্রয়োজনীয় সাহস নেই এবং হিন্দুরা মুসলমানদের ভয়ে ভীত।" (এম, এইচ, সাঈদ " Sound of Fury, page - 171")।

দ্বিতীয় গোলটেবিল বৈঠকেও জিন্নাহ প্রতিনিধি মনোনীত হয়েছিলেন এবং বিভিন্ন উপ-সমিতিতে আলোচনায় অংশ গ্রহণ করেছিলেন। ফেডারেল সাব কমিটির ১৬ই নভেম্বরের সভায় মন্তব্য করেন " মুসলিম দাবীসমূহ এবং

www.amarboi.org

রক্ষাকবচগুলো সংবিধানের অঙ্গীভূত না হওয়া পর্যন্ত তা আমাদের নিকট গ্রহণীয় হবে না, যতক্ষণ না মুসলমানদের জন্য এমন রক্ষাকবচের ব্যবস্থা করছেন যা তাদের মনে পরিপূর্ণভাবে নিরাপত্তা ও ভারত সরকারের ভবিষ্যত সংবিধান সম্পর্কে বিশ্বাসের ভাব সৃষ্টি করে এবং যতক্ষণ না আপনারা তাদের সহযোগিতা ও স্বেচ্ছামূলক স্বীকৃতি প্রাপ্ত হন, ততক্ষণ আপনারা ভারতের জন্য যে সংবিধানই রচনা করুন না কেন, তা ২৪ ঘন্টার বেশী কাজ করবে না।"

প্রথম গোলটেবিল বৈঠকের ন্যায় দ্বিতীয়টিও ব্যর্থ হল। ব্যর্থ হওয়ার কারণ হল প্রতিনিধিদের পরস্পর বিরোধী ভূমিকা ও দাবীর জন্য এবং সাম্প্রদায়িক প্রতিনিধিত্বের ব্যাপারে সর্বসম্মত সমাধানের কোন সূত্র আবিষ্কারে ব্যর্থতার কারণে। গান্ধী, ডাঃ আনসারী ও মৌলানা আজাদকে দেখিয়ে বললেন কংগ্রেস মানেই ভারত, হিন্দু প্রতিষ্ঠান নয়। জিন্নাহ ও আগা খান তা অস্বীকার করলেন। গান্ধী বললেন "স্বরাজ প্রথমে আসুক, দেখবেন স্বাধীনতার সূর্যের উত্তাপে সাম্প্রদায়িক সমস্যার বরফ পিণ্ড আপনা থেকেই গলে যাবে। বিরুদ্ধ পক্ষ যথা- মুসলমান, দেশীয় রাজন্যবর্গ এবং অনুন্নত সম্প্রদায়ের প্রতিনিধিরা প্রতি উত্তরে বললেন স্বাধীনতার পূর্বে বিভিন্ন সম্প্রদায় ও গোষ্ঠির মধ্যে বোঝা-পড়া হতে হবে নচেৎ স্বরাজ সংখ্যালঘুদের উৎপীড়ন সুনিশ্চিত করবে। ফলে আবার অচল অবস্থার সৃষ্টি হয়ে সম্মেলন ব্যর্থ হল।

দ্বিতীয় গোলটেবিল বৈঠক প্রসঙ্গে খালিকুজ্জামানের জবানীতে জিন্নাহর এক ভূমিকার কথা উল্লেখযোগ্য। রাম গোপালের সমগ্রন্থ ২৩৪ পৃষ্ঠার উদ্ধৃতিতে দেখা যায় খালিকুজ্জামান বলেন দ্বিতীয় গোলটেবিলের প্রাক্কালে ভারতবর্ষ সফরকালে ৮ই আগস্ট ১৯৩১ সালে এলাহাবাদের সংযুক্ত প্রদেশ মুসলিম সম্মেলনে জিন্নাহ তাঁর ভাষণে বলেন, "আমার মতে সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন হল হিন্দু-মুসলিম সমঝোতার সমস্যা। এ সম্বন্ধে আমি কেবল এটুকুই বলতে পারি যে আমার আন্তরিক বিশ্বাস - এই যে হিন্দুদের পাঞ্জাব ও বঙ্গে মুসলমানদের সংখ্যাগরিষ্ঠতা দেবার প্রস্তাবে সম্মত হওয়া উচিত আর তা যদি তারা দেন তবে অতি অল্প সময়ের মধ্যে একটা বোঝাপড়া হয়ে যেতে পারে বলে আমি বিশ্বাস করি।

" দ্বিতীয় প্রশ্ন হল, পৃথক বনাম যৌথ নির্বাচন ব্যবস্থার। সবাই প্রায় জানেন যে পাঞ্জাব ও বঙ্গে (মুসলমানদের) সংখ্যাগরিষ্ঠতা মেনে নিলে, আমি ব্যক্তিগতভাবে যৌথ নির্বাচন-ব্যবস্থার ভিত্তিতে বোঝাপড়ায় উপনীত হওয়া

www.amarboi.org

পছন্দ করব (করতালি)। তবে আমি একথাও জানি যে মুসলমানদের মধ্যে অনেকে - আমার মনে হয় অধিকাংশই পৃথক নির্বাচন ব্যবস্থার সমর্থক। আমার ভূমিকা হল এই যে, আমি বরং পৃথক নির্বাচন ব্যবস্থার ভিত্তিতেও একটা বোঝা পড়া কাম্য মনে করব। করব এই আশা ও বিশ্বাস নিয়ে যে যখন আমরা নতুন সংবিধানকে রূপ দেব এবং হিন্দু ও মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ই যখন অবিশ্বাস, সন্দেহ ও পারস্পরিক ভীতির প্রভাব মুক্ত হবে এবং যখন তারা তাদের স্বাধীনতা পাবে, আমরা তখন কালোপযোগী মানসিকতার পরিচয় দিতে পারব ও সম্ভবতঃ আমাদের মধ্যে অনেকের ধারণার তুলনায় অনেক তাড়াতাড়ি পৃথক নির্বাচন ব্যবস্থার অবসান হবে।"

খালিকুজ্জামান আরও বলেছেন দ্বিতীয় গোলটেবিল বৈঠকে "মুসলমানরা তাদের তরফ থেকে কংগ্রেসের কথা বলার দাবী খন্ডন করেছিলেন এবং নিজ দাবীতে অটল ছিলেন। এভাবে একটা অচলাবস্থার সৃষ্টি হয়। কিছুদিন পর মিঃ জিন্নাহ্ আমাকে বলেছিলেন যে, একটি পর্যায়ে এমন কি স্যার শফীও যৌথ নির্বাচনের প্রস্তাবে রাজি হয়েছিলেন-যদি অবশ্যই পাঞ্জাব ও বাংলায় মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠতার নিশ্চয়তা থাকে। তিনি জানান যে তিনি স্বয়ং এই প্রস্তাব নিয়ে গান্ধীজীর কাছে গিয়েছিলেন। কিন্তু মালব্যজী এবং অপরাপর হিন্দু ও শিখ প্রতিনিধিদের প্রতিরোধের ফলে গান্ধীজী হিন্দু ও শিখ জনমতের প্রকাশ্য অভিব্যক্তির বিরুদ্ধে যাবার ব্যাপারে তাঁর অক্ষমতার কথা জ্ঞাপন করেন।"

জিন্নাহ্‌র উপরোক্ত বক্তব্যগুলো থেকে দেখা যায় নেহরু রিপোর্ট পড়ে এবং তাঁর চৌদ্দ দফা মুসলিম কর্তৃক গৃহীত হওয়ার পর যৌথ নির্বাচনের আর কোন প্রস্তাবের সম্ভাবনাই যখন ছিল না তখনও ১৯৩১/৩২ সাল পর্যন্তও যখনই সুযোগ এসেছে জিন্নাহ্ যৌথ নির্বাচনের পক্ষে ওকালতি করেছেন। এমনকি পৃথক নির্বাচনের কথা বলতে গিয়েও বলেছেন হিন্দু ভাইরা যদি পরবর্তীতে তাদের ব্যবহার দ্বারা মুসলমানদের মনে এ বিশ্বাস উৎপাদন করতে পারে যে মুসলিম দাবী দাওয়া সম্বন্ধে সম্পূর্ণ তারা সচেতন এবং মুসলমানরা তাদের কাছ থেকে ন্যায্য ব্যবহার পাচ্ছে তখন পৃথক নির্বাচানের দাবী ত্যাগ করে তারা যুক্ত নির্বাচনে ফিরে আসতে দ্বিধা করবেনা। এ থেকে অনুমান করা যায় হিন্দু মুসলিম স্থায়ী বোঝাপড়ার জন্য তাঁর আগ্রহ কত গভীর ছিল। তখন পর্যন্তও দেশ বিভাগের কথা তাঁর চিন্তায় আসে নাই।

www.amarboi.org

কালেভদ্রে কাজ উপলক্ষে ভারতবর্ষে যাওয়া ছাড়া ১৯৩৪ সালের মার্চ পর্যন্ত জিন্নাহ্ বিলাতেই ছিলেন। এই সময় ভারতবর্ষে ফিরে গিয়ে অন্তর্দ্বন্দ্বে ছিন্নভিন্ন মুসলিম লীগের নেতৃত্ব নিজের হাতে নিয়ে এবং তার মাধ্যমে মুসলিম রাজনৈতিক আশা আকাঙ্খার রূপায়ণের জন্য জিন্নাহ্‌র কাছে যে সব নেতা আগ্রহ করতেন তার মধ্যে ছিল সস্ত্রীক লিয়াকত আলী খাঁ এবং আসামের আবদুল মতিন চৌধুরী প্রমুখ। কিন্তু ভারতবর্ষের তদানীন্তন রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে হতাশ ও বীতশ্রদ্ধ জিন্নাহর মনে স্বদেশে প্রত্যাবর্তনের কোন ইচ্ছা জাগেনি। তাঁর ঐ সময়কার মনোভাবের পরিচয় পাওয়া যায় আবদুল মতিন চৌধুরীকে লিখিত কয়েকটি পত্রে। ১৯৩৩ সালের ৩০শে মার্চ তাঁকে লেখেন ঃ

"ওখানে আমি এখন কি যে করতে পারি তা আমি বুঝে উঠতে পারছি না। আপনি অতি সঙ্গত প্রস্তাবই করেছেন- আমার আইন সভায় প্রবেশ করা উচিত। কিন্তু সেখানেও যে খুব একটা কিছু করা যাবে এমন আশা করা যায় কি? এসব প্রশ্নের কারণ আমার মনে এখনও এই ধারণা বিদ্যমান যে ভারতবর্ষে আমার সেবার কোন অবকাশ নেই। তবু আমাকে সখেদে এই কথার পুনরাবৃত্তি করতে হচ্ছে যে হিন্দুরা সঠিক অবস্থা উপলব্ধি না করা পর্যন্ত ভারতবর্ষকে বাঁচাবার জন্য কিছু করার উপায় নেই।" ২৭শে এপ্রিল তাঁকে লেখেন,-

"আমাকে ভারতবর্ষে যেতে বলা হয়েছিল, কিন্তু কি করতে? নির্দিষ্ট কোন কিছু করার প্রস্তাব নেই। এছাড়া ওখানে তেমন কিছু করারও নেই। মত পার্থক্য ও মতভেদ অনেক বেশী গভীর এবং প্রত্যহ এই বিভেদ আরো শোচনীয় রূপ ধারণ করছে। ভারতে জনমত বলে যেটুকু আছে তাও এলোমেলো। এখন বেশ কিছুদিন এ অবস্থার সংশোধন করা যাবে না। ... লোকে বলে না – প্রতিটি দেশ নিজের যোগ্যতা অনুযায়ী সরকার পায়। আমরাও এর ব্যতিক্রম নই।"

১৯৩২ সালের ২রা মার্চ আবদুল মতিন চৌধুরীকে যে "ব্যক্তিগত ও গোপনীয় পত্র" জিন্নাহ লেখেন তাতেও রয়েছে এই মানসিকতার প্রতিচ্ছবি। "মুসলমানদের ঐক্যবদ্ধ হয়ে দাঁড়াতে হবে। ... হাতের তাস কিভাবে খেলতে হয় তা যদি মুসলমান নেতারা জানেন তাহলে নিঃসন্দেহে সম্প্রদায় যা চান তা পাবেন। আর এ চাহিদাও খুব একটা বেশী কিছু নয়। ... কেন্দ্রেও দায়িত্ব নেয়া হবে যদি আমরা যে সব রক্ষাকবচ চাই তা সংবিধানে লিপিবদ্ধ করা

www.amarboi.org

হয়।" ১৯৩২ সালের ১লা ডিসেম্বর আবদুল মতিন চৌধুরীকে যে সংক্ষিপ্ত চিঠিটি লিখেন তার শেষ ছত্রটি পরবর্তীকালে দিব্যদৃষ্টিসম্পন্ন রূপে প্রতিপাদিত হয়, "জনসাধারণই যখন বিভক্ত তখন আর কি আশা করা যেতে পারে ? এ ভারত বর্ষের বিধিলিপি।"

দ্বিতীয় গোলটেবিল থেকে প্রত্যাবর্তন করে গান্ধী জানতে পারলেন যে সরকারী নীতির পরিবর্তন ঘটেছে জওহরলাল, সীমান্ত গান্ধী প্রভৃতি নেতারা আবার গ্রেফতার হয়েছেন। অনতিবিলম্বে গান্ধী আবার বন্দী হলেন। যে সব ভারতীয় নেতা কারাগারের বাইরে ছিলেন তারা দ্বিতীয় গোলটেবিল বৈঠকের ব্যর্থতার পরিপ্রেক্ষিতে ভারতের সাম্প্রদায়িক সমস্যার সমাধানের সূত্র খুঁজে বার করার যে চেষ্টা আরম্ভ করলেন, তার অন্যতম নিদর্শন হল ১৯৩২ সালের আগস্টে মদনমোহন মালব্যের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এলাহাবাদের ঐক্য সম্মেলন। এতে হিন্দু ছাড়াও লীগ পন্থী ও জাতীয়তাবাদী মুসলমান এবং শিখ প্রতিনিধিরা অংশগ্রহণ করেছিলেন। এ সম্বন্ধে খালিকুজ্জামান বলেছেনঃ "ঐক্য সম্মেলন যে প্রশ্নটি নিয়ে সর্বাগ্রে আলোচনা করে তা হল কেন্দ্রীয় সরকারে মুসলমানদের প্রতিনিধিত্ব। হিন্দুরা শতকরা ২৫ ভাগ দিয়ে আরম্ভ করেন এবং শতকরা ৩২ ভাগ মেনে নেবার জন্য পাঁচ দিন সময় নষ্ট করেন। মুসলমানরা তবুও অসন্তুষ্ট ছিলেন। এর পরদিন অর্থাৎ ১৭ই আগস্ট লন্ডন থেকে রয়টার এক তার বার্তায় জানালো যে বাঁটোয়ারা দ্বারা মুসলমানদের কেন্দ্রীয় পরিষদের শতকরা ৩৩.১৩ ভাগ আসন দেয়া হয়েছে এবং বোম্বে থেকে সিন্ধুকে এক পৃথক প্রদেশে পরিণত করার সিদ্ধান্তও গৃহীত হয়েছে। সুতরাং ঐ সম্মেলনের কার্যকারিতা আর রইল না।

ম্যাকডোনাল্ডের ১৭ই আগস্টের ঘোষণায় উপরোল্লিখিত সিদ্ধান্ত ছাড়াও প্রাদেশিক বিধান সভাগুলোতে সংখ্যালঘুদের কিছু বেশী আসন দেওয়া ছাড়া বাংলায় ও পাঞ্জাবে মুসলমানদের জনসংখ্যার চাইতে অনেক কম আসন দেয়া হল। উভয় প্রদেশেই ইংরেজ ও ইঙ্গ ভারতীয়দের অনেক বেশী আসন দেয়া হল। সর্বোপরি নিম্নশ্রেণীর হিন্দুদের আলাদা নির্বাচনের সুযোগ দেয়া হল। জেলখানা থেকে গান্ধী তফসিলী হিন্দুদের স্বতন্ত্র নির্বাচনের খবর জানতে পেরে প্রতিবাদে ২৫শে সেপ্টেম্বর থেকে অনশন ধর্মঘট শুরু করেন। এর ফলে দেশব্যাপী এক প্রচন্ড আলোড়ন সৃষ্টি হয় এবং তফসিলী ভুক্ত জাতিদের জন্য

www.amarboi.org

জনসংখ্যার অনুপাতে অধিক সংরক্ষিত আসনের ব্যবস্থাযুক্ত পুনা চুক্তির ফলে সরকার তাদের পৃথক নির্বাচন ব্যবস্থা প্রত্যাহার করে নেন।

তৃতীয় বা শেষ গোলটেবিল বৈঠকে কংগ্রেসের কোন প্রতিনিধি ছিল না কারণ কংগ্রেস নেতারা তখন কারান্তরালে। জিন্নাহও তৃতীয় গোলটেবিল বৈঠকে নিমন্ত্রিত হননি। সম্ভবতঃ তাঁর পুরান প্রতিদ্বন্দ্বী স্যার ফজলে হাসানের প্রভাবে তাঁকে প্রতিনিধি দল থেকে বাদ দেয়া হয়েছিল। আগা খান, জাফরুল্লাখান, সাপরু, জয়াকর, আম্বেদকর প্রমুখেরা হার্ডিঞ্জ, এটলি ও জেটল্যান্ড প্রভৃতির সঙ্গে সাংবিধানিক প্রশ্ন নিয়ে যেখানে পাঞ্জা লড়ছেন সেখানে জিন্নাহর মত সাংবিধানিক প্রশ্নে অভিজ্ঞ কৌশুলি নেতাকে বাদ দেয়া হল কি ভাবে তা সকলের বুদ্ধির অগম্য। লিনলিথগোর সভাপতিত্বে গঠিত পার্লামেন্টের জয়েন্ট সিলেক্ট কমিটির সামনে সাক্ষ্য দিতেও তাঁকে আহ্বান করা হয়নি। তৃতীয় গোলটেবিল বৈঠকের সিদ্ধান্ত অনুসারে শাসন সংস্কারের আইন রচিত হতে আরও আড়াই বছর সময় লাগল এবং ১৯৩৫ সনের জুন মাসে নতুন ভারত শাসন আইন বিধিবদ্ধ হল।

জিন্নাহর ভারতে প্রত্যাবর্তন

১৯৩৪ সালে এপ্রিল মাসে জিন্নাহ ভারতবর্ষে ফিরে আসেন। তাঁর ফিরে আসার ব্যাপারটা বেশ খানিকটা নাটকীয় যেটা রাজমোহন গান্ধী এভাবে বর্ণনা করেছেন।

" In July 1933 a 37 year-old man, in Europe on his honeymoon, called, with his bride, at the Hampstead house. His name was Liaquat Ali Khan; he would be Pakistan's first Prime Minister. According to Begum Liaqat Ali Khan, her husband "had the belief that Jinnah was the one man who could save the League, and the Muslims." He, and the Begum, pressed Jinnah to return. Jinnah spoke of his "Contentment at Hampstead." Liaqat repeated his convictions. At the end of a long dinner, during which Begum Liaqat Ali felt that " nothing could move" Jinnah from England, Jinnah said, " you go back and survey the

www.amarboi.org

situation. Test the feelings of all parts of the country. If you say, 'come back' I will give up my life here and return."

Liaqat did as he was told. He took soundings. Finally he sent the message, "Return." Jinnah sold the villa, disposed of his furnishings and, Fatima beside him, came back. In the view of some of his Hampstead neighbours, he bore the stamp of a man going on a great mission."

১৯৩৩ সালের জুলাই মাসে ৩৭ বৎসর বয়স্ক এক ভদ্রলোক তাঁর স্ত্রীসহ মধুচন্দ্রিমা উদযাপনের জন্য লন্ডনে এসে হেম্পস্টেডে জিন্নাহ্ সাহেবের বাড়ীতে আসেন। তাঁর নাম লিয়াকত আলী খান, তিনি পাকিস্তানের প্রথম প্রধানমন্ত্রী হন। বেগম লিয়াকতের মতে তাঁর স্বামীর দৃঢ় বিশ্বাস ছিল যে জিন্নাহ্ই একমাত্র ব্যক্তি যিনি লীগ ও মুসলমানদের বাঁচাতে পারে। লিয়াকত ও তাঁর বেগম জিন্নাহ্কে দেশে ফেরার জন্য অনুরোধ জানালেন। জিন্নাহ্ জানালেন তিনি হেম্পস্টেডে বেশ সুখে শান্তিতে আছেন। লিয়াকত তাঁর দৃঢ় বিশ্বাসের পুনরাবৃত্তি করল। একটি সুদীর্ঘ নৈশভোজের শেষে যখন বেগম লিয়াকতের প্রায় ধারণা হচ্ছিল জিন্নাহকে কোন ভাবেই ইংল্যান্ড থেকে টলান যাবে না এমন সময় জিন্নাহ্ বললেন, "তোমরা দেশে ফিরে গিয়ে অবস্থা জরিপ কর। যদি তোমরা বল ফিরে আসুন।" তখন আমি আমার এখানকার জীবনযাত্রা গুটিয়ে দেশে ফিরে যাব।

লিয়াকতকে যা বলা হয়েছিল তিনি তাই করলেন। তিনি চারদিকে খবর নিলেন। শেষ পর্যন্ত তিনি খবর পাঠালেন, 'ফিরে আসুন'। জিন্নাহ্ বাড়ী বিক্রি করে দিলেন, আসবাবপত্র বেচে দিলেন এবং ফাতিমাকে সঙ্গে নিয়ে দেশে ফিরে এলেন। তাঁর কোন কোন প্রতিবেশীর ভাষায় সে সময় তাঁর চেহারা দেখে মনে হচ্ছিল তিনি কোন মহৎ উদ্দেশ্য সাধনের জন্য যাত্রা করছেন।"

১৯৩৪ সালের এপ্রিলে লীগ সর্বসম্মত ভাবে জিন্নাহ্কে লীগের স্থায়ী সভাপতি নিযুক্ত করল। ছয়মাস পরে তিনি আবার বোম্বের আসন থেকে কেন্দ্রীয় পরিষদের মেম্বার হলেন এবং ২২ জন নির্দলীয় সদস্যদের নেতা হলেন যার মধ্যে মুসলমান ছিল ১৮ জন। কংগ্রেস গত তিন বৎসর ধরে অসহযোগ নীতি স্থগিত রেখে আইন সভায় ফিরে এসেছে। গান্ধী সাময়িকভাবে কংগ্রেস মঞ্চ থেকে সরে গেছেন। ভারত সরকারও সরকারী কর্মচারী নমিনেটেড মেম্বার

www.amarboi.org

ও কয়েকজন অনুগতদের নিয়ে ৬০ জন সদস্যের সমর্থনের উপর নির্ভর করতে পারতেন। এই ভারসাম্য যে কোন ইস্যুতে জিন্নাহ্‌কে তার প্রভাব খাটাবার সুবর্ণ সুযোগ এনে দিল। তার দল প্রায় সব সময় বিজয়ীদের পক্ষের দিকে থাকতো। কখনো সরকারী পক্ষে ভোট দিত কংগ্রেসের বিপক্ষে, কখনও কংগ্রেসের পক্ষ হয়ে সরকারী বিলের বিরুদ্ধে ভোট দিত। যদিও ভাইসরয়ের আইন সভার সিদ্ধান্তগুলোকে বাতিল করার ক্ষমতা থাকায় সরকারের আইন প্রণয়নে বিশেষ অসুবিধা হতো না তথাপি জনগণের মনোবল সৃষ্টির পক্ষে এটা মঙ্গলজনক ছিল।

জিন্নাহ্‌ পরিষদে যখন দৃঢ়তার সঙ্গে কাজ করে যাচ্ছিলেন সে সময় তিনি দেশের বিভিন্ন শহরে ঘুরে ঘুরে লীগের সদস্য সংখ্যা বৃদ্ধি করে যাচ্ছিলেন যাতে লীগ তার সম্প্রদায়ের প্রশ্নাতীত কণ্ঠস্বর বলে বিবেচিত হতে পারে। তাঁর প্রতিষ্ঠানের জনপ্রিয়তা ১৯৩৭ সনের নির্বাচনে পরীক্ষিত হয়েছিল। এই নির্বাচন ১৯৩৫ সালের আইন অনুসারে অনুষ্ঠিত হয়েছিল যাতে প্রদেশগুলোর হাতে যথেষ্ট ক্ষমতা দেওয়া হয়েছিল।

জিন্নাহর দেশে ফেরার কিছু পূর্বে মুসলিম লীগের বিবদমান দুই গোষ্ঠির নেতারা (পেশোয়ারের মিঞা আবদুল আজিজ ও খান বাহাদুর হাফিজ হেদায়েত হুসেন) নিজ গোষ্ঠির স্বাতন্ত্র বিলীন করে জিন্নাহর সভাপতিত্বে পুনর্গঠিত লীগের অঙ্গীভূত হয়ে যান। জিন্নাহ্‌ দিল্লীতে ঐক্যবদ্ধ লীগ কাউন্সিলের সভায় সভাপতিত্ব করেন। এবং উপস্থিত সদস্যগণ কর্তৃক বিপুলভাবে সংবর্ধিত হন। সভাশেষে এক সংবাদপত্র প্রতিনিধিকে বিবৃতি প্রসঙ্গে তিনি বলেন “লীগ বেশ স্বাস্থ্য সম্পন্ন ও সুস্থই আছে। আর আমি এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছি যে ভারতের স্বার্থ সাধনের জন্য মুসলমানরা আর সব সম্প্রদায়ের তুলনায় পিছিয়ে থাকবেনা।” পূর্বোক্ত বিবৃতিতে তিনি আরও বলেন “আমরা কি এই শেষ মুহূর্তেও লড়াই শেষ করতে পারিনা এবং প্রত্যাসন্ন বিপদের সামনে কি অতীত বিস্মৃত হওয়া একেবারে অসম্ভব?” দেশবাসীর বিবেকের কাছে পূর্বোক্ত আবেদন জানিয়ে তিনি নিজের বিশ্বাসের পুনরুক্তি করলেন ঃ

“হিন্দু ও মুসলমানদের মধ্যে সম্পূর্ণ সহযোগিতা ও মৈত্রী স্থাপনের চেয়ে আর কোন কিছু আমার কাছে তেমন সুখকর নয়। এবং আমার এই বাসনা পূর্তির ব্যাপারে আমার মনে হয় মুসলমানদের অবিচল সমর্থন রয়েছে। ....

www.amarboi.org

জাতীয় স্বায়ত্তশাসনের দাবী উত্থাপন করার ব্যাপারে মুসলমানরা অন্যান্য সম্প্রদায়ের তুলনায় কোন অংশে পিছিয়ে নেই। সুতরাং মোদ্দা প্রশ্ন হলঃ মুসলমানদের আমরা কি পূর্ণতঃ ভরসা দিতে পারি যে তারা যে সমস্ত রক্ষাকবচের উপর এতটা গুরুত্ব দেন, সেগুলো ভারতবর্ষের সংবিধানে স্থান পাবে ?" (উলপ্যার্ট সমগ্রন্থ ১৩৫ ও ১৩৬ পৃষ্ঠা)

পূর্বোক্ত এই অনুচ্ছেদে সংবাদপত্র প্রতিনিধির কাছে বিবৃতিদান প্রসঙ্গে জিন্নাহ যে আসন্ন বিপদের প্রতি ইঙ্গিত করছিলেন সেটা ছিল নতুন ভারত শাসন আইন প্রণয়নের উদ্দেশ্যে বৃটিশ পার্লামেন্টে যে শ্বেতপত্র বিবেচিত হচ্ছিল তার ধারাগুলি। ঐ ধারাগুলোতে দেখা যায় বৃটিশ সরকারের ভারতীয়দের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তরের তেমন কোন ইচ্ছে নেই। নির্বাচিত প্রতিনিধিরা ছোট লাট বড় লাটের অনুগ্রহে কাজ করবেন। সমস্ত ক্ষমতা বৃটিশ রাজের হাতে ন্যস্ত থাকবে। দেশের যাবতীয় রাজনৈতিক দলসহ লীগ ও জিন্নাহ্ শ্বেতপত্রের এই অগণতান্ত্রিক প্রস্তাবের বিরোধী ছিলেন।

ম্যাকডোনাল্ডের সাম্প্রদায়িক বাটোয়ারা দেশে হিন্দু-মুসলিম বিভেদকে আরও বাড়িয়ে তোলে। কেন্দ্রে মুসলমানদেরকে ৩৩.৫ ভাগ আসন, স্বতন্ত্র নির্বাচনের স্বীকৃতি ও হিন্দু সংখ্যাগরিষ্ঠ প্রদেশে মুসলমান সংখ্যাগরিষ্ঠদের কিছু বেশী আসন দেয়ায় হিন্দুরা এর ঘোরতর সমালোচনা করতে থাকায় মুসলমানরা অধিক সংখ্যায় কংগ্রেস ত্যাগ করে মুসলিম লীগে যোগদান করতে লাগলো। সর্ববৃহৎ রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান কংগ্রেসও নানা স্বার্থের আকর্ষণ-বিকর্ষণে বিব্রত হয়ে জুন মাসে " না গ্রহণ না বর্জ্জন" নীতি গ্রহণ করে।

সাম্প্রদায়িক বিবাদে জিন্নাহর মধ্যস্থতা

১৯৩৬ সালে কেন্দ্রীয় আইন সভার বিভিন্ন বিতর্কে যোগদান করা ছাড়াও লাহোরে শহীদগঞ্জ মসজিদের কর্তৃত্ব নিয়ে মুসলমান ও শিখ সম্প্রদায়ের আন্দোলন যে বিস্ফোরক পর্যায়ে উপনীত হচ্ছিল জিন্নাহর প্রচেষ্টায় তা অনেকটা প্রশমিত হয়। জিন্নাহর জীবনীকার হেক্টর বালিথোর মতে এই উপলক্ষে তিনি সর্বপ্রথম সাধারণ মানুষের ঘনিষ্ট সম্পর্কে আসেন। উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে সম্প্রীতি পুনঃস্থাপনার এই উদ্যোগের এক বক্তৃতায় সম্প্রদায়ের সদস্যদের তিনি আন্দোলনের পথ ছেড়ে সাংবিধানিক পথ ও আইনের সহায়তা গ্রহণ করার পরামর্শ দিয়ে বলেন " অপর এক ভ্রাতৃস্থানীয় সম্প্রদায়ের নিরন্তর বিরোধিতা

www.amarboi.org

করা অথবা তাদের উপর চাপ দেবার কোন প্রশ্ন উঠে না। অতীতে তাঁরা আমাদের বিরুদ্ধে লড়েছেন এবং আমরাও তাদের বিরুদ্ধে লড়াই করেছি। কিন্তু শিখেরা এক মহৎ সম্প্রদায়। তাই তাদের সঙ্গে কোন সম্মানজনক আপস নিষ্পত্তির মত অপর কিছুই আমাকে সন্তুষ্ট করতে পারবেনা এবং এই উদ্দেশ্যে আমরা যে কোন রকমের প্রয়াস করতে প্রস্তুত আছি।"

সাম্প্রদায়িক বিবাদে জিন্নাহর মধ্যস্থতা করার প্রয়াস বহুলাংশে সফল হয় এবং পাঞ্জাবের ছোট লাট তাঁর প্রচেষ্টার প্রকাশ্য প্রশংসা করে বলেন "অবস্থার উন্নতি সাধনে শ্রীযুক্ত জিন্নাহ যে প্রচেষ্টা করেছেন, তার জন্য আমি তাঁর কাছে অতীব কৃতজ্ঞ। তিনি যে কাজ করেছেন এবং এখনও করছেন তার জন্য আমি তাঁকে ভূয়সী প্রশংসা জানাই। শ্রীযুক্ত জিন্নাহ্ তাঁর প্রথম দায়িত্ব সাফল্য সহকারে পালন করেছেন এবং মুসলমানদের আন্দোলনকে একান্তভাবে বৈধানিক এবং আইন নির্ভর পথে নিয়ে এসেছেন। এভাবে তিনি সরকার যে পদক্ষেপ নেবার জন্য সুযোগের অপেক্ষায় ছিল তা সম্ভবপর করে তুলেছেন।

উপরোক্ত ঘটনা থেকে আমরা দেখতে পাই জিন্নাহ শুধু হিন্দু-মুসলমান নয় অন্যান্য সম্প্রদায়ের সঙ্গে সম্প্রীতি রক্ষায় তাঁর কতখানি আগ্রহ ছিল। ন্যায় ও শান্তির জন্য তাঁর কতখানি অদম্য ইচ্ছা ছিল এ তারও পরিচয় বহন করে। এতে আরও প্রমাণ করে যে মানব কল্যাণে প্রয়োজনবোধে সাধারণ মানুষের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ হওয়ার ক্ষমতাও তাঁর ছিল।

এপ্রিলের প্রথম ভাগে জমিয়তে ওলামায়ে হিন্দের সম্মেলনে পুনর্গঠিত লীগের সভাপতি হিসাবে জিন্নাহ্ ১৯৩৭ সালের আসন্ন নির্বাচন পরিপ্রেক্ষিতে এক বক্তৃতায় হিন্দু ও মুসলমানদের পৃথকভাবে সংঘটিত হওয়ার পরামর্শ দেন। কারণঃ একবার সংঘঠিত হলেই তারা পরস্পরকে ভালভাবে বুঝবে এবং সে অবস্থায় আমাদের বোঝাপড়ায় উপনীত হওয়ার জন্য বছরের পর বছর অপেক্ষা করতে হবে না। তিনি আরও বলেছিলেন যে ভারতবর্ষের আট কোটি মুসলমান ভারত মাতার স্বাধীনতার জন্য ইচ্ছুক এবং এমনকি অপর যে কোন সম্প্রদায়ের তুলনায় অধিক পরিমাণে উদ্‌গ্রীব। ... যাবতীয় রাজনৈতিক দলের ইচ্ছার বিরুদ্ধে সরকার যে এসব শাসন সংস্কার চাপিয়ে দিয়েছেন তার কারণ হল ভারতবাসীরা ঐক্যবদ্ধ নয় এবং তারা তাদের ঘরোয়া বিবাদের নিষ্পত্তি করতে পারেনি।

www.amarboi.org

উক্ত বক্তৃতায় আগামী দিনের জলন্ত সমস্যা প্রতিনিধিত্বমূলক শাসন ব্যবস্থা বনাম সংখ্যালঘু স্বার্থ সম্বন্ধে মন্তব্য করতে গিয়ে তিনি বলেন, "প্রতিনিধিত্বমূলক শাসন ব্যবস্থার ... অর্থ হল ... সংখ্যাগুরুদের শাসন এবং তাই স্বভাবতইঃ সংখ্যালঘুদের মনে আশঙ্কা যে সংখ্যাগুরুরা কি করবেন। সংখ্যাগুরুদের পীড়নকারী হবার সম্ভাবনা থাকে। ক্ষমতা ও কর্তৃত্ব মানুষকে মদমত্ত করে তোলে। তাই গণতান্ত্রিক সংবিধান সঙ্গত যে কোন ব্যবস্থায় সংখ্যালঘুদের জন্য রক্ষাকবচের ব্যবস্থা থাকা অপরিহার্য। আমরা কি অগ্রসর হতে মনস্থ করেছি এবং আমাদের চিন্তা-ভাবনাকে ভারতবর্ষের স্বার্থ সংশ্লিষ্ট অপেক্ষাকৃত বৃহৎ সমস্যাবলীর প্রতি নিবদ্ধ করছি ? অন্ততঃ সাময়িক ভাবেও সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ারা সম্পর্কিত বিতর্ক বন্ধ করুন এবং ঈশ্বরের ইচ্ছা হলে আমরা ওর থেকে ভাল আপস নিষ্পত্তি করতে পারব।" গণতন্ত্রে সংখ্যালঘুদের সমস্যা সম্বন্ধে জিন্নাহর এ উক্তিকে যথার্থই গভীর অন্তর্দৃষ্টি সম্পন্ন বলা চলে।

১৯৩৭ সনের নির্বাচনে লীগের অংশগ্রহণের সিদ্ধান্ত

১১ই এপ্রিল বোম্বেতে সৈয়দ ওয়াজির হাসানের সভাপতিত্বে লীগের অধিবেশনে ভারত শাসন আইনের নানা ত্রুটিবিচ্যুতির জন্য নিন্দা করা সত্ত্বেও এর প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসনের অংশের কার্যকারীতা পরখ করে দেখার জন্য প্রাদেশিক আইন সভাসমূহের আসন্ন নির্বাচনে লীগ অংশগ্রহণ করার সিদ্ধান্ত নেয়। জিন্নাহর সভাপতিত্বে ৩৫ জনের একটি পার্লামেন্টারী বোর্ড গঠন করে লীগ নিম্নলিখিত ঘোষণাপত্র রচনা করে। এতে বলা হয় ঃ

"বিভিন্ন বিধান সভায় আমাদের প্রতিনিধিরা যে সব মূলনীতি অবলম্বনে কাজ করবেন তা হল ঃ (১) বর্তমানের প্রাদেশিক এবং প্রস্তাবিত কেন্দ্রীয় সংবিধানের পরিবর্তে অবিলম্বে পূর্ণ স্বায়ত্তশাসন মূলক সংবিধান চাই; (২) ইতিমধ্যে বিভিন্ন বিধান সভায় মুসলিম লীগের সদস্যরা জাতীয় জীবনের বিভিন্ন স্তরের মানুষদের প্রচলিত সংবিধানের মধ্যেই যতটুকু কল্যাণ সাধন করতে পারেন তার উদ্দেশ্যে ঐ সব আইন সভাকে কাজে লাগাবেন। যত দিন পর্যন্ত পৃথক নির্বাচন ব্যবস্থা রয়েছে ততদিন আইন সভাসমূহে মুসলিম দল গঠন করতেই হবে। তবে যে সব দল বা দলসমূহের সঙ্গে লীগের লক্ষ্য ও আদর্শের মোটামুটি সামঞ্জস্য আছে তাদের সঙ্গে অবাধ সহযোগিতা চলবে।" (রাজমোহন সমগ্রন্থ ২৪৪ পৃষ্ঠা)।

www.amarboi.org

লীগের ঐ কেন্দ্রীয় পার্লামেন্টারী বোর্ড আসন্ন নির্বাচনের প্রেক্ষিতে নিম্নলিখিত ১৪ দফা কর্মসূচী গ্রহণ করেঃ

"১. মুসলমানদের ধর্মীয় অধিকারসমূহ রক্ষা করা। একান্তভাবে ধর্মীয় বিষয়সমূহ সম্বন্ধে জমায়েতুল উলেমা-ই-হিন্দ এবং মুজাহিদদের অভিমতের উপর যথোচিত গুরুত্ব দেয়া হবে।

২. যাবতীয় দমনমূলক আইনের প্রত্যাহারের জন্য সর্ব প্রকারের চেষ্টা করা হবে।

৩. যে সব বিধি-বিধান ভারত বর্ষের স্বার্থের প্রতিকূল এবং যা জনসাধারণের মৌলিক স্বাধীনতার পরিপন্থী এবং যার পরিণামে দেশের আর্থিক শোষণ হতে পারে তার বিরোধিতা করা হবে।

৪. প্রাদেশিক ও কেন্দ্রীয় প্রশাসন যন্ত্রের উচ্চ ব্যয় হার হ্রাস করে জাতিগঠন মূলক বিভাগসমূহের জন্য যথেষ্ট অর্থ বরাদ্দ করা হবে।

৫. ভারতীয় সৈন্য বাহিনীর জাতীয়করণ করা ও সামরিক ব্যয় বরাদ্দ হ্রাস করা।

৬. কুটির শিল্পসহ যাবতীয় শিল্পের পৃষ্ঠপোষকতা

৭. দেশের আর্থিক বিকাশের স্বার্থে মুদ্রাব্যবস্থা, বিনিময়ের হারও নির্ধারণ ব্যবস্থার নিয়ন্ত্রণ।

৮. গ্রামীণ জনসাধারণের সামাজিক, শিক্ষাগত ও আর্থিক অবস্থার উন্নয়ন।

৯. কৃষকদের ঋণের বোঝা হ্রাস করার জন্য ব্যবস্থা গ্রহণ।

১০. প্রাথমিক শিক্ষাকে অবৈতনিক ও বাধ্যতামূলক করা হবে।

১১. উর্দু ভাষা ও লিপিকে সংরক্ষণ দান ও তার প্রসার।

১২. মুসলমানদের সাধারণ অবস্থার উন্নয়নের জন্য উপায় উদ্ভাবন।

১৩. বর্তমানের প্রচন্ড কর ভার হ্রাস করার ব্যবস্থা গ্রহণ।

১৪. দেশের সর্বত্র সুস্থ জনমত এবং প্রয়োজনীয় রাজনৈতিক চেতনা গড়ে তোলা।"

(খালিকুজ্জামান সমগ্রন্থ, ৪১৭ পৃষ্ঠা)।

www.amarboi.org

একটু ভালভাবে নজর করলে দেখা যাবে যে বিশেষ করে মুসলমান সম্প্রদায়ের ধর্মের সঙ্গে সম্পর্কিত প্রথম কর্মসূচীটি ছাড়া এতে এমন কোন কর্মসূচী নেই যার সঙ্গে ধর্মনিরপেক্ষ গণতন্ত্রে বিশ্বাসী কোন ভারতবাসীর ভিন্নমত হবার কারণ থাকতে পারে। লীগের নির্বাচন সম্পর্কিত ভূমিকা সম্বন্ধে মন্তব্য করতে গিয়ে রাম গোপাল বলেছেনঃ

"এসময়ে মুসলিম লীগ সাম্প্রদায়িকতার কথা একরকম বলেনই নাই এবং নির্বাচনের কর্মসূচীর ব্যাপারে নিজেকে প্রায় কংগ্রেসের সমপর্যায়ে উন্নীত করে। কংগ্রেস তখন লীগের প্রতি শত্রুভাবাপন্ন ছিল না এবং নির্বাচন যতই এগিয়ে আসতে লাগল লীগের প্রতি কংগ্রেসের দৃষ্টিভঙ্গি আরও অনুকূল হয়ে উঠল। এমন একটা ধারণার সৃষ্টি হতে দেয়া হল যে প্রতিষ্ঠান দুটি পরস্পরের সঙ্গে সংঘর্ষে লিপ্ত হবেনা। সংযুক্ত প্রদেশে কংগ্রেস ও লীগ নির্বাচন প্রচারে পরস্পরকে সাহায্য করবে এমন একটা প্রকাশ্য বোঝাপড়ায় উপনীত হল।"

(রাম গোপাল সমগ্রন্থঃ ২৪২ পৃষ্ঠা)।

লীগের ঐ অধিবেশনে জিন্নাহ বক্তৃতায় বললেন, " হিন্দু ও মুসলমানদের লক্ষ্য বহুলাংশে এক। যে কোন হিন্দু জাতীয়তাবাদীর মত মুসলমানরাও স্বদেশের হিতের প্রতি জাগরুক এবং তার মুক্তির জন্য সংগ্রাম করতে উদগ্রীব।" নতুন আইনে সংখ্যাগরিষ্ঠের শাসননীতির স্বীকৃতি এবং তার পরিপ্রেক্ষিতে সংখ্যালঘুদের জন্য প্রয়োজনীয় রক্ষাকবচের আবশ্যকতার উপর জোর দিয়ে দেশবাসীর কর্তব্য নির্ধারণ প্রসঙ্গে অতঃপর তিনি বলেন, " ... তাঁদের কাছে একমাত্র সংবিধান সম্মত আন্দোলনের পথ খোলা। এর .. অর্থ হল আইন সভায় তাঁরা এমন ভাবে কাজ করবেন যাতে বৃটিশ সরকারকে তাঁদের ইচ্ছার কাছে নতি স্বীকার করতে হয়। কিন্তু .... এ কাজ একা মুসলমানদের পক্ষে করা সম্ভব নয়। দুটি প্রধান সম্প্রদায় পাশাপাশি দাঁড়িয়ে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে কাজ করলেই কেবল এ উদ্দেশ্য সাধন সম্ভবপর।" কিন্তু এ ব্যাপারে " সর্ববৃহৎ প্রতিষ্ঠান" কংগ্রেসের কাছ থেকে আশানুরূপ সাড়া পাওয়া যাচ্ছেনা বলে খেদ প্রকাশ করে জিন্নাহ বলেন, ' আমি সাহস করে বলতে পারি যে মুসলমানদের কাছে আবেদন না করা পর্যন্ত কংগ্রেস যে লক্ষ্যে উপনীত হতে চায় (এবং আমরাও চাই) সেখানে উপনীত হওয়া সম্ভব হবেনা।' ... মুসলমানদের সম্পর্কে, জিন্নাহ বললেন যে শুধু স্ব-সম্প্রদায়ের প্রতিই নয়,

www.amarboi.org

দেশের প্রতিও তাঁদের কর্তব্য রয়েছে। (এম. এইচ. সাঈদ, Sound of fury ১৮৭-৮৮ পৃষ্ঠা)।

লীগের নির্বাচনী ইস্তাহার ও তৎকালীন লীগ নেতাদের মনোভাব সম্বন্ধে প্রখ্যাত বৃটিশ লেখক উলপার্ট বলেন "লীগের নির্বাচনী ইস্তাহারে লক্ষ্ণৌ চুক্তির সময়কার অনুকূল পরিবেশের প্রতি ইঙ্গিত করে বলা হয় যে সেই সময় থেকে মুসলমানরা " ভারত বর্ষের স্বাধীনতা প্রাপ্তির জন্য অপরাপর ভ্রাতৃপ্রতিম সম্প্রদায়ের সঙ্গে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে কাজ করেছে।" আরও বলা হয় যে, "তারা যদি এই দাবী জানিয়ে থাকেন যে সংবিধানের কাঠামোর মধ্যে সংখ্যালঘু হিসাবে তাঁদের অধিকার সম্বন্ধে রক্ষাকবচের ব্যবস্থা থাকুক তাহলে তা সাম্প্রদায়িকতা নয়। বিশ্ব ইতিহাস সম্বন্ধে ওয়াকিবহাল যে কোন ব্যক্তি এ কথা উপলব্ধি করবেন যে, এ এক স্বাভাবিক দাবি এবং এটা সংখ্যালঘুদের স্বেচ্ছা প্রণোদিত ও আন্তরিক সহযোগিতা পাবার জন্য অপরিহার্য। কারণ সংখ্যালঘুদের মধ্যে এই অনুভূতির সৃষ্টি হওয়া দরকার যে পরিপূর্ণ বিশ্বাস ও নিরাপত্তা সহকারে তাঁরা সংখ্যাগুরুদের উপর নির্ভর করতে পারেন।"

নির্বাচনের প্রাক্কালে হিন্দু সম্প্রদায় তথা কংগ্রেস ও হিন্দু মহাসভার নেতাদের সঙ্গে একটা সম্মানজনক বোঝাপড়ায় আসার জন্য জিন্নাহর আগ্রহ কতটুকু ছিল তা 'উলপার্টের' নিম্নোক্ত বক্তব্য থেকে প্রতীয়মান হয়। উলপার্ট বলেন যে "তিনি (জিন্নাহ) এমনকি এতদূর অগ্রসর হয়েছিলেন যে চার দফার এক কর্মসূচী এই আশা নিয়ে রচনা করেছিলেন যে তার দ্বারা জওহরলালের কংগ্রেস, লিবারেলদের এবং সম্ভবতঃ এমনকি (হিন্দু) মহাসভাপন্থীদেরও একটি গোলটেবিল বৈঠকে যোগ দিতে আকৃষ্ট করা সম্ভব হবে এবং সে বৈঠক হবে এবারে ভারতবর্ষের মাটিতে।

১. প্রচলিত ব্যবস্থার পরিবর্তে প্রাপ্তবয়স্কদের ভোটাধিকার ভিত্তিতে এক গণতান্ত্রিক দায়িত্বশীল শাসন ব্যবস্থা।

২. যাবতীয় অতীব দমনমূলক আইন প্রত্যাহার এবং মত প্রকাশ, সংবাদপত্র ও সংগঠনের স্বাধীনতার ব্যবস্থা।

৩. অবিলম্বে কৃষকদের আর্থিক সহায়তা দেয়া; সরকার কর্তৃক শিক্ষিত এবং শিক্ষার সুযোগ বঞ্চিত ব্যক্তিদের জন্য কর্মসংস্থান। দৈনিক কাজের সময় ৮ ঘন্টা করা এবং শ্রমিকদের জন্য ন্যূনতম মজুরী নির্ধারণ।

৪. অবৈতনিক বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা প্রবর্তন।"

www.amarboi.org

জিন্নাহ ঐকান্তিক আগ্রহ নিয়ে উপরোক্ত চার দফা প্রণয়ন করলেও কংগ্রেস ও হিন্দু মহাসভা নেতাদের অনাগ্রহের কারণে উক্ত বৈঠক আর অনুষ্ঠিত হয়নি।

জিন্নাহর প্রাক নির্বাচনী প্রকাশ্য বক্তৃতাতেও কংগ্রেসের সঙ্গে এভাবে মানিয়ে চলার মনোভাব প্রকাশ পায়। "তাঁর বক্তৃতাগুলোর মূল বক্তব্য ছিল- মুসলমানদের আন্দোলন কারো বিরোধী নয়। তাদের আন্দোলন যাবতীয় মুসলিম সম্প্রদায়ের প্রতি মৈত্রীর আহবান এবং যদি তাদের আদর্শ ও উদ্দেশ্যের মোটামুটি মিল দেখা যায় তাহলে লীগ যে কোন গোষ্ঠি বা গোষ্ঠি সমুদয়ের সঙ্গে সহযোগিতা ও মিলেমিশে কাজ করতে ইচ্ছুক। বোম্বেতে তিনি ঘোষণা করলেন যে মুসলিম লীগ ভারতবর্ষের জনসাধারণের জন্য পূর্ণ জাতীয় স্বায়ত্তশাসন চায়। হিন্দু মুসলমান ও অপরাপর সম্প্রদায়ের মধ্যে পারস্পরিক ঐক্য ও সম্মানজনক বোঝাপড়াই হচ্ছে সেই একমাত্র চক্র-নাভি যার উপর নির্ভর করে ৩৮ কোটি ভারতবাসীর জাতীয় স্বায়ত্তশাসনের ভিত্তি রচিত হতে পারে এবং তা চলতেও পারে।" (জে, জে, পাল সমগ্রন্থ-৭২ পৃষ্ঠা।)

জিন্নাহর এই মনোভাবের নিদর্শন হিসাবে তাঁর নিম্নোক্ত বক্তব্যটি বিশেষ ভাবে উল্লেখ যোগ্যঃ "মুসলিম লীগ ও কংগ্রেসের আদর্শের মধ্যে কোন পার্থক্য নেই- উভয়ের আদর্শই হল ভারতবর্ষের পূর্ণ স্বাধীনতা। এমন কোন আত্মমর্যাদাশীল ভারতবাসী থাকতে পারেন না যিনি বিদেশী প্রভুত্ব পছন্দ করেন বা যিনি স্বদেশের জন্য পূর্ণ স্বাধীনতা বা স্বায়ত্তশাসন না চান।"

স্যার বিজয় প্রসাদ সিং রায়, Parliamentary Govt. in India. জে, জে, পালের গ্রন্থে ২২ পৃষ্ঠায় উদ্ধৃত।

নির্বাচনের সময় মুসলিম লীগ প্রার্থীরা যে সব বক্তব্য রাখছিলেন তা প্রায় কংগ্রেসেরই অনুরূপ ছিল। লীগের কর্মসূচীর প্রত্যেকটিই দীর্ঘকাল যাবৎ কংগ্রেসের জাতীয় দাবীর অপরিহার্য অঙ্গ ছিল। যুক্ত প্রদেশের গভর্নর ম্যানকম হেলির সৃষ্ট যুক্ত প্রদেশের এগ্রিকালচারিস্ট পার্টির মত অপেক্ষাকৃত রক্ষণশীল মুসলিম রাজনৈতিক দলগুলোর কাছে ঐ সব কর্মসূচী ছিল অবাঞ্ছনীয়।

প্রায় ছিন্নভিন্ন এবং মৃতপ্রায় মুসলিম লীগের কর্ণধার হয়ে প্রাদেশিক বিধান সভা সমূহের নির্বাচনের পরিপ্রেক্ষিতে জিন্নাহ তাতে নবজীবনের সঞ্চার করে তাকে একটি শক্তিশালী গণ-প্রতিষ্ঠানে পরিণত করেন। তার পূর্বে এই প্রতিষ্ঠানের রূপ কি ছিল চৌধুরী খালিকুজ্জামানের লেখনি থেকে তার একটি সুস্পষ্ট চিত্র পাওয়া যায়। "এই সময় (১৯৩৪ খৃষ্টাব্দ) লীগ একেবারে নিষ্ক্রিয়

www.amarboi.org

হয়ে পড়েছিল। সরকারী খেতাবদারী ভদ্রলোক, নবাব, জমিদার এবং জ্বী-হুজুরেরা লীগে প্রভুত্ব করতেন। তারা সাধারণতঃ সদিচ্ছা পরায়ণ হলেও মুসলমানদের স্বার্থে তারা ততটুকুই অগ্রসর হতে ইচ্ছুক ছিলেন যেটুকুতে সামাজিক ভাবে অথবা সরকারী দরবারে তাদের গায়ে আঁচড় না লাগে। ১৯০৬ খৃস্টাব্দে এর জন্ম লগ্ন থেকে মুসলিম লীগের কার্যকলাপ বরাবরই কোন ঘরের চার দেয়ালের রাজনৈতিক তৎপরতার মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল।" এমনকি এর বাৎসরিক অধিবেশনগুলোও অনুষ্ঠিত হত সুসজ্জিত শামিয়ানার নীচে বা কোন বড় হল ঘরে যেখানে বিশেষ আমন্ত্রণলিপি পাঠিয়ে কিছু সংখ্যক সম্মানীয় অতিথিকে প্রবেশ করতে দেয়া হত। মুসলিম লীগে প্রকাশ্য জনসভার ব্যাপার প্রায় ছিলনা। ১৯০৬ খৃস্টাব্দে ঢাকায় প্রতিষ্ঠার পর থেকে ১৯১০ খৃঃ পর্যন্ত এর কেন্দ্রীয় কার্যালয় ছিল আলীগড়ে এবং লীগ ছিল সেখানকার শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের পুচ্ছস্বরূপ। সে সময়কার লীগকে এক স্বতন্ত্র মুসলিম রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানের আখ্যা দেয়া যায় না কারণ আলীগড় ছিল তখন রাজনীতিসহ মুসলমানদের যাবতীয় কার্যকলাপের কেন্দ্রবিন্দু। প্রধান কার্যালয় লক্ষ্ণৌতে স্থানান্তরিত হওয়ার পর লীগ রাজনৈতিক ব্যাপারে মাথা ঘামানো শুরু করল বটে, তবে বেশ নিরাপদ দূরত্ব বজায় রেখে। সদস্য হওয়ার এবং বার্ষিক চাঁদা থেকে এর আয় এমন হতনা যা দিয়ে এর দপ্তরটুকু চালান যায়- জনসাধারণের মধ্যে কাজ করার মত অর্থতো দূরের কথা। মাহমুদাবাদের রাজা যে বার্ষিক তিন হাজার টাকা অনুদান দিতেন তাতে কোনমতে লীগের খরচ চলত। ঐ ছিল তার স্থায়ী আয়ের প্রধান উৎস।

"খিলাফত আন্দোলনের দিনে এর অস্তিত্ব ছিল শুধু কাগজে কলমে। যেখানে যেখানে খিলাফত সম্মেলন বা কংগ্রেসের অধিবেশন হত মুসলিম লীগও সেখানে মিলিত হত। খিলাফত শেষ হয়ে যাওয়ার পর কয়েকজন নতুন নবাব এই সুলক্ষণ যুক্ত শিশুটির অভিভাবকত্ব গ্রহণ করলেন। কারণ এর মাধ্যমে সম্মান ও খেতাব পাবার বিপুল সুযোগ তাদের হাতে এল। মুসলমান সম্প্রদায়ের রাজনৈতিক দুর্গের এইসব রক্ষা কর্তাদের আত্মত্যাগের নিদর্শন ছিল লীগের বাৎসরিক অধিবেশনে যোগ দেয়া এবং এত কষ্ট করে রেলের প্রথম শ্রেণীর কামরায় সফর করে তাদের শহরে পদার্পণ করে অতিথি হয়ে সুসজ্জিত সর্বসুবিধাযুক্ত গৃহে থেকে অত্যুৎকৃষ্ট খাদ্য সম্ভারে উদর পূর্তির পর তাম্বুল চর্বন করতে করতে সিগারেটের ধূঁয়া ছাড়ার জন্য যে শহরে অধিবেশন হচ্ছে

www.amarboi.org

সেখানকার ঐ জাতীয় সম্মানিত আয়োজকদের মুখে নিজেদের ভূয়সী প্রশংসা শ্রবণ। অধিবেশনের পর তার বিবরণী যথারীতি সংবাদপত্রে পাঠান হত। কিন্তু তার বহু পূর্বেই বৃটিশ কর্মচারীরা তাদের গোপন সূত্র থেকে সবাই কে কি বলেছেন তার পূর্ণাঙ্গ বিবরণ পেয়ে যেতেন। অধিবেশনের সমাপ্তির পরই সে বছরের মত প্রতিষ্ঠানের সব কাজ সমাপ্ত হয়ে যেত এবং ভারত সরকারের মহাফেজখানার বিবরণে লিপিবদ্ধ হওয়া ছাড়া অধিবেশনে কে কি বলেছেন সে সম্বন্ধে কেউ খেয়ালও করতেন না।

মুসলিম লীগরূপী ভগ্নস্তূপের এই মাল-মশলা নিয়ে জিন্নাহ্ এক নতুন ইমারত তৈরী করার কাজ শুরু করলেন। লক্ষ্যঃ প্রাদেশিক আইন সভাসমূহের আগাম নির্বাচনে মুসলমানদের এক শক্তিশালী মিলিত ফ্রন্ট খাড়া করা, যাতে ভবিষ্যৎ শাসন ব্যবস্থায় মুসলমানদের যথাযোগ্য স্থান থাকে এবং তার ফলে যেন মুসলমানরাও পূর্ণ স্বায়ত্তশাসনের লক্ষ্যে উপনীত হতে পারেন। বোম্বের লীগ অধিবেশনেই তাই স্থির হল যে প্রতিষ্ঠানের দৈনন্দিন খরচ চালাবার জন্য ৫ লক্ষ টাকা সংগ্রহ করতে হবে। আলীগড় বিশ্ববিদ্যালয় এবং অন্যান্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠান থেকে লীগের তরুণ স্বেচ্ছাসেবক সংগৃহীত হল।

লিয়াকত আলী খান এবং আবদুল মতিন চৌধুরীর মত তরুণ গুণগ্রাহীরা ইতিপূর্বেই জিন্নাহর শিবিরে ছিলেন। লীগের অধিবেশনের পরই জিন্নাহ ব্যাপকভাবে ভারত ভ্রমণ করে বিভিন্ন প্রদেশে মুসলমান সমাজের সর্বজন মান্য নেতাদের লীগের পতাকাতলে সমবেত করার চেষ্টা করতে লাগলেন। সর্বাগ্রে পৃথক মুসলিম রাষ্ট্রের প্রবক্তা কবি ইকবালকে নিজের সঙ্গী করলেন, যাঁকে তিনি ১৯৩০ খৃষ্টাব্দে এলাহাবাদের লীগ অধিবেশনের সভাপতিত্বে বরণ করেছিলেন। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ করা যেতে পারে যে গোলটেবিল বৈঠকের সময় ইকবালের সঙ্গে এ ব্যাপারে একাধিক পত্র বিনিময় হয়। পরবর্তী কালে জিন্নাহ স্বীকার করেন যে ভারত ব্যবচ্ছেদ যে অপরিহার্য এই বিশ্বাস তাঁর মনে সৃষ্টি করার ব্যাপারে ইকবাল এক নিশ্চিত ভূমিকা পালন করেন।

যাই হোক, পাঞ্জাবের অদ্বিতীয় নেতা স্যার ফজল-ই হাসান জিন্নাহর প্রতি আদৌ প্রসন্ন ছিলেন না বলে জিন্নাহর আহবানে সাড়া দিতে ইতস্তত করছিলেন। কিন্তু তাঁর মৃত্যু জিন্নাহর পথ প্রশস্ত করে দিল। ইকবাল ও রাজা গজনফর আলীসহ পাঞ্জাবের মোট ১১ জন বিশিষ্ট মুসলিম নেতা লীগ পার্লামেন্টারী বোর্ডের সদস্য পদ গ্রহণ করেন। এভাবে বাংলায় ঢাকার নবাব, শহীদ

www.amarboi.org

সোহরাওয়ার্দী, ইস্পাহানী প্রমুখ ৮জন, উত্তর প্রদেশের নবাব ইসমাইল খাঁন, মাহমুদাবাদ ও সলিমপুরের রাজাদ্বয়, শওকত আলী ও খালিকুজ্জামান প্রমুখ ৭ জন এবং মাদ্রাজ, সিন্ধু, বিহার, মধ্যপ্রদেশ, দিল্লী, আসাম ও বোম্বের বহু মুসলমান নেতৃবৃন্দকে তিনি নিজ সহযাত্রী করতে সক্ষম হন। ব্যতিক্রম ছিল উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশের খাঁন ভ্রাতৃদ্বয় এবং মৌলানা আজাদ, রফিক আহমদ কিদওয়াই, আসফ আলী এবং বিহারের ডাঃ মাহমুদ, অধ্যাপক আবদুল বারি প্রমুখের মত কংগ্রেসের প্রথম সারির মুসলিম নেতৃবৃন্দ যাঁরা কোন অবস্থাতেই জিন্নাহর সহযাত্রী হতে প্রস্তুত ছিলেন না। জিন্নাহর এ সময়কার সফরে বাংলার নাজিম উদ্দিন এবং বোম্বের চুন্দ্রীগড় প্রমুখও তাঁর সঙ্গে যোগদান করেন এবং কাল ক্রমে তাঁরা পাকিস্তানের শাসন কার্য নির্বাহের ব্যাপারে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন।

১৯৩৭ সনের সাধারণ নির্বাচনের সময় জিন্নাহ ও জওহরলাল নেহরু দুই প্রতিদ্বন্দ্বী নেতা দু'জন দু'জনকে যে ভাবে বাক্যবাণে বিদ্ধ করছিলেন তা উল্লেখ করার মত। জিন্নাহর প্রতি নেহরুর ছিল দারুণ বিতৃষ্ণা। জিন্নাহ সম্বন্ধে নেহরুর অনিহা এত প্রবল ছিল যে গোলটেবিল বৈঠকে গান্ধীজীকে জিন্নাহর কথা শুনতে হচ্ছে এও তাঁর সহ্য হচ্ছিল না। ১৯৩১ খৃষ্টাব্দের ২৭শে সেপ্টেম্বর গান্ধীকে লিখিত এক পত্রে জিন্নাহ সম্বন্ধে ব্যঙ্গ করে জওহরলাল মন্তব্য করেনঃ "আমার প্রিয় বন্ধু জিন্নাহর চৌদ্দ দফারূপী বিশুদ্ধ আবোল-তাবোল যদি কিছুক্ষণের জন্যও আমাকে শুনতে হত, তাহলে দক্ষিণ সমুদ্রের দ্বীপে পালিয়ে বাঁচার কথা চিন্তা করতে হত- যেখানে হয়ত এমন কিছু মানুষের দেখা পাবার সম্ভাবনা যাঁদের এতটুকু বুদ্ধি বা অজ্ঞতা আছে যে তাঁরা চৌদ্দদফার আলোচনা করেন না।" ১৯৩৫ খৃষ্টাব্দের ভারত শাসন আইনে জিন্নাহর চৌদ্দ দফার অধিকাংশ যখন স্থান পায় তখন জওহরলাল জিন্নাহ সম্বন্ধে নিজের অভিমত পরিবর্তন করেছিলেন কি না, তা জানা নেই। নেহরুর এই অযৌক্তিক মনোভাবের জন্যই হিন্দু মুসলিম মিলন বা মিটমাট শেষ পর্যন্ত সম্ভব হয়ে উঠেনি। তার উন্নাসিকতাই শেষ অবধি জিন্নাহকে আপোষহীন মনোভাব গ্রহণ করে দেশ বিভাগের পরিকল্পনা নিতে বাধ্য করে।

যাইহোক আসন্ন নির্বাচন উপলক্ষে নেহরু জিন্নাহ পরস্পরের প্রতি বিষোধগার করলেও লীগের নির্বাচনী ইশতেহার ও নিজের ব্যক্তিগত ভূমিকা ও বক্তৃতা বিবৃতি ইত্যাদির মাধ্যমে জিন্নাহ সম উদ্দেশ্য সাধনের জন্য কংগ্রেসের

www.amarboi.org

প্রতি যে সহযোগিতার হস্ত প্রসারিত করেছিলেন নেহরু তাকে রুঢ় ভাবে প্রত্যাখ্যান করে কোলকাতায় ১৯৩৬ সনের ৫ই নভেম্বর এক জন সভায় ঘোষণা করেন "যতই উদার চেহারা নিয়ে দেখা দিন না কেন আমরা কোন সাম্প্রদায়িক গোষ্ঠির সঙ্গে হাত মিলাবনা। আক্রমণ প্রতি আক্রমণের এই প্রতিক্রিয়ায় নেহরু যখন বলেনঃ " দেশে মাত্র দু'টো শক্তিই বিদ্যমান- কংগ্রেস ও ভারত সরকার; জিন্নাহ সঙ্গে সঙ্গে প্রতিউত্তর করেন " এ দেশে এক তৃতীয় পক্ষও আছে আর তা হল মুসলমানেরা" এবং সে সঙ্গে তিনি বলেন, আমরা কোন দলের তল্পিবাহক হব না। সমান অংশীদার রূপে আমরা কাজ করতে প্রস্তুত আছি।

সেবছর ১৩ই জানুয়ারী জওহরলাল এক বিবৃতিতে জিন্নাহর মানসিকতাকে মধ্যযুগীয় ও সেকেলে আখ্যা দিয়ে দাবী করেন "মুসলিম লীগের অধিকাংশ সদস্যদের চেয়ে আমি অধিক মাত্রায় মুসলমান জন সাধারণের সম্পর্কে আসি।" জিন্নাহ সঙ্গে সঙ্গে হুঙ্কার দিয়ে বলেন, " জনসাধারণের সমর্থন বিহীন অপর সম্প্রদায়ের জন্য কতক ভাগ্য সন্ধানী এবং সব কিছু বিশ্বাস করতে প্রস্তুত মানুষ নিয়ে অসাম্প্রদায়িকতার তকমা আঁটায় লীগ আস্থা রাখেনা।"

নেহরু-জিন্নাহর বাক যুদ্ধ সম্পর্কে উল্লেখ করতে গিয়ে নেহরুর সমালোচনা করে উলপার্ট লিখেছেন " তাঁর জীবনের এ ছিল এক ভ্রমাত্মক কার্য যা দ্বেষ ও রুঢ়তার দ্বারা চালিত হয়ে তিনি করেছিলেন। ইকবালের চেয়েও নেহরু বেশী করে লীগকে এক নতুন গণমুখী কর্মকৌশল নিতে প্ররোচিত করেন। এর পিছনে ছিল জিন্নাহকে তাঁর বৈঠকখানার রাজনীতি ছেড়ে যে সব লক্ষ লক্ষ মুসলিম জনসাধারণ দিনের অধিকাংশ সময় গ্রামের ক্ষেত খামারে জীবিকা অর্জনের জন্য কাজ করেন তাঁদের কাছে পৌঁছানোর জন্য জিন্নাহকে খোঁচা দেয়া এবং চ্যালেঞ্জ জানানো। ফলে সেই সব জনসাধারণকে আন্দোলিত করে, তাদের জাগরিত করে মুসলিম নেতৃত্বের পিছনে পিছনে তাদেরকে মিছিল করে চলতে জিন্নাহ অনুপ্রাণিত করতে সক্ষম হয়েছিলেন।"

হিন্দু-মুসলিম সমস্যা সমাধানের জন্য ১৯৩৫ খৃস্টাব্দে রাজেন্দ্র প্রসাদ-জিন্নাহ যে আলোচনা অনুষ্ঠিত হয়েছিল তা ব্যর্থ হওয়ার পিছনে একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন ছিল- মুসলমানদের যথার্থ প্রতিনিধিত্বমূলক প্রতিষ্ঠান কোনটি? ফেডারেশন, গভর্নরদের বিশেষ ক্ষমতা, ১৯৩৫ খৃস্টাব্দের ভারত শাসন আইনের সীমাবদ্ধতা ইত্যাদির সঙ্গে সঙ্গে সেই প্রশ্নও ১৯৩৬ খৃস্টাব্দের গোড়ার

www.amarboi.org

দিকে অনুষ্ঠিত সাধারণ নির্বাচনে বিশেষ গুরুত্ব পায়। দেখা গেল তাবৎ দুর্বলতা সত্ত্বেও এবং মুসলিম ভোটারদের শতকরা মাত্র ৪.৭ ভাগ পেলেও একমাত্র লীগই সর্বভারতীয় দৃষ্টিতে সঙ্গতভাবে মুসলমানদের প্রতিনিধিত্বের দাবি করতে পারে। কারণ কংগ্রেসের এত ধর্মনিরপেক্ষতার কথা সত্ত্বেও ১৯৩৬ খৃষ্টাব্দে নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটির ১৪৩ জন সদস্যের মধ্যে মাত্র ৬ জন মুসলমান ছিলেন। এদের মধ্যে তিনজন খোদা-ই-খিদমদগার প্রভাবিত সীমান্ত প্রদেশের, একজন বিহার এবং অপরজন উত্তর প্রদেশ থেকে। ষষ্ঠ সদস্য মৌলানা আজাদ ছিলেন ভূতপূর্ব সভাপতিরূপে। কংগ্রেস স্বয়ং নিজের দুর্বলতা সম্বন্ধে সচেতন ছিল। তাই মুসলমানদের জন্য নির্ধারিত প্রাদেশিক আইন সভাসমূহের ৪৮২টি আসনের মধ্যে মাত্র ৫৮টি আসনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। এজন্য উপরের স্তরে জিন্নাহ্ ও জওহরলালের বাক্‌যুদ্ধ সত্ত্বেও উভয় দলের প্রাদেশিক স্তরের নেতারা মনে করতেন যে কংগ্রেস ও লীগের শক্তি মিলিত হলে সরকারী আশীর্বাদপুষ্ট প্রার্থীদের পরাজিত করা সম্ভবপর হতে পারে। নির্বাচনের পরে নির্বাচনের ফলাফল প্রতিটি দলের সামনে আয়নার মত খাড়া হয়ে নিজের সম্বন্ধে নিজ ধারণায় কোথায় কোথায় ত্রুটি ছিল তা স্পষ্ট দেখিয়ে দিল। বাংলা ছাড়া মুসলিম লীগ আর সব মুসলমান সংখ্যাগরিষ্ঠ প্রদেশে পরাজিত হয়েছিল।

নির্বাচনের পরে দেখা গেল হিন্দু সংখ্যাগরিষ্ঠ প্রদেশগুলোতে কংগ্রেস প্রায় ক্ষেত্রে একক সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করেছে এবং যে দু'একটিতে সংখ্যাগরিষ্ঠতা পায়নি সেখানে সর্ববৃহৎ দল হিসাবে আবির্ভূত হয়েছে। লীগ মুসলিম সংখ্যালঘিষ্ঠ প্রদেশগুলোতে খুব ভাল ফল করলেও মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ প্রদেশগুলোতে মোটেই সুবিধা করতে পারেনি। বাংলায় ১১৯টি মুসলিম আসনের মধ্যে লীগ পায় ৪০টি, বাকিগুলোর মধ্যে ৪৪টি পেয়েছিল ফজলুল হক সাহেবের নেতৃত্বাধীন কৃষক প্রজাপার্টি।

পাঞ্জাবে ৮৬টি আসনের মধ্যে লীগ পায় মাত্র ২টি এবং কংগ্রেসও পায় ২টি। বাকিগুলো পায় সেকেন্দার হায়াৎ খানের মুসলিম জমিদার ও হিন্দু জমিদারদের মিলিত প্রতিষ্ঠান ইউনিয়ানিস্ট পার্টি। সিন্ধুতেও মুসলিম লীগ মোটেই সুবিধা করতে পারেনি। সেখানে কংগ্রেসের সমর্থনে কয়েকজন জাতীয়তাবাদী ও স্বতন্ত্র পার্টি প্রায় সবগুলো আসন দখল করে ও পরে কংগ্রেস মনোভাবাপন্ন এক মন্ত্রিপরিষদ গঠিত হয়। উত্তর পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশে

www.amarboi.org

কংগ্রেস মুসলিম আসনে সর্বশ্রেষ্ঠ দল হিসাবে নির্বাচনে বিজয়ী হয়ে কয়েকজন নির্দলীয় পার্টির সহায়তায় সরকার গঠন করে।

যুক্ত প্রদেশে যেটা ছিল লীগের মূল ঘাঁটি বা স্নায়ু কেন্দ্র সেখানে ৬৬টি মুসলিম আসনের মধ্যে লীগ পায় ২৭টি আসন বাকিগুলো নির্দলীয় মুসলিম প্রার্থীরা দখল করে। কংগ্রেস নয়টি মুসলিম আসনের প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে সব গুলোতে পরাজিত হয়। এতে মোটামুটি প্রমাণিত হয় যে লীগ মুসলমানদের সর্ববৃহৎ প্রতিষ্ঠান এবং কংগ্রেস বলতে গেলে মোটের উপর হিন্দুদের প্রতিষ্ঠান। নওয়াব ইসমাইল খান ছিলেন যুক্ত প্রদেশ মুসলিম লীগের প্রেসিডেন্ট এবং চৌধুরী খালিকুজ্জামান ছিলেন সেক্রেটারী। নির্বাচনের কিছুদিন পূর্বে খালিকুজ্জামান কংগ্রেস ত্যাগ করে লীগে যোগ দেন। নির্বাচনের সময় যুক্ত প্রদেশ কংগ্রেসের সভাপতি এবং ভাবী প্রধানমন্ত্রী গোবিন্দ বল্লভ পন্থের সঙ্গে ব্যক্তিগতভাবে ও প্রাদেশিক কংগ্রেস নেতৃবৃন্দের সঙ্গে লীগের যে বুঝাপড়া ও অলিখিত চুক্তি হয় তাতে লীগ নেতারা স্বভাবতঃই আশা করেছিলেন যে, নির্বাচনের পর কংগ্রেস লীগের সঙ্গে কোয়ালিশন মন্ত্রিসভা গঠন করবে।

কংগ্রেস কর্তৃক কোয়ালিশন সরকার গঠনের ওয়াদা খেলাপ

ছোট লাটরা তাদের বিশেষ ক্ষমতা প্রয়োগ করে নির্বাচিত মন্ত্রীদের গণতান্ত্রিক অধিকার খর্ব করবেন না এই প্রতিশ্রুতির দাবীতে এবং বন্দী মুক্তি প্রশ্নে কংগ্রেস পাঁচটি প্রদেশে একক সংখ্যা গরিষ্ঠতা লাভ করলেও মন্ত্রিমন্ডল গঠন করতে বিলম্ব করছিল। এ সময়ে লীগ মন্ত্রিপরিষদে তাদের সদস্য নেয়া সম্বন্ধে আলাপ করে তেমন অনুকূল সাড়া পেল না। নির্বাচনের পরে মন্ত্রিমন্ডল গঠনের সময় পর্যন্ত কংগ্রেসের প্রতি শুভেচ্ছার নিদর্শন হিসাবে লীগ দুটি গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত নিল যেটা লীগ-কংগ্রেস অলিখিত চুক্তির বাস্তবায়নের পক্ষে লীগ নেতৃবৃন্দের আন্তরিকতার পরিচয় বহন করে। প্রথমটি হল কংগ্রেস মন্ত্রিত্ব গ্রহণে বিলম্ব করায় যুক্ত প্রদেশে ছতরির নবাবের নেতৃত্বে যে অস্থায়ী সরকার গঠিত হয়েছিল তাতে আমন্ত্রণ জানান সত্ত্বেও লীগ যোগ দেয়নি। দ্বিতীয়টি হল মুসলিম লীগ থেকে নির্বাচিত জনৈক সদস্যের মৃত্যুতে ইতিমধ্যে যে একটি আসন খালি হয়েছিল তা কংগ্রেসের একজন প্রভাবশালী জাতীয়তাবাদী নেতা রাফি আহমদ কিদওয়াই এর অনুকূলে লীগের ছেড়ে দেয়া। এ'দুটি কাজ লীগের আপাতঃ স্বার্থবিরোধী হলেও কংগ্রেসের সঙ্গে মিলিতভাবে কাজ করার জন্য

www.amarboi.org

অনুকূল আবহাওয়া সৃষ্টি করতে সহায়ক হবে মনে করে খালিকুজ্জামান এ দু'টি পদক্ষেপ নিতে দ্বিধা করেননি। এতদব্যতীত কংগ্রেস মন্ত্রিত্ব গ্রহণ না করায় ছোটলাটের আদেশে ছতরির নবাবের নেতৃত্বে যে অস্থায়ী মন্ত্রিসভা গঠিত হয়েছিল তাতে যোগ দেয়ার অপরাধে লীগ নেতা সালেমপুরের রাজা সাহেবকে প্রতিষ্ঠান থেকে বহিষ্কৃত করা হয়। লীগের পক্ষ থেকে এত কিছু করার পরও কংগ্রেসের তরফ থেকে কোন সাড়া এলোনা। পরে কংগ্রেস যখন মন্ত্রিমন্ডল গঠন করার সিদ্ধান্ত নিল তখন খালিকুজ্জামান নিজের নাম ছাড়াও নবাব ইসমাইল খানের নাম মন্ত্রিত্বের জন্য প্রস্তাব করেন। জিন্নাহ্ সাহেব কংগ্রেসের সঙ্গে কোয়ালিশনের বা যুক্ত ফ্রন্টের প্রস্তাব দেন। এ সম্পর্কে আলোচনার জন্য মাওলানা আজাদ জওহ্রলালের কাছে গেলে তিনি জানালেন যে লীগ থেকে তারা দু'জনকে মন্ত্রী হিসাবে নিতে পারেন তবে তাদেরকে মুসলিম লীগের সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করে আসতে হবে। দ্বিতীয়তঃ মুসলিম লীগের সঙ্গে বোর্ডের অবলুপ্তি করতে হবে এবং উপনির্বাচনে কোন প্রার্থী দিতে পারবেনা। খালিকুজ্জামানের পক্ষে এ দু'টি শর্ত মেনে নেয়া আত্মহত্যারই সমতুল্য ছিল বলে আলোচনা ভেঙ্গে গেল।

এছাড়া বোম্বেতে প্রায় অনুরূপ ব্যাপার ঘটল। বোম্বে প্রাদেশিক কংগ্রেসের সভাপতি ও সম্ভাব্য প্রধানমন্ত্রী বি, জি, খেরের মারফত জিন্নাহ্ গান্ধীর কাছে সহযোগিতার প্রস্তাব দেন এবং ক্ষমতায় মুসলমানদের অংশীদার করার অনুরোধ জানান। দুর্ভাগ্যক্রমে সেখানেও প্যাটেলের জন্য জিন্নাহ্র অনুরোধ রক্ষা হলো না। প্যাটেল অভিমত প্রকাশ করলেন যে মন্ত্রিত্ব পেতে হলে লীগকে কংগ্রেসের মধ্যে মিশে যেতে হবে। জিন্নাহ্ বললেন দু'টি স্বতন্ত্র দলের মধ্যে কোয়ালিশন, কিন্তু কংগ্রেস দাবী করল আত্মবিলুপ্তি। তাই বোম্বে ও যুক্ত প্রদেশ কোথাও বুঝাপড়া হলো না। আলোচনা ভেঙ্গে গেল।

যা'হোক যুক্ত প্রদেশ, বোম্বেসহ আরও পাঁচটি হিন্দু সংখ্যাগুরু প্রদেশে লীগকে বাদ দিয়েই মন্ত্রিমন্ডল গঠিত হলো। হিন্দুরা বলল স্বরাজ প্রতিষ্ঠা হতে যাচ্ছে। মুসলমানরা বলতে লাগলো হিন্দুরাজ প্রতিষ্ঠিত হয়েছে যার অধীনে মুসলমানদের ন্যায্য অধিকার, শিক্ষা সংস্কৃতি, ধর্ম সবই বিপন্ন হবে।

বহু জননেতা, শিক্ষিত ও চিন্তাশীল ব্যক্তির মতে ১৯৩৭ সনে মুসলমানদের সঙ্গে ক্ষমতা ভাগাভাগির ব্যাপারে কংগ্রেসের ব্যর্থতা সমগ্র মুসলিম সমাজকে পাকিস্তান মুখী করে দিয়েছিল। গান্ধীর জীবনীকার ও

www.amarboi.org

সেক্রেটারী প্যায়ারী লালের মতে মুসলমানদের বাদ দেয়ার সিদ্ধান্ত একটি প্রথম শ্রেণীর কৌশলগত ভুল হয়েছিল এবং কংগ্রেস হাইকম্যান্ড এ সিদ্ধান্ত নিয়েছিল গান্ধীর সুচিন্তিত মতের বিরুদ্ধে।

রাজ মোহন গান্ধী তার Understanding the Muslim Mind বইতে এ সম্পর্কে লিখেছেনঃ According to Frank Moraes: "Had the Congress handled the League more tactfully after the (1937) elections, Pakistan might never have come into being." Penderel Moon, a British who served with the I. C. S before and after independence, describes Congress's failure to co-operate with the League in 1937 as " the prime cause of the creation of Pakistan.

ফ্রাঙ্ক মোর্সের মতে "১৯৩৭ সনের নির্বাচনের পরে কংগ্রেস যদি আরও সাবধানতা ও একটু কৌশল ও বুদ্ধিমত্তার সঙ্গে লীগের সঙ্গে আলোচনা করে একটা সিদ্ধান্তে আসতে পারতো তবে পাকিস্তান আন্দোলনের জন্মই হতো না। পেন্ডরাল মুন একজন ইংরেজ যিনি স্বাধীনতার পূর্বে ও পরে আই, সি, এস, দের সঙ্গে কাজ করেছিলেন, তাঁর মতে ১৯৩৭ সালে লীগের সঙ্গে সহযোগিতা করতে ব্যর্থতাই হলো পাকিস্তান সৃষ্টির প্রধান কারণ।

রাজমোহন গান্ধী আরও বলেছেন " We can fairly accuse the Congress of 1937 of being stingy and haughty. It could have openly invited the League as partner and disproved allegations that it sought Hindu rule." ....Though Gandhi's " best judgement" was in favour of coalitions with the League, it is note wrothy that he was unresponsive when Jinnah sent that private message to him via Kher.

আমরা ১৯৩৭ সনের কংগ্রেসকে সরাসরি ভাবে হুলবিদ্ধকারী ও উগ্রমস্তিষ্ক হিসাবে দোষারূপ করতে পারি। তারা খোলাখুলি ভাবে লীগকে অংশীদার হিসাবে নিমন্ত্রণ জানিয়ে মুসলমানদের মনে যে ভীতি ছিল আচরণের দ্বারা সে ভীতির অবসান ঘটাতে পারতো।" .... যদিও গান্ধীর সুচিন্তিত অভিমত কোয়ালিশনের পক্ষে ছিল, তথাপি এখানে উল্লেখযোগ্য যে জিন্নাহ যখন খেরের মাধ্যমে তার নিকট বার্তা পাঠিয়েছিলেন তখন তিনি নিরুত্তর ছিলেন।

www.amarboi.org

কেউ কেউ মনে করেন যে জিন্নাহর সঙ্গে একত্রে কাজ করা খুব দুরূহ ব্যাপার হতো। মন্ত্রিমন্ডলীতে মুসলিম লীগ সদস্য নিলে কংগ্রেসকে অনেক ব্যাপারেই জিন্নাহর সম্মতি নিতে হতো, তাতে কাজের ব্যাপারে অনেক অসুবিধা সৃষ্টি হতে পারতো। অংশীদার হিসাবে জিন্নাহ অত্যন্ত ঝুঁকিপূর্ণ অংশীদার হওয়ার সম্ভাবনা ছিল। তথাপি দেশের স্বার্থে এরূপ ঝুঁকি নেয়া খুবই উচিত ছিল বলে অনেকে মনে করেন।

জিন্নাহ্ বা মুসলিম লীগের সঙ্গে ১৯৩৭ সনের নির্বাচনের পর কংগ্রেস একটা চুক্তির মাধ্যমে ক্ষমতা ভাগাভাগি করে কতদিন একত্রে কাজ করতে পারতো বলা কঠিন। বিরুদ্ধ স্বার্থের টানাপোড়েনে ঐ ঐক্য কতদিন টিকে থাকতো তা বলা শক্ত। তবে ক্ষমতা ভাগাভাগির মাধ্যমে কাজ করতে করতে একটা সহমর্মিতা গড়ে উঠতো, পারস্পরিক সন্দেহ-অবিশ্বাস অনেকটা দূর হয়ে কংগ্রেসের প্রতি মুসলমানদের কিছুটা আস্থার সৃষ্টি হতো। রাম রাজত্ব মানে যে ন্যায়ের শাসন, হিন্দু সংখ্যাগরিষ্ঠের যে মুসলিম স্বার্থবিরোধী শাসন নয় এটা মুসলমানদের অনুভব করার সুযোগ হত। পরে এই কোয়ালিশন ভেঙ্গে গেলেও এ ব্যাপারে কার দায়িত্ব কতটুকু ছিল এটা দেশবাসীর কাছে অনেকটা পরিষ্কার হয়ে যেত। জিন্নাহর সঙ্গে একত্রে কাজ করা সম্ভব হত না পূর্ব থেকেই এই ধারণা নিয়ে মুসলিম লীগের সহযোগিতার হস্ত প্রত্যাখ্যান যে সে সময় অত্যন্ত অযৌক্তিক হয়েছিল এ সম্পর্কে বলতে গিয়ে রাজমোহন গান্ধী লিখেছেনঃ

"More generosity or wisdom in Congress might not have produced a pact with Jinnah, but, partially at least, it could have allayed the quam's fears; and it could have enlisted some sections of the League. Though the Unionist Premier of Punjab, Sir, Sikandar Hyat, had a comfortable majority, he offered a ministrial berth to the Hindu Mahasabha; similar gestures from congress to the League in the Hindu-Majority Provinces would have made it more difficult for Jinnah to convince the quam that Congress was its enemy."

"কংগ্রেসের তরফ থেকে আরো কিছুটা ঔদার্য ও প্রজ্ঞা দেখালে হয়তো জিন্নাহর সঙ্গে শেষ পর্যন্ত একটা চুক্তিতে আসা সম্ভব হতো না, কিন্তু এটা

www.amarboi.org

করলে মুসলমানদের ভয় খানিকটা দূরীভূত করতে সাহায্য করতো এবং লীগের কিছু অংশের সমর্থন কংগ্রেস পেয়ে যেত। ইউনিয়নিস্ট পার্টির প্রধানমন্ত্রী সেকেন্দার হায়াত খান যথেষ্ট সংখ্যাগরিষ্ঠতার অধিকারী হয়েও যে ভাবে হিন্দু মহাসভাকে মন্ত্রিসভায় একটি আসন দিয়েছিলেন সেভাবে হিন্দু সংখ্যাগরিষ্ঠ প্রদেশগুলোতে কংগ্রেসের তরফ থেকে মুসলিম লীগের প্রতি সে রকম সম্প্রীতিমূলক মনোভাব দেখালে কংগ্রেস মুসলমানদের শত্রু এটা মুসলমানদের বুঝানো জিন্নাহর পক্ষে কিছুটা শক্ত হতো। মুসলমানদের বাদ দিয়ে প্রদেশগুলোতে ক্ষমতা গ্রহণের ব্যাপারে এইচ. এম. সীরভাই তার পার্টিশন অব ইন্ডিয়া- লিজেন্ড এন্ড রিয়্যালিটি বইয়ের ১৯ পৃষ্ঠায় লিখেছেনঃ Congress Ministries were formed in eight provinces , including Bombay. But this moment of opportunity brought with it the need to make a vital decision. "Should the Congress form coalition Ministries to include Muslim League members? The decision against coalition ministries appeared to be logically and theoratically correct, but there is a broad consensus of well informed opinion that, in practice, the decision proved disastrous.

বোম্বেসহ ৮টি প্রদেশে মন্ত্রিসভা গঠিত হল। কিন্তু ওই মুহূর্তে সুযোগ একটি গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত নেয়ার আবশ্যকতা কে সামনে এনে হাজির করলো; কংগ্রেস কি মুসলিম লীগ সদস্যদের নিয়ে কোয়ালিশন সরকার গঠন করবে? কোয়ালিশনের বিরুদ্ধে সিদ্ধান্ত নেয়াটা যুক্তি ও তর্কের দিক থেকে সঠিক ছিল কিন্তু যাঁরা অভিজ্ঞ এবং সমগ্র ব্যাপারে খবরাখবর রাখতেন তাঁদের অনেকেরই মতে বাস্তব ক্ষেত্রে এই সিদ্ধান্ত নেয়ার পরিণতি শেষ পর্যন্ত মারাত্মক হয়েছিল"।

কে, এল, মুন্সী তাঁর Pilgrimage to Freedom গ্রন্থে বলেন ..."A serious situation arose with regard to the choice of the Muslim member wherever Congress Ministries were formed. At that time it did not appeare to be formidable; but as events were to show 10 years later, it was the begining of the end of united India ...... the situation in the United Provinces and the province of Bombay was

www.amarboi.org

particularly difficult. In the United Provinces, Congress had contested 9 seats out of 66 Muslim seats and lost all; in Bombay it had contested 2 seats out of the 30 and lost both."

"যেখানেই কংগ্রেস মন্ত্রিসভা গঠিত হলো সেখানেই মুসলিম মেম্বার নেয়ার ব্যাপারে একটা মারাত্মক পরিস্থিতির সৃষ্টি হল। তৎকালে এটা তত বিপদজ্জনক মনে হয়নি। কিন্তু ১০ বছর পর ঘটনা প্রবাহে দেখা গেল এটাই ছিল অখন্ড ভারতের বিলুপ্তির প্রারম্ভ। যুক্ত প্রদেশে ও বোম্বেতে বিশেষ করে পরিস্থিতি ছিল অত্যন্ত কঠিন। যুক্ত প্রদেশে কংগ্রেস ৬৬টি মুসলিম আসনের মধ্যে ৯টিতে প্রতদ্বন্দ্বিতা করে সবগুলোতেই হেরেছিল এবং বোম্বেতে ৩০টি আসনের মধ্যে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে ২টিতেই হেরেছিল।"

কোয়ালিশন মন্ত্রিসভা গঠন না করার সিদ্ধান্ত নেয়া সম্পর্কে তাঁর স্বাধীনতা আন্দোলনের অধ্যায়ে তিনি বলেনঃ There is no doubt that the decision of the Congress leaders was extremely unwise and it was bound to have disastrous consequences. The Muslims now fully realised that as a separate community they had no political prospects in future. The Congress ultimatum was the signal for the parting of the ways, which by inevitable stages, led to the foundation of Pakistan. "

"কংগ্রেস নেতাদের সিদ্ধান্ত যে অত্যন্ত অবিজ্ঞচিত হয়েছিল এতে কোন সন্দেহ নেই এবং এর ফল হয়েছিল মারাত্মক। মুসলমানরা এবার পুরোপুরি বুঝতে পারলো যে স্বতন্ত্র সম্প্রদায় হিসেবে তাদের কোন রাজনৈতিক ভবিষ্যত নেই। কংগ্রেসের চরম পত্র দু'সম্প্রদায়ের পথ সম্পূর্ণ আলাদা করে দিল যেটা অনিবার্যভাবে বিভিন্ন স্তরে পাকিস্তানের ভিত্তিস্থাপন করেছিল।

মেনন তাঁর Transfer of Power in India বইতে লিখেছেনঃ "কhe Congress decided to have a homogenous Ministries of its own and chose Muslim Ministers from among those who were members of the Congress party. This was the begining of a serious rift between the Congress and the League. and was a factor which induced neutral Muslims opinion to turn to the support of Jinnah. "

www.amarboi.org

"কংগ্রেস তার একমতের লোক নিয়ে মন্ত্রিসভা গঠনের সিদ্ধান্ত নিয়ে মুসলমানদের মধ্য থেকে যাঁরা কংগ্রেস পার্টির সদস্য তাঁদেরকেই মন্ত্রিসভায় নিল। কংগ্রেস ও লীগের মধ্যে এটা একটা মারাত্মক বিভেদের সৃষ্টি করলো যার ফলে নিরপেক্ষ মুসলমানদের মতামত জিন্নাহ্‌কে সমর্থন করতে প্ররোচিত করে।"

কংগ্রেসের ওয়াদা খেলাপের মারাত্মক পরিণতি

মওলানা আজাদ যিনি ১৯৩৯ সাল থেকে ১৯৪৬ সাল পর্যন্ত কংগ্রেসের সভাপতি ছিলেন তিনি ১৯৩৭ সনের নির্বাচন পরবর্তী মারাত্মক পরিণতি সম্বন্ধে তাঁর আত্মজীবনীতে লিখেছেনঃ

"If the U.P. League's offer of co-operation had been accepted, the Muslim League party would for all practical purposes have merged in the Congress. Jawaharlal's action gave the Muslim League in the U.P. a new lease of life ... it was from the U.P. that the League was reorganised. Mr. Jinnah took full advantage of the situation and started an offensive which ultimately led to partition."

"যদি যুক্তপ্রদেশে লীগের সহযোগিতা প্রস্তাব গৃহীত হত তবে বাস্তবিক পক্ষে লীগ কংগ্রেসের সঙ্গে মিশে যেত। জওহর লালের সিদ্ধান্ত যুক্ত প্রদেশ মুসলিম লীগকে পুনরুজ্জীবন দান করলো। যুক্ত প্রদেশ থেকেই লীগ আবার পুনর্গঠিত হয়েছিল। মিঃ জিন্নাহ্‌ ঘটনার পূর্ণ সুযোগ নিয়ে এমন আক্রমণ আরম্ভ করলেন যা শেষ পর্যন্ত দেশ বিভক্তিতে গিয়ে শেষ হয়েছিল।"

নেহরুর জীবনীকার মিঃ ব্রেচার এ সম্পর্কে লিখেছেনঃ

"The immediate and most far-reaching effect of the congress victory at the polls was a widening of the breach with the Muslim League. Flushed with success the Congress adopted an imperious attitude to all other political parties, a ' Himalayan blunder,' for which it was to pay dearly in the years to come. Nehru himself set the tone with his haughty remark in March 1937: ' There are only

www.amarboi.org

two forces in India today, British imperialism, and Indian Nationalism as represented by the Congress.' Jinnah was quick to retort: 'No', there is a third party, the Mussulmans.' History was to bear him out." The Congress went beyond contemptuous words. During the election campaign the two parties had co-operated to some extent, notably in the United Provinces where there developed a tacit understanding that a coalition government would be formed. However, this was before the election, when the Congress did not expect a clear majority. It was no longer necessary to make concessions. The League offer of co-operation was now treated with disdain. It was not rejected outright, but a series of incredible conditions was laid down by the Congress. ..... "

"নির্বাচনে কংগ্রেসের বিজয়ের তাৎক্ষণিক এবং দীর্ঘস্থায়ী ফল হল লীগের সঙ্গে ব্যবধানের গভীরতা বৃদ্ধি। বিজয়ের সাফল্যে উদ্বেলিত হয়ে কংগ্রেস অন্যান্য রাজনৈতিক দলের প্রতি একটা অশোভনীয় মনোভাব গ্রহণ করলো যেটা হিমালয় সদৃশ ভুল বলা যায়। যার জন্য কংগ্রেসকে পরবর্তীকালে কঠিন মূল্য দিতে হয়েছিল। ১৯৩৭ সনের মার্চে নেহেরু তাঁর উত্তপ্ত মনোভাব এভাবে প্রকাশ করলো "আজকে ভারতবর্ষে মাত্র দু'টিই শক্তি আছে, একটি হলো বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদ আরেকটি হল ভারতীয় জাতীয়তাবাদ যার প্রতিভূ হলো কংগ্রেস।" জিন্নাহ সঙ্গে সঙ্গে প্রত্যুত্তর করলেন "না" সেখানে তৃতীয় আরেকটি শক্তি আছে সেটা হলো মুসলমানরা।" পরবর্তীতে ইতিহাস তাই প্রমাণ করেছিল।

কংগ্রেস ঘৃণাব্যঞ্জক ভাষাও ব্যবহার করেছিল। কংগ্রেস ও লীগ নির্বাচন প্রচারণার সময় দুটো দলই কিছুটা পরিমাণ একে অপরের সঙ্গে সহযোগিতা করেছিল, বিশেষভাবে যুক্ত প্রদেশে যেখানে একটা মোটামুটি বুঝাপড়া হয়ে গিয়েছিল যে, কোয়ালিশন সরকার গঠিত হবে। এটা অবশ্য হয়েছিল নির্বাচনের পূর্বে যখন কংগ্রেস পরিষ্কার সংখ্যাগরিষ্ঠতা পাবে এটা আশা করেনি। পরবর্তীতে মুসলিম লীগকে সে সুবিধা দেয়ার আর সেই প্রয়োজনীয়তা রইল না। লীগের সহযোগিতার প্রস্তাব এখন ঘৃণার সঙ্গে

www.amarboi.org

বিবেচিত হল। এটা সোজাসুজিভাবে প্রত্যাখ্যাত না হলেও কংগ্রেস কর্তৃক কতকগুলো অবিশ্বাস্য ধরনের শর্ত জুড়ে দেয়া হলো।

সিভারাও '৩৭ সনের নির্বাচন সম্বন্ধে ইঙ্গিত করে বলেন যে, এমনকি সে নির্বাচনের পরেও জিন্নাহ্ পাকিস্তান নামক স্বতন্ত্র রাষ্ট্রের কথা ভাবেননি। ......

"In a public statement, shortly after the elections in 1937 he declared, "nobody will welcome on honourable settlement between the Hindus and the Muslims more than I and nobody will be more ready to help it; and he followed it with a public appeal to Gandhi to tackle this question. The latter's response was somewhat depressing: 'I wish I could do something, but I am utterly helpless. My faith in unity is bright as ever; only I see no daylight but impenetrable darkness and in such distress I cry out to God for light."

"১৯৩৭ সনের অল্পদিন পরেই জিন্নাহ্ একটি প্রকাশ্য বিবৃতিতে ঘোষণা করলেন হিন্দু -মুসলমানদের মধ্যে একটা সম্মানজনক মিটমাটকে আমার চাইতে আর কেউ বেশী স্বাগত জানাবে না এবং এটা সম্পন্ন করতে সাহায্য করার ব্যাপারে আমার চাইতে আর কেউ অধিক আগ্রহশীল নয়। এই প্রকাশ্য বিবৃতির সঙ্গে সঙ্গে তিনি গান্ধীকে সমস্যাটি সমাধানের অনুরোধ জানালেন। গান্ধীজীর জবাব খানিকটা নিরুৎসাহব্যঞ্জক। " আমি কিছু করতে পারলে খুশী হতাম। কিন্তু আমি একেবারে অসহায়। হিন্দু-মুসলমান ঐক্যের ব্যাপারে আমি পূর্বের ন্যায়ই আশাবাদী, তবে আমি বর্তমানে কোন আশার আলো দেখছিনা। শুধু দেখছি নিশ্চিদ্র অন্ধকার। এই বিপদের মধ্যে আমি ভগবানের কাছে আলোর জন্য প্রার্থনা করছি।"

ভগবানের কাছে-আলোর জন্য প্রার্থনার জবাব আর এলো না। সিভারাও প্রশ্ন করলেনঃ অতঃপর তিন বছরের মধ্যে ভারতের পরিস্থিতি কিভাবে এরূপ পরিবর্তিত হয়ে গেল যে, পাকিস্তান আন্দোলন এতটা প্রাণবন্ত হয়ে গেল? তাঁর প্রশ্নের উত্তর এভাবে দেয়া যায়ঃ যুক্ত প্রদেশে নির্বাচনে পরিষ্কার সংখ্যা গরিষ্ঠতা পাওয়ার ব্যাপারে পুরোপুরি নিশ্চিত ছিল না বলে কংগ্রেস লীগের সঙ্গে একটা নির্বাচনী বোঝাপড়ায় এসেছিল যেটা পরে যুক্ত প্রদেশের বাইরেও সম্প্রসারিত

www.amarboi.org

করা যেত, যাতে দুটো প্রতিষ্ঠানের মধ্যে একটা সহযোগিতামূলক কার্যকরী কর্মপন্থা গড়ে উঠে। নির্বাচনের পরে লীগের সঙ্গে কোয়ালিশনে অস্বীকৃতি লীগ কংগ্রেসের তরফ থেকে বিশ্বাসঘাতকতা বলে ধরে নেয়। এছাড়া নেহরুর মুসলমানদের কংগ্রেসে আনার (মুসলিম গণসংযোগ) পরিকল্পনা (যেটা মোটেই সাফল্যলাভ করেনি) অবস্থাকে আরো জটিল করে তোলে। যুক্তপ্রদেশের বাইরে বহু মুসলমান মনে করতে লাগলো যে, এতে মুসলিম লীগের অস্তিত্ব বিপন্ন হতে চলেছে, তাই কংগ্রেসের এই মুসলিম গণসংযোগের উত্তরে লীগ এমন কার্যকরী জোরদার পাল্টা আন্দোলন আরম্ভ করলো যে কয়েকটি মুসলিম উপনির্বাচনে কংগ্রেস প্রার্থী পরাজয় বরণ করলো। এই সমস্ত পরাজয় পরিষ্কারভাবে প্রমাণ করলো যে, নেহরু ও তাঁর কংগ্রেস কৌশলগত একটা মারাত্মক ভুল করেছে।

১৯৩৭ সনের এ ঘটনার পর কংগ্রেস ও হিন্দু নেতৃবৃন্দের প্রতি মুসলিম লীগ ও জিন্নাহ্র মনোভাব সম্পূর্ণ বদলে গেল। হিন্দু মুসলিম মিলনের আশাও জিন্নাহ্ চিরতরে ত্যাগ করলেন। তাঁর বদ্ধমূল ধারণা হলো কংগ্রেস বা হিন্দু নেতৃবৃন্দ কোন প্রকারেই মুসলমানদের ন্যায্য দাবী দাওয়া মেনে কোন রকম সম্মানজনক মীমাংসায় আসতে রাজি নয়। তখন থেকে জিন্নাহ্ সাহেবের মনোভাব কঠোর থেকে কঠোরতর হতে লাগলো। মুসলমানদের মনে ধীরে ধীরে এ ধারণা বদ্ধমূল হতে আরম্ভ হলো যে, ভারতে যখন তারা বরাবরের জন্য সংখ্যালঘিষ্ঠ তখন তাদের কোন রাজনৈতিক ভবিষ্যত নেই কোন কালেই তাদের ক্ষমতার অংশীদার হওয়ার কোন সম্ভাবনা নেই। এই অবস্থা থেকে পরিত্রাণের একমাত্র উপায় হলো বিচ্ছিন্ন হয়ে যাওয়া। এর পরই মুসলমানদের মনোজগতে বিচ্ছিন্নতাবাদের চিন্তা ধীরে ধীরে উদয় হতে লাগলো।

নির্বাচনের পূর্বে কোয়ালিশনের অঙ্গীকার করে পরে ক্ষমতার ভাগ দিতে অস্বীকৃতি, বি. জি. খেরের মারফত অনুরুদ্ধ হয়েও জিন্নাহ্র প্রস্তাবে গান্ধীর অসামর্থতা প্রকাশ, অন্যদিকে নেহরুর তাচ্ছিল্য ও উগ্র মনোভাবের বহিঃপ্রকাশে জিন্নাহ যার পর নাই অপমানিতবোধ করে লীগকে শক্তিশালী করে কংগ্রেসের মোকাবেলায় সিদ্ধান্ত নিলেন। কংগ্রেসের এই ব্যবহার লীগের অন্যান্য নেতৃবৃন্দ ও জনগণের মধ্যে প্রথমে হতাশা পরে তজ্জনিত ক্রোধ এবং সর্বশেষে কংগ্রেসের প্রতি দারুণ বিতৃষ্ণার সৃষ্টি করলো। লীগের পতাকা তলে সকল মুসলমানকে ঐক্যবদ্ধ করার জন্য জিন্নাহ ও লীগ নেতৃবৃন্দ দারুণভাবে

www.amarboi.org

কার্যকরী প্রচার কার্য আরম্ভ করলেন। ফল পেতেও দেরী হলো না। এক বছরের মধ্যে লীগের সদস্য সংখ্যা কয়েক হাজার থেকে পাঁচ লাখে গিয়ে দাঁড়ায়। এ ছাড়া কংগ্রেস শাসিত প্রদেশে মুসলমানরা হিন্দু শাসকদের দ্বারা অত্যাচারিত হচ্ছে, চাকরি-বাকরির ক্ষেত্রে মুসলমানরা তাদের ন্যায্য অংশ থেকে বঞ্চিত হচ্ছে, মুসলমানদের ধর্ম বিশ্বাসের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ নয় এমন সব আচার-আচরণ করতে বিদ্যালয় গুলোতে মুসলমান ছেলেদের বাধ্য করা হচ্ছে। লীগ কংগ্রেসের বিরুদ্ধে এসব অভিযোগ তুলে ছোট লাটদের এ ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করার জন্য অনুরোধ জানাল। মোটের উপর হিন্দু-মুসলমানদের মধ্যে বিভেদ হ্রাসের চাইতে অনেকাংশে বৃদ্ধি পেয়ে পারস্পরিক শত্রুতাবোধ অনেক তীব্র আকার ধারণ করলো।

এরমধ্যে ১৫ই অক্টোবর জিন্নাহ লক্ষ্ণৌতে মুসলিম লীগের অধিবেশন ডাকলেন। ঐ অধিবেশনে জিন্নাহ্ হিন্দু নেতৃবৃন্দ বিশেষ করে গান্ধীকে তীব্র ভাষায় আক্রমণ করে বক্তৃতা দিলেন। বি. জি খেরের মারফত প্রেরিত তাঁর সহযোগিতার প্রস্তাবে সাড়া না দেয়ার জন্য গান্ধীর কঠিন সমালোচনা করলেন। এই লক্ষ্ণৌ শহরেই ১৯১৬ সনে জিন্নাহর হিন্দু মুসলিম মিলনের স্বর্ণ সৌধ হিসেবে 'লক্ষ্ণৌ প্যাক্ট' রচিত হয়েছিল। আবার ১৯৩৮ সনে সেই লক্ষ্ণৌ শহরেই হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে বিভেদ চরমভাবে আত্মপ্রকাশ করলো। এই অধিবেশনে জিন্নাহ অভিযোগ করেন যে, কংগ্রেস এমন নীতি অনুসরণ করছে যা সম্পূর্ণ হিন্দু স্বার্থের অনুকূল। এ ছাড়া তিনি আরো বললেন যে, হিন্দু নেতাদের আচরণে মনে হয় ভারতবর্ষ যেন শুধু হিন্দুদেরই জন্য। যে মানুষ জিন্নাহ্ এতদিন হিন্দু মুসলমানদের মধ্যে সেতু বন্ধনের কাজে একান্তভাবে নিয়োজিত ছিলেন এবং যিনি এতদিন প্যান ইসলামের ঘোর বিরোধী ছিলেন এখন দেখা গেল তিনি আরব ও মুসলিম জাহানের কথা বলতে আরম্ভ করেছেন। যে জিন্নাহ্ একদিন সর্বভারতীয় নেতার পর্যায়ে উঠে সমগ্র ভারতকে পরিচালিত করার মতো অবস্থায় উঠে গিয়েছিলেন তিনি এখন শুধু তাঁর সম্প্রদায়, তাঁর কওমের নেতৃত্বের মধ্যেই নিজেকে সীমাবদ্ধ করে ফেললেন। ব্যাপারটা খুবই আশ্চর্য ও হতাশাব্যঞ্জক হলেও তা ছিল বাস্তব সত্য। এবং এর উপযুক্ত কারণও ছিল। কংগ্রেস নেতাদের বার বার চুক্তি ভঙ্গে জিন্নাহ্ সাহেব কংগ্রেসের উপর সম্পূর্ণ আস্থা হারিয়ে ফেলেছিলেন। প্রথম হলো ১৯১৬ সালের লক্ষ্ণৌ চুক্তি ভঙ্গ; পরে হলো ১৯২৬ সনের দিল্লীর মুসলিম প্রস্তাব চুক্তির অস্বীকৃতি এবং সর্বশেষ হলো ১৯৩৭ সনের নির্বাচন পূর্ব চুক্তি না মানা। এ সবের পর জিন্নাহ পরিষ্কার

www.amarboi.org

বুঝতে পারলেন অধঃপতিত বহু বিভক্ত মুসলমানদের নেতৃত্ব দিয়ে তাদেরকে সংগঠিত করে লীগকে শক্তিশালী করে কংগ্রেসের সমপর্যায়ে উন্নীত করতে না পারলে হিন্দুরা কখনও মুসলমানদের দাবি মানবে না।.......... লক্ষ্ণৌ অধিবেশনকে লীগের রাজনীতিতে একটা গুরুত্বপূর্ণ মাইলফলক বলা যায়। এখান থেকেই লীগের কর্ম পদ্ধতিতে এমন সব সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছিল যার ফলাফল ভবিষ্যতের জন্য ছিল সুদূর প্রসারী। এই অধিবেশনে মিঃ জিন্নাহ্ গরুত্বপূর্ণ বক্তৃতা প্রসঙ্গে বলেন, "কংগ্রেসের বর্তমান নেতৃত্ব বিশেষ করে বিগত দশ বছরে একান্তভাবে হিন্দু নীতি অনুসরণ করার ফলে ভারতবর্ষের মুসলমানদের ক্রমশঃ একাধিক মাত্রায় বিছিন্নতাবাদের শিকারে পরিণত করার জন্য দায়ী। আর যখন থেকে তাঁরা সংখ্যাগরিষ্ঠতার বলে ছয়টি প্রদেশে মন্ত্রিমন্ডল গঠন করেছেন, নিজেদের উক্তি, কার্য ও কর্মসূচীর দ্বারা উত্তরোত্তর এই কথা প্রমাণ করেছেন যে, তাঁদের হাতে মুসলমানরা কোন ন্যায় বিচার আশা করতে পারে না। আমি জোর দিয়ে একথা বলতে চাই যে, কংগ্রেস দলের বর্তমান নীতির পরিণাম হবে শ্রেণীবিদ্বেষ, সাম্প্রদায়িক যুদ্ধ এবং তার পরিণামে সাম্রাজ্যবাদীদের কর্তৃত্ব বৃদ্ধি।"

আদর্শ নেতার মত প্রতিনিধিদের উদ্দীপ্ত করার উদ্দেশ্যে ত্যাগ তপস্যা ও তিতিক্ষার আবেদন জানিয়ে তাঁদের সংগ্রামী বৃত্তি গড়ে তোলার জন্য অতঃপর জিন্নাহ বললেনঃ

"নিজেদের সংগঠিত করুন, আপন সংহতি ও সম্পূর্ণ ঐক্য প্রতিষ্ঠা করুন। প্রশিক্ষিত এবং সুশৃংখল সৈন্যদের মত নিজেদের গড়ে তুলুন। শ্রম, কৃচ্ছ্রসাধন ও আত্মত্যাগ ব্যতিরেকে কোন ব্যক্তি বা ব্যক্তিসমূহ কিছু পাবার যোগ্যতা অর্জন করে না। এমন অনেক শক্তি আছে যা আপনাদের ভয় দেখাবে, আতঙ্কিত করবে, আপনাদের উপর চাপ দেবার চেষ্টা করবে। এসবের জন্য আপনাদের হয়তো দুর্ভোগও ভোগ করতে হতে পারে। কিন্তু এইসব অত্যাচার উৎপীড়নের অগ্নিপরীক্ষার ভেতর দিয়ে চলেই .... এইসব অসুবিধা, কষ্ট এবং নিগ্রহের সম্মুখীন হয়ে তার প্রতিরোধ ও জয়ের মাধ্যমে আপনাদের যথার্থ বিশ্বাস ও আনুগত্য বজায় রেখে একটি জাতির আবির্ভাব হবে। সেই জাতি হবে তার অতীত গৌরব ও ইতিহাসের উপযুক্ত এবং কেবল ভারতেই নয় বিশ্বের পটভূমিকায় নিজেদের ভবিষ্যত ইতিহাসকে মহত্তর ও অধিকতর গৌরবমণ্ডিত করার জন্য বেঁচে থাকবে ভারতবর্ষের আটকোটি মুসলমান। তাদের ভীত হবার কিছু নেই।"

www.amarboi.org

লীগই মুসলমানদের পক্ষ থেকে একমাত্র কথা বলার অধিকারী এই সত্য প্রতিষ্ঠা না করতে পারা পর্যন্ত ব্রিটিশ সরকার এবং কংগ্রেস কেউ মুসলমানদের ন্যায্য অধিকার স্বীকার করবে না এবং জিন্নাহ্ নিজেও কোন মর্যাদার অধিকারী হবেন না। তাই তখন থেকে তিনি মনপ্রাণ ঢেলে ছিলেন লীগের সাংগঠনিক কার্যে। কিন্তু হাতের তাস তার তেমন শক্তিশালী ছিল না। হিন্দু সংখ্যাগরিষ্ঠ প্রদেশগুলোতে মুসলমানদের মধ্যে লীগের জনপ্রিয়তা বেশী হলেও পাঞ্জাব ও বাংলায় লীগের তেমন প্রতিষ্ঠান না থাকায় তিনি খানিকটা দুর্বল বোধ করছিলেন। তথাপি দক্ষ খেলোয়াড়ের মতো হাতের দুর্বল তাস নিয়েও কৌশলে তিনি খেলে যাচ্ছিলেন। সৌভাগ্যবশতঃ অতি অল্প সময়ের মধ্যে দু'টি শক্তিশালী তাস তার হাতে এল। ১৯৩৭ সনের অক্টোবরে লক্ষ্ণৌ-মুসলিম সম্মেলনে পাঞ্জাবের স্যার সেকান্দার হায়াত খান ও বাংলার এ, কে ফজলুল হক মুসলিম লীগ প্রধানমন্ত্রী হিসেবে যোগ দিলেন। এদিকে কংগ্রেস ও অন্যদিকে ব্রিটিশ সরকারের চাপ দু'য়ের মধ্যে পড়ে এই দু'নেতাই মুসলিম লীগের মধ্যে কিছুটা সাহায্যকারী শক্তির সন্ধান পেল। পাঞ্জাবে জিন্নাহ-হায়াত চুক্তির মাধ্যমে ইউনিয়নিস্ট পার্টির সঙ্গে কাজ করার ব্যাপারে পাঞ্জাব লীগ কোন অন্তরায় সৃষ্টি করবে না বলে হায়াতকে প্রতিশ্রুতি দিল।

এই লক্ষ্ণৌ অধিবেশনেই জিন্নাহ্কে প্রথম কায়েদে আযম উপাধিতে ভূষিত করা হলো এবং এখানে তিনি তাঁর চিরপরিচিত সর্বাধুনিক ডিজাইনের সাহেবী স্যুট পরিত্যাগ করে লম্বা কোট ও ঢোলা পায়জামায় আবির্ভূত হলেন। এই লক্ষ্ণৌতেই লীগ পূর্ণ স্বাধীনতার প্রস্তাব গ্রহণ করল যেটা আট বৎসর পূর্বে কংগ্রেস গ্রহণ করেছিল। এর পর জিন্নাহ্ আর কখনও কংগ্রেসের দ্বারস্থ্ হননি। ১৯৩৭ সনে তাঁর পক্ষ থেকে প্রস্তাবই ছিল শেষ প্রস্তাব। তিনি জানতেন লীগকে শক্তিশালী করতে পারলে কংগ্রেসকেই তার কাছে আসতে হবে। কারণ ব্রিটিশরাজ তাদেরকে যে প্রশ্ন করবে "ভারতের মুসলমানরা কি আপনাদের সঙ্গে আছে?" এ প্রশ্নের উত্তর তাদের দিতে হবে।

লক্ষ্ণৌ অধিবেশনের পর পরই গান্ধী জিন্নাহকে লিখলেন, " আমি আপনার বক্তৃতাগুলো খুব ভাল ভাবে পড়েছি এবং যতই পড়ছি মনে হচ্ছে এটা যুদ্ধ ঘোষণার শামিল। জিন্নাহ লিখলেন আমি মনে করি এগুলো সম্পূর্ণভাবে আত্মরক্ষা মূলক। গান্ধী আবার লিখলেন "আপনার বক্তৃতাগুলো যুদ্ধ ঘোষণা নয় বলে আপনি বলছেন কিন্তু আপনার পরবর্তী বক্তৃতাগুলো সে ধারণাকেই

www.amarboi.org

প্রতিষ্ঠিত করছে। আপনার বক্তৃতায় আমি পুরাতন জাতীয়তাবাদীকে খুঁজে পাচ্ছি না। আপনি কি এখনও সেই আগের জিন্নাহ্‌ই আছেন ? জিন্নাহ কঠিনভাবে প্রত্যুত্তর দিলেন " কংগ্রেস প্রেসগুলোতে কি লেখা হচ্ছে মনে হয় সম্ভবতঃ আপনি তা জনেন না। প্রতিদিন আমার সম্বন্ধে কি পরিমাণ কুৎসা, সত্যের অপলাপ ও মিথ্যা ছড়ান হচ্ছে এসব না হলে সম্ভবতঃ আপনি আমাকে দোষারূপ করতেন না। .... আপনার সম্বন্ধে লোকে ১৯১৫ সনে কি বলত এবং এখন কি বলে একথা আমি আপনাকে বলতে চাই না।

১৯৩৮ সনের অক্টোবরে লীগের অধিবেশনের পর নতুন জিন্নাহ্‌র ভূমিকা সম্বন্ধে ইকরাম লিখেছেনঃ

" Jinnah was not going to lower his flag to come to terms with the Congress. Far from his accepting conditions ... it would be he who would impose conditions."

"কংগ্রেসের সঙ্গে মিটমাটের জন্য জিন্নাহ্ আর নিজের পতাকা নীচু করতে রাজি ছিলেন না। কোন রকম শর্ত গ্রহণ করাতো দূরের কথা, এখন থেকে তিনিই শর্ত আরোপ করতে আরম্ভ করলেন"। আর এরূপ আচরণ তার সম্প্রদায়ের কাছে প্রশংসিত হতে লাগল।

গান্ধী জিন্নাহ্‌র পত্রালাপের পর গান্ধী জিন্নাহ্‌র সঙ্গে বোম্বেতে দেখা করার প্রস্তুতি নিয়ে মওলানা আজাদকে সঙ্গে নিতে চাইলেন। জিন্নাহ্ জানালেন একা গান্ধীর সঙ্গে তিনি কথা বলবেন। গান্ধী জিন্নাহ্‌র আলোচনার শেষ দিকে সুভাস বোস (যিনি নেহেরুর পরে কংগ্রেসের সভাপতি হয়েছিলেন) যোগ দিলেন। দেখা গেল কংগ্রেস এখন কোয়ালিশন সম্পর্কে আলাপ করতে প্রস্তুত কিন্তু ব্যাপারটা তখন অনেক বিলম্ব হয়ে গেছে, জিন্নাহ্‌র মনোভাবের ইতিমধ্যে অনেক পরিবর্তন ঘটেছে। যা' হোক আলোচনা শেষ পর্যন্ত ব্যর্থ হল। যে ইস্যুর উপর তারা দ্বিমত পোষণ করলেন সেটা গান্ধীকে লেখা জিন্নাহ্‌র পত্রে ফুটে উঠল।

" We have reached a stage when no doubt should be left you recognize the Muslim League as the one authoritative and representative organization of the Muslims of India and, on the other hand you represent the Congress and

www.amarboi.org

other Hindus throughout the Country. Only on that basis we can proceed further. ....."

" আমরা এখন এমন একটা স্তরে পৌঁছে গেছি যখন আপনাকে নিঃসন্দেহে স্বীকার করতে হবে যে লীগই মুসলমানদের একমাত্র প্রতিনিধি স্থানীয় প্রতিষ্ঠান এবং অপরদিকে আপনি ও কংগ্রেস শুধু দেশব্যাপী হিন্দুদেরই প্রতিনিধিত্ব করেন। শুধু এই শর্তের ভিত্তির উপরই আমরা সম্মুখে অগ্রসর হতে পারি।"

এর পর থেকে জিন্নাহ মুসলিম লীগই মুসলমানদের একমাত্র রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান বলে স্বীকৃতি দাবি করতে লাগলেন যা কংগ্রেসের দেয়া সম্ভব ছিল না কারণ কংগ্রেসে তখনও নেতৃস্থানীয় কিছু কিছু মুসলমান ছিল। এতদব্যতীত মুসলিম লীগ ছাড়াও জমিয়তে উলামায়ে হিন্দ, আহরার পার্টির ন্যায় আরো দু'একটা মুসলিম সংগঠন তখনও মাঠে ছিল। এই বাস্তব কারণেই লীগের দাবি মানা ঐ মূহূর্তে কংগ্রেসের পক্ষে সম্ভব ছিল না। এই দাবি ঐ মুহূর্তে যুক্তি সঙ্গত মনে না হলেও সে দাবি বাস্তবধর্মী হয়ে উঠতে বেশী বিলম্ব হলো না। কয়েক বৎসরের মধ্যে জিন্নাহ প্রামাণ করে ছিলেন যে, সে দিন সে দাবী মোটেই অসঙ্গত ছিল না। এটা সম্ভব হয়েছিল জিন্নাহর দৃঢ়চিত্ততা, অবিচলিত ও নিরবচ্ছিন্ন চেষ্টার ফলে। এ সময় জিন্নাহর দাবী এতদূর পর্যায়ে পৌঁছেছিল যে, তিনি কংগ্রেস দলের কেন্দ্রীয় কমিটিতে কোন মুসলমানকে নিযুক্ত করতে কংগ্রেসকে নিষেধ করেছিলেন। যেহেতু কংগ্রেস তার নীতি ও বিশ্বাস ত্যাগ করতে পারে না তাই সুভাস বোস লীগের এ দাবী মানতে রাজি হয়নি।

'৩৭ সনের নির্বাচনের পরে ওয়াদা খেলাপের পর জিন্নাহর আহত মনের জ্বালা অনেকগুণ বাড়িয়ে দিয়েছিল নেহেরুর একটি পত্র। এই পত্রে নেহেরু এমনি উগ্র মস্তিষ্কের পরিচয় দিয়েছিলেন যেটাতে জিন্নাহ্ অত্যন্ত অপমাণিত বোধ করেছিলেন। এই পত্রে নেহেরু লীগের দাবিকে অত্যন্ত তাচ্ছিল্য করে প্রকারান্তরে প্রতিষ্ঠানের অন্তর্নিহিত শক্তির পরিচয় দিতে চ্যালেঞ্জ করেছিলেন।

১৯৩৮ সনের ৬ই এপ্রিল নেহেরু জিন্নাহকে লিখলেনঃ

"Obviously, the Muslim League is an important Commuanal Organization and we deal with it as such. But we have to deal with all organizations and individuals that come within our ken. We do not determine the measure of importance or distinction they possess .... Inevitably,

www.amarboi.org

the more important the organization, the more the attention paid to it, but this importance does not come from outside recognition but from inherent strength. And the other organizations, even though they might be younger and smaller, can not be ignored."

"এটা অনস্বীকার্য যে, লীগ একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ সাম্প্রদায়িক প্রতিষ্ঠান এবং আমরা সেটাকে সে ভাবেই দেখছি। কিন্তু আরো যে সব দল বা ব্যক্তি বিশেষ যারা আমাদের পরিধির মধ্যে আসে তাদের বিষয়ও আমাদের বিবেচনা করতে হয়। দলের মূল্য নিরুপণের ব্যাপারে আমাদের নীতি হল যে দল যত গুরুত্বপূর্ণ তার দিকে আমরা ততবেশী মনোযোগ দেই। কিন্তু এই গুরুত্বটা বাইরের স্বীকৃতির উপর নির্ভর করে না। করে তার অন্তর্নিহিত শক্তির উপর। অন্য প্রতিষ্ঠানগুলো তুলনামূলকভাবে নবীন ও ক্ষুদ্র হতে পারে কিন্তু তাদেরকে অস্বীকার করা যায় না।"

এই পত্রের উত্তরে জিন্নাহ্ লিখেনঃ-

" Your tone and language again display the same arrogance and militant spirit, as if the Congress is the Sovereign power ... I may add that, in my opinion, as I have publicly stated so often, that unless the Congress recognizes the Muslim League on a footing of complete equality and is prepared as such to negotiate for a Hindu-Muslim settlement, we shall have to wait and depend upon our 'inherent strength' which will 'determine the measure of impoortance or distinction' it possesses."

" আপনার বলার ভঙ্গী ও ভাষা এখনও আগের মতই ক্রোধ ও যুদ্ধংদেহী মনোভাবের পরিচয় দিচ্ছে যেন মনে হয় কংগ্রেস একটি সার্বভৌম শক্তি। ... আমি বলতে চাই আমার মতে যা আমি বহুবার জনসমক্ষে বলেছি যতক্ষণ না কংগ্রেস লীগকে তার সমতুল্যের মর্যাদা দেয়ার ব্যাপারে স্বীকৃতি দিতে সম্মত হবে না এবং সেই ভিত্তিতে হিন্দু মুসলমান সমস্যার মিটমাটে সম্মত হবে না ততক্ষণ আমাদেরকে অপেক্ষা করতে হবে এবং আমাদের অন্তর্নিহিত শক্তির উপর নির্ভর করতে হবে।

www.amarboi.org

বস্তুতঃ এই চিঠিই জিন্নাহ্‌র ভেতরের ঘুমন্ত সিংহকে যেন জাগ্রত করে তুলেছিল। রুগ্ন দেহ নিয়ে প্রচন্ড মনোবলের অধিকারী জিন্নাহ দেশের একপ্রান্ত থেকে ওপ্রান্ত পর্যন্ত ঘুরে ঘুরে অতি অল্প সময়ের মধ্যে লীগকে সংগঠিত করে প্রতিষ্ঠানটি যে অন্তর্নিহিত শক্তির অধিকারী হয়েছে এটা প্রমাণ করে ছিলেন এবং সে সঙ্গে এটাও প্রমাণ করলেন যে এখন থেকে লীগকে আর স্বীকৃতির জন্য কংগ্রেসের দ্বারস্থ হতে হবে না। হিন্দু-মুসলমানের মিটমাটের জন্য কংগ্রেসকেই লীগের দ্বারস্থ হতে হবে সমস্যা সমাধানের মানসে।

জিন্নাহ্ মুসলিম লীগকে গণসংগঠন হিসেবে গড়ে তোলার লক্ষ্যে কংগ্রেসের মতো লীগের সাধারণ সদস্যভুক্তির অভিযান শুরু করলেন। লীগের সদস্যদের চাঁদার হার কংগ্রেসের অর্ধেক অর্থাৎ দু' আনা করা হল। এতে অল্প সময়ের মধ্যে লীগের সদস্য সংখ্যা ৫ লাখে গিয়ে দাঁড়াল। বিভিন্ন প্রদেশে গঠন করা হল প্রাদেশিক মুসলিম লীগ। প্রাদেশিক পরিষদের ১১টির মধ্যে ৭টি প্রদেশের বিধান সভায় মুসলিম লীগ সক্রিয় হয়ে উঠলো। লীগের শক্তি বৃদ্ধির লক্ষ্যে ছাত্র সমাজকে অন্তর্ভুক্ত করার প্রয়াস নেয়া হল। ১৯৩৭ সনে তিনি কোলকাতায় নিখিল ভারত মুসলিম ছাত্র ফেডারেশন উদ্বোধন করেন।

বাস্তব বুদ্ধি সম্পন্ন জিন্নাহ

এসব প্রচারাভিযানের সময় জিন্নাহর বাস্তব বুদ্ধি যে কতখানি প্রখর ছিল তার পরিচয় পাওয়া যায় একটি ঘটনা থেকে। এসময় তিনি ১৯৩৯ সালে কোয়েটায় প্রায় ২৫ দিন একটি বাগানঘেরা বাড়ীতে বিশ্রাম নিচ্ছিলেন এবং বেলুচিস্তানের উপজাতীয়দের মধ্যে লীগের পক্ষে জোর প্রচার কার্য চালাচ্ছিলেন। উপজাতীয় পাঠানদের মধ্যে কড়া পর্দাপ্রথা চালু ছিল। জিন্নাহ্ সাহেবের বোন মিস্ ফাতেমা জিন্নাহ্ পর্দা মানতেন না। তিনি সাধারণতঃ ভাইয়ের সঙ্গে সব জনসভায় যেতেন এবং ভাইয়ের সঙ্গে মঞ্চে উপবেশন করতেন। কোয়েটার এক জনসভায় তাঁর গৃহ স্বামীনি যিনি নিজে পর্দা করতেন না মিস্ জিন্নাহকে জনসভায় নেয়ার জন্য পীড়াপীড়ি করে বলেন যে, আপনাদের উচিত এদের কুসংস্কার দূর করার চেষ্টা করা। এতে জিন্নাহ্ রাগান্বিত হয়ে বললেন যে, আপনি কি আমার চার বছরের পরিশ্রম নষ্ট করতে চান ? জিন্নাহ চার বছর ধরে উপজাতীয়দের মধ্যে লীগের অনুকূলে মনোভাব সৃষ্টির চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছিলেন। কঠোর পর্দা বিরোধী মিস্ জিন্নাহ মঞ্চের উপর উপবিষ্ট হলে জিন্নাহর প্রচেষ্টা যে ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে এ ব্যাপারে বাস্তব জ্ঞানসম্পন্ন জিন্নাহ্ সচেতন ছিলেন। গৃহকর্তার এক শিশু পুত্র সকাল হলেই জিন্নাহর কোলে

www.amarboi.org

গিয়ে বসত এবং দু'জনে দু'জনের মধ্যে গল্প করতো। একদিন জিন্নাহ্ একটি খেলনা দোকানে গিয়ে একটি দোল খাওয়া কাঠের ঘোড়া আছে কিনা জানতে চাইলেন। জিন্নাহ্ তখন কোয়েটাতে বেশ পরিচিত হয়ে উঠেছেন এবং যেখানে যেতেন প্রচুর লোক তার আশে-পাশে জমে যেত। তিনি যখন ভিড় ঠেলে দোকানে ঢুকলেন সবাই অবাক হয়ে গেল। দোল খাওয়া ঘোড়াটি কিনে এনে তিনি গৃহকর্তার শিশু পুত্রকে উপহার দিলেন। গৃহকর্তা বুঝলেন বাইরে থেকে জিন্নাহকে যতই নীরস, ভাবাবেগহীন মনে হোক না কেন অন্তরের গভীরে সাধারণ মানুষের মতই তাঁর মন স্নেহ মমতায় পূর্ণ ছিল।

কোমল হৃদয় জিন্নাহ

কঠোর নিয়মানুবর্তিতার মধ্যে একাকি জীবনযাপনে অভ্যস্থ জিন্নাহ্র মনের গভীরে যে পিতৃ-স্নেহের একটা আকুতি ঘুমরে মরছিল তার প্রমাণ পাওয়া যায় আর একটি ঘটনা থেকে। কিছুদিন পূর্বে তাঁর এক বন্ধু পুত্র তার এক স্কুলের বন্ধুকে নিয়ে জিন্নাহর বাড়ীতে কয়েক দিনের জন্য থাকতে এসেছিলো। তারা বিদায় নিয়ে চলে যাওয়ার পূর্ব রাত্রিতে অনেক রাতে তারা যখন প্রায় ঘুমিয়ে পড়েছে এমন সময় দরজা খুলে গেল। একটু পরেই বাতি জ্বলে উঠলে তারা দেখলো জিন্নাহ্ পায়জামা ও ড্রেসিং গাউন পরে দরজায় এসে দাঁড়িয়েছেন। জিন্নাহ্ তাদের রাত্রি বেলা বিরক্ত করার জন্য ক্ষমা চেয়ে বললেন, "তোমরা কাল চলে যাচ্ছ মনে হওয়ায় আমি ঘুমাতে পারছিলাম না।" তারপর তিনি অনেক্ষণ ধরে আমাদের সঙ্গে কথা বললেন। সে সব কথা রাজনীতি বিষয়ে নয়। সে সব কথা ছিল তার বিলেতের জীবনযাত্রা সম্পর্কে। করাচীতে তাঁর বাল্যকালের দিনগুলো সম্পর্কে। পরে যখন তিনি তাঁর কামরায় যেতে উদ্ধত হলেন তখন বললেন যে, আমাদেরকে এতক্ষণ জাগিয়ে রাখার জন্য তিনি দুঃখিত। সব শেষে বাতি নিভিয়ে দেয়ার পূর্ব মুহূর্তে তিনি দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলে বললেন, আহা! আমার যদি একটি ছেলে থাকতো। স্বজাতির মঙ্গলের জন্য অহর্নিশি যুদ্ধে লিপ্ত ক্লান্ত মানুষটির মনের এ আক্ষেপ যে কাউকে ব্যথিত করার জন্য যথেষ্ট।

এখানে স্মরণযোগ্য যে, এ সময় তিনি তাঁর বোনের সঙ্গে নিঃসঙ্গ জীবনযাপন করছিলেন। তাঁর মেয়েও এ সময় তাঁর সঙ্গে থাকত না। বহুদিন পূর্ব থেকেই সে তাঁর মায়ের পারসি আত্মীয়দের সঙ্গে বাস করত। শেষ পর্যন্ত সে জিন্নাহর অমতে এক খ্রিস্টান যুবককে বিয়ে করেছিল এবং বহুদিন যাবত

www.amarboi.org

পিতা-কন্যার মধ্যে বিশেষ সম্পর্ক ছিল না। তাই মনের দিকে জিন্নাহ্ ছিলেন সম্পূর্ণ নিঃসঙ্গ ও একাকী। কিন্তু অসম্ভব মনোবলের অধিকারী ও আত্মসম্মান সম্পর্কে সচেতন ছিলেন বলে কাউকে কিছু জানতে দিতে চাইতেন না।

১৯৩৮ সনের এপ্রিলে কোলকাতায় অনুষ্ঠিত লীগের কাউন্সিল সভায় জিন্নাহ্ আরো বলিষ্ঠ কণ্ঠে বললেনঃ " কংগ্রেস প্রধানতঃ হিন্দু প্রতিষ্ঠান। মুসলমানরা একাধিকবার একথা স্পষ্টভাবে বলেছে যে ধর্ম, সংস্কৃতি, ভাষা ও ব্যক্তিগত আইন ছাড়াও তাদের অপর একটি সমান গরুত্বপূর্ণ জীবন-মরণের প্রশ্ন আছে এবং তা হলো এই যে, তাদের ভবিষ্যত ও ভাগ্য, রাজনৈতিক ক্ষেত্রে অধিকার, জাতীয় জীবন, সরকার প্রশাসনে উপযুক্ত অংশ পাবার উপর নির্ভর করছে। শেষ পর্যন্ত তারা এর জন্য লড়াই চালিয়ে যাবে।"

লীগের কোলকাতা অধিবেশনেই কংগ্রেস শাসিত প্রদেশসমূহে মুসলমানদের উপর অনুষ্ঠিত অত্যাচার সমূহের তদন্তের জন্য পীরপুরের রাজা সৈয়দ মোহাম্মদ আলীর নেতৃত্বে একটি কমিটি গঠন করা হয় যার নাম হলো পীরপুর কমিটি। এই কমিটি নভেম্বর মাসে গত দেড় বৎসরে কংগ্রেস শাসিত প্রদেশগুলোতে মুসলমানদের উপর অনুষ্ঠিত বিভিন্ন প্রকারের অত্যাচারের বিস্তারিত রিপোর্ট পেশ করে। এই রিপোর্টের কপি জিন্নাহ্ বড়লাটদের নিকট পাঠিয়ে সংখ্যালঘুদের স্বার্থ রক্ষার ব্যাপারে বৃটিশ সরকারের ব্যর্থতার নিন্দা করে ক্ষোভ প্রকাশ করেন। কংগ্রেস অবশ্য পীরপুর কমিটির রিপোর্টে উল্লেখিত অভিযোগগুলো অস্বীকার করে।

যা'হোক ইতিমধ্যে কংগ্রেস ও লীগের মধ্যে দফায় দফায় পত্রালাপ ও আলোচনা হয়, কিন্তু কোন ফল হয়নি। ফল না হওয়ার কারণ হলো মুসলমানদের পক্ষ থেকে কথা বলার একমাত্র অধিকারী মুসলিম লীগ এবং কংগ্রেস শুধু হিন্দুদেরই প্রতিনিধিত্ব করে লীগের এই দাবীর ফলে। তখন পর্যন্ত ভারতের রাজনৈতিক অবস্থা যা ছিল তাতে কংগ্রেসের পক্ষে এ অবস্থান স্বীকার করে নেয়া একটু কষ্টকর ছিল যদিও বাস্তব ক্ষেত্রে পরিস্থিতি ছিল লীগের দাবির স্বপক্ষে।

২৬ শে ডিসেম্বর পাটনায় বিপুল উৎসাহ ও উদ্দীপনার মধ্যে লীগের বাৎসরিক অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়। এই অধিবেশনে হাজার হাজার শ্রোতার কাছে জিন্নাহ তাঁর কংগ্রেসের প্রতি বিরূপ মনোভাব উজাড় করে দিয়ে বললেন, "কংগ্রেস এবারে ... ফ্যাসিবাদীদের রাজকীয় পদ্ধতিতে হিন্দু মুসলমানের মধ্যে

www.amarboi.org

বোঝাপড়া হবার সর্বাবিধ আশাকে হত্যা করেছে।" তিনি বজ্রকণ্ঠে বললেন, "আমরা ভারতবর্ষের মুসলমান সম্প্রদায় আমাদের পূর্ণ অধিকার আদায় করার ব্যাপারে মনস্থির করে নিয়েছি।" তিনি বিভিন্ন ভাষায় কংগ্রেসের উপর আক্রমণ চালান, 'কংগ্রেস এক হিন্দু প্রতিষ্ঠান ছাড়া আর কিছু নয়। জনাকয়েক পথভ্রান্ত এবং কু পথে পরিচালিত মুসলমানদের উপস্থিতি ঐ প্রতিষ্ঠানকে জাতীয় সংস্থায় পরিণত করতে পারে না।" জিন্নাহ্ দ্বিধাহীন চিত্তে বললেন, হিন্দু-মুসলিম মিলনের জন্য একদিন যে কংগ্রেস প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল তা গান্ধীর কারণেই ব্যর্থ হল। তিনি বলেন, কংগ্রেসকে হিন্দু পুনরুত্থানবাদের যন্ত্রে পরিণত করার জন্য যদি কোন একজন ব্যক্তিকে দায়ী করতে হয় তাহলে তিনি হলেন মিঃ গান্ধী। তাঁর উদ্দেশ্য হল এদেশে হিন্দুধর্মের পুনরভ্যুদয় এবং হিন্দুরাজ প্রতিষ্ঠা করা। এই উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য তিনি কংগ্রেসকে কাজে লাগাচ্ছেন।" পাটনার ওই সভায় জিন্নাহ হাজার হাজার শ্রোতামন্ডলীর করতালির মধ্যে গান্ধী ছাড়াও জওহরলাল নেহেরু, সুভাস চন্দ্র, বল্লভ ভাই প্যাটেল ও রাজেন্দ্র প্রসাদ প্রমুখ কংগ্রেস নেতাদের কঠোরভাবে সমালোচনা করেন।

পাটনার অধিবেশন আরো একটি কারণে উল্লেখযোগ্য ছিল যে, ঐ সম্মেলনে কতিপয় গোঁড়া প্রতিনিধিদের বক্তব্য অগ্রাহ্য করে মুসলিম লীগ মহিলা সংগঠন তৈরির সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। এই সিদ্ধান্তে বিশেষভাবে ফল পাওয়া গেল। হাজার হাজার মহিলা পর্দার অন্তরাল থেকে বেরিয়ে এসে লীগের মহিলা সংগঠনে যোগ দিতে লাগল। মুসলিম নারী সমাজের মধ্যে লীগ দ্রুত জনপ্রিয়তা লাভ করল। এ অধিবেশনে জিন্নাহ হিন্দু কংগ্রেসের বিরোধিতা করে ৯ কোটি মুসলমানকে লীগের পতাকাতলে সংগঠিত হয়ে মুসলমানদের ন্যায়সঙ্গত দাবি অর্জনের জন্য আবেদন জানিয়ে ছিলেন। জিন্নাহর এই আহবানে মুসলমানদের মধ্যে উৎসাহ উদ্দীপনা প্রবল হয়ে উঠলো। দলে দলে মুসলিম মধ্যবিত্ত, ছাত্র ও তরুণ সম্প্রদায় লীগের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে উঠলো। বিভিন্নস্থানে লীগের অফিস খোলা হয় এবং সেখানে কর্মীদের নিয়মিত যাতায়াতে কর্মচাঞ্চল্যও দেখা দেয়।

জিন্নাহ তাঁর রাজনৈতিক জীবনের প্রথম থেকেই প্রায় ১৯৩৭ সন পর্যন্ত হিন্দু মুসলমানদের মধ্যে মিটমাট ও বুঝাপড়ার ভিত্তি হিসেবে সংখ্যালঘুদের

www.amarboi.org

জন্য সংবিধানে রক্ষা কবচের ব্যবস্থা ও চাকরি-বাকরি ব্যবসা -বাণিজ্যের ক্ষেত্রে জনসংখ্যার অনুপাতে একটা সুনির্দিষ্ট অংশ দাবি করে আসছিলেন। কিন্তু পরবর্তীতে দেখা যায়, তাঁর মানসিক অবস্থার ক্রমশঃ উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন ঘটে যাচ্ছে। প্রথমে সুদীর্ঘকাল পর্যন্ত তিনি ভারতীয় একজাতির অন্তর্গত হিন্দু-মুসলমানকে দু'টি আলাদা সম্প্রদায় মনে করতেন। কালক্রমে হিন্দু-মুসলমানকে দু'টি আলাদা সম্প্রদায় হিসেবে অভিহিত না করে তাদেরকে দু'টি সম্পূর্ণ আলাদা জাতি হিসেবে চিহ্নিত করার পেছনে তাঁর মনোভাবকে প্রভাবিত করেছিল খুব সম্ভব হিন্দু-মুসলমানদের সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র ঐতিহ্যও জীবন ধারণ প্রণালী, ধর্ম বিশ্বাস, কৃষ্টি-সংস্কৃতি ও ভবিষ্যত আশা-আকাঙ্খার বৈপরীত্যের কারণে। মুসলমানরা আলাদা এক জাতি এই চিন্তা তাঁর মনোজগতে স্থান পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে বিচ্ছিন্নতাবাদের চিন্তা তখন ভারত বিভক্তির সঙ্গে কোন ভাবেই সম্পৃক্ত ছিল না। হিন্দু আধিপত্য থেকে মুসলমানদেরকে মুক্ত করে অখণ্ড ভারতের কাঠামোর মধ্যে তিনি একটা সমাধান খুঁজে বের করার চেষ্টা করছিলেন। ভারতীয় রাজনীতিতে তিনি যে কংগ্রেসের প্রতি ক্রমাগত কঠোর ও আপোষহীন হয়ে উঠেছিলেন তার পেছনে হিন্দু মহাসভার নেতাদের মুসলিম স্বার্থবিরোধী আন্দোলন ও তাদের লাগামহীন উক্তি অনেকটা সক্রিয়ভাবে কাজ করছিলো। কংগ্রেস যে, মুসলমানদের ন্যায্য দাবি প্রথমে স্বীকার করে পরবর্তীতে বারে বারে অস্বীকার করছিলো তার পেছনে হিন্দু মহাসভার মুসলিম বিরোধী আন্দোলন ও চাপ অনেকটা কাজ করছিলো।

হিন্দু মহাসভার দ্বিজাতিতত্ত্ব

হিন্দু মহাসভার নেতাদের বক্তব্য থেকে পরিষ্কার ভাবে প্রমাণ হলো তারা হিন্দু মুসলমানের একাজাতিত্বে বিশ্বাস করে না। হিন্দু-মুসলমান দু'টি আলাদা জাতি বলে তারা দাবি করলো। ১৯৩৭ সনে হিন্দু মহাসভার অধিবেশনে তার সভাপতি সাভারকার পরিষ্কার ভাবে ঘোষণা করলেনঃ " ভারতবর্ষকে আজ আর এক অবিভাজ্য ও সুসংহত জাতি মনে করা যায় না। পক্ষান্তরে এদেশে প্রধানতঃ দু'টি জাতি হিন্দু ও মুসলমান।" (রাম গোপাল, সমগ্রন্থ, ২৬৪ পৃঃ)। ১৯৩৯ সনে কোলকাতায় অনুষ্ঠিত মহাসভার সম্মেলনেও তিনি দ্বিজাতিতত্ত্বের কথা আরো জোর দিয়ে উল্লেখ করেন। দু'জাতির কথা সাভারকার বললেও অবশ্য ভারত বিভক্তির কথা তিনি বলেন নি। এখানে প্রণিধান যোগ্য যে,

www.amarboi.org

দ্বিজাতি তত্ত্বের কথা ১৯৪০ সনে লাহোর প্রস্তাবের সময় জিন্নাহ্ বললেও এখন দেখা যায় তাঁর অনেক আগেই হিন্দু মহাসভার সভাপতি সাভারকার হিন্দু-মুসলমান দু'টি আলাদা জাতি ও দ্বিজাতিতত্ত্বের কথা খোলাখুলিভাবে উল্লেখ করেছিলেন। তাই দেখা যাচ্ছে ভারত বিভাগের ভিত্তি যে দ্বিজাতিতত্ত্বের উপর প্রতিষ্ঠিত তার উদগাতা জিন্নাহ্ নন, সে হল হিন্দু মহাসভার নেতা সাভারকার।

কিন্তু অতীব আশ্চর্যের বিষয় যে, আমাদের এখানে দেশ বিভাগের পর থেকে বামপন্থী হিন্দু-মুসলমান নির্বিশেষে সকল বুদ্ধিজীবীরা প্রচার করে আসছিলেন যে, দ্বিজাতিতত্ত্বের প্রবক্তা হলেন জিন্নাহ্ সাহেব। এখন দেখা যাচ্ছে, এ ধারণা কতখানি ভ্রান্ত ছিল। অন্যের উক্তির অপবাদের বোঝা তাঁকে অনর্থক বয়ে বেড়াতে হচ্ছিল। তবে ভারতের হিন্দু-মুসলমান যে পৃথক সম্প্রদায় নয়, দু'টি আলাদা জাতি এ সত্য জিন্নাহ্‌র বহু পূর্বে হিন্দু নেতারা উপলব্ধি করেছিলেন। কিন্তু কংগ্রেসী হিন্দু নেতারা এটা উপলব্ধি করলেও স্বীকার করতে চাইতেন না বৃহত্তর রাজনৈতিক স্বার্থের কারণে। হিন্দু মহাসভা নেতারা অত ঘোরপ্যাচের তোয়াক্কা না করে সোজাসুজি এ বাস্তব সত্যকে প্রকাশ করতেন, ভারত উপমহাদেশে হিন্দু ও মুসলমান যে দু'টি আলাদা জাতি একথা সাভারকারের ও বহু পূর্বে বাংলার অনেক বিখ্যাত হিন্দু নেতারা স্বীকার করতেন। প্রখ্যাত মুসলিম লেখিকা কাজী জাহান আরা তাঁর বার্ষিকীতে একটি বাণী চেয়ে তৎকালীন বিখ্যাত ঔপন্যাসিক, বিশিষ্ট বুদ্ধিজীবী ও হিন্দু সম্প্রদায়ের নেতা শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়কে যখন অনুরোধ জানিয়ে পত্র লিখেন তখন শরৎবাবু ১৯১৬ সালে সামতাবেড়িয়া থেকে কাজী জাহান আরাকে লিখে পাঠানঃ "ভারতের হিন্দু-মুসলমান দুই বৃহৎ জাতি বহুদিন যাবত পাশাপাশি বাস করছে। তাদের মধ্যে বাইরে লেনদেন অনেক হয়েছে কিন্তু অন্তরের লেনদেন হয়নি। সেই লেনদেনের সুযোগ সৃষ্টির দায়িত্ব আমার ও তোমার।" শরৎবাবু সে সময় ছিলেন একজন উল্লেখযোগ্য প্রতিনিধিত্বশীল হিন্দু নেতা। তাই তাঁর মতামতকে সমগ্র শিক্ষিত হিন্দু সম্প্রদায়ের মতামত বলে ধরে নেয়া যায়। শুধু কাজী জাহান আরার নিকট চিঠিতেই যে শরৎবাবু এই উক্তি করেছিলেন তা নয়। ১৯১২ সালে নভেল প্রাইজ পাওয়ার পর কলকাতায় রবীন্দ্রনাথকে যে নাগরিক সংবর্ধনা দেয়া হয়েছিলো সে সভার

www.amarboi.org

সভাপতি হিসেবে শরৎবাবু রবীন্দ্রনাথকে উদ্দেশ্য করে বলেছিলেন, " আমি আপনাকে ভারতের মহান হিন্দু জাতির পক্ষ থেকে অভিনন্দন জানাচ্ছি।" এ থেকে তখনকার হিন্দু সমাজের অধিকাংশ নেতাই যে মুসলমানদের আলাদা জাতি মনে করতেন তা পরিষ্কার ভাবে প্রমাণিত হয়।

উপরোক্ত দুটো ঘটনা ছাড়াও অধ্যাপক কাজী আবদুল ওয়াদুদকে লেখা শরৎবাবুর আরো একটি চিঠির অংশ এখানে উদ্ধৃত করছি যা থেকে হিন্দু-মুসলমানের পৃথক জাতিতত্ত্ব সম্বন্ধে তৎকালীন শিক্ষিত হিন্দু নেতৃবৃন্দের ধারণার প্রমাণ পাওয়া যায়। চিঠিটি বাজে শিবপুর থেকে ১৯১৮ সনের ২০শে মার্চ শরৎবাবু লিখেছিলেন কাজী আবদুল ওয়াদুদকে তাঁর 'মীর পরিবার' বই সম্পর্কেঃ-

"আপনার রচনার মধ্যে যে উর্দু কথা ব্যবহার করিয়াছেন সে ভালই হইয়াছে। তা না হইলে মুসলমান পাঠক-পাঠিকা কখনই ইহাকে নিজেদের মাতৃভাষা বলিয়া অসঙ্কোচে গ্রহণ করিতে পারিতনা। তাহাদের কেবলই মনে হইত ইহা হিন্দুদের ভাষা, আমাদের নয়। এই পাশাপাশি দুই জাতির মধ্যে সাহিত্যের সংযোগ সাধনের বোধ করি ইহাই সবচেয়ে ভাল উপায়। অবশ্য সকল সাহিত্যিকই এই মতের সপক্ষে নয়, কিন্তু আমি নিজে এইরূপ রচনারই পক্ষপাতি।"

হিন্দু মহাসভা নেতাদের তৎকালীন মুসলমানদের প্রতি কিরূপ বিদ্বেষ ও শত্রুতামূলক মনোভাব ছিল তার কিছুটা প্রমাণ পাওয়া যায় প্রখ্যাত কলামিস্ট মরহুম আবু জাফর শামসুদ্দিনের লেখা 'মুসলিম সমাজের ঝড়ো পাখি বেনজীর আহমদ' বইতে। তিনি লিখেছেনঃ

"কাচারির বিপরীত দিকে ঢাকা ন্যাশনাল মেডিক্যাল স্কুলের বিরাট প্রাঙ্গণ। সেখানে বিশাল চন্দ্রাতপের নিচে নিখিল বঙ্গীয় অথবা নিখিল ভারতীয় হিন্দু মহাসভার সম্মেলন হচ্ছে। খুব সম্ভব ১৯২৮ সালের অথবা ১৯২৯ সালের প্রথম দিককার কথা- ঠিক মনে করতে পারছিনা। সম্মেলন উপলক্ষে শহরে জোর প্রচার চলছিল। পাড়ায় পাড়ায় হিন্দু তরুণ-তরুণীদের ব্যায়াম কুস্তির আখড়া। সেগুলোতে লাঠি খেলা, ছোরা খেলা শেখানো হয়। সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা লাগে লাগে অবস্থা। স্মরণীয় যে, ঢাকা শহর ইতিপূর্বেই সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা হাঙ্গামার জন্য কুখ্যাতি অর্জন করেছিল। প্রচারপত্র এবং ন্যাশনাল মেডিক্যাল স্কুলের গেটে ঝুলন্ত ব্যানারে দেখলাম, নিখিল ভারত হিন্দু মহাসভার নেতা ডক্টর মুঞ্জে

www.amarboi.org

এবং এন. সি. কেলেকার সভায় বক্তৃতা দেবেন। সম্মেলনে বিধর্মীর প্রবেশ নিষিদ্ধ। বেনজীর সাহেব সর্বক্ষণ ধূতি-শার্ট পরতেন। আমাকে বললেন ধূতি পরে চলুন, ওরা কি বলে শুনে আসি। আমি মাদ্রাসার ছাত্র; ধূতি ছিল না। বাবা নিজে সাদা তহবন, সাদা পাঞ্জাবি এবং সাদা টুপি পরতেন, আমাদের ধূতি কিনে দিতেন না; ঢাকা কলেজে প্রথম বর্ষে ভর্তি হয়ে আমি প্রথম ধূতি ক্রয় করি। এক বন্ধুর কাছ থেকে ধূতি যোগাড় করলাম। বিকেলে দু'জনে গেলাম সভায়। ডক্টর মুঞ্জে এবং এন. সি. কেলেকার উভয়েই উগ্র-সম্প্রদায়িকতাবাদী বক্তৃতা করলেন। দু'জনের মধ্যে কোন জন, আজ এতকাল পরে ঠিক মনে করতে পারছিনা, কিন্তু দু'জনেরই একজন বলেছিলেন যে, মুসলমানরা যদি এদেশে থাকতে চায়, তাহলে হিন্দু জাতির সঙ্গে লীন হয়ে থাকতে হবে নতুবা সাতশ' বছর বসবাসের পর মুসলমানরা স্পেন হতে যে ভাবে বিতাড়িত হয়েছিল আমরাও তাদেরকে সেভাবেই আরব সাগর পার করে দেবো। তখন পাঞ্জাবে জোর শুদ্ধি আন্দোলন চলছিল। স্বামী দয়ানন্দ ছিলেন আর্য সমাজ ও শুদ্ধি আন্দোলনের নেতা। দয়ানন্দের মৃত্যুর পর স্বামী শ্রদ্ধানন্দ সেই আন্দোলনের নেতা হন। ১৯২৬ সালে আবদুর রশীদ নামক এক ব্যক্তির ছুরিকাঘাতে তিনি নিহত হলে হিন্দু মুসলিম সমস্যার দারুণ অবনতি ঘটে। ঢাকা এবং কলকাতায় দাঙ্গা হয়। বলা বাহুল্য, ঐ বক্তৃতা শুনে বেনজীর সাহেব এবং আমি খুবই ক্ষুব্ধ হই। আমরা সভা শেষ হওয়ার আগেই করোনেশন পার্কে চলে যাই। ফিরে আসার সময় ভিক্টোরিয়া পার্কের কাছে পৌঁছে দেখি আতঙ্কগ্রস্ত লোকজনের মধ্যে দৌড়াদৌড়ি শুরু হয়ে গেছে। সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা লেগে গিয়েছিল কিনা আজ আর তা মনে করতে পারছিনা (মুসলিম সমাজের ঝড়ো পাখি বেনজীর আহম্মদ পৃষ্ঠা ২২)।

উপরোক্ত লেখা থেকে সেই ১৯২৭/২৮ সালে মুসলমানদের প্রতি হিন্দুদের মনোভাবের পরিচয় পাওয়া যায়। হিন্দু নেতাদের এসব বক্তব্যই নিঃসন্দেহে এককালীন হিন্দু-মুসলমান মিলনের শ্রেষ্ঠ রাজদূত জিন্নাহকে হিন্দু-মুসলমান মিলনের চরম অবিশ্বাসী করে তোলে। ভারতের হিন্দু মুসলমান দুটি পৃথক সম্প্রদায় নয়-দু'টি আলাদা জাতি হিন্দু মহাসভা নেতাদের এই বিশ্লেষণ জিন্নাহর চিন্তাধারাকে দারুণভাবে প্রভাবিত করে যেভাবে সম্ভবতঃ প্রভাবিত করেছিল অনেক আগে কবি ইকবালকে। দার্শনিক কবি ইকবাল ১৯৩৪/৩৫ এর দিকে ভারতের পশ্চিম অংশের মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ প্রদেশগুলো নিয়ে একটা স্বাধীন রাষ্ট্রের কল্পনা করেছিলেন এবং জিন্নাহকে তাঁর কল্পনার কথা

www.amarboi.org

ত্রিশদশকের প্রথম দিক থেকেই বলে আসছিলেন, কিন্তু জিন্নাহ সে সময় ইকবালের কথার তেমন গুরুত্ব দেননি। ১৯৩৭ সালের পর থেকে সম্ভবতঃ জিন্নাহ্ হিন্দু -মুসলিম সমস্যা সমাধানের ব্যাপারে পৃথক জাতির জন্য পৃথক আবাসভূমির প্রয়োজনীয়তার কথা সবিশেষ গুরুত্ব সহকারে চিন্তা করতে আরম্ভ করেন। আর তাঁর মনোজগতে এ চিন্তা আসার পিছনে হিন্দু মহাসভার নেতাদের বক্তৃতা-বিবৃতি যে অনেকখানি কাজ করেছিল এতে কোন সন্দেহ নেই।

কংগ্রেস নেতাদের ক্রমাগত অযৌক্তিক আচরণের ফলে ধীরে ধীরে এক কালের হিন্দু মুসলিম মিলনের রাজদূত মোহাম্মদ আলী জিন্নাহর মনোভাবের উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন ঘটতে ঘটতে দু'সম্প্রদায়ের নেতা থেকে এক সম্প্রদায়ের নেতায় কিভাবে রূপান্তরিত হলেন তার ইতিহাস আমরা এর পূর্বে দেখেছি। সেই ইতিহাস যেমনিই বিচিত্র তেমনি বেদনাদায়ক। যে সাম্প্রদায়িক রাজনীতিকে তিনি খুবই অপছন্দ করতেন ঘটনাচক্রে নিয়তির নির্মম বিধানে সেই সাম্প্রদায়িক রাজনীতিতেই তাঁকে পুরোপুরি জড়িয়ে পড়তে হল। অবশ্য তখন তাঁর চোখে মুসলমানরা আর একটি সম্প্রদায় নয় একটি জাতি এবং তিনি যেন একটি জাতির নেতৃত্ব দিচ্ছেন বলে মনে করতেন। মুসলমানরা তখন একটি সম্প্রদায় হিসেবে অভিহিত হবার হীনমন্যতা থেকে মুক্ত হয়েছে এবং জিন্নাহ্ ও এই সময় একটি জনসভায় খোলাখুলি ঘোষণা করতে দ্বিধা করলেন না যে তাঁকে সাম্প্রদায়িক নেতা বলে অভিহত করলে তিনি বিন্দুমাত্র লজ্জাবোধ করেন না। এলাহাবাদ ইউনিভারসিটির এক ছাত্র সভায় তিনি বলেন ঃ

" If for uplifting the social, economic and political standards of the Mussalmans of India, I am branded a Communalist, I assure you gentlemen, that I am proud to be a communalist."

" ভারতের মুসলমানদের সামাজিক, অর্থনৈতিক এবং রাজনৈতিক মান উন্নয়নের জন্যে যদি কেউ আমাকে সাম্প্রদায়িক বলে আখ্যায়িত করে, ভদ্রমহোদয়গণ, আমি আপনাদেরকে নিশ্চিতভাবে বলছি যে, সাম্প্রদায়িক বলে অভিহিত হতে আমি গর্ববোধ করছি।"

জিন্নাহর এই বক্তৃতা তুমুল আনন্দধ্বনীর দ্বারা প্রশংসিত হয়েছিল। বক্তৃতার মাঝখানে একবার মাত্র সামান্য বাধা এসেছিল যখন কয়েকটি হিন্দু ছেলে গান্ধীজীর জয় বলে চিৎকার করে উঠেছিল।

www.amarboi.org

জিন্নাহ একটুখানি থামলেন এবং পিন্‌পতনের নিস্তব্ধতা নেমে এল। তার পর তিনি শান্ত কণ্ঠে বললেন " হ্যাঁ ঠিকই গান্ধী একজন বিরাট হিন্দু নেতা এতে কোন সন্দেহ নেই।" এর পরে হিন্দু মুসলমান ছাত্ররা তার বক্তৃতা নীরবে শুনে গিয়েছিল। এই ঘটনা থেকে জিন্নাহর মনোবল ও বিরোধী পক্ষকে উপযুক্ত উত্তর দিয়ে নিশ্চুপ করে দেয়ার অসাধারণ ক্ষমতার পরিচয় পাওয়া যায়। মুসলমানদের নেতা হিসেবে এরপর অল্প কয়েক বৎসরের মধ্যে সমগ্র ভারতের বিভিন্ন গোষ্ঠীর স্বার্থে ও সম্প্রদায় বিভক্ত মুসলমানদের তিনি যেভাবে সংগঠিত করে এক পাতাকাতলে নিয়ে এসে এক বিরাট শক্তিতে পরিণত করেছিলেন তা যেমনি বিস্ময়কর তেমনি অবিশ্বাস্য। এটা সম্ভব হয়েছিল তাঁর অবিশ্বাস্য দৃঢ়চিত্ততা কৌশলী নীতি ও অনমনীয় মনোভাবের জন্য। কয়েক ব ৎসরের মধ্যে তিনি ভারতের দশ কোটি মুসলমানদের একচ্ছত্র নেতার আসনে সমাসীন হলেন এবং এস্থানে উন্নীত হবার ব্যাপারে তাঁকে বেশ কিছুটা সুযোগ এনে দিল দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ।

ইতিমধ্যে জার্মানী প্রথমে চেকোশ্লোভাকিয়া গ্রাস করার পর পোল্যান্ড আক্রমণ করে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সূচনা করেছে। মিত্র পক্ষ ৩রা সেপ্টেম্বর ১৯৩৯ সনে জার্মানীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করল। বড়লাট লর্ড লিনলিথগো ভারতের রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ বা কেন্দ্রীয় আইন সভার মতামত না নিয়েই ঘোষণা করলেন যে, ভারত জার্মানীর সঙ্গে যুদ্ধে লিপ্ত হয়ে পড়েছে। যেহেতু হিটলারের ফ্যাসিস্ট জার্মানীর সঙ্গে যুদ্ধ-তাই গান্ধীজী বিনা শর্তে মিত্রপক্ষকে সাহায্য করার পক্ষপাতি ছিলেন। কিন্তু কংগ্রেস এই ব্যাপারে দ্বিমতপোষণ করল। জঙ্গী নেতা জওহরলাল, প্যাটেল, সুভাষ বোস প্রমুখের নেতৃত্বে কংগ্রেস সিদ্ধান্ত নিল যে, যুদ্ধের ব্যাপারে সহযোগিতার পূর্বে শর্ত হবে স্বাধীনতার স্বীকৃতি যদিও কংগ্রেসের মডারেট অধিকাংশ নেতা এ যুদ্ধকে ফ্যাসিস্ট জার্মানীর বিরুদ্ধে গণতন্ত্রের লড়াইয়ের বিবেচনায় যুদ্ধের ব্যাপারে মিত্র পক্ষের প্রতি সহানুভূতিশীল ছিলেন। যা' হোক স্বাধীনতা দানের পূর্ব স্বীকৃতির ব্যাপারে বৃটিশ সরকার রাজি হলো না। তারা এটাকে নাজুক সময়ে অন্যায় দরকষাকষি বলে মনে করলেন। ইংরেজ সিভিলিয়ানদের মধ্যে অনেকে কংগ্রেসের অনেক চরমপন্থী নেতার উগ্র কথাবার্তা ও বক্তৃতায় কংগ্রেসের প্রতি বিরূপ মনোভাব পোষণ করছিল। আবার ইংরেজদের মধ্যে অনেকেরই ভারতকে নিঃশর্ত স্বাধীনতা দেয়ার বিপক্ষে ছিল। ফলে কংগ্রেসের দাবি স্বীকৃত

www.amarboi.org

হলো না। এর ফলে কংগ্রেস হিন্দু সংখ্যাগরিষ্ঠ প্রদেশগুলোর মন্ত্রীমন্ডলীকে পদত্যাগ করার নির্দেশ দিল।

জিন্নাহ্ আবার অত্যন্ত বিচক্ষণতার সঙ্গে তাঁর হাতের তাস খেলে চললেন। তিনি বৃটিশ সরকারকে যুদ্ধের ব্যাপারে সাহায্যের আভাস দিলেন শুধু এই শর্তে যে, ভবিষ্যতে যে কোন শাসনতন্ত্র প্রণয়ন হবে তাতে মুসলমান স্বার্থ সন্তোষজনক ভাবে রক্ষিত হবে। তিনি এখনই স্বাধীনতার ব্যাপারে চাপ সৃষ্টি করলেন না।

যুদ্ধে সহযোগিতাদানের ব্যাপারে কংগ্রেস ও লীগের এ মতপার্থক্য ও স্বাধীনতা প্রাপ্তির জন্য বৃটিশ সরকারের উপর চাপ সৃষ্টির ব্যাপারে কৌশলগত মতপার্থক্য বৃটিশ সরকারের সামনে সুযোগ এনে দিল এবং বৃটিশ সরকার সে সুযোগ গ্রহণ করতে বিলম্ব করলেন না। বড় লাট লর্ড লিনলিথগো বুঝতে পারলেন যে, যুদ্ধে সহযোগিতার জন্য কংগ্রেস নিশ্চয়ই বড় রকমের রাজনৈতিক সুবিধা দাবি করবে, তাই তিনি দেশের বড় বড় স্বার্থের প্রতিভূ, বিভিন্ন সম্প্রদায়ের নেতৃবর্গ, দেশীয় রাজন্যবর্গের, চেম্বারের চ্যান্সেলর ও মিঃ জিন্নাহকে আহবান করলেন এবং প্রত্যেকের সঙ্গে আলাদা আলাদাভাবে সাক্ষাৎ করলেন।

বড় লাটের সঙ্গে জিন্নাহর সাক্ষাতকার কংগ্রেসকে বেশ ক্ষুব্ধ করলো। ভবিষ্যৎ শাসনতন্ত্র রচনায় মুসলামনদের স্বার্থ পুরোপুরি রক্ষিত হবে এই আশ্বাসের ভিত্তিতে লীগের সহযোগিতার আশ্বাসে বৃটিশ রাজের পক্ষে কংগ্রেসের চাপ অনেকটা প্রতিহত করা সম্ভব হলো। ভারত সরকারের অনমনীয় মনোভাবের ফলে কংগ্রেস মন্ত্রিসভাগুলো পদত্যাগ করায় জিন্নাহ মুসলমানদেরকে হিন্দুদের অত্যাচার থেকে মুক্তির জন্য আল্লাহর কাছে শোকরিয়া জানিয়ে নাজাত দিবস পালনের নির্দেশ দিলেন। এবং সমগ্র ভাতরব্যাপী মুসলমানরা নাজাত বা মুক্তি দিবস পালন করলো। এই নাজাত দিবস পালন কংগ্রেস ও হিন্দু সম্প্রদায়কে মুসলমানদের প্রতি আরো বিরূপ মনোভাব সম্পন্ন করে তুলল কারণ তারা মনে করত লীগের কথিত অভিযোগ অধিকাংশই ছিল মিথ্যা।

জিন্নাহ-বড়লাট সক্ষাতকার গান্ধীকে বেশ খানিকটা ক্ষুব্ধ করলো অধিকাংশ কংগ্রেস নেতা বিশ্বাস করতেন জিন্নাহ্ ভারতের স্বাধীনতা বিরোধী কোন কাজ করবেন না। বড় লাটের সঙ্গে তাঁর সাক্ষাতকার একটি কৌশলমাত্র। রাজমোহন গান্ধী লিখেছেনঃ

www.amarboi.org

As Rajagopalachari, Premier of Madras said shortly after the Jinnah- Linlithgow meeting: " Do I not know Mr. Jinnah? Do I not know the innermost ambiton of his heart that India should be free?"

মাদ্রাজের প্রধানমন্ত্রী রাজা গোপাল আচারী জিন্নাহ্-লিনলিথগো সাক্ষাতকারের পরে বলেছেন, "আমি কি জিন্নাহ্কে জানি না? আমি কি জানি না যে, তাঁর মনের গভীরে যে আকাঙ্খা রয়েছে সেটা হলো ভারতের স্বাধীনতা প্রাপ্তি"?

কংগ্রেস মন্ত্রিসভাগুলোর পদত্যাগের পর নাজাত দিবস পালনের শেষে মুসলিম সম্প্রদায়ের মনোভাব দ্রুত পরিবর্তন দেখা দিল। এতদিনকার পরিচয় ধর্মাবলম্বী হিসেবে মুসলমান কিন্তু জাতি হিসেবে ভারতীয় পরিচয় থেকে ধর্মাবলম্বী হিসেবে মুসলমান জাতি হিসেবে ও মুসলমান এই পরিচয়ে মুসলমানরা নিজেদের অভিহিত করতে লাগলো। গান্ধী মুসলমানদের এই মানসিক ভাবধারার পরিবর্তনের গতিরোধ করার চেষ্টা করলেন। তাঁর পরামর্শে মুসলমানদের মনোভাবকে প্রভাবিত করার জন্য ১৯৪০ সনে মওলানা আবুল কালাম আজাদকে কংগ্রেসের সভাপতি করা হল। জিন্নাহ্কে খুশি করার জন্য গান্ধী এক পত্রে তাঁকে প্রিয় কায়দে আযম বলে সম্বোধন করলেন। হরিজন পত্রিকায় এক প্রবন্ধে তিনি কংগ্রেসের বিরুদ্ধে তফসিলী সম্প্রদায়ের নেতা ডঃ আম্বেতকার ও তামিলদের নেতা রামস্বামী নাইকার যিনি মাদ্রাজে বহু তামিলকে কংগ্রেসের বিরুদ্ধে সংগঠিত করেছিলেন তাদের নিয়ে কংগ্রেসের বিরুদ্ধে জোর আন্দোলন গড়ে তোলার জন্য জিন্নাহ্কে অনুরোধ জানান। এই আন্দোলনে কংগ্রেস ক্ষতিগ্রস্ত হবার সম্ভাবনা থাকলেও গান্ধী আশা করেছিলেন যে, জিন্নাহ্ এই আন্দোলন গড়ে তুললে মুসলমানরা বিচ্ছিন্নতাবাদের পথ থেকে সরে আসবে এবং অখণ্ড ভারতের দর্শন বজায় থাকবে। কিন্তু জিন্নাহ্ গান্ধীর এ টোপ গিললেন না। তিনি উত্তর দিলেন ভারত যে একটা জাতি নয়, একটা দেশও নয় এব্যাপারে আমার বিন্দু মাত্র বিভ্রান্তি নেই। এটা বিভিন্ন জাতি অধ্যুষিত একটি উপমহাদেশ। এবার থেকে তিনি শুধু কংগ্রেসের বিরুদ্ধে সংগ্রামই করবেন না বরং ভারতীয়রা এক জাতি এই ধারণার বিরুদ্ধেও এখন থেকে সংগ্রাম করবেন। তিনি আম্বেতকার ও নাইকারকেও এ ধারণার বিরুদ্ধে সংগ্রামে উদ্বুদ্ধ করতে চেষ্টা চালাবেন বলে জানালেন।

www.amarboi.org

১৯৪০ সনের লাহোর প্রস্তাব

১৯৪০ সনের মার্চ মাসে লাহোরে জিন্নাহ্ মুসলমানরা যে আলাদা জাতি এ দাবি প্রকাশ্যে উত্থাপন করে বললেন যে, ভারতের উত্তর পশ্চিমে ও পূর্বাঞ্চলে মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ এলাকা নিয়ে স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্রগঠনের দাবি পূরণ ছাড়া অন্য কোন ব্যবস্থাতেই তিনি রাজি হবেন না। প্রস্তাবটি উত্থাপন করবেন বাংলার প্রধানমন্ত্রী ও লীগের সভাপতি এ, কে ফজলুল হক। কবি ও দার্শনিক ইকবাল ১৯৩০ সন থেকে এরূপ একটি স্বতন্ত্র মুসলিম রাষ্ট্রের কথা বলে আসছিলেন এবং জিন্নাহ্‌কে ১৯৩৭ সনে এটি গ্রহণের জন্য উদ্বুদ্ধ করতে চেষ্টা করেছিলেন। তবে তিনি এই কল্পিত রাষ্ট্রের নাম পাকিস্তান দেন নি। অবশ্য লাহোর প্রস্তাবেও একে পাকিস্তান নামে অভিহিত করা হয়নি। ত্রিশ দশকের প্রথম দিকে খাজা আবদুর রহিম নামে একজনের মাথায় এ নামটি প্রথম আসে। নামটির অর্থ হলো 'পবিত্রভূমি' এবং এটি উচ্চারিত হলো ইংরেজী ভাষায়। পাঞ্জাব, আফগানিস্তান অর্থাৎ উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ, সিন্ধুর আধ্যক্ষর ও বেলুচিস্তানের শেষ অক্ষর নিয়ে 'PAKISTAN' শব্দটি গঠিত হয়। তৎকালে কেমব্রীজের এক ছাত্র রহমত আলী প্রথম এ শব্দটি মুদ্রিত আকারে প্রকাশ করে কিছু লোকের মধ্যে বিতরণ করে। এটা ঘটেছিল ১৯৩৩ সনে, লাহোর প্রস্তাবের মধ্য দিয়ে এ চিন্তা রূপ লাভ করার সাত বৎসর পূর্বে। প্রস্তাবিত রাষ্ট্রের একটি নামকরণ করা প্রয়োজনবোধে পত্রিকাগুলো এটিকে পাকিস্তান নামকরণ করে এবং কিছুদিন পরে লীগও সে নাম গ্রহণ করে। এখানে উল্লেখযোগ্য যে নানা বিতর্ক সৃষ্টির আশংকায় জিন্নাহ কখনও এই স্বাধীন রাষ্ট্র বা রাষ্ট্রসমূহের সীমানা সম্পর্কে স্পষ্টভাবে কখনও কিছু বলেননি। তবে পাঞ্জাব ও বাংলার পুরাটাই পাকিস্তানে আসবে এরূপ একটি ধারণা সৃষ্টিতে প্রকারান্তরে সাহায্য করেছিলেন।

লাহোর প্রস্তাবের উপর ৬০ হাজার ডেলিগেটের সামনে জিন্নাহ সেদিন দু' ঘন্টা ধরে যে বক্তৃতা দিয়েছিলেন তা ছিল যেমনই হৃদয়গ্রাহী, যুক্তিজালে সমর্থিত, চিত্তাকর্ষক তোমনই ছিল আবেগময় ও প্রাণস্পর্শী। বক্তৃতার প্রথম দিকে খানিকটা উর্দু থাকলেও পরের সম্পূর্ণ অংশ ছিল ইংরেজীতে। শ্রোতৃমন্ডলী তাঁর বক্তৃতার অধিকাংশ না বুঝলেও মন্ত্রমুগ্ধের মত দু'ঘন্টা ধরে তাঁর বক্তৃতা শুনছিল এবং মাঝে মাঝে সোল্লাশে হাততালি দিচ্ছিল। বক্তৃতাকালে জিন্নাহর কণ্ঠস্বর কখনও আবেগ, কখনও উষ্মা, বা অনুকম্পা, কখনও ব্যঙ্গ, কখনও বা কংগ্রেসের প্রতি বিদ্রুপে মুখর হয়ে উঠছিল। তিনি

www.amarboi.org

তাঁর বক্তৃতায় বললেন, 'হিন্দু মুসলমান সমস্যা আর ভারতবর্ষের আভ্যন্তরীণ প্রশ্ন বা সংখ্যাগুরু-সংখ্যালঘুর ব্যাপার নয়। এই বিবাদকে আন্তর্জাতিক পর্যায়ে উন্নীত করে তিনি ঘোষণা করলেনঃ "ভারতবর্ষের সমস্যা আন্তঃসাম্প্রদায়িক চারিত্র্যযুক্ত নয়। প্রকাশ্যতঃ এটা আন্তর্জাতিক ধরনের এবং তাই অবশ্যাম্ভাবীরূপে একে তদনুরূপ বিবেচনা করতে হবে। এই মূলভীত ও মৌলিক সত্য উপলব্ধি না করা পর্যন্ত যে সংবিধানই রচনা করা হোক না কেন, তা এক দুর্বিপাকেরই সৃষ্টি করবে। তা' কেবল মুসলমানদের পক্ষেই ধ্বংসাত্মক এবং ক্ষতিকারক বলে প্রতিপন্ন হবে না, ব্রিটিশ ও হিন্দুদের উপরও তার একই পরিণাম হবে। ব্রিটিশ সরকার যদি এই উপমহাদেশের অধিবাসীদের শান্তি ও সুখের জন্য যথার্থই আন্তরিকতাসম্পন্ন হন তা হলে আমাদের সকলের সামনে যে একমাত্র পথ খোলা আছে তা হল ভারতবর্ষকে 'স্বয়ংশাসিত জাতীয় রাষ্ট্রে' বিভক্ত করে বিভিন্নজাতিগুলিকে (Nation) পৃথক পৃথক বাসভূমি পেতে দেওয়া।"

অতঃপর দ্বিজাতিতত্ত্বের স্বপক্ষে-যুক্তিজাল বিস্তার করে বললেন, "একথা উপলব্ধি করা অত্যন্ত কঠিন যে, কেন আমাদের হিন্দু-বন্ধুরা ইসলাম এবং হিন্দুধর্মের সঠিক তাৎপর্য অনুধাবন করতে ব্যর্থ হল। প্রচলিত অর্থে এদের ধর্ম বলা চলে না। এগুলো আসলে পৃথক এবং স্বাতন্ত্র্যবিশিষ্ট সমাজ ব্যবস্থা। হিন্দু ও মুসলমানেরা আদৌ কোনদিন একজাতিতে পরিণত হবে এ এক স্বপ্ন। এক ভারতীয়তার এই ভ্রান্ত ধারণা সীমাবহির্ভূতভাবে এতদূর শিকড় বিস্তার করেছে যে, এটা রয়েছে বর্তমানের অধিকাংশ সমস্যার মূলে এবং সময়ে যদি আমরা আমাদের ধারণার সংশোধন না করি তাহলে এর পরিণতিতে ভারতবর্ষ ধ্বংস হয়ে যাবে। হিন্দু ও মুসলমানেরা দুই ভিন্ন ভিন্ন ধর্মীয় দর্শন, সামাজিক প্রথা ও সাহিত্যের এলাকাভুক্ত। তাদের মধ্যে না বৈবাহিক বন্ধন স্থাপিত হয়, না তারা একত্রে পান ভোজন করেন। সত্যি কথা বলতে কি তারা দুই পৃথক পৃথক সভ্যতার অঙ্গ, যার ভিত্তি প্রধানতঃ পরস্পর সংঘর্ষরত ভাবধারা ও ধারণা। জীবনের প্রতি ও তার সম্বন্ধে তাদের দৃষ্টিভঙ্গি ভিন্ন। একথাও স্পষ্ট যে, হিন্দু ও মুসলমান ইতিহাসের ভিন্ন ভিন্ন উৎস থেকে নিজ নিজ প্রেরণা সংগ্রহ করেন। তাঁদের মহাকাব্য তার নায়ক এবং ঘটনাবলীও পৃথক। প্রায়শঃ একের নায়ক অপরের শত্রু এবং অনুরূপভাবে তাদের জয়পরাজয় ও অঙ্গাঙ্গীভাবে সম্পর্কিত এই রকম দু'টি জাতিকে এক রাষ্ট্রের জোয়ালে জুড়লে এর একটি হবে সংখ্যাগরিষ্ঠ ও অপরটি সংখ্যালঘু। ঐ জাতীয় রাষ্ট্রের সরকারের জন্য যে

www.amarboi.org

ঐক্যসূত্র রচিত হবে তার বিরুদ্ধে অসন্তোষ বৃদ্ধি পেতে পেতে শেষ অবধি তা ধ্বংস হয়ে যাবে।"

ভারত বিভাজনের পক্ষে তাঁর যুক্তি হলঃ "বলকান এলাকায় সাত-আটটি সার্বভৌম রাষ্ট্র আছে। অনুরূপভাবে ইবিরিয়ান অঞ্চলে পর্তুগীজ ও স্পেনীয়রা বিভক্ত। তথাপি এক অস্তিত্বহীন ভারতের ঐক্য ও অখণ্ড জাতীয়তার দোহাই দিয়ে এদেশে এক কেন্দ্রীয় সরকারের কথা বলা হচ্ছে যদিও আমরা জানি যে, গত বারো শত বৎসরের ইতিহাসে এমন কোন ঐক্যসাধিত হয়নি এবং এই দেশ বরাবরই হিন্দুভারত ও মুসলমান ভারত রূপে বিভক্ত থেকেছে। আজকে যে কৃত্রিম ঐক্য দেখা যায় তার সূচনা ব্রিটিশ বিজয়ের লগ্নে এবং এ বজায় ও রয়েছে তাদের অস্ত্রের বলে।" কোন রকম অস্পষ্টতা বা দ্বিধা সংকোচ না রেখে তিনি ঘোষণা করলেনঃ "মুসলিম-ভারত এমন কোন সংবিধান স্বীকার করতে পারে না যার পরিণতি হবে হিন্দু সংখ্যাগরিষ্ঠ সরকার। গণতান্ত্রিক প্রথার নাম দিয়ে হিন্দু ও মুসলমানদের একত্র করে সেই প্রথা সংখ্যালঘুদের উপর চাপিয়ে দিলে তার একটিই মাত্র অর্থ হবে এবং তা হল হিন্দু রাজত্ব। কংগ্রেস হাইকমান্ড যে ধরনের গণতন্ত্রের জয়গান করেন তার অর্থ হল ইসলামের দৃষ্টিতে সর্বাপেক্ষা মূল্যবান সবকিছুর সম্পূর্ণ বিনাশ।" হিন্দু-মুসলমানের মিলন যে অসম্ভব এই বক্তব্যের সমর্থনে তিনি লাজপাৎ রায়ের উক্তি উদ্ধৃত করলেন। তাই তাঁর দাবি হল, "জাতি (Nation) শব্দের যে কোন পরিভাষা অনুসারে মুসলমানেরা একটি জাতি এবং তাদের নিজস্ব বাসভূমি, এলাকা এবং রাষ্ট্র চাই।"

পূর্বে যেমন বলা হয়েছে- এর অনুসরণে ২৩ শে মার্চ নিখিল ভারত মুসলিম লীগ ভারত বিভক্তি সম্পর্কে নিম্নোক্ত প্রস্তাব গ্রহণ করলঃ

"নিখিল ভারত মুসলিম লীগের এই অধিবেশনের সুবিবেচিত অভিমত এই যে, নিম্নোক্ত মূলনীতি অনুযায়ী না হলে কোন সাংবিধানিক পরিকল্পনা এদেশে কার্যকরী হবে না বা মুসলমানদের পক্ষে গ্রহণযোগ্য হবে না। এই মূলনীতি হল ভৌগোলিক দিক থেকে পরস্পর সমন্বিত এলাকাসমূহকে প্রয়োজনীয় আঞ্চলিক ব্যবস্থাপিতকরণের (Readjustment) সহায়তায় এমনভাবে পৃথক পৃথক এলাকায় পরিণত করতে হবে যেন ভারতবর্ষের উত্তর-পশ্চিম ও পূর্বাঞ্চলের মত যে সব এলাকায় মুসলমানরা সংখ্যাগরিষ্ঠ সেগুলোকে একত্র করে "স্বাধীন রাষ্ট্রসমূহের State গঠন করা সম্ভব হয় যার অঙ্গীভূত এলাকাসমূহ স্বয়ংশাসিত ও সার্বভৌম হবে।"

www.amarboi.org

এইভাবে মুসলমান "জাতির জন্য আত্মনিয়ন্ত্রণ ও স্বতন্ত্র বাসভূমির দাবি উপস্থাপিত করে একদিকে জিন্নাহ্ যেমন তাঁর অনুগামীদের চোখে পাকিস্তানের জনক ঐতিহাসিক পুরুষে পরিণত হলেন, অন্যদিকে তাঁর সমালোচকদের দৃষ্টিতে মুসলিম বিচ্ছিন্নতাবাদের প্রবলতম প্রবক্তারূপে পরিগণিত হলেন।

প্রথম সিমলা কনফারেন্স

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ চলাকালীন সময়ে যুদ্ধ প্রচেষ্টায় ভারতীয়দের পূর্ণ সহযোগিতা পাওয়ার লক্ষ্যে ভারতীয় নেতাদের ঐকমত্যে আনার জন্য বৃটিশ সরকারের প্রচেষ্টা এসময় অব্যাহত ছিল। বড় লাট লিনলিথগো ১৯৪০ সনের জুন মাসে গান্ধী এবং জিন্নাহকে সিমলাতে তাঁর সঙ্গে দেখা করার জন্য অনুরোধ জানালেন। তিনি আশা করেছিলেন তাদের উভয়ই কংগ্রেস ও লীগকে যুদ্ধ প্রচেষ্টায় সাহায্যের ব্যাপারে উৎসাহিত করতে সক্ষম হবে।

দেওয়ান চেমন লাল ও অন্যান্য নির্দলীয় বন্ধুরা আশা করেছিলেন যে বড় লাটের সঙ্গে দেখা করার পূর্বে তারা উভয়ই মিলিত হয়ে আলাপ করলে ভারতের স্বাধীনতার দাবি শক্তিশালী হবে। কিন্তু দুঃখের বিষয় উভয়ের অহমিকার কারণে এই পারস্পরিক সহযোগিতা সম্ভব হলো না। এ সম্পর্কে দেওয়ান চমন লাল বলেছেনঃ "আমি গান্ধীর নিকট গিয়ে জিন্নাহ্র সঙ্গে দেখা করার প্রস্তাব দিলাম। মহাত্মা গান্ধী একটি সাদা চাদরের উপর বসে একটি রৌপ্য পাত্র থেকে কিছু ভক্ষণ করছিলেন। আমি যখন গান্ধীকে প্রস্তাব দিলাম তিনি আমার দিকে তাকিয়ে চমকপ্রদ উত্তর দিলেন "বিপদে পড়ে মানুষ অপরিচিত ব্যক্তিকেও শয্যাসঙ্গী করতে বাধ্য হয়।" দেওয়ান চমন লাল অতঃপর সিসিল হোটেলে গিয়ে জিন্নাহ্ এবং গান্ধী ঐকমত্য হলে কি সুবিধা হবে তা বর্ণনা করে জিন্নাহ্কে জিজ্ঞাসা করলেন, "আমি কি গান্ধীকে বলতে পারি আপনি তাঁর সঙ্গে দেখা করতে চান ? জিন্নাহ্ উত্তর দিলেনঃ "না, আমি তাঁর সঙ্গে দেখা করতে পারি যদি তিনি ইচ্ছা প্রকাশ করেন। কিন্তু আমি চাই না যে, আপনি তাঁকে বলেন, আমি তাঁর সঙ্গে দেখা করতে চাই।"

দেওয়ান চেমন লাল তখন মহাত্মার কাছে ফিরে গিয়ে জানতে চাইলেন তিনি জিন্নাহ্র সঙ্গে দেখা করতে চান কিনা? গান্ধী উত্তর দিলেনঃ "আমাকে যদি বলতে হয় যে আমি জিন্নাহ্র সঙ্গে দেখা করতে আগ্রহী তবে বলবো এটা সম্পূর্ণ মিথ্যা। কিন্তু জিন্নাহ্ যদি আমার সঙ্গে দেখা করতে চান তবে আমি সিসিল হোটেল পর্যন্ত খালি পায়ে হেঁটে যেতে রাজি আছি।"

www.amarboi.org

ফল হল এই গান্ধী ও জিন্নাহ্ কেউ কারো সঙ্গে দেখা করলেন না এবং ভাইসরয় এর সঙ্গে দেখার আগে উভয়ের ঐক্যের যে ক্ষীণ আশা দেখা দিয়েছিল তা হারিয়ে গেল। বড় লাটের সঙ্গে আলাপে জিন্নাহ্ পহেলা জুলাই তাঁর প্রস্তাব দিলেন যাতে তিনি ভারত বিভাগের কথা উত্থাপন করলেন এবং কি কি শর্তে তাঁর অনুগামীরা যুদ্ধ প্রচেষ্টায় সমর্থন দিতে পারে সে কথা বললেন। তিনি পরিষ্কার জানালেন যুদ্ধ প্রচেষ্টায় প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টিতে তাদের কোন পরিকল্পনা নেই। তাদের অবস্থান হলো বদান্য নিরপেক্ষতা।

নির্দলীয় নেতৃবৃন্দ সিমলাতে জিন্নাহ্ ও গান্ধী দু'নেতাকে একত্রে মিলিত করার প্রচেষ্টা ব্যর্থ হবার পর ১৯৪১ সনের গোড়ার দিকে দেশে রাজনৈতিক অচলাবস্থা দূরীকরণার্থে বোম্বেতে একটি নির্দলীয় সম্মেলনের আয়োজন করে উদারনৈতিক নেতা সাপ্রুর নেতৃত্বে পুনরায় জিন্নাহ-গান্ধী বৈঠকের চেষ্টা করা হয়, কিন্তু সেই চেষ্টাও ব্যর্থ হয়। এ সময়ে ভারত-বিভক্তির বিরুদ্ধে যুক্তি উত্থাপনকারী প্রভাবশালী নেতা গান্ধী ও অন্যান্যদের যুক্তি খন্ডনে জিন্নাহ্ অসামান্য কৃতিত্ব প্রদর্শন করেন। ২রা মার্চ পাঞ্জাব মুসলিম ছাত্র ফেডারেশন কর্তৃক আহূত পাকিস্তান সম্মেলনে জিন্নাহ্ পরিষ্কারভাবে উল্লেখ করেন কোন ইংরেজ ভিন্নধর্ম গ্রহণ করলেও ইংরেজ-ই থেকে যায় গান্ধীর এ যুক্তি ভারতবর্ষের ক্ষেত্রে খাটে না। কারণ এখানে হিন্দু-ধর্ম গ্রহণকারী মাত্রেই হিন্দুদের চোখে ম্লেচ্ছ থেকে যায় এবং হিন্দুরা সামাজিক, ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক কোন ক্ষেত্রে তার সঙ্গে আর সম্পর্ক রাখে না। এদেশে ধর্মান্তরিত ব্যক্তি সম্পূর্ণ এক ভিন্ন ব্যবস্থার সদস্য হয়ে পড়ে।

ভারতবর্ষে মুসলমানরা এই সেই দিন ধর্মান্তরিত-গান্ধীর এই যুক্তির জবাবে জিন্নাহ্ বলেন "প্রায় এক হাজার বছর অতিক্রান্ত হবার পর অধিকাংশ মুসলমান এক ভিন্ন জগত, ভিন্ন সমাজ, ভিন্ন দর্শন এবং এক ভিন্ন বিশ্বাসের আওতাভুক্ত হয়ে গেছে। তিনি প্রশ্ন করেন এই বাস্তব জগৎকে উপেক্ষা করে শুধু ধর্ম পরিবর্তন পাকিস্তান দাবির পক্ষে যুক্তি হতে পারে না গান্ধীর এই অযৌক্তিক বাগাড়ম্বরকে কি আপনারা সত্য বলে মেনে নিতে পারেন?"

ইসলাম দেশ বিভাগের বিরোধী-গান্ধীর এই বক্তব্যের খন্ডন প্রসঙ্গে নাটকীয়ভাবে জিন্নাহ্ বলেন, "ভদ্রমহোদয় ও ভদ্রমহোদয়াগণ। আমি শাস্ত্রজ্ঞ মৌলানা বা মৌলভী নই, আর ধর্মতত্ত্ব সম্বন্ধে আমার জ্ঞান আছে, এমন দাবিও

www.amarboi.org

আমি করি না। তবে আমার ধর্ম বিশ্বাস সম্বন্ধে অল্প স্বল্প আমিও জানি এবং আমার ঐ ধর্ম বিশ্বাসের আমি এক দীন কিন্তু গর্বিত অনুগামী। ইশ্বরের দোহাই, আমি কি একথা জানতে পারি যে, এই লাহোর প্রস্তাব কি করে ইসলাম বিরোধী হল ? কেন এ ইসলাম-বিরোধী ?" ভারত-বিভাজন মুসলিম স্বার্থের পরিপন্থী-এর জবাবও দিলেন তিনি অনুরূপ নাটকীয় ভঙ্গিতে। বললেন, "আমার হিন্দু বন্ধুদের আমি বলি দয়া করে আমাদের বিরক্ত করবেন না। আমাদের ভুল দেখিয়ে দেবার জন্যে আপনাদের আমরা আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই। এর পরিণতির সম্মুখীন হতে আমরা প্রস্তুত। ...দয়া করে নিজেদের সামলান।" দেশ বিভাগে সংখ্যালঘু সমস্যার সমাধান হবে না, প্রস্তাবিত উভয় রাষ্ট্রেই যথেষ্ট সংখ্যক সংখ্যালঘু থেকে যাবেন-এই যুক্তির বিরুদ্ধে তিনি বললেন,"যুক্তি হিসেবে কি আপনারা একথা উল্লেখ করতে চান যে হিন্দু-সংখ্যালঘুরা অথবা মুসলমান অঞ্চলসমূহের সংখ্যালঘুরা সংখ্যালঘু হয়েই থেকে যাবেন বলে ৯ কোটি মুসলমান এক কৃত্রিম 'অবিভাজিত ভারতে', যেখানে এককেন্দ্রিক শাসন ব্যবস্থা চলবে যেখানে সংখ্যালঘু হিসেবে বসবাস করবেন যাতে আপনারা তাদের সকলের উপর প্রভূত্ব করতে পারেন...?" যুক্তির দিক থেকে জিন্নাহ্‌র এই বক্তব্য ছিল অপ্রতিরোধ্য।

বড়লাটের জাতীয় প্রতিরক্ষা পরিষদ গঠন ও জিন্নাহর আপত্তি

১৯৪১ সালের জুলাই মাসে বড় লাট জাতীয় প্রতিরক্ষা পরিষদ গঠন করে। বাংলা, পাঞ্জাব ও আসামের প্রধানমন্ত্রী ফজলুল হক, স্যার সেকান্দর হায়াতখান ও স্যার সাদুল্লাসহ আরো তিনজনকে সদস্য হিসাবে নিযুক্ত করেন। এদের অন্তর্ভুক্তির ব্যাপারে বড়লাট জিন্নাহ্‌র সঙ্গে কোনরূপ পরামর্শের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেননি। এভাবে লীগ এবং তার কার্যকরী পরিষদকে এড়িয়ে এদেরকে ডিফেন্স কাউন্সিলের মেম্বার করায় জিন্নাহ্ আপত্তি তুললেন এবং বললেন যে মুসলমান সমাজের প্রতিনিধি হিসাবে কাউকে নির্বাচন করতে হলে মুসলমানদের একমাত্র প্রতিনিধিত্বকারী প্রতিষ্ঠান লীগের অনুমতি নিতে হবে। তাই জিন্নাহ্ সবাইকে পদত্যাগ করার নির্দেশ দিলেন। যদিও সেকান্দার হায়াত খান ও ফজলুল হক, সাদুল্লা যুক্তি দেখালেন যে, তাদেরকে নিজ নিজ দেশের প্রধানমন্ত্রী হিসাবে যুদ্ধ প্রচেষ্টায় সাহায্য করার জন্য প্রতিরক্ষা পরিষদে নেয়া হয়েছে, কিন্তু জিন্নাহ তাতে সন্তুষ্ট হলেন না। তাদেরকে কি হিসাবে প্রতিরক্ষা পরিষদের মেম্বার করা হয়েছে এর ব্যাখ্যা চাওয়ায় বড়লাট ও ভারত সচিব আমেরী ঘোষণা করলেন যে, তাদেরকে মহান মুসলিম সম্প্রদায়ের প্রতিনিধি

www.amarboi.org

হিসাবে নিযুক্ত করা হয়েছে। লীগ ও তার প্রেসিডেন্টকে পাশ কাটিয়ে এদের নিযুক্তি সম্পূর্ণ অবৈধ ঘোষণা করে জিন্নাহ্ এদেরকে পদত্যাগের জন্য কঠোরভাবে নির্দেশ দিলেন। প্রথমে তাঁরা ইতস্ততঃ ও অসন্তুষ্টি প্রকাশ করলেও শেষ পর্যন্ত ছয়জনই পদত্যাগ করল। পদত্যাগকারীদের মধ্যে বাকি তিনজন হলো ছতরির নবাব, বেগম শাহ্ নেওয়াজ ও স্যার সুলতান আহমদ। বাংলার ফজলুল হকই সব চাইতে বিলম্বে পদত্যাগ করেন এবং জিন্নাহ্ সাহেবের সঙ্গে খানিকটা বাকবিতন্ডায় লিপ্ত হন কিন্তু শেষ পর্যন্ত জনমতের চাপে পদত্যাগে সম্মত হয়ে জিন্নাহ্র কাছে নিঃশর্ত ক্ষমা প্রার্থনা করেন।

এক পর্যায়ে এভাবে বড়লাটের ডিফেন্স কাউন্সিলের মেম্বার নিযুক্তির ব্যাপারটা লীগের রাজনৈতিক মর্যাদা ও জিন্নাহর শক্তি পরীক্ষার প্রশ্ন হয়ে দাঁড়িয়েছিল। যা হোক জিন্নাহর কঠোর মনোভাব দৃষ্টে সবাই যখন পদত্যাগ করল তখন লীগের মর্যাদা অনেকাংশে বৃদ্ধি পেল এবং মুসলিম সমাজে লীগ দ্রুত জনপ্রিয়তা অর্জন করতে লাগল। ১৯৪০ সালের ২৫শে ডিসেম্বর মুহম্মদ আলী জিন্নাহ্র বয়স ৬৪ বৎসর পূর্ণ হলো। যদিও তখন তাঁর ধূসর মস্তকে একটি সাদা চুলের গুচ্ছ স্পষ্ট হয়ে দেখা দিয়েছিল, তথাপি তিনি পূর্বের মতই হালকা পাতলা ঋজু কিন্তু চলাফেরায় যৌবনকালের মতই ক্ষিপ্র ছিলেন। ভারতের অধিকাংশ মুসলমানদের কাছে তিনি তখন আশার আলো হিসাবে প্রতিভাত হচ্ছিলেন। শুধু শিক্ষিত সম্প্রদায়ের কাছে নয় অশিক্ষিত মুসলমান জনগণের কাছেও তিনি তখন কায়দে আযম বা সবচাইতে বড় নেতারূপে সম্মানিত।

সেদিন তাঁর জন্মদিনে সব ধর্মের ৮৩ জন নেতা তাঁকে যে উষ্ণ সংবর্ধনা দিতে গিয়ে তাঁর সম্বন্ধে যে সব উক্তি করেছিলেন তা মনে রাখার মতো। অন্ধ্রপ্রদেশ বিশ্ববিদ্যালয়ের হিন্দু ভাইস চ্যান্সেলর ডঃ সি, আর রেড্ডি লিখেছেন, "তিনি সমস্ত ভারতের গৌরব-শুধু মুসলমানদের একার সম্পত্তি নয়। স্যার ফ্রেডারেক জেসন একজন ক্রিশ্চিয়ান জিন্নাহ্র অসাধারণ পার্লামেন্টারিয়ান দক্ষতার কথা উল্লেখ করে বলেন তিনি ছিলেন একজন অত্যন্ত শক্তিমান তার্কিক এবং একজন প্রথম শ্রেণীর কৌশলী ব্যক্তি। তিনি ছিলেন নির্ভীক ও সম্পূর্ণ দুর্নীতিমুক্ত নিষ্কলঙ্ক ব্যক্তি। স্যার আর, এ, সম্মুখন চেট্টি, আরেকজন হিন্দু ভদ্রলোক তাঁর সম্বন্ধে লিখেন-"জিন্নাহ ছিলেন বাস্তববাদী দেশপ্রেমিক। স্বদেশের রাজনৈতিক মুক্তির ব্যাপারে তাঁর উৎসাহ কারো চাইতে

www.amarboi.org

কম ছিল না।" স্যার কাওয়াসজী জাহাঙ্গীর নামে এক পার্সি ভদ্রলোক যিনি জিন্নাহ্কে তাঁর প্রথম জীবনের পসারহীন দিনগুলোর সংগ্রামের দিন থেকে জানতেন তিনি জিন্নাহ্র দৃঢ় স্বাধীন চিত্ততা, সাহস ও কঠিন নিষ্ঠার কথা বলেন। তিনি আরো বলেন, দেশের স্বার্থের উপর তিনি কখনো নিজের স্বার্থকে স্থান দেননি। রায় বাহাদুর এম,সি রাজা নিম্নশ্রেণীর অচ্ছুতদের একজন হিন্দু নেতা তাঁর সম্বন্ধে যে কথা লিখেছেন তা পূর্বাপর প্রণিধানযোগ্য।

"প্রত্যেক ধর্মের লোকই বিশ্বাস করে যে, ভগবান যুগসন্ধিক্ষণে তাঁর পরিকল্পনা কার্যকরী করার জন্য উপযুক্ত কাউকে পৃথিবীতে প্রেরণ করেন। আমি মনে করি, গান্ধীর নেতৃত্বে ভারতের জনগণকে কংগ্রেস যে ভুল পথে পরিচালিত করছিল তা সংশোধনের জন্য জিন্নাহ্ ভগবান কর্তৃক নির্দিষ্ট ব্যক্তি ছিলেন। কংগ্রেস যতদিন পর্যন্ত দাদাভাই নওরোজী ও গোখলে কর্তৃক প্রবর্তিত উপযুক্ত সমালোচনা ও বৃটিশ সরকারের সঙ্গে কার্যকরী সহযোগিতার পথ অনুসরণ করছিলো ততদিন পর্যন্ত কংগ্রেস এদেশের প্রভূত উপকার করতে সক্ষম হয়েছিল। কিন্তু কংগ্রেস যখন গান্ধীর নির্দেশিত পুরোপুরি অযৌক্তিক ও বৃটিশ বিরোধী পরিকল্পনা গ্রহণ করে সত্য ও অহিংসার নামে আইন অমান্যের অজুহাতে মানুষের মনে আইনের প্রতি অশ্রদ্ধা সৃষ্টি করলো তখনই ব্যাপার অন্যরকম হয়ে দাঁড়াল। এতদ্ব্যতীত মিঃ গান্ধীকে মহাত্মা গান্ধীরূপে অভিহিত করে হিন্দু সমাজের এক কুসংস্কারাচ্ছন্ন অংশের কাছে দেবতা রূপে পূজনীয় করে তুলে তাঁর অসহযোগ আন্দোলনের পক্ষে রাজনৈতিক সমর্থন যোগাল। এই কৌশল যদিও বৃটিশ সরকারকে কংগ্রেসের নিকট কিছু কিছু ক্ষেত্রে ক্ষমতাপ্রদানে বাধ্য করতে সক্ষম হয়েছিল কিন্তু এই কৌশল প্রকারান্তরে ভারতের জনগণকে হিন্দু-অহিন্দু অংশে বিভক্ত করে ফেলেছিল।

এ সময় একজন লোকের প্রয়োজন ছিল যিনি উঠে দাঁড়িয়ে কংগ্রেসকে বলতে পারেন যে, তোমরা সংখ্যা বা আর্থিক দিক থেকে যতই শক্তিশালী হও না কেন তোমরা সমগ্র ভারতের প্রতিনিধিত্ব কর না।

আমি মিঃ জিন্নাহ্কে প্রশংসা করি, কারণ তিনি মুসলমানদের অধিকারের কথা বলতে গিয়ে অন্যান্য সম্প্রদায়ের যারা গান্ধীর নির্দেশ ও অনুপ্রেরণায় উৎসাহী বর্ণ হিন্দুদের স্টীম রোলারের নিচে পিষ্ট হচ্ছিল তাদের অধিকারের কথাও তিনি তুলে ধরেছিলেন।

www.amarboi.org

১৯৪০ সালের ২৫শে ডিসেম্বর জিন্নাহ্‌র ৬৪তম জন্মবার্ষিকীতে ভারতের ৮৩ জন বিশিষ্ট হিন্দু-মুসলিম নেতার উপরোক্ত শুভেচ্ছাবাণী প্রমাণ করে তিনি তাঁর সাহস, প্রজ্ঞা নির্মল চরিত্র ও নেতৃত্ব সুলভ যোগ্যতার জন্য তৎকালে সমগ্র ভারতব্যাপী কতখানি জনপ্রিয়তা ও সম্মানের অধিকারী হয়েছিলেন।

১৯৪১ সালের ডিসেম্বরে জাপান পার্ল হারবার আক্রমণের দ্বারা যুদ্ধে যোগদান করে ফেব্রুয়ারীর ভেতর মালয়, সিঙ্গাপুর প্রভৃতি দখল করে দ্রুত ভারতের পূর্ব প্রান্তের দিকে এগিয়ে আসতে থাকে। এ অবস্থায় শংকিত হয়ে ব্রিটিশ সরকার ভারতের জনগণের সর্বাত্মক সাহায্যের জন্যে অধীর হয়ে উঠেন। ইতিমধ্যে চীনের প্রেসিডেন্ট চিয়াং কাইশেক ভারতীয় নেতাদের সঙ্গে দেখা করে জাপানের বিরুদ্ধে তাদের সহানুভূতি কামনা করেন। জাপান যুদ্ধে নামার সঙ্গে সঙ্গে আমেরিকাও মিত্রপক্ষে যোগ দিয়ে জাপানের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে ভারতীয় নেতাদের সঙ্গে সমঝোতায় আসার জন্য ব্রিটিশ সরকারকে চাপ দিতে থাকেন। তখন বাধ্য হয়ে কংগ্রেস নেতাদের কারামুক্ত করে মন্ত্রী পরিষদের সদস্য স্যার স্ট্যাফোর্ড ক্রিপসের মাধ্যমে ব্রিটিশ সরকার আর একদফা ভারতবাসীর সঙ্গে একটা মীমাংসায় আসতে চেষ্টা করলেন।

ক্রিপস ১৯৪২ সালের ২৩শে মার্চ দিল্লীতে এসে দফায় দফায় ভারতীয় নেতাদের সঙ্গে আলোচনা করলেন। ক্রিপস এর আগেও ১৯৪০ সালে একবার ভারতে এসেছিলেন। সেবার তাঁর সঙ্গে আলাপ করে জিন্নাহ্‌ বেশ কিছুটা হতাশ হয়েছিলেন। এবার তাই তাঁর সঙ্গে আলাপ করতে গিয়ে জিন্নাহ্‌ প্রথম থেকে সতর্কতা অবলম্বন করলেন। ভারতে আগমনের এক সপ্তাহ পর ক্রিপস তার প্রস্তাবে বললেন যে, ব্রিটিশ সরকারের অভিপ্রায় হচ্ছে ধাপে ধাপে সুস্পষ্ট শর্তে ভারতকে যথাশীঘ্র স্বায়ত্তশাসন প্রদান করা। তিনি ঘোষণা করলেন যে, ব্রিটিশ রাজের লক্ষ্য হচ্ছে একটি নতুন ভারতীয় ইউনিয়ন সৃষ্টি। সে ইউনিয়ন হবে বৃটিশ সাম্রাজ্যের অন্যান্য ডোমিনিয়নের মতই একটি ডোমিনিয়ন যেটি বৃটিশ রাজের প্রতি আনুগত্যের বন্ধনে আবদ্ধ থাকবে। এই ডোমিনিয়ন আভ্যন্তরীণ ও বাহ্যিক কোন ব্যাপারেই অন্যান্য ডোমিনিয়ন থেকে কোন ভাবেই নিম্নমর্যাদার হবে না। তবে এ সমস্ত কিছুই কার্যকরী হবে যুদ্ধ শেষ হবার পর।

পাকিস্তান বা মুসলমানদের নাম উল্লেখ না করে খসড়া ঘোষণায় বলা হলো যে, কোন প্রদেশ যদি নতুন সংবিধান গ্রহণ না করে তা বর্তমান শাসনতান্ত্রিক অবস্থা বজায় রাখতে চায় তবে তা রাখতে দেয়া হবে। যে সব

www.amarboi.org

প্রদেশ এই নতুন সংবিধানে যোগ দিবে না তারা যদি তাদের জন্য নতুন কোন শাসনতন্ত্র তৈরি করতে চায় ব্রিটিশ সরকার তাতে রাজি হবে এবং তাদেরকেও ভারতীয় ইউনিয়নের পূর্ণ মর্যাদা দেবে।

যে সময় ক্রিপস তার প্রস্তাব নিয়ে এসেছিলেন তার প্রস্তাবের সাফল্যের জন্য সময়টি মোটেই অনুকূল ছিল না। সে সময় প্রায় রণক্ষেত্রেই মিত্রশক্তির পরাজয় হচ্ছিল এবং কংগ্রেসের প্রভাবশালী সকল নেতারই ধারণা হয়েছিল যুদ্ধে মিত্র শক্তির নিশ্চিত পরাজয় ঘটবে। তাই কংগ্রেস ক্রিপস প্রস্তাবে রাজি হতে সম্মত হলো না। গান্ধী ক্রিপস প্রস্তাব সম্পর্কে মতামত প্রকাশ করলেনঃ "A post dated cheque on a crashing bank" (ফেল হয়ে যাওয়া ব্যাংকের ওপর পরবর্তীতে ভাঙ্গানোর তারিখ যুক্ত ঋণপত্র) জাপান মার্চ মাসের শেষ দিকে রেঙ্গুন দখল করে ভারত সীমান্তের দিকে দ্রুত অগ্রসর হচ্ছিল। গান্ধী মনে করলেন ভারতে ব্রিটিশের অবস্থানের কারণে ভারত জাপানী আক্রমণের লক্ষ্যবস্তুতে পরিণত হতে যাচ্ছে। তাই ব্রিটিশ ভারত ত্যাগ করলে ভারত জাপানী আক্রমণ থেকে রক্ষা পেতে পারে এই মনে করে তিনি বৃটিশদের ভারত ত্যাগ করার পরামর্শ দিলেন।

ভারতে আগমনের একমাস পর ক্রিপস ব্রিটিশ সরকারকে জানালেন যে, কংগ্রেস প্রেসিডেন্ট থেকে তিনি একটি দীর্ঘ পত্র পেয়েছেন যাতে কংগ্রেস তাঁর প্রস্তাব গ্রহণ করতে অপারগতা জানিয়েছে। তাই তিনি সহসা দেশে ফিরে যাচ্ছেন। লীগ নেতারাও ব্রিটিশ যুদ্ধে পরাজয়বরণ করতে যাচ্ছে ভেবে এবং পাকিস্তান সম্পর্কে কোন কথা ঘোষণায় উল্লেখ না থাকার অজুহাতে ক্রিপস প্রস্তাব গ্রহণে অসম্মতি জানাল। সেদিন বৃটিশের যুদ্ধে নিশ্চিত পরাজয় হবে ভেবে ক্রিপস প্রস্তাব অগ্রাহ্য করার জন্য মিঃ ক্যাসির মতে, পরবর্তীকালে কংগ্রেস আপশোস করেছিল। তার মতে ১৯৪৩-৪৪ সালে মিত্রপক্ষের জয়ের সম্ভাবনা যখন স্পষ্ট হয়ে উঠেছিল তখন এ প্রস্তাব দিলে কংগ্রেস নিশ্চিতভাবে সাগ্রহে তা গ্রহণ করত। ইতিমধ্যে নেহেরু জাপানীদের সর্বতোভাবে রুখবার জন্য একটি প্রকাশ্য আবেদন জানালেন এবং জিন্নাহ্ সর্বতোভাবে মুসলমানদের যুদ্ধ প্রচেষ্টায় সাহায্যের আশ্বাস দিলেন। এতে ক্রিপস খানিকটা আশ্বস্ত হয়ে বৃটিশ সরকারকে জানালেন যে, এতটা নিরাশ হওয়ার কারণ নেই। এখন আমাদের ভারতকে যেভাবে হোক রক্ষা করতে হবে।

www.amarboi.org

স্যার স্ট্যাফোর্ড ক্রিপসের প্রস্তাবের পরদিন নেহেরু ঘোষণা করলেন যে, আমরা কিছুতেই আক্রমণকারীদের কাছে আত্মসমর্পণ করবো না। যা কিছু ঘটুক না কেন আমরা বৃটিশদের কোনভাবে ব্যতিব্যস্ত করবো না।

আহমদাবাদে মুসলিম লীগের এক অধিবেশনে জিন্নাহ্ সাহেব যুদ্ধজনিত ভীতির কারণে ক্রিপস প্রস্তাবের ব্যর্থতার কথা উল্লেখ না করে বললেন "আমি গভীর হতাশার সঙ্গে আপনাদের মনোভাবের ঘৃণাভরে প্রতিধ্বনি করছি যে, মুসলমানরা অত্যন্ত দুঃখিত ও নিরাশ হয়েছে যে, তাদের স্বকীয়তা, জাতীয় স্বত্তা ও বৈশিষ্ট্য স্বীকৃতি লাভ করেনি। ... মুসলমানরা তাদের জাতীয় আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকার স্বীকৃত না হওয়া পর্যন্ত কিছুতেই সন্তুষ্ট হবে না। তিনি আরো বলেন যে, আমি বিশ্বাস করি, বৃটিশ রাজ ও স্যার স্টাফোর্ড ক্রিপস পাকিস্তানের নীতি ও মুসলমানদের আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকার স্বীকৃতির জন্য তাদের ব্যবস্থায় প্রয়োজনীয় পরিবর্তন করবেন। আমরা আশা করি, এসব আলাপ-আলোচনার ভেতর দিয়ে আমাদের পক্ষে গ্রহণযোগ্য ন্যায়সঙ্গত, সম্মানজনক একটি মীমাংসা শেষ পর্যন্ত বেরিয়ে আসবে।

প্রবীণ ইংরেজ রাজনীতিবিদ ও সৈন্যরা যারা বহুদিন ধরে ভারতে ছিল তারাও কংগ্রেস লীগ ও বৃটিশ সরকারের সঙ্গে একটা মীমাংসা না হওয়ায় ক্ষুদ্ধ ছিল। তারা মনে করল এখানে বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে কলহ-দাঙ্গা-হাঙ্গামা, তিক্ততার কারণে ব্রিটিশ সরকার ভারতবাসীকে যতটুকু সুযোগ-সুবিধা দিতে ইচ্ছুক ছিল তা দিতে পারছেনা। তারা যতটুকু গ্রহণ করতে সক্ষম ছিল তাই তাদেরকে দেয়া হচ্ছিল। মিঃ ক্যাসি যিনি অস্ট্রেলিয়ায় জন্মগ্রহণ করেছিলেন এবং ব্রিটিশ সরকারের হাতে অনেক দুঃখ-কষ্ট সহ্য করেছিলেন তিনিও এমত পোষণ করতেন।

১৯৪১ সনের প্রথম থেকেই জিন্নাহ্ প্রায়ই অসুস্থ হয়ে পড়তে থাকেন। তাঁর চিকিৎসক চিকিৎসার জন্য তাঁকে বিশ্রাম নেয়ার জন্য অনুরোধ করতে থাকেন। কিন্তু প্রচণ্ড মনোবলের অধিকারী এই মানুষটি সব কিছু অগ্রাহ্য করে একান্তভাবে লীগের সংগঠনের কাজে মনপ্রাণ ঢেলে দিলেন। কেউ জিজ্ঞাসা করলে বলতেন, "আমার তেমন গুরুতর কিছু হয়নি। অধিক পরিশ্রমের ফলে যা কিছু দুর্বলতা অনুভব করছি। আমার কিছুটা শান্তি ও বিশ্রামের প্রয়োজন। তা হলে সবকিছু ঠিক হয়ে যাবে"।

www.amarboi.org

কিন্তু বিশ্রাম নেয়া জিন্নাহ্‌র স্বভাবই ছিল না। তিনি কাজ করে যেতে লাগলেন। যখন ১৯৪২ সনে বোম্বেতে স্যার এভিলীন রেন্ট জিন্নাহ্‌কে জিজ্ঞাসা করলেন কিভাবে তিনি বিশ্রাম নিতে পারেন এবং কি করলে তিনি অফিসের কাজকর্ম ভুলে থাকতে পারেন তখন জিন্নাহ্‌ উত্তর দিয়েছিলেন আমার পেশাই এমন ধরনের যা আমাকে কোন রকমে বিশ্রাম বা অবকাশের সুযোগ দেয় না।

জিন্নাহ্‌ তাঁর নতুন বাড়ীর সম্মুখভাগে ছোট্ট একটি কামরায় কাজ করতেন। এই অফিসেই তিনি সবার সঙ্গে দেখা করতেন। মেঝের এক পাশে তাঁর কাগজপত্র পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নভাবে স্তূপাকৃত হয়ে থাকতো। দিনরাত তিনি এই অফিসে কাজ করে যেতেন। মাঝে মধ্যে লিয়াকত আলী খান তাঁকে বিভিন্ন প্রদেশে বড় বড় জনসভায় বক্তৃতা দেয়ার জন্য নিয়ে যেতেন। নিজের বিশ্বাস ও লক্ষ্যের প্রতি তাঁর গভীর আন্তরিকতা বাগ্মী হিসাবে তাঁকে প্রচন্ড শক্তির অধিকারী করে তুলেছিল। বক্তৃতার সময় তিনি মাঝে মাঝে আঙ্গুল উঠিয়ে উপদেশ দিতেন, তিরস্কার করতেন এবং কোন কোন পয়েন্টের ওপর দরকার হলে জোর দিতেন এবং সুচিন্তিতভাবে প্রয়োজনে তাঁর এক চক্ষু বিশিষ্ট চশমা (Monocle) ব্যবহার করতেন এর ফলে বিরাট শ্রোতৃমন্ডলীকে তিনি সম্মোহিত করে স্বমতে নিয়ে যেতে সক্ষম হতেন। তারা তাঁর বাগ্মিতায়, বলার ধরনে বিস্মিত হয়ে তাঁর সঙ্গে একমত হতো, যদিও তাঁর অনেক কথাই তারা বুঝতো না।

ব্যক্তিগতভাবে জিন্নাহ্‌ খুব প্রচার বিমুখ ছিলেন। কোন পত্রিকাকে সাক্ষাতকার দেয়া সহজে পছন্দ করতেন না। জনপ্রিয়তার প্রতি তিনি বরাবরই উদাসীন ছিলেন। সাংবাদিকদের ভৎর্সনার খবর বোম্বেতে সংবাদপত্র অফিসগুলোতে প্রায়ই কল্পকাহিনীর মত উড়ে বেড়াত। সাংবাদিকরা কায়েদে আযমকে কিন্তু খুব সম্মান করত। তাদের মধ্যে একজন বলেছিলো তিনি আমাদেরকে কখনো খুশি করবার চেষ্টা করতেন না। রাজনীতিবিদদের মধ্যে তাঁর সঙ্গে কাজ করাই ছিল সব চেয়ে কঠিন ব্যাপার। তিনি খুব খুঁতখুঁতে স্বভাবের এবং আমাদের সঙ্গে অত্যন্ত গর্বের সঙ্গে ব্যবহার করতেন। আমাদেরকে তিনি তাঁর বাড়ীতে ডেকে পাঠাতেন কিন্তু কখনও এককাপ চা বা একটি সিগারেটও দিতেন না। এ সমস্ত ছোট খাট ঘুষ দেয়ার মনোভাবের অনেক উর্ধ্বেই ছিলেন তিনি।"

www.amarboi.org

"একদিন বোম্বেতে একটি কনফারেন্সের শেষে জিন্নাহ্ যখন কক্ষ ত্যাগ করছিলেন আমার এক সহযোগী তাঁকে একটি প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করাতে তিনি ভৎর্সনার সুরে বললেন-

"কনফারেন্স শেষ হয়ে গেছে। তুমি অনর্থক আমার সময় নষ্ট করছো। ভারতে তৎকালীন যত প্রভাবশালী দৈনিক পত্রিকা ছিল তার মালিক ছিল হয় হিন্দুরা না হয় ইংরেজরা। মুসলমানদের দৈনিক পত্রিকা প্রায় ছিলই না বলা চলে। পাকিস্তান আন্দোলনকে জোরদার করার জন্য একটি শক্তিশালী ইংরেজী দৈনিকের অভাব জিন্নাহ অনুভব করে 'ডন' নামে একটি ইংরেজী দৈনিক পত্রিকা প্রকাশ করেন। অল্প দিনেই এই পত্রিকা দারুণ জনপ্রিয়তা অর্জন করে এবং মুসলিম লীগের আদর্শ প্রচারে একটি শক্তিশালী হাতিয়ার হিসাবে আবির্ভূত হয়। পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর তিনি এই পত্রিকাটিকে করাচী নিয়ে যান এবং অদ্যাবধি ডন পত্রিকা পাকিস্তানে একটি জনপ্রিয় পত্রিকা হিসাবে চালু রয়েছে। ভাবলে অবাক লাগে যে মানুষ জিন্নাহ অত্যন্ত প্রচারবিমূখ ছিলেন এবং নিজের প্রচার কার্যের জন্য কোনদিন প্রেস এজেন্ট নিযুক্ত করেন নাই তিনি কি করে ডন-এর মত একটি শক্তিশালী পত্রিকা জন্ম দিয়ে তাকে এত সুচারুরূপে পরিচালনা করতে সক্ষম হয়েছিলেন ?

১৯৪২ সন ছিল অত্যন্ত অরাজকতা ও বিপদ সংকুল বৎসর। এ সময়টি ছিল জিন্নাহ্র মত একজন সাংবিধানিক ব্যক্তির পক্ষে মানসিক দিক থেকে অত্যন্ত বিপর্যয়কর। নেহেরু যদিও ক্রিপ্স মিশনের ব্যর্থতার পরে বলেছিলেন ইংরেজকে কোনভাবেই বিব্রত করা হবে না, কিন্তু তারা তাদের কথা রাখেন নি। জুলাই মাসে গান্ধী ইংরেজদের পরিষ্কারভাবে জানালেন, তাদের ভারত ত্যাগ করতে হবে নতুবা তিনি খোলাখুলি বিদ্রোহ ঘোষণা করবেন। আগস্ট মাসে তনি 'কুইট ইন্ডিয়া' আন্দোলন আরম্ভ করেন এবং সর্বত্র দেয়ালের গায়ে এই দু'টি শব্দ লিখে দেয়া হল। সে মাসেই তিনি বোম্বেতে সর্বভারতীয় কংগ্রেস কমিটিতে বললেন, "জিন্নাহ কংগ্রেসের প্রোগ্রামে এবং দাবিতে বিশ্বাস করে না। কিন্তু জিন্নাহ আমাদের স্বমতে না আসা পর্যন্ত আমরা অবিলম্বে ভারতের স্বাধীনতা ঘোষণার ব্যাপারে অপেক্ষা করতে পারি না।"

গান্ধীর ঘোষণার পর পরই দেশব্যাপী যে নৈরাজ্য ও অন্তর্ঘাতমূলক কাজকর্ম দেখা দিল তাতে জিন্নাহ অত্যন্ত চিন্তিত হয়ে পড়লেন। একদিন

www.amarboi.org

সন্ধ্যায় তাঁর সেক্রেটারী তাঁর অফিসে গিয়ে দেখলেন গভীর রাতে জিন্নাহ সাহেব হাতের উপর মাথা রেখে টেবিলের উপর ঝুঁকে বসে আছেন এবং মিল্টনের একটি খোলা বই তাঁর সামনে পড়ে আছে। সেই বইটিতে দু'টি লাইন লেখা রয়েছে "For what can war but endless war still breed? Till truth and right from violence be freed." (যুদ্ধ এবং সীমাহীন যুদ্ধ কি প্রসব করতে পারে ? যতক্ষণ না সত্য এবং ন্যায়কে হিংস্রতা থেকে মুক্ত করা না যাবে)।

১৯৪২ সনের আগস্টের মাঝামাঝি মহাত্মা গান্ধী পন্ডিত নেহেরু এবং কংগ্রেসের অন্যান্য নীতি নির্ধারক নেতৃবৃন্দ বিদ্রোহ সৃষ্টির অপরাধে গ্রেফতার হয়ে গেলেন। গান্ধী ছাড়া আর সবাই যুদ্ধ শেষ না হওয়া পর্যন্ত কারারুদ্ধ ছিলেন। এ সময় কায়েদে আযম তাঁর আইন সম্মত সাংবিধানিক নীতির সম্পূর্ণ সুযোগ গ্রহণ করলেন। তিনি সমস্ত দেশব্যাপী প্রচার কার্যের দ্বারা লীগের শক্তি বৃদ্ধি করতে লাগলেন। ইতিমধ্যে মুসলমানদের মধ্যে একটি ক্ষুদ্র অংশ জিন্নাহর প্রতি অত্যন্ত শত্রুভাবাপন্ন হয়ে উঠল। এই ক্ষুদ্র অংশের মধ্যে 'খাকসার' পার্টির লোকেরা ছিল প্রধান যারা বরাবরই প্রথম থেকে জিন্নাহর বিরোধিতা করে আসছিল। এই সকল লোকেরা জিন্নাহকে চিঠি, টেলিগ্রাম, পোস্টকার্ড প্রভৃতি দ্বারা তাঁর জীবননাশের হুমকি দিয়ে আসছিল। ২৭শে জুন একজন নেতৃস্থানীয় তাঁকে লিখল "পাকিস্তান অর্জনই যদি আপনার লক্ষ্য হয় তবে সেটি অর্জনকে নিকটতর করার জন্য আল্লাহর ওয়াস্তে গান্ধীর সঙ্গে একটি সমঝোতায় আসুন। ...... গান্ধীর সঙ্গে জেলে অবিলম্বে দেখা করার জন্য আপনাকে অনুরোধ জানাচ্ছি, তা না হলে আমাদের মধ্যে কেউ জীবনের ঝুঁকি নিয়ে হলেও আপনাকে বুলেট বিদ্ধ করবে।"

এর কিছুদিন পরে রফিক সাবির নামে একজন মধ্যবয়সী খাকসার ২৬ শে জুলাই মালাবার হিলে জিন্নাহ সাহেবের অফিসে দুপুর ১টার সময় এসে হাজির হল। জিন্নাহ সাহেবের সঙ্গে দেখা করার ইচ্ছা প্রকাশ করায় তাকে দারোয়ান জিন্নাহর সেক্রেটারীর কাছে নিয়ে গেল। সেক্রেটারী বলল, জিন্নাহ সাহেব এখন খুব ব্যস্ত তাই দেখা করা সম্ভব হবে না। ঠিক সেই মুহূর্তে জিন্নাহ ঐ কামরায় পদার্পণ করলেন এবং কাজ সেরে যেই মুহূর্তে তিনি কক্ষ ত্যাগ করতে উদ্যত হলেন ঐ মুহূর্তে রফিক সাবির চোখের পলকে লাফ দিয়ে জিন্নাহ

www.amarboi.org

সাহেবের সামনে এসে তাঁর বাম গালে সজোড়ে মুষ্ঠাঘাত করল। স্বাভাবিকভাবেই জিন্নাহ্ সাহেব ক্ষাণিকটা পিছু হটে গেলেন এবং সঙ্গে সঙ্গে রফিক সাবির তার কটিদেশ থেকে একটি ছুরি বের করল। হত্যার উদ্দেশ্যে আততায়ী তার দীর্ঘ ছুরিটা দিয়ে জিন্নাহকে বিদ্ধ করবার চেষ্টা করলেও জিন্নাহ্ রফিক সাবিরের হাত ধরে ফেলায় আঘাতটা তেমন মারাত্মক হতে পারল না। ধস্তাধস্তির এই পর্যায়ে কয়েকজন সেখানে হাজির হয়ে গেলে জিন্নাহর ড্রাইভার আততায়ীর হাত থেকে ছুরিটা কেড়ে নিল। আঘাতটি তেমন গুরুতর হয়নি শুধু তাঁর চিবুকে এবং হাতের দু'এক জায়গায় সামান্য কেটে গিয়েছিল যেটা তাঁর ভগ্নী ফাতেমা সঙ্গে সঙ্গে ব্যান্ডিজ করে দিল। খাকসারটিকে গ্রেফতার করে জেলে দেয়া হলো এবং পরবর্তীতে একজন বিশেষ জজ তাকে পাঁচ বছরের জন্য সশ্রম কারাদন্ডে দন্ডিত করেছিল।

যুদ্ধের এই কয় বছর ইংরেজী পত্রিকাগুলোতে কায়েদে আজম সম্পর্কে তেমন কোন লেখালেখি বা প্রবন্ধাদি ছাপা হয় নি সম্ভবতঃ তাঁর নিজের প্রচার বিমুখতা ও সাংবাদিকদের স্বাগত জানাবার ব্যাপারে শীতল মনোভাব পত্রিকার লোকদের তাঁকে খুঁজে বের করে তাঁর সম্বন্ধে লেখালেখি করে ইংরেজ পাঠকদের কাছে তাঁকে একজন গুরুত্বপূর্ণ লোক হিসাবে পরিচিত করে তোলার ব্যাপারে অনাগ্রহী করে তুলেছিল। যা হোক এ সময় Mr. Veverley Nichols নামে একজন বিদেশী সাংবাদিক তাঁর সঙ্গে দেখা করেন এবং তার ভারত সম্পর্কে একটি বইতে "Dialogue with a Giant" (একটি দৈত্যের সঙ্গে কথোপকথন) নামে একটি অধ্যায় লিখেন। তা যেমনই চমকপ্রদ তেমনি জীবন্ত ও প্রাণবন্ত। এতে কায়েদে আজমের সঙ্গে তার আলাপচারিতা লিপিবদ্ধ হয়েছে। ১৯৪৩ সনের ১৮ই ডিসেম্বর মিঃ নিকল্‌স কায়েদে আজমের সংগে দেখা করেন। তিনি লিখেছেনঃ এশিয়ার সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তির বয়স এখন সাড়ে সাতষট্টি। তিনি দীর্ঘদেহী পাতলা অবয়ব এবং শ্রীমন্ডিত ব্যক্তিত্ব।

তিনি সর্বদা সংগে রাখেন ছাই রঙের সুতার আটকানো একটি মনোকল (এক চক্ষু বিশিষ্ট চশমা) এবং অত্যন্ত গরমের দিনেও পরে থাকেন একটি সাদা শক্ত গলাবদ্ধ। তাঁকে দেখলে মনে হয় তিনি স্পেনের একজন অভিজাত শ্রেণীর ভদ্রলোক অথবা একজন প্রাচীন পন্থী কূটনীতিবিদ যিনি সেন্ট জেমস

www.amarboi.org

ক্লাবে আনন্দে বসে ধীরে ধীরে পানীয় গ্রহণ করতে করতে সংবাদপত্রের পাতা উল্টাতে উল্টাতে মাঝে মাঝে মলরয়-টোস্ট ভক্ষণ করছিলেন।

জিন্নাহ্ তাঁর মনোকলটি হাতে নিয়ে টেবিলের উপর ঝুঁকে বললেন "The Muslims are a Nation. If you grant that and if you are an honest man, you must grant the principle of Pakistan," Then, "The Muslims are a tough people, lean hardy. If Pakistan means that they will have to be a little tougher they will not complain." (মুসলমানরা একটি জাতি। আপনি যদি সেটা স্বীকার করে নেন এবং আপনি একজন সাধু লোক হলে তবে নিশ্চয়ই পাকিস্তানের মূলনীতি আপনাকে মানতেই হবে। এ ছাড়া মুসলমানরা অত্যন্ত শক্ত মানুষ। পাতলা কিন্তু খুব কষ্ট সহিষ্ণু। পাকিস্তান অর্জন করতে হলে তাদেরকে যদি আরও একটু কঠোর হতে হয় তারা আপত্তি করবে না।") নিকল্স তখন তাঁকে জিজ্ঞাসা করলেন , পাকিস্তানের মুসলমানরা ধনী হবে না দরিদ্র হবে। এ কথার উত্তরে জিন্নাহ বললেন, "What conceivable reason is there to suppose that the gift of nationality is going to be an economic liablity ? ... How any European can get-up and say that Pakistan is 'economically impossible' after the Treaty of versailles is really beyond my comprehension. The great brains who cut Europe into a ridiculous patchwork of conflicting and artificial boundaries are hardly the people to talk economics to us. ... ?"

"আপনি কি করে ভাবতে পারেন যে, একটি জাতির স্বাধীনতার মূল্য অর্থনৈতিক দায়-দেনার বিপরীতে বিবেচিত হতে পারে ? ভার্সিলিস-এর চুক্তির পরে একজন ইউরোপবাসী উঠে দাঁড়িয়ে কি করে বলতে পারে যে, পাকিস্তান অর্থনৈতিক দিক থেকে সম্ভবপর নয়-এটা আমার ধারণার অতীত। যে সব উর্বর মস্তিষ্কের লোকেরা ইউরোপকে হাস্যকরভাবে টুকরো টুকরো এলাকায় কৃত্রিম সীমারেখা দ্বারা ভাগ করেছিল তারাই আজকে আমাদেরকে অর্থনীতি শিখাতে আসছে।"

মিঃ নিকলস্ জিন্নাহ ও সাধারণ হিন্দু রাজনীতিবিদদের মধ্যে পার্থক্য বর্ণনা করতে গিয়ে বলছেন জিন্নাহ্ ছিলেন একজন অভিজ্ঞ সার্জন এবং হিন্দু রাজনীতিবিদরা ছিলেন সে তুলনায় একজন হাতুড়ে ডাক্তার। একজন সার্জন

www.amarboi.org

এর উপর তুমি পুরাপুরি বিশ্বাস করতে পার যদিও তার মতামত তোমার কাছে খুব কঠোর মনে হতে পারে।

আলোচনার সময় মহাত্মা গান্ধী ও তাঁর অনুগামীদের সম্বন্ধে উল্লেখ করতে গিয়ে জিন্নাহ বললেন, জীবনের সর্বক্ষেত্রে আমাদের দৃষ্টিভঙ্গি হিন্দুদের চাইতে শুধু স্বতন্ত্র নয় বরং অধিকাংশ ক্ষেত্রে সম্পূর্ণ পরস্পর বিরোধী। আমরা সম্পূর্ণ আলাদা স্বত্বা। জীবনের কোন ক্ষেত্রেই তাদের সঙ্গে আমাদের কোন মিল নেই। মিঃ নিকলস্ যখন জিন্নাহকে বললেন, জীবনের অনেক ক্ষেত্রে হিন্দু ও মুসলমানের অবস্থান সম্পূর্ণ পরস্পর বিরোধী এ ব্যাপারে খানিকটা উদাহরণ দিয়ে পরিষ্কার করুন, তখন জিন্নাহ বললেন, "মুসলমানরা সামনের দিকে দাঁড়ি রাখে, হিন্দুরা পিছনের দিকে টিকি রাখে; মুসলমানরা পশ্চিম দিকে ফিরে নামাজ পড়ে। হিন্দুরা পূর্ব দিকে তাকিয়ে উপাসনা করে; মৃত্যুর পরে আমাদের কবর দেয়া হয়, তাদেরকে পুড়িয়ে ফেলা হয়। আমরা গরু খাই, তারা ইহা দেবতা জ্ঞানে উপাসনা করে। জিন্নাহর উদাহরণগুলোর বাস্তবতায় নিকলস্ বিস্মিত হলেন। তারপর তিনি বললেন বৃটিশদের ভারতে থেকে যাবার একমাত্র কারণ হল গান্ধী কর্তৃক প্রচারিত অখন্ড ভারতের ধারণা।

এ সময় গান্ধী আগা খানের একটি প্রাসাদে অন্তরীণ ছিলেন। যেখানে তিনি আহার-বিহারে সর্বোত্তম সুবিধা ও শান্তি ভোগ করছিলেন। কিন্তু এ সময় তাঁর বয়স হয়েছিল ৭৪ বছর। তাই বাধ্যর্ক্যের কারণে গান্ধী খানিকটা অসুস্থ হয়ে পড়ায় মে ১৯৭৪ সনে সরকার তাঁকে মুক্তি দিলেন। কিন্তু এ দুবছর অন্তরীণ থাকা অবস্থাতেও তাঁর মানসিক চিন্তায় কোন পরিবর্তন ঘটল না। তাঁর তখনও বিশ্বাস অখণ্ড ভারতের দর্শনে তিনি জিন্নাহকে বিশ্বাসী করে তুলতে পারবেন।

হিন্দু মুসলমান মিলন বা কংগ্রেস লীগের সমঝোতা ব্যতীত স্বাধীনতা প্রাপ্তি সম্ভব নয়, এ সত্য হৃদয়ঙ্গম করে মুক্তির পরপরই ১৭ই জুলাই মহাত্মা গান্ধী জিন্নাহকে একটি পত্র লিখলেন। জিন্নাহকে ভাই সম্বোধন করে তিনি লিখলেন, "আমার মুক্তির পরে এ যাবৎ আমি আপনাকে লিখতে পারিনি কিন্তু আজ আমার হৃদয় বলছে আপনাকে লেখা উচিত। আপনার যখনই সুবিধা হয় আমরা উভয়ে মিলিত হতে পরি। আমাকে ইসলামের অথবা

www.amarboi.org

এদেশের মুসলমানদের শত্রু বলে মনে করবেন না, আমি শুধু আপনার নই সমগ্র বিশ্ব মানবের বন্ধু ও খাদেম, আমাকে নিরাশ করবেন না।" জিন্নাহ্ তখন কাশ্মীরের শ্রীনগরে বিশ্রাম নিচ্ছিলেন। সেখান থেকে উত্তর দিলেন ঃ

"আমি বোম্বেতে স্বীয় গৃহে আগস্টের মাঝামাঝি প্রত্যাবর্তনের পর আপনাকে আমার বাড়িতে সানন্দে স্বাগত জানাতে চাই। আমি আশা করি আপনি ততদিনে পুরাপুরি সুস্থ হয়ে বোম্বেতে প্রত্যাবর্তন করতে পারবেন। আপনার সঙ্গে মোলাকাতের পূর্বে আমি আর অধিক কিছু বলতে চাই না। আমি সংবাদপত্র থেকে জানলাম আপনি দ্রুত আরোগ্য লাভ করছেন এবং আশা করি সহসা সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে যাবেন।"

দুই নেতার মধ্যে সাক্ষাত অসুস্থতার কারণে এবং ডাক্তারের উপদেশে বিলম্বিত হল। আগস্টের ২২ তারিখে একটি অত্যন্ত ক্লান্তিকর ও পরিশ্রান্ত ভ্রমণের পর জিন্নাহ্ জনৈক বন্ধুকে লিখলেন, "শ্রীনগর থেকে রওয়ানা হওয়ার পর থেকে অগণিত মানুষের ভালবাসা আবদার, আমাকে অতি মাত্রায় ক্লান্ত করে ফেলেছে। আমার ক্ষমতায় যতটুকু কুলিয়েছে তাদেরকে খুশি করতে গিয়ে আমাকে কঠিন মূল্য দিতে হয়েছে। যাহোক, তোমাকে সানন্দে বলতে পারি আমি সম্পূর্ণ সুস্থ এবং খুব সহসাই কাজে ফিরে যাব। সেপ্টেম্বরের দিকে কায়েদে আযম তাঁর ফুসফুসে একটি ব্যাধির জন্য কয়েকজন ডাক্তারের পরামর্শ নিলেন। তাদের মধ্যে ১ম জনের একটি অদ্ভূত অভিজ্ঞতা হয়েছিল। তিনি একই সঙ্গে জিন্নাহ্ এবং গান্ধীর চিকিৎসা করছিলেন। প্রথম জন জিন্নাহকে একজন অত্যন্ত ভদ্র রোগী হিসেবে বিবেচনা করতেন। তিনি বলতেন, "রাজনীতিবিদ হিসাবে জিন্নাহ্ সর্বদা দূরত্ব মেনে চলতেন, গান্ধী তাঁর শিষ্যদের কাছে প্রায়ই বিবস্ত্র হয়ে থাকতেন। কিন্তু জিন্নাহ তাঁর অনুসারীদের সামনে পোশাক পরিচ্ছদ সম্বন্ধে পূর্ণমাত্রায় সচেতন থাকতেন। দু'জনের মধ্যে এই ছিল পাথর্ক্য। গান্ধী ছিলেন শক্তির উৎস আর জিন্নাহ্ ছিলেন নিজেই শক্তি। রাজনীতিতে তিনি (জিন্নাহ) ছিলেন সম্পূর্ণ শীতল যুক্তিবাদী মানুষ, মনোজগতে এক আলাদা পথের মানুষ, কিন্তু এই মনের পিছনে ছিল তাঁর অসাধারণ শক্তি। এই ছিল জিন্নাহ ও গান্ধীর মধ্যে গুণগত পাথর্ক্য।

উক্ত ডাক্তারের মতে জিন্নাহ্ স্বাভাবিকভাবে ছিলেন অত্যন্ত দয়ালু। কিন্তু প্রথম জীবনে তিনি বোম্বেতে যে দারিদ্রের সম্মুখীন হয়েছিলেন এবং পরবর্তীতে তাঁর দাম্পত্য জীবনে যে বিপর্যয় ঘটেছিল সবকিছু মিলিয়ে দয়া প্রকাশের

www.amarboi.org

ব্যাপারে তাঁকে খুব সাবধানী করে তুলেছিল। এই সাবধানতার কারণে কারো সঙ্গে তাঁর ব্যক্তিগত সম্পর্ক গড়ে উঠার ব্যাপারে অন্তরায় সৃষ্টি হয়েছিল।

ডাক্তার অতঃপর তাঁদের ব্যক্তিগত পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতার ধারণা সম্পর্কে অভিমত প্রকাশ করেন। গান্ধী বলতেন, পবিত্রতা ভগবানের কাছাকাছি কোন্ বস্তু নয়, পবিত্রতাই হল ভগবান, তিনি তাঁর শারীরিক সমস্ত আচার-আচরণে পরিচ্ছন্নতা পুরাপুরি মেনে চলতেন। তথাপি দরিদ্রদের জন্য কোন কিছু করতে গিয়ে নোংরা কাজ বা হস্ত কর্দমাক্ত করতে তিনি দ্বিধা করতেন না। জিন্নাহ কিন্তু গান্ধীর মত ছিলেন না। পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা ছিল তাঁর ব্যক্তিগত ম্যানিয়ার মত। তিনি দিনে বহুবার হস্ত প্রক্ষালন ও অন্তর্বাস পরিবর্তন করতেন। কিন্তু তিনি সহজে কোন লোককে স্পর্শ করতেন না। এটা যেন তাঁর মানসিকভাবে নিজের শ্রেষ্ঠত্ববোধ ও একাকীত্বের অনুভূতি থেকে সঞ্চারিত হত বলে মনে হয়।

জিন্নাহর দ্বিতীয় ডাক্তার ছিলেন একজন পার্সি সার্জন কমান্ডার জাল প্যাটেল। এ সময় জিন্নাহর অসুস্থতা সম্পর্কে আরও বাস্তব বিবরণ প্রদান করেন। "জিন্নাহ একদিন আমাকে টেলিফোনে বলেন, আমি আপনার সঙ্গে দেখা করতে চাই, এটা সম্ভবতঃ সেপ্টেম্বর ১৯৪৪ সন। জিন্নাহ এলে আমি তাঁকে পরীক্ষা করে দেখতে পাই তাঁর ব্লাড প্রেসার ৯০°। এ সময় সম্ভবতঃ তিনি মহাত্মা গান্ধীর সংগে তাঁর গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা চালিয়ে যাচ্ছিলেন, যাতে তাঁর মনের উপর প্রচুর চাপ পড়ছিল। দৈহিক দিক থেকে তিনি তখন ছিলেন অত্যন্ত দুর্বল ও শীর্ণ। আমি তাঁকে বিশ্রাম নিতে ও টনিক জাতীয় কোন ঔষধ খেতে পরামর্শ দিলাম। তিনি বললেন, কয়েকদিন আগে তার আমাশয় জাতীয় অসুখ হয়েছিল এবং তাতে তিনি বুকে খানিকটা ব্যথা ও কাঁশিতে আক্রান্ত হয়েছেন। তাঁর ফুসফুসের তলায় অবিলুপ্ত নিমোনিয়ার চিহ্ন ছিল। তিনি তাঁর বুকের একখানা এক্স-রে এর ছবি আমাকে দেখালেন, এতে তাঁর রোগ সম্পর্কে আমার ধারণা বদ্ধমূল হল। আমি তাঁকে ক্যালসিয়াম ইনজেকশন, টনিক ও খানিকটা স্বল্পদৈর্ঘ্য ডায়োথেরামি চিকিৎসা দিলাম। এতে তাঁর কাঁশি চলে গেল এবং তিনি বিশ্রামের জন্য পার্বত্য অঞ্চলে স্বাস্থ্য নিবাসে চলে গেলেন। তিনি যখন ফিরে এলেন তাঁর ওজন তখন ১৮ পাউন্ড বেড়ে গেছে। খবরটি আমার নাম সহযোগে পত্রিকায় বের হল। জিন্নাহর সঙ্গে দেখা হতে

www.amarboi.org

আমি বললাম, কোন নিবোর্ধ এ কাজটি করেছে। তিনি বললেন, সেই নির্বোধ ব্যক্তিটি আমি। যে ব্যক্তি আমার জন্য এতখানি করেছে তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ আমি কেন করব না ?"

জিন্নাহ-গান্ধী আলোচনা

১৯৪৪ সনের ৯ই সেপ্টেম্বর জিন্নাহ-গান্ধী আলোচনা জিন্নাহর বাসভবনে আরম্ভ হল। এই দু'জন বৃদ্ধ ও অভিজ্ঞ নেতার মধ্যে আলোচনা যখন চলছিল তখন উভয়েই ছিলেন খুবই সতর্ক। তাঁদের মধ্যে স্থির হয়েছিল যে প্রতিদিন যা আলোচনা হবে পরবর্তীতে পত্র বিনিময়ের মারফত তা সমর্থিত হবে। সেপ্টেম্বরের ১৫ তারিখের মধ্যে দেখা গেল তাঁদের মধ্যে মতদ্বৈততা দেখা দিয়েছে। সেদিন সন্ধ্যায় গান্ধী জিন্নাহকে লিখলেন, "In the course of our discussion you have passionately pleaded that India contains two nations, i. e. Hindus and Muslims, and that the later have their homelands in India as the former have their's. The more your argument progresses, the more alarming your picture appears to me. It would be alarming if it were true. But my fear is that it is wholly unreal. I find no paralled in history for a body of converts and their descendents claiming to be a nation apart from the parent stock. If India was one nation before the advent of Islam, it must remain one inspite of the change of faith of a very large body of their children.

You do not claim to be a separate nation by right of conquest but by reason of acceptance of Islam, Will the two nations become one if the whole of India accepted Islam?

"আমাদের আলোচনার সময় আপনি অত্যন্ত জোরালোভাবে বলেছেন যে, ভারতে দু'টি জাতি রয়েছে, হিন্দু ও মুসলমান এবং শেষোক্ত জাতির বাসস্থান প্রথমোক্তের ন্যায় ভারতবর্ষ। আপনার যুক্তি যতই এগুচ্ছে ততই আপনাকে আমার কাছে ভয়াবহ মনে হচ্ছে। আপনার যুক্তি যদি সঠিক হয় তবে এটা ভয়ানক ব্যাপার হবে বলে আমি মনে করি। তবে আমার ভয় হচ্ছে সম্পূর্ণ ব্যাপারটাই অবাস্তব। আমি ইতিহাসে এমন কোন নজির দেখি না যে, কিছু

www.amarboi.org

১৯৪৪ সনে এম. এ. জিন্নাহ ও মহাত্মা গান্ধী

www.amarboi.org

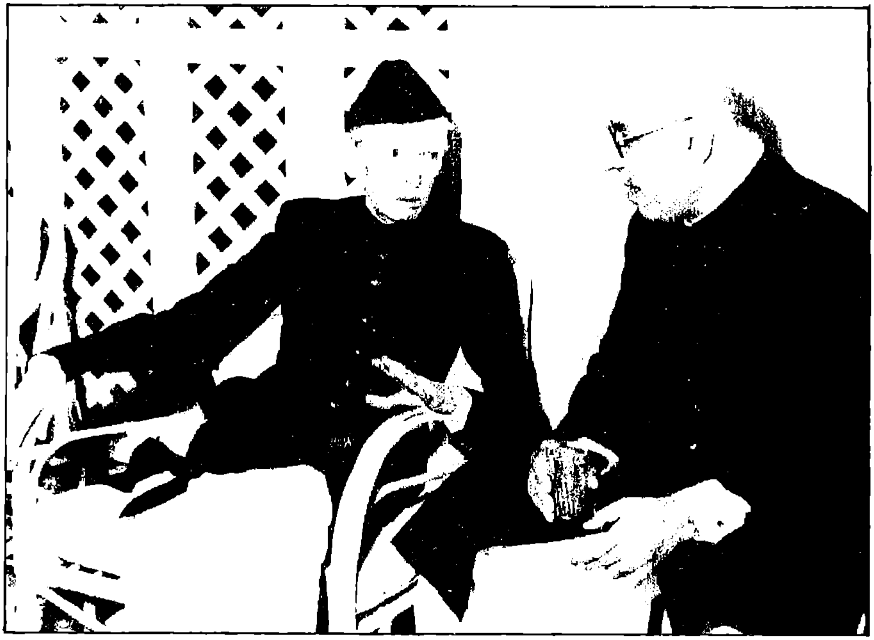

১৯৪৭ সনে জিন্নাহ্ ও লিয়াকত আলী খান

www.amarboi.org

ধর্মান্তরিত ব্যক্তি ও তাঁদের সন্তান-সন্ততিরা ধর্মান্তরিত হওয়ার কারণে তাদের অতীত গোষ্ঠী থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে আলাদা জাতিতে পরিণত হল। ইসলামের আগমনের পূর্বে ভারত যদি এক জাতি থেকে থাকে তবে তার একটি বৃহৎ অংশের সন্তান-সন্ততিরা ধর্ম বদল করলেও জাতিত্বের কোন পরিবর্তন হয় না। ভারত জয়ের জন্য আপনি আলাদা জাতিত্ব দাবি করছেন ইসলাম গ্রহণ করার কারণে। সমগ্র ভারত যদি ইসলাম গ্রহণ করে তবে দু'টি জাতি এক হয়ে যাবে?"

জিন্নাহ দু'দিন পরে উত্তর দিলেন, " We maintain that Muslims and Hindus are two major nations by any definition or test as a nation. We are a nation of a hundred million, and what is more, we are a nation with our distinctive culture and civilization, langauge and literature, sense of values and proportion, legal laws and moral codes, customs and calendar, history and traditions, aptitudes and ambitions: in short, we have our own distinctive outlook on life and of life. By all the canons of international law, we are a nation."

"যে কোন জাতির সংজ্ঞা ও বিচারে মুসলমান ও হিন্দু দু'টি আলাদা জাতি। আমরা ১০ কোটি লোকের একটি জাতি। যাদের রয়েছে সম্পূর্ণ ভিন্ন কালচার ও সভ্যতা, ভাষা ও সাহিত্য, শিল্প-কলা ও ভাস্কর্য, নাম ও পদবী। আমাদের রয়েছে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র মূল্যবোধ ও মাত্রাজ্ঞান, আইন-কানুন ও নীতিবোধ, আচার ব্যবহার ও দিনপঞ্জী, ইতিহাস এবং ঐতিহ্য, মানসিক বৃত্তি ও আশা-আকাঙ্খা, এক কথায় বলতে গেলে জীবনবোধ জীবনের দৃষ্টিভঙ্গি সম্পর্কে আমাদের ধারণা সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। আন্তর্জাতিক যে কোন আইনের দৃষ্টিতে আমরা একটি স্বতন্ত্র জাতি।

২৪ ও ২৫ শে সেপ্টেম্বর উভয়ের আলাপ-আলোচনা আরও বাস্তব রূপ পরিগ্রহণ করে। দেশ বিভক্তির সময় যদি আসে তবে সেটা কিভাবে হবে। সে সম্পর্কে আলাপ চলছিল। সেপ্টেম্বরের ২৪ তারিখে গান্ধী জিন্নাহকে একটি দীর্ঘ পত্র দিলেন, যাতে তিনি কংগ্রেস ও দেশবাসীকে মুসলিম লীগের দেশ বিভাগের ৪০ সনের লক্ষ্ণৌর প্রস্তাব নিম্নলিখিত শর্তে মেনে নেয়ার জন্য

www.amarboi.org

সুপারিশ করলেন। গান্ধী এভাবে লিখলেন, I proceed on the assumption that India is not to be regarded as two or more nations but as one family consisting of many members, of whom the Muslims living in the North-West zones, i.e. Baluchistan, Sindh, North-west Frontier Province, and that part of Punjab where they are in absolute majority over all other elements, and in parts of Bengal and Assam where they are in absolute majority, desire to live in separation from the rest of India."

"আমি এই ধারণা নিয়ে অগ্রসর হচ্ছি যে, ভারত একটি বা দু'টি জাতির আবাসস্থল বলে বিবেচনা না করে এটিকে একটি বৃহৎ পরিবার মনে করতে হবে যার মধ্যে অনেকগুলো সদস্য রয়েছে। তাদের মধ্যে রয়েছে মুসলিম অধ্যুষিত উত্তর পশ্চিমাঞ্চলে একটি এলাকা অর্থাৎ বেলুচিস্তান, সিন্ধু, উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ এবং পাঞ্জাবের একটি অংশ যেখানে তারা অন্যদের তুলনায় সম্পূর্ণ সংখ্যাগরিষ্ঠ, এতদ্ব্যতীত বাংলা ও আসামের একটি অংশে তারা সম্পূর্ণ সংখ্যা গরিষ্ঠ বলে ভারতের অন্য অংশ থেকে তারা আলাদাভাবে বাস করতে চায়।

এর উত্তরে জিন্নাহ্ লিখলেন, " If this term were accepted and given effect to, the present boundaries of these provinces would be mained and mutilated beyond redemption,' and the Muslims would be left' only with the husk." (এই শর্তগুলো যদি এভাবে গৃহীত ও কার্যকরী করা হয় তবে প্রদেশগুলোর বর্তমান সীমারেখা এমনভাবে পরিবর্তনের মারফত ক্ষুণ্ন ও বিকৃত করা হবে যার থেকে তাকে পুনরায় উদ্ধার করা অসম্ভব হবে, এবং মুসলমানরা শুধু শষ্যের পরিবর্তে তুষই পাবে।)

মহাত্মা গান্ধীর দ্বিতীয় শর্ত ছিল কংগ্রেস ও লীগের সম্মতিক্রমে একটি কমিশন এই এলাকাগুলো নির্ধারণ করবে। ঐ এলাকার প্রাপ্ত বয়স্কদের ভোট অথবা তার সমপর্যায়ের কোন উপায়ে অত্র অঞ্চলের অধিবাসীদের মতামত গৃহীত হবে।

www.amarboi.org

জিন্নাহ্ দ্বিমত পোষণ করে বললেন গান্ধীর প্রস্তাব অনুযায়ী তাঁর নির্দেশিত ক্ষত-বিক্ষত এলাকাতেও মুসলমানরা তাদের আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার প্রকাশের এককভাবে সুযোগ পাবে না। বরং ঐ এলাকার সমস্ত অধিবাসীরাই তাদের মতামত প্রকাশের সুযোগ পাবে।

অতঃপর গান্ধী তাঁর তৃতীয় শর্ত আরোপ করলেন,

"If the vote is in favour of seperation, it shall be agreed that these areas shall form a separate state as soon as possible after India is free from foreign domination, and can therefore be constituted into two sovereign Independent states."

(ভোট যদি বিভক্তির পক্ষে হয় তবে এটা সাব্যস্ত করা যাবে যে, এসমস্ত এলাকা নিয়ে একটি স্বতন্ত্র প্রদেশ ভারত বিদেশী শাসন মুক্ত হওয়ার পরে যথাসম্ভব গঠিত হবে এবং এভাবে দু'টি সার্বভৌম রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হবে।)

জিন্নাহ্ এতে রাজি হলেন না, তিনি প্রস্তাব করলেন, তাদের অবিলম্বে সম্পূর্ণ বুঝাপড়ায় উপস্থিত হতে হবে এবং পাকিস্তান ও হিন্দুস্থানের ভিত্তিতে উভয়ের মিলিতভাবে সর্বশক্তি নিয়ে দেশের স্বাধীনতার জন্য চেষ্টা চালিয়ে যেতে হবে।

গান্ধীজীর চতুর্থ শর্তে প্রকাশ পেল যে, ইংরেজদের দেশত্যাগের পর যে যে বাক্যাংশে তিনি মুসলমানদেরকে স্বাধীন রাষ্ট্র গঠনের অধিকারের স্বীকৃতির মনোভাব প্রকাশ করেছিলেন তার ব্যাখ্যায় তিনি বলেনঃ

"There shall also be a treaty of separation which should also provide for the efficient and satisfactory administration of foreign affairs, defence, internal communications, customs, commerce and the like, which must necessarily continue to be the matters of common interest between the contracting parties."

("বিভক্তির পর উভয় রাষ্ট্রের মধ্যে একটি সুষ্ঠু ও সন্তোষজনক চুক্তি সম্পাদিত হবে যার দ্বারা বিদেশ সংক্রান্ত ব্যাপার, দেশরক্ষা, আভ্যন্তরীণ

www.amarboi.org

যোগাযোগ ব্যবস্থা, শুল্ক বাণিজ্য ও এতদসম্পর্কীয় ব্যাপার যাহা চুক্তিবদ্ধকারী উভয় রাষ্ট্রের স্বার্থের ব্যাপারে সম্পর্কিত থাকবে।

এর উত্তরে জিন্নাহ লিখলেন,

"According to the Lahore Resolution, as I have already explained it to you, all these matters, which are the lifeblood of any state, cannot be delegated to any central authority or government. The matter of security of the two states, and the natural and mutual obligations that may arise out of physical contiguity, will be for the constitution-making body of Pakistan and that of Hindustan...to deal with on the footing of their being two independent states.

("আপনাকে আমি আগেই জানিয়েছি লাহোর প্রস্তাবের ভিত্তিতে যে সমস্ত বিষয় একটি রাষ্ট্রের প্রাণ ও রক্তবাহিকা শক্তি, তা কোনভাবেই একটি কেন্দ্রীয় কর্তৃপক্ষের নিকট হস্তান্তর করা চলে না। পাকিস্তান ও হিন্দুস্থান যেহেতু দু'টি সম্পূর্ণ স্বাধীন রাষ্ট্র হবে তাই এ দু'টি রাষ্ট্রের নৈকট্য ও স্বাভাবিক স্বার্থের কারণে যে সব সমস্যার উদ্ভব হবে তা পাকিস্তান ও হিন্দুস্থানের গঠনতন্ত্র প্রণয়ন কমিটি সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবে।

এর পরেই আলোচনা ভেঙ্গে পড়ল। লন্ডনের 'নিউজ ক্রনিকেল' পত্রিকার প্রতিনিধির নিকট জিন্নাহ বললেন, আমাদেরকে যা দিতে প্রস্তাব করা হয়েছিল তা যে কোন বুদ্ধিমান ব্যক্তির কাছে অসম্মানজনক। ভারতে হিন্দু মুসলমান সমস্যা সমাধানের একটি মাত্র বাস্তব ও কার্যকরী ব্যবস্থা হল ভারতবর্ষকে পাকিস্তান ও হিন্দুস্থান এ দু'টি সার্বভৌম রাষ্ট্রে বিভক্ত করে দেয়া। এতে বর্তমানে যেরূপ আছে সেভাবে সম্পূর্ণ স্বাধীন ও সমগ্র উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ, বেলুচিস্তান, সিন্ধু, পাঞ্জাব, বঙ্গ এবং আসামকে মুসলিম সার্বভৌম প্রদেশ হিসেবে স্বীকার করে নিতে হবে এবং সে সঙ্গে আমরা নিজ নিজ দেশে সংখ্যালঘুদেরকে পূর্ণ নাগরিককত্ব ও সম ব্যবহারে প্রতিশ্রুতি দেব। হিন্দুস্থানে আমরা আড়াই কোটি মুসলমানদের ব্যাপারে তাদের উপর পূর্ণ আস্থা স্থাপন করতে পারি যদি তারা আমাদেরকে বিশ্বাস করে। বাস্তব ব্যাপার হল হিন্দুরা এমন কোন ধরনের চুক্তি করতে চায় যা তাদেরকে কোনভাবে আধিপত্যের

www.amarboi.org

সুযোগ দিবে। তারা কোনভাবেই আমাদের সম্পূর্ণ স্বাধীনতা মেনে নিতে রাজি নয়।

গান্ধী-জিন্নাহর এই বৈঠকের তের দিন পর জিন্নাহ্‌র ঘনিষ্ঠ হিন্দু বন্ধু কাঞ্জী দ্বারকা দাস তাঁর ডায়েরীতে লিখেছেন "আমি জিন্নাহর সঙ্গে এক ঘন্টা কথা বলেছি। তাঁকে আমি দেখলাম খুব দুর্বল, পীড়িত ও মানসিকভাবে হতাশাগ্রস্ত। আমার কাছ থেকে দু'ফুট দূরে অবস্থান করলেও জিন্নাহর কথা স্পষ্টভাবে শুনতে আমার কষ্ট হচ্ছিল। তিনি ফিসফিস করে বলছিলেন, গান্ধীর যদি এর চেয়ে বেশি কিছু আমাকে দেয়ার ছিল না তবে তিনি কেন আমার সঙ্গে দেখা করতে এলেন। আমি বললাম, এমন তো হতে পারে গান্ধী আপনাকে বেকায়দায় ফেলে আপনার বিরুদ্ধে জনমত সৃষ্টি করতে চেয়েছিলেন। জিন্নাহ উত্তর দিলেন, 'না, না এমন হতে পারে না, গান্ধী আমার সঙ্গে খুব খোলামেলাভাবে কথা বলছিলেন এবং আমাদের আলোচনা খুব ভালভাবে হয়েছিল।

এরূপ দু'জন বৃহৎ প্রতিদ্বন্দ্বীর মধ্যে যখন আলোচনা চলছিল তখন ভদ্রতা ও পারস্পরিক শুভেচ্ছার কিরূপ নিদর্শন পাওয়া যায় তা আলোচনার সময় একটি ক্ষুদ্র ঘটনার থেকে পরিদৃষ্ট হয়। একদিন মহাত্মা গান্ধী যখন কায়েদে আযমের সঙ্গে দেখা করতে এসে সামান্য তর্ক-বিতর্কের পর উভয়ের দৈনন্দিন জীবনের ব্যাপার নিয়ে আলোচনা করতে আরম্ভ করলেন। দু'জনেই ক্লান্ত ছিলেন মনে হচ্ছিল দু' বক্সার সাময়িক বিরতির সময় পারস্পরিক করমর্দন করছিল। জিন্নাহ বললেন, তাঁর অসুখগুলোর মধ্যে একটি হল তাঁর একটি পায়ে শিরাঘটিত কারণে তিনি একটুখানি কষ্ট পাচ্ছিলেন মহাত্মা গান্ধী মেঝেতে বসে পড়ে জিন্নাহর পা থেকে মোজা এবং জুতা খুলে দিতে চাইলেন। দৃশ্যটি ছিল অপূর্ব-জিন্নাহ তাঁর অননুকরণীয় পরিচ্ছদে ভূষিত এবং গান্ধী অতি সাধারণ পোশাকে প্রায় নগ্নভাবে আচ্ছাদিত-দৃশ্যটি যেমনই ছিল মজার, তেমনি হৃদয় স্পর্শকারী। মহাত্মা গান্ধী জিন্নাহর রোগগ্রস্ত পদদলটি নিজের হাতের উপর রেখে বলছিলেন, আমি জানি কি ঔষধ আপনাকে ভাল করবে। আগামীকাল ভোরে আমি সেটি আপনার কাছে পাঠিয়ে দেব। পরদিন ভোরে মাটি মিশ্রিত ঔষধসহ একটি ছোট বাক্স এসে জিন্নাহর কাছে পৌছালো। জিন্নাহ সেটি ব্যবহার করেন নি, কিন্তু গান্ধী যখন সেদিন বিকালে তাঁর সঙ্গে দেখা করতে

www.amarboi.org

এলো তিনি তাঁকে ঔষধের জন্য ধন্যবাদ জানিয়ে বললেন যে, ঔষধটি তার ব্যথা দূর করে দিয়েছে।

জিন্নাহ-গান্ধী আলোচনার সময় হিন্দু-মুসলমান অধিবাসীদের মতামতের ভিত্তিতে উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ, বেলুচিস্তান, সিন্ধু ও পাঞ্জাব নিয়ে পশ্চিম অংশে এবং বাংলা ও আসামের মুসলিম এলাকা নিয়ে আলাদা মুসলিম রাষ্ট্র বা পাকিস্তান অঞ্চল সৃষ্টির নীতিতে গান্ধী সম্মতি প্রকাশ করছিলেন। যেটাতে জিন্নাহর দাবির প্রায় পুরোপুরিটাই মানা হয়েছিল বলা চলে। ১৯৪৭ সনে মাউন্টবেটেনের নেতৃত্বে ও র‍্যাড ক্লিফের নির্দেশে দেশ যেভাবে ভাগ করে উভয় অংশে বৃহৎ বৃহৎ মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ট এলাকা হিন্দুস্থানকে দিয়ে দেয়া হয়েছিল গান্ধীর প্রস্তাব অনুযায়ী ভাগ হলে পাকিস্তান এলাকার দিক থেকে অনেক বেশী লাভবান হতো বলে মনে হয়। অনেকে মনে করেন তৎকালে আপোষহীন মনোভাব দেখিয়ে জিন্নাহ ভুল করেছেন। কিন্তু ব্যাপারটা গভীরভাবে তলিয়ে বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় জিন্নাহ সাহেব মোটেই ভুল করেন নি। অতীত অভিজ্ঞতা থেকে জিন্নাহ বরাবরই দেখেছেন কংগ্রেস অতীতে যখনই সুযোগ এসেছে কোনদিন চুক্তি ভঙ্গ করতে দ্বিধাবোধ করেনি। অতীতে তার ১৯১৬ সালে অনুষ্ঠিত লাক্ষ্মৌ প্যাক্ট ভঙ্গ করেছে, ১৯২০ সালে সম্পাদিত দিল্লী মুসলিম প্যাক্ট মেনেও পরে অস্বীকার করেছে, ১৯৩৫ সনে অনুষ্ঠিত নির্বাচনের পরে ওয়াদামাফিক বিভিন্ন প্রদেশে কোয়ালিশন সরকার গঠন না করে ওয়াদা ভঙ্গ করে এককভাবে সরকার গঠন করেছে। অতীতে কংগ্রেসের এ মসীলিপ্ত রেকর্ডের কারণে জিন্নাহ কংগ্রেসের প্রতিশ্রুতির উপরে বিন্দুমাত্র আস্থা স্থাপন করতে পারছিলেন না। তিনি মনেপ্রাণে বিশ্বাস করতেন ইংরেজ এদেশ থেকে চলে যাওয়ার পর কংগ্রেস কোনভাবেই তার প্রতিশ্রুতি রক্ষা করবে না। গান্ধীর প্রস্তাব অনুযায়ী যে কেন্দ্রীয় সরকারের পরিকল্পনা করা হয়েছিল যার অধীনে দেশরক্ষা, আভ্যন্তরীণ যোগাযোগ, শুল্ক কাস্টমস্, বৈদেশিক সম্পর্কের মত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলো ন্যস্ত থাকবে সে অবস্থায় পাকিস্তান একটি সাধারণ ইউনিট হিসাবে বিবেচ্য হলেও তাঁর কোন ভবিষ্যত নিরাপত্তা ছিল না। কেন্দ্র যেহেতু হতো হিন্দু সংখ্যাগরিষ্ঠের নিয়ন্ত্রাণাধীন এবং দেশরক্ষার নামে সৈন্যবাহিনী তাদের নিয়ন্ত্রণাধীনে থাকত, তখন ইচ্ছা করলে যে কোন সময় তারা মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ট এলাকা গুলোর স্বাধীনতা বিলুপ্ত করে দিতে পারতো। গান্ধী ব্যক্তিগতভাবে যতই সৎ, চুক্তির ব্যাপারে যতই নিষ্ঠাবান থাকুন

www.amarboi.org

সরোজিনী নাইডু, জিন্নাহর একজন বন্ধু ও একান্ত ভক্ত

লর্ড মাউন্টব্যাটেন, লেডী এডুইনার সঙ্গে জিন্নাহ

www.amarboi.org

মিঃ ও বেগম লিয়াকতসহ মিঃ জিন্নাহ ও ফাতেমা জিন্নাহ

www.amarboi.org

না কেন পরবর্তীকালে উগ্র-সাম্প্রদায়িকতাবাদী নেতা জওহর লাল, প্যাটেল প্রভৃতির চাপের কাছে তিনি যে আত্মসমর্পণ করবেন, জিন্নাহর ধারণায় এটা ছিল অবধারিত। তাই ভবিষ্যৎ রাজনৈতিক জীবনে মুসলমানদের স্বাধীন আবাসভূমি গঠনের মতো গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপারে তিনি কোন প্রকার ঝুঁকি নিতে রাজি ছিলেন না। তাঁর সিদ্ধান্ত যে সঠিক ছিল তা আজকে ভারত কর্তৃক কাশ্মীরের ব্যাপারে গণভোটের চুক্তিভঙ্গ, ভারতব্যাপী মুসলিম সংখ্যালঘিষ্ঠ সম্প্রদায়ের উপযুক্ত নিরাপত্তা বিধানে অস্বীকৃতি এবং ফারাক্কার ব্যাপারে চুক্তিভঙ্গ এর জাজ্জ্বল্যমান প্রমাণ।

গান্ধী-জিন্নাহর বৈঠকের পূর্বেও গান্ধী যখন আগাখান প্রাসাদে বন্দী ছিলেন, সে সময় গান্ধীর বেয়াই মাদ্রাজের শ্রদ্ধেয় প্রখ্যাত নেতা রাজা গোপাল আচারী গান্ধীর উপস্থাপিত প্রস্তাবে প্রায় অনুরূপ একটি প্রস্তাব হিন্দু-মুসলমান সমস্যা সমাধানের জন্য উপস্থাপন করেন, যেটি জিন্নাহ্ কর্তৃক বিকলাঙ্গ ও কীটদ্রষ্ট পাকিস্তান রূপে প্রত্যাখ্যান করেন। ঐ প্রস্তাবেও গান্ধীর প্রস্তাবের ন্যায় গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলো নিয়ে একটি কেন্দ্রীয় সরকারের পরিকল্পনা ছিল। ভবিষ্যতে কংগ্রেস কর্তৃক চুক্তিভঙ্গের আশংকার কারণে জিন্নাহ্ সে প্রস্তাবও প্রত্যাখ্যান করেছিলেন।

জিন্নাহ্ সম্বন্ধে রানা লিয়াকত আলী খান

এ ক'বছর জিন্নাহ লিয়াকত আলী খান ও তাঁর সুন্দরী বুদ্ধিমতী স্ত্রী রানার সাহচর্য উপভোগ করছিলেন। জিন্নাহর ভগ্নী ফাতেমা তাদের সঙ্গে যোগ দিতেন। তারা মাঝে মাঝে সিনেমায় যেতেন, কখনও বা তাস খেলে সময় কাটাতেন। একদিন একটি ব্রিজ খেলার শেষে লিয়াকত আলী খান সাহস করে তাঁর নেতাকে তাঁর একাকীত্বের প্রতি ইঙ্গিত করলেন। জিন্নাহ্ বেগম লিয়াকত আলীর প্রতি তাকিয়ে হাসিমুখে বললেন, " হ্যাঁ, আমি আবার বিয়ে করতে পারতাম যদি রানার মত একজনকে পেতাম।" জিন্নাহ্ যখন লিয়াকত আলীর নিকট পত্র দিতেন তখন পত্রের শেষভাগে লিখতেন আমার হৃদয় তোমাদের দু'জনের চিন্তায় পূর্ণ রয়েছে।" ইতিমধ্যে লিয়াকত আলী খান প্রায় দশ বৎসর ধরে জিন্নাহর সাথে কাজ করছিলেন। মুসলিম লীগের আর্থিক ও অন্যান্য ব্যবস্থা সুষ্ঠু ও সাফল্যজনকভাবে সম্পাদিত হচ্ছিল। জিন্নাহ্ সাহেব তাঁর সহকর্মীকে পরিপূর্ণভাবে বিশ্বাস করতেন। তাঁদের বন্ধুত্ব, পারস্পরিক বিশ্বাস এবং চারিত্রিক নিষ্ঠা প্রাচ্য দেশে রাজনৈতিক জীবনে যে সমস্ত বিপদের সম্মুখীন

www.amarboi.org

হয়, সেগুলো অতিক্রম করে শেষ পর্যন্ত বজায় থেকে ছিল। তাঁদের ব্যক্তিগত জীবনের পার্থক্যই বোধহয় তাঁদের এই যুগসূত্রের কারণ ছিল। তাঁদের দু'জনার মধ্যে একজন ছিলেন স্বপ্রতিষ্ঠিত তীক্ষ্ণ মেধাবী আইনজীবী, যিনি তাঁর চরিত্র ও প্রতিভার দ্বারা নিজকে প্রায় সম্পূর্ণ অপরিচিত অবস্থা থেকে নিজের চেষ্টায় প্রতিষ্ঠা লাভ করেছিলেন । আর একজন ছিলেন অত্যন্ত উষ্ণ হৃদয়ের মানুষ, অভিজাত জমিদার শ্রেণীর একজন কর্তব্যপরায়ণ ব্যক্তিত্ব, যিনি নেতৃত্ব দানের ক্ষমতা উত্তরাধিকার সূত্রে পেয়েছিলেন, যার মধ্যে ব্যক্তিগত উচ্চাভিলাষের কোন চিহ্ন ছিল না।

কায়েদে আযম ও রানার স্বামীর মধ্যে যখন প্রগাঢ় বন্ধুত্ব স্থিতি লাভ করেছিল, সে সময়ের কিছু কাহিনী উল্লেখ করতে গিয়ে বেগম লিয়াকত আলী এভাবে স্মৃতিচারণ করেছেনঃ "আমার মন পূর্ণ রয়েছে কায়েদে আযমের নিষ্কলংক শারীরিক দূরত্ব বজায় রক্ষাকারী একজন অবিশ্বাস্য সৎলোকের স্মৃতিতে। তাঁর জন্য নিষ্কলংক ও সাধুতা একটি গুণ হিসাবে ছিল না; তাঁর জন্য এটা ছিল প্রায় মানসিক বিকৃতির কাছাকাছি। তিনি যে সাধারণের সংস্পর্শ এড়িয়ে চলবার চেষ্টা করতেন এটা বুঝা যেত, সাধারণের সঙ্গে করমর্দনের ব্যাপারে তাঁর অনিচ্ছা থেকে। আমি শুনেছি, তিনি বেলুচিস্তানে একটি গার্ডেন পার্টিতে বহু লোকের সমাবেশে যখন একজন উপজাতীয় সর্দার তাঁর সঙ্গে করমর্দনের জন্য এগিয়ে আসলেন, তিনি করমর্দন করতে অস্বীকৃতি জানালেন। তিনি বললেন, এর সঙ্গে করমর্দন করলে এখানে সকলের সঙ্গে আমাকে করমর্দন করতে হবে, যা আমার পক্ষে শারীরিকভাবে সম্ভব ছিল না এবং যথেষ্ট সময়ও ছিলনা।" বেগম লিয়াকত আলী বললেন, আমি জানি, রূঢ় মনোভাব থেকে তিনি এটা করেন নি। এটার কারণ ছিল দৈহিকভাবে তিনি একটি স্বতন্ত্র জগতে বাস করতেন যেটা ছিল সম্পূর্ণ স্বাধীন ও মানব সম্পর্কবিহীন। এতদ্বসত্ত্বেও তিনি আমার স্বামী ও আমার সঙ্গে মাঝে মাঝে সহজ হতেন এবং স্কুল বালকের ন্যায় হাস্যরস উপভোগ করতেন। কিন্তু অপরিচিতের ক্ষেত্রে তাঁর এই আত্মবল ছিল অত্যন্ত উঁচু ও দূরত্বপূর্ণ। তাঁর সাধুতা সম্বন্ধে বলতে গেলে প্রত্যেক পদক্ষেপেই তিনি এই নীতির উপর গ্রহণ করতেন। আমার মনে আছে মুসলিম লীগ যখন প্রতি বৎসর তাঁকে সভাপতি হিসাবে পুনঃ নির্বাচনের নীতি পরিত্যাগ করে তাঁকে স্থায়ী প্রেসিডেন্ট হিসাবে নির্বাচনের প্রস্তাব দিল, তিনি আপত্তি করে বললেন, তা হতে পারে না। আমাকে আপনাদের কাছে প্রতি

www.amarboi.org

বৎসরের শেষেই উপস্থিত হতে হবে, যাতে আমি আপনাদের আস্থা ভোট পেতে পারি। মানুষ সময় সময় তাঁর রূঢ় ব্যবহার সম্বন্ধে অভিযোগ করে। আমার মনে হয় এটিরও উৎসমূল ছিল তাঁর অতিমাত্রায় উচ্চমার্গের সুচিন্তাবোধ ও কোন প্রকার ভান না করার প্রবণতা থেকে। একবার যখন মুসুল্লীদের কয়েকজন সদস্য গান্ধীর ন্যায় তাঁকে তৃতীয় শ্রেণীতে ভ্রমণ করতে অনুরোধ জানালেন, তিনি ভীষণভাবে রেগে গেলেন। তিনি বললেন, আমাকে নির্দেশ দিতে যেও না আমি কি করব বা কি করব না, আমি যেটা ব্যয় করছি সেটা তোমাদের পয়সা নয়। যেভাবে আমি ভাল মনে করব সেভাবেই আমি চলব এবং কাজ করব।

বেগম লিয়াকত আলী কায়েদে আযম সম্বন্ধে বলেন,"জিন্নাহর সর্ববিষয়ে স্বচ্ছতা এবং তাঁর ছলনাবিহীন ব্যবহার যেটা মানুষকে আশ্চর্যান্বিত ও প্রশংসা মুখর করে তুলত।" আমার মনে পড়ে কোথায় আমি পড়েছিলাম "দু'টি সত্যের আলো" (Twin Lamps of Truth) জিন্নাহ্‌র চোখ দু'টি ছিল ঠিক সেরূপ টুইন লেম্পস অব ট্রুথ। শুধু সৎ লোকেরাই তাঁর দিকে সোজাসুজি তাকাতে পারতো। এ কারণেই শুধু আমার স্বামী বরাবর তাঁর বিশ্বস্ত বন্ধু ছিলেন। মানুষের মধ্যে অনেকে আছেন যারা সব সময় অবিভক্তকে বিভক্ত করতে চেষ্টা করতো। তারা বলতো, দেশ বিভক্তির পরে জিন্নাহ আমার স্বামীর আনুগত্য ত্যাগ করে একাই চলতে চেষ্টা করবেন। এ ধারণা ছিল সম্পূর্ণ মিথ্যা। এক ঘটনা এটাকে সত্য প্রমাণ করে।

বহুপূর্বে ১৯৩৯ সনে জিন্নাহ যখন বোম্বেতে ছিলেন তখন তিনি একটি উইল লিখেন। একটি সামান্য ঘটনা ছাড়া পরবর্তীতে তিনি উইলের ক্রোড়পত্রের কোনরূপ পরিবর্তন করেন নি। এই উইল কার্যকরী করার ব্যাপারে তিনি আমার স্বামীকে এক্সিকিউটার নিযুক্ত করেন। কিন্তু তিনি আমার স্বামীকে তাঁর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন সম্পর্কে কোন কথা বলেন নি। জিন্নাহ তাঁর মৃত্যু পর্যন্ত তাঁর মনোভাব পরিবর্তন করেন নি। তিনি একবার আমার স্বামীকে দক্ষিণ হস্ত হিসাবে আখ্যায়িত করেন এবং লিয়াকত শেষ পর্যন্ত সে রূপই ছিলেন।

কায়েদে আযম সম্পর্কে তাঁর শেষ বিশ্লেষণে বেগম লিয়াকত বলেন, আপনারা মনে রাখবেন জিন্নাহ অত্যন্ত ক্ষমতাশালী ব্যক্তি ছিলেন এবং তিনি

www.amarboi.org

যখন মনে বিশেষ ব্যক্তি বা গোষ্ঠিকে দীক্ষিত করবার চেষ্টা করতেন তখন তাঁর ব্যক্তিত্ব অসাধারণ ভীতির পর্যায়ে পৌঁছাত। আমি তাঁকে কারো কারোর সামনে অঙ্গুলি উত্তোলন করে বলতে শুনেছিঃ

..."You are talking nonsense: You do not know what you are talking about,.' They always subsided into silence. But his real power was over a great audience. Even with them he would use his monocle; put it to his eye, remove it and then speak . All this power over a vast crowd was asserted in spite of the barrier of language. He spoke to them in English-but they listened, bewitched."

("আপনি নির্বোধের মতো কথা বলছেন। আপনি জানেন না কি সম্বন্ধে আপনি বলছেন," এ কথা বলার পরেই দেখেছি তারা সবাই নিশ্চুপ হয়ে যেত কিন্তু তাঁর সত্যিকারের প্রভাব ছিল একটি বিরাট শ্রোতৃমন্ডলীর উপর। তাদের সামনে বক্তৃতা দিতে গিয়েও তিনি তাঁর একচক্ষু বিশিষ্ট চশমাটি ব্যবহার করতেন। এটি মাঝে মাঝে খুলে তিনি বক্তৃতা করতেন। ভাষার পার্থক্য সত্ত্বেও এই বিরাট জনতার উপরে তাঁর প্রভাব অসাধারণভাবে কার্যকরী হতো। তিনি ইংরেজীতে বক্তৃতা দিতেন, কিন্তু শ্রোতৃবর্গ ইংরেজী না জানলেও মন্ত্রমুগ্ধের মতো শুনে যেত।

১৯৪৫ সনের মে মাসে ইউরোপে যখন যুদ্ধের পরিসমাপ্তি ঘটল তখন কংগ্রেস নেতাদের সবাইকে মুক্তি দেয়া হল। এসময় হিন্দু -মুসলমান প্রশ্নে অচলাবস্থা দূরীকরণের জন্য তিনি একটি পরিকল্পনা উপস্থাপন করলেন এবং এটি সিমলা কনফারেন্সে আলোচনা হ'ল। এই পরিকল্পনা ব্রিটিশ পক্ষ আরও একটু অধিক উদারতার পরিচয় দিয়ে প্রস্তাব করলেন যে, ভাইসরয়ের নির্বাহী পরিষদ (Executive Council) সম্পূর্ণভাবে ভারতীয় হবে, শুধু প্রধান সেনাপতি এবং ভাইসরয় এই দু'জন মাত্র ইংরেজ থাকবেন। এই কাউন্সিল জাপানী যুদ্ধের শেষে নতুন সংবিধান রচিত না হওয়া পর্যন্ত অন্তর্বর্তী সরকার হিসেবে কাজ করবে। সিমলা কনফারেন্সের পূর্বাহ্নে কংগ্রেস ও লীগ নেতারা নিজেদের মধ্যে আলোচনা করে যাতে একটা সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত নিয়ে ভাইসরয়ের মুখোমুখি হতে পারেন, তজ্জন্য কংগ্রেস ও লীগের নেতাদের বন্ধুস্থানীয় অনেক নেতা জিন্নাহ ও গান্ধীর মধ্যে বৈঠকের জন্য অনেক চেষ্টা করলেন কিন্তু সে চেষ্টা ফলপ্রসূ হল না।

www.amarboi.org

ভাইসরয়ের সঙ্গে আলোচনা ব্যর্থ হলে জিন্নাহ দাবি করলেন যে, অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের সকল মুসলিম প্রতিনিধি মুসলিম লীগ নির্বাচন করবে কিন্তু কংগ্রেস ও বৃটিশ সরকার তাতে রাজি হলেন না। তবে এটা স্থির হল যে, বর্ণ হিন্দু ও মুসলমান প্রতিনিধিদের সংখ্যা সমান হবে জিন্নাহ তাঁর দাবিতে শেষ পর্যন্ত অটল থাকার ফলে সম্মেলন পরিত্যক্ত হল।

জিন্নাহ এখন পর্যন্ত ভারতের সকল মুসলমানকে তাঁর প্রতিষ্ঠানের মধ্যে আনতে সক্ষম হননি। উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশের প্রধানমন্ত্রী এবং অধিকাংশ জনগণ কংগ্রেস দলভুক্ত ছিল। পাঞ্জাবের অবস্থাও প্রায় তদ্‌রূপ। স্যার খিজির হায়াৎ খান তিওয়ানা বরাবরই জিন্নাহ ও লীগ বিরোধী ছিলেন। তিনি সেখানে হিন্দু-মুসলমান শিখদের নিয়ে ইউনিয়নিস্ট পার্টি নামে একটি কোয়ালিশন সরকার গঠন করেছিলেন। এমতাবস্থায় এ সব এলাকার মুসলিম জনগণকে তাঁর পাকিস্তান দাবির পিছনে টেনে আনার জন্য তাঁকে আরও কিছুদিন অপেক্ষা করতে হলো। তিনি সিমলা থেকে ব্যর্থ মনোরথ হয়ে বোম্বেতে ফিরে এলেন।

এট্‌লির সোসালিস্ট পার্টির ক্ষমতায় আগমন

এদিকে বৃহত্তর বিশ্বে ঘটনাচক্র অপ্রত্যাশিতভাবে মোড় নিল, যার ফলে জিন্নাহর রাজনীতি গভীরভাবে প্রভাবিত হল। ৪৫ সনের জুলাই মাসে মিঃ এট্‌লির নেতৃত্বে সোসালিস্ট পার্টি বৃটেনে ক্ষমতায় চলে এল এবং আগস্ট মাসে জাপানীরা নিঃশর্ত আত্মসমর্পণ করল। জাপানীদের আত্মসমর্পণের ফলে পূর্বদিক থেকে যেহেতু বিদেশী আক্রমণের আর কোন সম্ভাবনা রইল না, ভারতের হিন্দু মুসলমান এবার তাদের পুরানো শত্রু ইংরেজের সঙ্গে বুঝাপড়ার জন্য প্রস্তুত হল।

বৃটেনে শ্রমিক গভর্ণমেন্টের অনেকেই ভারতীয় আশা আকাঙ্খার প্রতি সহানুভূতিশীল ছিল এবং তাদের দাবি-দাওয়া পূরণের জন্য বেশ খানিকটা আগ্রহশীল হয়ে উঠল। মুসলিম লীগ পাকিস্তান দাবীতে অটল এবং তারা সমগ্র ভারতে মুসলমানদের প্রতিনিধিত্ব করে এই দাবিতে সোচ্চার। কিন্তু কংগ্রেস মুসলিম লীগের এ দাবি অস্বীকার করে তারাও মুসলমানদের কিছু অংশের প্রতিনিধিত্ব করে এই দাবির প্রেক্ষিতে এট্‌লি সরকার ভারতের জনমত যাচাই-এর জন্য ১৯৪৬ সনের জানুয়ারীতে নির্বাচন ঘোষণা করলেন।

১৯৪৬ সনের নির্বাচনকে জিন্নাহ তাঁর লক্ষ্য পাকিস্তান অর্জনের ব্যাপারে একটা জীবনমরণ প্রশ্নরূপে তার জন্য ব্যাপক প্রচার ও অর্থ সংগ্রহের কাজে কোমর বেঁধে গেলে গেলেন। বোম্বাই থেকে তিন লক্ষ, আহমাদাবাদ থেকে

www.amarboi.org

দুই লক্ষ, এভাবে দেশের সমস্ত এলাকা থেকে মুসলমানরা দরাজ হাতে লীগের অর্থভান্ডারে দান করতে লাগলেন। গান্ধী এবং কংগ্রেস ও তাঁর উচ্চ বর্ণ হিন্দু নেতৃত্বের প্রতি তাঁর আক্রমণ তীব্র হতে তীব্রতর হয়ে উঠতে লাগল। মনে হচ্ছিল পঁচিশ বৎসর পূর্বে নাগপুরের প্রকাশ্য সভায় তাঁকে যেভাবে অপমানিত করা হয়েছিল সেই অপমানের ধুলিসাৎ থেকে উঠে দাঁড়িয়ে আসন্ন মৃত্যুর দ্বারদেশে উপনীত হয়ে পৃথিবীর কাছে সগর্বে প্রমাণ করতে চাইছিলেন যে, তিনি গান্ধীর চাইতে কোন অংশে ছোট নন। গান্ধী যেমন কংগ্রেস ও বর্ণ হিন্দুদের একমাত্র নেতা তেমনি তিনিও ভারত উপমহাদেশে বিরাট জনগোষ্ঠীর একমাত্র নেতা। এখানে স্মরণযোগ্য যে, পঁচিশ বৎসর পূর্বে নাগপুর কংগ্রেসে অধিকাংশ সদস্য জিন্নাহকে মুসলমানদের পক্ষ থেকে কথা বলার অধিকার স্বীকার করতে অস্বীকৃতি জানিয়েছিল।

জিন্নাহ তাঁর বিভিন্ন বক্তৃতায় গান্ধীর দু' মুখো নীতির কঠোর সমালোচনা করতেন। তিনি বলতেন "সুবিধা হলে তিনি বলেন যে, তিনি কারও প্রতিনিধি নন, তিনি ব্যক্তি হিসাবে কথা বলতে পারেন; তিনি কংগ্রেসের এমনকি চারআনা সদস্যও নন। রাজনৈতিক প্রশ্নের মীমাংসার জন্য তিনি অনশন করেন, নিজেকে শূন্যে পর্যবসিত করে তিনি নিজ অন্তরাত্মার সংগে পরামর্শ করেন। তারপর যখনই আবার তাঁর পক্ষে সুবিধাজনক মনে হয় তিনি কংগ্রেসের চূড়ান্ত ডিক্টেটর হয়ে পড়েন। তিনি মনে করেন যে, তিনি সমগ্র ভারতবর্ষের প্রতিনিধি। মিঃ গান্ধী এক হেঁয়ালী। তাঁর সংগে কিভাবে একটা বুঝাপড়ার উপনীত হওয়া সম্ভব ?

বোম্বাইএর এক প্রকাশ্য জনসভায় তিনি বলেন, কংগ্রেস ছলে বলে কৌশলে মুসলমানদের এক নিখিল ভারত ইউনিয়নে প্রলুব্ধ করতে চেয়েছিল এবং এই উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য বৃটিশদের উপরে চাপ সৃষ্টি করে তাদের হাতের বেয়নেট নিজেদের হাতে তুলে নিয়ে বৃটিশদের শাসাতে চাচ্ছে। কখনও তারা বৃটিশদের তোষামোদ করে কখনও গালিগালাজ করে, কখনও বা বৃটিশ প্রভুর সামনে নত মস্তকে দাস সুলভ মনোভাব প্রকাশ করে, আবার সুযোগ পেলেই তাদের শাসানী দিতেও দ্বিধা করে না। আমরা তাদের আজ্ঞাবহ হতে পারি না, যা কংগ্রেসের কাম্য। স্বাধীনতার দ্বারা হিন্দুরাজ প্রতিষ্ঠা করে মুসলমানদের তারা দাসে পরিণত করবে।

কোয়েটায় লীগের এক সভায় গান্ধীর অহিংস নীতিকে বিদ্রুপ করে তিনি বলেন, গান্ধীর কাজ হ'ল নেতৃত্ব পাবার জন্য প্রথমে পুলিশের লাঠি বর্ষণের

www.amarboi.org

মুখে ছাগলের মত বসে থাকা, তারপর জেলে যাওয়া এবং তারপর অভিযোগ করা যে, তাঁর ওজন হ্রাস পাচ্ছে এবং তারপর কায়দা করে কারামুক্ত হওয়া। জিন্নাহ্‌র এ ভাষণে শ্রোতৃবৃন্দ উচ্চ হাস্য করে উঠে। জিন্নাহ্ বলেন, আমি ঐ জাতীয় সংগ্রামে বিশ্বাসী নই। তবে কারাবরণ করার সময় যখন আসবে তখন সর্বাগ্রে আমি বক্ষে বুলেটের আঘাতবরণ করে নিব। তিনি বললেন, কংগ্রেসের উদ্দেশ্য হচ্ছে মুসলমানদের ভাগ্যলিপিকে জার্মানীর ইহুদীদের মত অসহায় করে ফেলার। তাঁর এই উক্তি মুসলমানদেরকে ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে আতঙ্কিত করে মুসলিম লীগ পতাকা তলে সমবেত করতে প্রভূত সাহায্য করেছে।

আহমদাবাদের এক সভায় তিনি বলেছিলেন সব মুসলমানই এক অদ্বিতীয় আল্লায় বিশ্বাসী এবং তাই তারা একই জাতি। তারা পাকিস্তান চেয়েছিলেন এবং তা পাবেনও। এ হ'ল তাদের মন্ত্রপুতঃ কবচ, তাদের রক্ষামন্ত্র যা তাদের শক্তি ও গৌরব বৃদ্ধি করবে। পাকিস্তানের চন্দ্রমা কিরণ বিকীর্ণ করছে এবং আমরা সেখানে উপনীত হবই।

২১ শে নভেম্বর ১৯৪৫ এক জনসভায় জিন্নাহ্ বলেন, "মিঃ গান্ধী ও কংগ্রেস আমাদের চূর্ণবিচূর্ণ করার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করছেন। কিন্তু আমরা এমন এক পর্যায়ে উপনীত হয়েছি যে, পৃথিবীর কোন মানুষ মুসলিম লীগকে ধ্বংস করার শক্তি রাখে না। কংগ্রেসের সম্মুখে দু'টি বিকল্প তুলে ধরে তিনি বলেন, তাদের হয় পাকিস্তান মেনে নিতে হবে নচেৎ মুসলমানদের পদদলিত করতে হবে। কিন্তু দশ কোটি মুসলমানকে শেষ করা যায় না।" ২৪শে নভেম্বর পেশোয়ারের এক বক্তৃতায় তিনি ঘোষণা করেন, "আমি যতদিন বেঁচে আছি ততদিন মুসলমানদের এক বিন্দু রক্তও বৃথাপাত হতে দেব না। মুসলমানদের কোন মতেই আমি হিন্দুদের ক্রীতদাসে পরিণত হতে দিতে পারি না। জাতীয়তাবাদী মুসলমানদের সম্বন্ধে তিনি মন্তব্য করেন।" তারা না জাতীয়তাবাদী, না সাচ্চা মুসলমান। তাদের উদ্দেশ্যে করে জিন্নাহ্ বলেন, তারা যদি সাচ্চা মুসলমান হন এবং তারা যদি মনে করেন যে, লীগের কার্যকলাপ মুসলমানদের মঙ্গলের পরিপন্থী, তবে তাদের উচিত লীগে যোগদান করে প্রতিষ্ঠানকে স্বমতে নিয়ে আসা। এ সময় বড় লাট লর্ড ওয়াভেলও বিশ্বাস করতেন ভারতবর্ষের মুসলমান অধিবাসীদের শতকরা নিরানব্বই জনের মনে হিন্দু প্রভূত্বের সম্বন্ধে যে আশংকা বিদ্যমান, তাকে ভিত্তিহীন বলা চলে না, এবং জিন্নাহ্ তাদের মুখপাত্র।

www.amarboi.org

এখানে লক্ষ্যণীয় যে, জিন্নাহ্ কোনদিনই পাকিস্তানে সীমারেখা সম্পর্কে কোন সুস্পষ্ট ব্যাখ্যা দেননি। মুসলিম সংখ্যা গরিষ্ট অঞ্চলগুলো নিয়ে মুসলমানদের আত্ম নিয়ন্ত্রণের ভিত্তিতে সার্বভৌম পাকিস্তান হবে। সিন্ধু, পাঞ্জাব, বেলুচিস্তান ও উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ পুরাপুরি মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ এবং তাই এগুলো পাকিস্তানে পড়বে এটা ছিল তখনকার অধিবাসীদের কাছে স্বতঃসিদ্ধ ব্যাপার। কিন্তু পাঞ্জাব ও বঙ্গদেশে যেখানে মুসলমানরা সামান্য মেজরিটি, সেখানে তাদেরকে ধারণা দেয়া হল যে, শুধু মুসলিম ভোটারদের গণভোটের দ্বারা স্থিরিকৃত হবে গোটা পাঞ্জাব ও গোটা বঙ্গদেশ পাকিস্তানে যাবে না হিন্দু কেন্দ্রীয় শাসনাধীনে থাকবে। সংখ্যালঘু প্রদেশের মুসলমানরা কংগ্রেস শাসনে উৎপীড়িত হচ্ছিল বলে তারা নতুন মুসলিম রাষ্ট্র পাকিস্তানকে তাদের রক্ষাকর্তা হিসাবে বিপদের সময় আশ্রয়স্থল মনে করত। অনেক রাজনৈতিক চিন্তাবিদদের ধারণা বঙ্গ এবং আসাম শেষ পর্যন্ত বিভক্ত হবে এটা জানলে এই দু' প্রদেশের মুসলমানরা পাকিস্তান আন্দোলনে এরূপ সক্রিয়ভাবে অংশ নিত কিনা সন্দেহ। মুসলমান জন সমষ্টির অধিকাংশ ছিল অশিক্ষিত। রাজনৈতিক দূরদৃষ্টির ব্যাপারে ছিল অদূরদর্শী এবং বিভিন্ন ধর্মীয় ও রাজনৈতিক গোষ্ঠীতে বিভক্ত। পাকিস্তানের সীমারেখা, অর্থনীতি ও অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপারে বিস্তৃত ব্যাখ্যা দিতে গেলে নানাবিধ সমস্যা দেখা দিয়ে সমস্ত আন্দোলনই দুর্বল হয়ে যাওয়ার আশংকা থাকায় বিভিন্ন মহল থেকে বিভিন্ন সময়ে বহু প্রশ্ন উত্থাপিত হওয়া সত্ত্বেও তিনি কোনরূপ ব্যাখ্যা দিতে অস্বীকৃতি জানান।

কিন্তু অপ্রত্যাশিতভাবে দেশ বিভাগের সিদ্ধান্ত নেয়ার পরে বাংলা ও আসাম বিভক্ত করার প্রশ্ন পুরাপুরিভাবে দেখা দিল তখন ইতিহাসের গতি এতদূর এগিয়ে গেছে যে, তাকে ফিরানো সম্ভবপর ছিল না।

পাঞ্জাবের রাজনীতি সম্বন্ধে অভিজ্ঞ ছোট লাট গ্ল্যান্সির মতে মুসলমানদের জন্য উপযুক্ত রক্ষা কবচযুক্ত ভারতীয় যুক্তরাজ্য অথবা প্রদেশের বিভাজনের পর পাকিস্তান এই দুই বিকল্প যদি পাঞ্জাবীদের সামনে উপস্থিত করা হত তারা খুব সম্ভবতঃ উপযুক্ত রক্ষা কবচযুক্ত ভারতীয় যুক্ত রাজ্যের পক্ষে থাকার পক্ষেই মত দিতেন। এখানে স্মর্তব্য ১৯০৬ সন থেকে ১৯৩৬ সন পর্যন্ত এই সুদীর্ঘকাল জিন্নাহ্ কংগ্রেস নেতাদের এই রক্ষা কবচের কথাই সংবিধানে অন্তর্ভুক্ত করার

www.amarboi.org

জন্য কংগ্রেস নেতাদের পরামর্শ দিয়ে আসছিলেন। কিন্তু তারা জিন্নাহ্‌র দাবী বা পরামর্শে কর্ণপাত করে নাই।

নির্বাচনী প্রচারকালে পেশোয়ারের এক জনসভায় মিঃ জিন্নাহ্‌ আবেগের সংগে বলেন, " আমাদের কোন সুহৃদ নেই, বৃটিশ এবং হিন্দু কেউই আমাদের মিত্র নয়। আমাদের মনে এ বিষয়ে কোন অস্পষ্টতা নেই যে, উভয়ের বিরুদ্ধে আমাদের লড়াই করতে হবে। উভয়েই যদি আমাদের বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ হয় তবুও আমরা ভীত হবো না। ওঁরা (হিন্দুরা) প্রশ্ন করেন, জিন্নাহ্‌ ও মুসলিম লীগ কতটা আত্মত্যাগ করেছে ? কিন্তু আমি তাঁদের জিজ্ঞাসা করছি ১৯২০-২১ সালে খেলাফত আন্দোলনের সময় কারা আত্মত্যাগ করেছিল ? মিঃ গান্ধী আমাদের কঙ্কালের উপর চড়ে নেতৃত্বের সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হয়েছেন। (জিন্নাহ্‌ পাকিস্তান ও নতুন ভাবনা, শৈলেশ কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়)।

নির্বাচনের সময় উত্তর ভারতের এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্ত পর্যন্ত জিন্নাহ্‌ পাকিস্তান আন্দোলনে পুরোটা সময় উল্কার মত ছুটে বেড়িয়েছিলেন। যে জনসভায় তিনি ভাষণ দিতেন সেখানে জনতার ঢল নামত এবং লক্ষ লক্ষ লোকের সমাবেশ হত। মন্ত্রমুগ্ধের মত তারা তাঁর ইংরেজী বক্তৃতা শুনত যদিও শ্রোতাদের মধ্যে অধিকাংশ তাঁর বক্তৃতার কোন অর্থ বুঝতে পারত না। শারীরিক দিক থেকে তিনি তখন যথেষ্ঠ অসুস্থ থাকলেও শুধু মনোবলের কারণে এ গুরুতর পরিশ্রম করে এ নির্বাচনে অসামান্য সফলতা অর্জন করতে সক্ষম হয়েছিলেন।

নির্বাচনের ফলাফল প্রকাশিত হওয়ার পর ৪৬ সনের ৯ এপ্রিল তারিখে লীগের আইন সভার সদস্যগণ এক সম্মেলনে মিলিত হয়ে নিম্নোক্ত প্রস্তাব গ্রহণ করে। "মুসলিম জাতি অবিভক্ত ভারতবর্ষের ভিত্তিতে রচিত কোন সংবিধানে কিছুতেই রাজি হবে না এবং এই উদ্দেশ্যে গঠিত একটি মাত্র সংবিধান রচনাকারী সংগঠনে কোন ভাবেই অংশগ্রহণ করবে না। এ প্রস্তাবে আরও দাবী জানানো হল যে, উত্তর পূর্বের বঙ্গ ও আসাম এবং উত্তর-পশ্চিম পাঞ্জাব, উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ, সিন্ধু ও বেলুচিস্তান নিয়ে গঠিত অঞ্চলসমূহ যেখানে মুসলমানরা বিপুলভাবে সংখ্যাগরিষ্ঠ তাকে যেন এক সার্বভৌম রাষ্ট্রে পরিণত করা হয় এবং পাকিস্তান ও হিন্দুস্তানের জনগণ নিজ নিজ সংবিধান রচনা করার জন্য দু'টি পৃথক গণ-পরিষদ গঠন করুক। এই দাবী স্বীকার করে

www.amarboi.org

নেয়া এবং অনতিবিলম্বে তা রূপায়ণ-কেন্দ্রে এক অন্তর্বর্তী সরকার গঠনের জন্য মুসলিম লীগের সহযোগিতা পাওয়ার ব্যাপারে অপরিহার্য পূর্বশর্ত। (রামগোপাল সমগ্রন্থ পৃষ্ঠা-৩৫০-৩০৬)।

'৪৬ সনের নির্বাচনের ফলাফল

যথাসময়ে নির্বাচন হল। কেন্দ্রে এবং প্রদেশগুলোতে মুসলিম লীগ অভাবিতভাবে বিজয় লাভ করল। কেন্দ্রে ৩৩টি আসনের মধ্যে সবগুলো এবং প্রদেশে ৪৯২ আসনের মধ্যে ৪২৫টি আসন মুসলিম লীগ দখল করল। বাংলাদেশে ১৯৯ আসনের মধ্যে ৩টি আসন বাদে আর সবগুলো আসনই মুসলিম লীগ বিজয়ী হল। এ ৩টি আসন হলঃ বরিশালে এ, কে, ফজলুল হক ও তাঁর একজন সমর্থক সৈয়দ আফজাল এবং ময়মনসিংহ জেলার গফরগাঁও এলাকায় মাওলানা শামসুল হুদা। বাংলার প্রায় প্রতিটি নির্বাচন কেন্দ্রে ফজলুল হক সাহেব তাঁর কৃষক প্রজা পার্টি প্রার্থী দাঁড় করিয়ে মুসলিম লীগ ও পাকিস্তান দাবির বিরোধিতা করেছিলেন কিন্তু বাংলার যুবক ও ছাত্র সমাজের মিলিত আন্দোলনে যে উত্তাল তরঙ্গের সৃষ্টি হয়েছিল, তার সামনে একদা বাংলার রাজনীতি ক্ষেত্রে একচ্ছত্র জননেতা এ, কে, ফজলুল হক তৃণখন্ডের মত ভেসে গেলেন। জিন্নাহর নামের অলৌকিক প্রভাবে হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী ও আবুল হাশেমের নেতৃত্বে বাংলায় মুসলিম লীগ পাকিস্তানের নামে এমনই উত্তাল তরঙ্গের সৃষ্টি করতে পেরেছিল।

নির্বাচনে এই অভাবিত বিজয়ে জিন্নাহর এতদিনের দাবি সুপ্রতিষ্ঠিত হল। গত কয়েক বৎসর ধরে দিবারাত্র তিনি রুগ্ন দেহ সত্ত্বেও যে পরিশ্রম করে চলেছিলেন এতদিনে তা ফলপ্রসূ হল। ত্রিশ বৎসর আগে কলকাতায় নেহেরু রিপোর্ট আলোচনার সময় অধিকাংশ সদস্যই জিন্নাহ মুসলমানদের প্রতিনিধিত্ব করে না বলে চিৎকার করে তাঁকে সভামঞ্চ থেকে নামিয়ে দিয়েছিল আর আজ এতদিন পরে জিন্নাহ প্রমাণ করতে সক্ষম হলেন যে, তিনিই ভারতের মুসলমানদের একমাত্র নেতা। এই বিজয় জিন্নাহর জীবনে শ্রেষ্ঠ বিজয়।

ভারতের সকল প্রদেশে মুসলিম লীগ জয়লাভ করলেও উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশে মুসলিম লীগ সংখ্যাগরিষ্টতা লাভে সমর্থ হয়নি। তথাপি সেখানেও মুসলিম লীগ পূর্বের চাইতে অনেক শক্তিশালীরূপে আবির্ভূত হল।

www.amarboi.org

সাড়ে তিন বছর পুর্বে নেহেরু জনৈক আমেরিকান রিপোর্টারকে বলেছিলেন ভারতে মুসলমানরদের কিছু অংশ ভারত বিভাগ চায় কিন্তু অধিকাংশ মুসলমান এই দাবিকে গুরুত্বের সঙ্গে বিবেচনা করে না। এবার প্রমাণিত হ'ল সেই স্বল্প সংখ্যা বিরাট সংখ্যায় পরিণত হয়েছে। জিন্নাহ্ এখন জোর করে বলতে পারেন পাকিস্তানকে অস্বীকার করতে পারে, পৃথিবীতে এমন কোন শক্তি নাই।"

এ কয় বৎসরে পাকিস্তান আন্দোলনের মধ্য দিয়ে সাধারণ মানুষের সংস্পর্শে আসতে আসতে রাজনৈতিক ক্ষেত্রে জিন্নাহ্ সাহেবের দৃষ্টিভঙ্গিতে প্রভূত পরিবর্তন এসেছিল। ইতিমধ্যে সাধারণ মানুষের সুখ-দুঃখের সঙ্গে তিনি অনেকখানি একাত্ম হয়ে পড়েছিলেন। ১লা মার্চ, ১৯৪৬ সনে কলকাতায় মুসলিম কর্মীদের এক সমাবেশে তিনি বলেন, "আমি একজন বৃদ্ধলোক এবং এই বয়সে আরাম আয়েশে দিনযাপন করবার জন্য আল্লাহ্ আমাকে যথেষ্ট দিয়েছেন। এই বয়সে কেন আমি রক্ত পানি করে এত পরিশ্রম করে যাব ? এটা করছি ধনীদের জন্য নয়, শুধু তোমাদের জন্য গরীবদের জন্য।" তারপর তিনি ১৯৩৬ সনে কলকাতায় এসে সাধারণ লোকদের মধ্যে যে দারিদ্র দেখেছেন তার উল্লেখ করলেন। "তিনি বললেন, তাদের মধ্যে অনেকে দিনে এক বেলাও খেতে পারত না এবার তাদেরকে দেখার আমার সুযোগ হয়নি তবে মনপ্রাণ তাদের সঙ্গে রয়েছে। পাকিস্তান হলে তারা প্রত্যেকেই যাতে ভালভাবে জীবনযাপন করতে পারে আমরা তার চেষ্টা করব।"

পাকিস্তানের ভবিষ্যত অর্থনীতির অবস্থা কেমন হবে এ সম্পর্কে অনেকেই জানতে চাইতেন। একবার আই,সি,এস, মিঃ এস, এম, বাকার যিনি ছিলেন জিন্নাহর খুব অনুগত, তিনি জিন্নাহকে প্রশ্ন করলেন পাকিস্তান এলাকায় লোহা নেই, কয়লা নেই, জলবিদ্যুৎ ও কোন প্রকার শিল্প কারখানাও নেই, এমতাবস্থায় পাকিস্তানের অর্থনৈতিক অবস্থা কেমন হবে ? জিন্নাহ্ উত্তর করলেন, " এসব ব্যাপার আমার জানা আছে। আমার লোকেরা এসব উন্নয়নে পূর্বে কোন সুযোগ পায়নি। আমার পূর্ণ বিশ্বাস আছে এবং তোমারও থাকা উচিত, আমাদের লোকদেরকে পূর্ণ সুযোগ দিলে এসব উন্নয়ন তারা করে নিতে পারবে। একটি কথা মনে রেখো, আমি সামনের দিকে এগিয়ে যেতে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ, তাতে যদি আমার মৃত্যুও ঘটে।"

www.amarboi.org

কেবিনেট মিশন প্লান

ইতিমধ্যে কনফারেন্স হতে হতে ভারতের রাজনীতি প্রায় মুমূর্ষু অবস্থায় পৌঁছেছিল। '৪৬ সালের মার্চে বৃটিশ সরকারের উদ্যোগে বৃটিশ কেবিনেটের ৩ জন সদস্য ভারতে এসে পৌঁছলেন। তাঁরা হলেন, ভারত সচিব লর্ড পেথিক লরেন্স, মিঃ এ, ভি, আলেকজান্ডার এবং স্যার স্ট্যাফোর্ড ক্রিপস্। তাদের উদ্দেশ্য ছিল ভারতের জননেতাদের সহযোগিতায় যথাশীঘ্র ভারতীয়দের জন্য স্বায়ত্তশাসনের ব্যবস্থা করা। ভাইসরয় পুনরায় কংগ্রেস ও লীগ নেতাদের কেবিনেট মিশনের সদস্যদের সঙ্গে মিলিত হওয়ার জন্য সিমলায় আহবান জানালেন। মধ্যস্থতাকারীদের চেষ্টা সত্ত্বেও উভয় পক্ষকে আপোষ রফায় সম্মত করানো সম্ভব হলো না। ইতিমধ্যে ব্রিটিশ সরকার হঠাৎ দ্রুত ভারত ত্যাগের সিদ্ধান্ত নিলেন এবং এর ফলে ভারতে রাজনৈতিক ঘটনাচক্র দ্রুত আবর্তিত হতে শুরু করল। সিমলা কনফারেন্স ব্যর্থ হওয়ার পরে কেবিনেট মিশন নিজেদের উদ্যোগে একটি প্লান ঘোষণা করলেন, যাকে 'কেবিনেট মিশন প্লান' বলে আখ্যায়িত করা হল। এই প্লান অনুযায়ী সাম্প্রদায়িক নির্বাচন প্রথায় প্রতি দশ লক্ষ ভোটার থেকে একজন প্রতিনিধি নির্বাচন করে একটি কেন্দ্রীয় সংবিধান সভা রচিত হবে। এই কেন্দ্রীয় সংবিধান সভা ভারত ইউনিয়নের জন্য সংবিধান রচনা করবে। বৃটিশ ভারতে যাতে মুসলিম স্বার্থ রক্ষিত হয় তার জন্য গ্রুপিং সিস্টেম নামে প্রদেশগুলোকে একটি বিশেষ ব্যবস্থাধীন করার পরিকল্পনা নেয়া হল।

গ্রুপ-এঃ মাদ্রাজ, বোম্বে, সংযুক্ত প্রদেশ, বিহার, মধ্য প্রদেশ এবং উড়িষ্যা অর্থাৎ হিন্দু সংখ্যাগরিষ্ট এলাকাসমূহ।

গ্রুপ-বিঃ পাঞ্জাব, উত্তর পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ, সিন্দু এবং পশ্চিম অঞ্চলের মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ট এলাকাসমূহ ।

গ্রুপ-সিঃ বাংলা এবং আসাম অর্থাৎ পূর্বাঞ্চলীয় মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ট এলাকাসমূহ।

প্রত্যেক গ্রুপ তার নিজের সংবিধান রচনা করবার অধিকার থাকবে এবং প্রত্যেক গ্রুপ দেশরক্ষা, বৈদেশিক সম্পর্ক, এবং যোগাযোগ ব্যবস্থা ছাড়া বাকি বিষয়গুলোর উপর পূর্ণ কর্তৃত্ব থাকবে। দেশরক্ষা, বৈদেশিক বিষয় ও যোগাযোগ ব্যবস্থা 'ভারত ইউনিয়ন' নামে একটি কেন্দ্রের নিয়ন্ত্রণাধীন থাকবে।

www.amarboi.org

কেবিনেট মিশন প্লান আরও প্রস্তাব করল যে, ভারতীয় সংবিধান সভা গঠিত না হওয়া পর্যন্ত প্রথম সিমলা কনফারেন্স পরিত্যক্ত 'ভাইসরয় পরিকল্পনা' যাতে একটি অন্তর্বর্তীকালীন পার্লামেন্ট গঠনের কথা বলা হয়েছিল তা পুনরুজ্জীবিত করা হবে। এখানেও মুসলিম স্বার্থ সংরক্ষণের কথা বলা হয়েছিল। ৩রা জুন লর্ড ওয়াভেল নির্বাচনে লীগের সাফল্য স্বীকার করে কংগ্রেস ও লীগকে অন্তর্বর্তীকালীন সরকারে সমান মর্যাদা দিতে স্বীকৃত হলেন। লীগ এবং কংগ্রেস প্রত্যেকে পাঁচটি করে আসন পাবে। এতদ্ব্যতীত শিখ ও অচ্ছুতরা পাবে প্রত্যেকে একটি করে আসন।

জুনের ৬ তারিখে মুসলিম লীগ কাউন্সিলের অধিবেশন নয়াদিল্লীতে বসলো। বহু তর্ক-বিতর্কের পর জিন্নাহর চাপে লীগ কাউন্সিল কেবিনেট মিশন প্লান গ্রহণ করতে রাজি হলো। জিন্নাহ তাদের বুঝালেন প্লানে ৬টি মুসলিম প্রদেশের বাধ্যতামূলক অন্তর্ভুক্তির শর্তের ভিতর দিয়ে পাকিস্তানের ভিত্তি রচিত হয়েছে, যা কালক্রমে মুসলমানদেরকে স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্র গঠনে সাহায্য করবে। লীগ নেতারা ঘোষণা করল যে, ভারতীয় সাংবিধানিক সমস্যার একটি শান্তিপূর্ণ সমস্যা সমাধানের আগ্রহ এবং লক্ষ্য থেকেই তাঁরা এই প্লান গ্রহণ করতে স্বীকৃত হয়েছে। জিন্নাহ দাবি জানালেন যে, মিশন প্লান গ্রহণ করার অর্থ হলো পাকিস্তানের পথে অর্ধেক অগ্রসর হওয়া এবং তিনি কংগ্রেস ও বৃটিশ সরকারকে সাবধান করে দিয়ে বললেন, ভারতকে স্বাধীন করার একমাত্র পথ হচ্ছে যথাশীঘ্র পাকিস্তান স্বীকার করে নেয়া। তিনি বরাবরের ন্যায় স্বীয় অঙ্গুলি আন্দোলন করে বললেন, "হয় তোমরা স্বীকৃত হও, নচেৎ তোমাদেরকে বাদ দিয়েই আমরা পাকিস্তান লাভ করব।"

কেবিনেট মিশন প্লানের উপর যখন আলোচনা চলছিল তখন জিন্নাহ প্রায় সব সময় অসুস্থ ছিল। দ্বিতীয় সিমলা কনফারেন্সের পর তিনি এত অসুস্থ হয়ে পড়েন যে, তাঁর ভগ্নি ফাতেমা ডাঃ জাল প্যাটেলকে অনুরোধ জানালেন জিন্নাহ বোম্বেতে পৌঁছার সঙ্গে সঙ্গে তিনি যেন তাঁকে দেখতে আসেন। এ সময় ডাঃ জাল জিন্নাহর স্বাস্থ্য সম্পর্কে বলেন, তিনি যখন মে মাসে দ্বিতীয় সিমলা কনফারেন্সে যান, তার পূর্ব থেকেই তিনি অসুস্থ ছিলেন। সেখানে গিয়ে তিনি আবার অসুস্থ হয়ে পড়লেন। সিমলা থেকে তিনি যখন বোম্বে আসছিলেন তখন

www.amarboi.org

তাঁর অনুগামী ত্রিশ হাজার লোক তাঁকে অভ্যর্থনা জানাবার জন্য সেন্ট্রাল স্টেশনে অপেক্ষা করছিল। তাঁর শরীরের অবস্থা বিবেচনা করে বোম্বে স্টেশনের কয়েক মাইল আগে 'দাদার'-এ তাঁকে ট্রেন থেকে নামিয়ে আনার আয়োজন করা হল। তিনি যখন এসে পৌঁছালেন আমি দেখলাম তিনি অতিশয় দুর্বল ও ক্লান্ত। তাই স্টেশন মাস্টার যিনি ছিলেন একজন হিন্দু ভদ্রলোক, তার সহায়তায় আমি সিঁড়ি ভেঙ্গে নামার কষ্ট পরিহার করার জন্য পার্শ্বের একটি গেইট দিয়ে তাঁকে বের করে আনলাম।

জিন্নাহর অসুস্থতা

আবারও দেখা গেল তাঁর ব্রোঙ্কাইটিস এবং দশদিন ধরে তিনি জ্বরে ভুগলেন। মনে হয় তাঁর বরাবরই ফুসফুসের রোগ ছিল। এতে বরাবরই ছিলেন তিনি অতিমাত্রায় ক্লান্ত, দুর্বল ও পরিশ্রান্ত।

এরপর ডাঃ জাল কায়েদে আযমের অসুস্থতার বিবরণ দিতে গিয়ে বলেন, ১৯৪৬ সালে যখন আমি তাঁকে সিমলা থেকে ফিরে আসার পর দেখি তখন তাঁকে শুধু অসুস্থ দেখলাম না, তাঁকে মানসিক দিক থেকে বিপর্যস্ত দেখলাম। তিনি অভিযোগ করলেন যে, স্যার, স্ট্যাফোর্ড ক্লিপস্ তাঁর সঙ্গে ভাল ব্যবহার করেনি এবং মিশনের নেতৃবৃন্দ তাঁর সঙ্গে অসৌজন্য আচরণ করায় তিনি দু:খিত মনে কনফারেন্স ত্যাগ করে বাড়ী চলে এসেছেন। অবশ্য লর্ড প্যাথিক লরেন্স, মিঃ এভি আলেকজান্ডার পরদিন টেলিফোনে তাদের আচরণে দুঃখ প্রকাশ করে, কিন্তু তাতে জিন্নাহর মনোকষ্টের বিশেষ লাঘব হয় নি।

ডাঃ জাল প্যাটেলের মতে এরূপ অসুস্থতার সময় রোগী অত্যন্ত স্পর্শকাতর হয়ে পড়ে সামান্য কারণেই মাথা গরম করে ফেলে। একটি ঘটনায় জানা যায় এ সময় কায়েদে আযম সামান্য কারণেই কিরূপ উত্তেজিত হয়ে পড়তো। একদিন বোম্বে গভর্ণরের সেক্রেটারী গভর্ণর সাহেব জিন্নাহর সঙ্গে আলাপ করবেন বলে তাঁকে টলিফোনে ডাকায় তিনি প্রতিবাদ জানিয়ে বললেন, "লাট সাহেব যদি নিজেকে এত বড় মনে করেন যে, নিজে টেলিফোন করতে তার বাধে তবে টেলিফোন ধরতে আমার আপত্তি আছে"; একথা বলে তিনি টেলিফোন ছেড়ে দিলেন।

ডা: জাল প্যাটেল এ ঘটনা উল্লেখ করে বললেন, এতে প্রতীয়মান হয় সে সময় তিনি কতখানি অসুস্থ ছিলেন, তার রাগের বহি:প্রকাশ ছিল সম্পূর্ণ

www.amarboi.org

বাহ্যিক। অন্তরের দিক থেকে সর্ব প্রকারের ক্ষুদ্রতা ও সংকীর্ণতার তিনি ছিলেন অনেক উর্ধে, বিশেষ করে জাতিগত ব্যাপারে। হিন্দু মুসলমান চরম বৈরীতার সময় একদিন আমি তাঁর বাড়ীতে গেলাম। জিন্নাহর বাবুর্চি ছিল একজন হিন্দু। আমি তাঁকে ঠাট্টা করে বললাম, একে কি আপনার ভয় করে না ? যে কোন সময় এ লোকটি আপনার কোন রকম ক্ষতি করতে পারে ? তিনি উত্তর দিলেন, না, না, আমি তাকে পছন্দ করি এবং বিশ্বাসও করি। সম্প্রতি মনে হচ্ছে সে যেন কংগ্রেসের কার্যকলাপের ব্যাপারে কিছুটা আগ্রহ দেখাচ্ছে। তথাপি সে অত্যন্ত ভাল লোক, এতে কোন সন্দেহ নেই।

ইতিমধ্যে দেখা গেল লর্ড ওয়াভেল লীগকে যে সমস্ত প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন তার থেকে অনেকটা সরে যাচ্ছেন যেটা মুসলিম স্বার্থের বিপক্ষে যাচ্ছিল। জুনের ৩ তারিখে ওয়াভেল লীগ এবং কংগ্রেসকে সমান সংখ্যক প্রতিনিধি, অচ্ছুত এবং শিখ সম্প্রদায়কে একজন করে প্রতিনিধি নিয়োগের প্রস্তাব দিয়েছিলেন। জিন্নাহ্ এই প্রস্তাব মেনে নিয়েছিলেন। কিন্তু কিছুদিন পরে ভাইসরয় পার্সি এবং এঙ্গলো ইন্ডিয়ান কমিউনিস্টদেরকে আরও ২ জন প্রতিনিধি নেয়ার প্রস্তাব দিলেন। এভাবে সংখ্যা বৃদ্ধি জিন্নাহর মনঃপুত হলো না এবং এটাকে তিনি মুসলিম স্বার্থের বিরোধী কাজ বলে ভাইসরয়কে অভিযুক্ত করলেন।

১৬ই জুন কেবিনেট মিশনের সঙ্গে আলোচনা করে ভাইসরয় ঘোষণা করলেন যে, প্রধান দু'টি দল মিলিতভাবেই অন্তর্বর্তীকালীন সরকারকে সফল করবার জন্য কাজ করবে বলে তিনি আশা করেন। অতঃপর তিনি প্রতিশ্রুতি দিলেন যে দু'টি প্রধান দল যোগ দিলে ভাল নচেৎ একটি দলও যদি অন্তর্বর্তী সরকার গঠনে এগিয়ে আসে এবং কেবিনেট মিশন প্লান গ্রহণ করে তবে তিনি তাদেরকে নিয়েই অন্তর্বর্তী সরকার গঠনে প্রস্তুত আছেন। ভাইসরয়ের এই ঘোষণায় মুসলমানরা আশ্বাস পেল যে কংগ্রেস যদি সহযোগিতা করতে অস্বীকার করে তা'হলেও ভাইসরয় তাদেরকে বাদ দিয়েই সরকার গঠন করবে। জিন্নাহ্ এই ব্যাপারে উৎসাহিত বোধ করবার কারণ হলো, লর্ড ওয়াভেল ৪ঠা জুন তাঁকে একটি ব্যক্তিগত পত্রে জানিয়েছিলেন যে, দু'টি দলের মধ্যে যে কোন একটি রাজি হলেই তিনি তাঁর পরিকল্পনা নিয়ে এগিয়ে যাবেন।

www.amarboi.org

জুনের ১৪ তারিখে জিন্নাহ জানতে পারলেন যে, অন্তর্বর্তী সরকারে কোন সদস্য নির্বাচন করতে কংগ্রেস অস্বীকৃতি জানিয়েছে। ২৬শে জুন কেবিনেট মিশন তাদের প্লান স্থগিত করে দেয়া হয়েছে বলে ঘোষণা করল এবং ভাইসরয় তার ১০দিন পূর্বে দেয়া প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করে মুসলিম লীগের সঙ্গে কোনরূপ যোগাযোগ না করেই সরকারের স্থায়ী আমলাদের নিয়ে একটি কেয়ারটেকার সরকার গঠন করল। এতে মুসলিম লীগ ও অন্যান্য সংখ্যালঘু সম্প্রদায়কে প্রতিনিধি নির্বাচনের ব্যাপারে যে প্রতিশ্রুতি দেয়া হয়েছিল তা সম্পূর্ণ অস্বীকৃত হলো। জিন্নাহ এতে গভীর ক্ষোভ প্রকাশ করে তাঁর স্বাভাবিক তীক্ষ্ম ও কঠোর ভাষায় ভাইসরয়কে লিখলেন, "আপনি প্রতিশ্রুতি দিয়ে সেই প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করার মত মানসিকতা প্রদর্শন করেছেন---- ।"

যা'হোক এতদ্বসত্ত্বেও জুলাই মাসের প্রথমদিকে মুসলিম লীগ সাংবিধানিক পরিষদের নির্বাচনে অংশ গ্রহণ করে মুসলিম আসনের ৮৯টির মধ্যে ৩টি বাদে বাকিগুলোতে জয়ী হলো। এই জয় লাভে জিন্নাহর আত্মবিশ্বাস অনেকখানি বৃদ্ধি পেল। এই নির্বাচনে বিভিন্ন সম্প্রদায়ের ভোটারদের মধ্যে প্রতি দশ লক্ষে একটি আসন দেয়া হয়েছিল তাতে হিন্দু সম্প্রদায়ের মুখপত্র কংগ্রেস ২৯২টি আসন লাভ করে বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠতার অধিকারী হল। এই সংখ্যা গরিষ্ঠতা লাভে পন্ডিত নেহেরু উৎসাহিত হয়ে ১০ই জুলাই তারিখে ঘোষণা করলেন যে, ভারতীয় ইউনিয়ন যখন গঠিত হবে তখন খুব সম্ভবতঃ গ্রুপিং বলে কিছু থাকবে না। এই ঘোষণা প্রকারান্তরে 'মিশন প্লান'-এর মধ্য দিয়ে পাকিস্তান প্রাপ্তির যে সম্ভাবনাটুকুর আশায় জিন্নাহ মুসলিম লীগকে মিশন প্লান গ্রহণে রাজি করিয়েছিল, একভাবে তাকেই অস্বীকার করা হলো।

প্রসঙ্গক্রমে এখানে উল্লেখযোগ্য যে, কেবিনেট মিশন প্লান রচনার ব্যাপারে মওলানা আজাদের বেশ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা ছিল। কংগ্রেসের প্রেসিডেন্ট হিসাবে তিনি ভাইসরয় ও মিশন নেতৃবৃন্দের সঙ্গে আলোচনা চালিয়ে যাচ্ছিলেন এবং গ্রুপিং সিস্টেমের মারফত পাকিস্তানের দাবি আংশিকভাবে মিটিয়ে লীগ নেতৃবৃন্দকে প্লান গ্রহণে রাজি করিয়ে ভারতের রাজনৈতিক অচলাবস্থায় অবসান ঘটাবার ব্যাপারে অনেকটা সক্ষম হয়েছিলেন। ১৯৩৯ থেকে ১৯৪৫ সন পর্যন্ত কংগ্রেসের প্রেসিডেন্ট ছিলেন বলে তিনি মনে করলেন যে,কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটি যখন প্লান গ্রহণ করেছে তখন নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটিতে

www.amarboi.org

এ প্লান গ্রহণের প্রস্তাব পাস হবে এটা অবধারিত। তাই তিনি ১৯৪৬ সনে কংগ্রেসের প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা না করে জওহরলালকে প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত করলেন। পরবর্তীকালে মাওলানা আজাদ তাঁর 'ইন্ডিয়া উইনস্ ফ্রিডম' এ লিখেছেন, "আরও কিছুদিন কংগ্রেসের প্রেসিডেন্ট না থেকে জওহরলালকে প্রেসিডেন্ট নির্বাচন করা তাঁর জীবনে বোধহয় সব চাইতে বড় ভুল হয়েছে।"

জওহরলালের মিশন প্লানের অপব্যাখ্যা ও সংকট সৃষ্টি

জওহরলাল প্রেসিডেন্ট হয়েই বোম্বেতে এক সাংবাদিক সম্মেলনে ঘোষণা করলেন যে, কোনরূপ চুক্তিতে আবদ্ধ না হয়েই কংগ্রেস সাংবিধানিক সভায় যোগ দেবে এবং পরিস্থিতি যখন যেরূপ হয় তার ভিত্তিতে সিদ্ধান্ত নেবে। সাংবাদিকরা তাঁকে যখন জিজ্ঞাসা করল, এ মতামতের অর্থ কি এই যে, কেবিনেট মিশন প্লান পরিবর্তন করা যাবে? তখন জওহরলাল জোর দিয়ে বললেন, কংগ্রেস কেবিনেট মিশন প্লানের যে কোন পরিবর্তন পরিবর্ধন ক্ষমতা অক্ষুণ্ণ রেখেই সাংবিধানিক সভায় যোগ দিতে সম্মত হয়েছে।

এতদিনের আপ্রাণ চেষ্টার ফলে গ্রুপিং সিস্টেমের মারফত হিন্দু মুসলিম সমস্যা একটা বাস্তব সম্মত সমাধানের দ্বারপ্রান্তে এসে নেহেরুর এই অর্বাচীন উক্তির ফলে সমস্ত সম্ভাবনা ধ্বংস হওয়ার উপক্রম হওয়ায় দারুণভাবে বিচলিত মওলানা আজাদ গান্ধী-প্যাটেল প্রমুখ শীর্ষস্থানীয় নেতৃবৃন্দের সঙ্গে দেখা করে নিজের প্রভাব খাটিয়ে কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটি কেবিনেট মিশন প্লানের প্রতি পূর্ণ আস্থা রয়েছে এ মর্মে একটি প্রস্তাব পাস করালেন। কিন্তু ক্ষতি যা হওয়ার তা হয়ে গেছে। এ ক্ষতি সংশোধন করা আর সম্ভব হলো না। মওলানা আজাদ তাঁর বইতে লিখেছেন, "জিন্নাহ কোনভাবেই অবস্থা মেনে নিতে সম্মত হলেন না। তিনি বললেন, জওহরলালের বক্তব্য কংগ্রেসের সঠিক মনোভাবের পরিচয় বহন করছে। তিনি যুক্তি দেখিয়ে বললেন, বৃটিশের ভারতে থাকা অবস্থায় এবং কংগ্রেসের হাতে এখনও ক্ষমতা হস্তান্তরিত হয়নি, এ অবস্থায় কংগ্রেস যখন বারে বারে মত পরিবর্তন করতে পারে তখন বৃটিশ চলে যাওয়ার পরে কংগ্রেস যে আবার মত পরিবর্তন করে জওহর লালের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবে না

www.amarboi.org

তার নিশ্চয়তা কি ?" নেহেরুর বিবৃতির পর পরই জিন্নাহ মুসলিম লীগের কাউন্সিল সভা ডাকলেন। ১৯৪৬ সনের ২৭শে জুলাই ঐ মিটিং দু'টি প্রস্তাব পাস হল। প্রথম প্রস্তাবটিতে বলা হল, মুসলিম লীগ কাউন্সিল মনে করে যেহেতু সাংবিধানিক সভাতে তাদের স্বার্থ রক্ষিত হবে না তাই কেবিনেট মিশন প্লানের ঘোষণার ভিত্তিতে যে স্কীম গৃহীত হয়েছিল, 'তা প্রত্যাহার করে নেয়া হল। দ্বিতীয় প্রস্তাবে লীগ কার্যকরী সভাকে একটি প্রত্যক্ষ কর্মপন্থা গ্রহণের প্লান তৈরি করার অনুরোধ জানান হল। সে সঙ্গে বৃটিশ সরকারের দেয়া সমস্ত উপাধি বর্জনের জন্য লীগের সকল নেতাকে নির্দেশ দেয়া হল।

প্রস্তাবগুলো পাসের পরে জিন্নাহ বললেন, "আজকে আমরা যা করেছি ইতিহাসের দিক থেকে তা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। লীগের ইতিহাসে আজ পর্যন্ত আমরা এমন কিছু করিনি যা শাসনতন্ত্র বহির্ভূত বা শাসনতন্ত্রের সঙ্গে সংগতিপূর্ণ নয়। কিন্তু আজকে আমাদেরকে এ অবস্থায় উপনীত হওয়ার জন্য বাধ্য করা হচ্ছে। আজকে আমরা সকল প্রকার শাসনতান্ত্রিক পদ্ধতির সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করলাম। তিনি বললেন, কেবিনেট মিশনের প্রথম থেকে শেষ অবধি আলোচনার সময় অপর দু'পক্ষ বৃটিশ ও কংগ্রেস হাতে একটি পিস্তল রেখে আলোচনা চালিয়ে যাচ্ছিল-এক জনের হাতে ছিল ক্ষমতা ও অস্ত্রবল, অন্যজনের হাতে ছিল গণসংগ্রাম ও অসহযোগের ভীতি প্রদর্শন। তিনি বললেন, আজকে আমরাও একটি পিস্তল যোগাড় করেছি এবং সে পিস্তল ব্যবহার করবার ক্ষমতাও অর্জন করেছি।"

জিন্নাহ তাঁর বক্তৃতায় আরও ব্যাখ্যা করে বললেন ঃ যে কোন দায়িত্বশীল ব্যক্তি স্বীকার করবেন যে, একটা আপসরফার অধীর আগ্রহে কেন্দ্রের হাতে দেশরক্ষা বৈদেশিক নীতি ও যোগাযোগ ব্যবস্থা ছেড়ে দিয়ে আমরা একটা সীমাবদ্ধ পাকিস্তানের প্রস্তাবে রাজি হয়েছিলাম। একটা সম্মানজনক মীমাংসার জন্য কংগ্রেসের বেদীমূলে আমরা দ্ব্যর্থহীনভাবে এ ত্যাগ স্বীকারে রাজি হয়েছিলাম। কিন্তু দুঃখের বিষয় আমাদের আপসের এ আগ্রহকে ঘৃণা ও তাচ্ছিল্যের দ্বারা অবজ্ঞা করা হয়েছে। অতঃপর তিনি তিক্তস্বরে বললেন, যেখানে কংগ্রেস পদে পদে নীতিহীনতা প্রদর্শন করছে, সেখানে আমাদেরকে কি বারে বারে যুক্তি, ন্যায়পরায়ণতা, সাধুতা ও সুনীতি প্রদর্শন করে যেতে হবে ? অতঃপর তিনি বললেন, মুসলিম ভারত আজ যেভাবে আন্দোলিত হয়েছে পূর্বে কখনও এরূপ হয়নি, আজ যেরূপ মর্মাহত হয়েছি, পূর্বে এমন কখনও হইনি। আজ আমাদের যেরূপ তিক্ত অভিজ্ঞতা হয়েছে- সব চাইতে তিক্ততর আমি

www.amarboi.org

বলব, এরূপ অতীতে আর কখনও হয়নি, এখন আর আপস-রফার কোন স্থান নেই। এখন আমাদের এগিয়ে যেতে হবে।

লীগের মিশন প্লানের স্বীকৃতি প্রত্যাহার

এ সভাতেই কেবিনেট মিশন প্লানের স্বীকৃতি প্রত্যাহার করে প্রত্যক্ষ কর্মপন্থা গ্রহণের সিদ্ধান্ত নেয়া হল। দেশবাসীর কাছে কেন এ প্রস্তাব গ্রহণ বর্জন ও নীতি পরিবর্তনের সিদ্ধান্ত নেয়া হল, সেটা ব্যাখ্যা করার জন্য ১৬ই আগস্টকে দিন স্থির করা হল। হিন্দু মুসলিম সংঘাত শুধু শিক্ষিত নেতৃবৃন্দ ও তাদের আলোচনার টেবিলের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল না এটা দ্রুত দেশব্যাপী ছড়িয়ে পড়ছিল। ইতিমধ্যে দলে দলে উদ্বাস্তুদের আগমন ঘটতে লাগল দেশের সুদূর অঞ্চল থেকে। বৃটিশ আধিপত্য ও কেন্দ্রে হিন্দুদের সংখ্যাগরিষ্ঠের শাসন থেকে মুক্তি পেয়ে পাকিস্তান অর্জনের জন্য মুসলমানরা মরিয়া হয়ে উঠল।

জিন্নাহর বক্তৃতার শেষে বিশিষ্ট মুসলিম লীগ নেতৃবৃন্দ মঞ্চের উপর এসে তাঁরা তাঁদের বৃটিশদের দেয়া খেতাব ও তঘমা ছুঁড়ে ফেলে দিতে লাগল। যে মানুষ জিন্নাহ সারাজীবন ন্যায়নীতি, শৃঙ্খলা ও আইনের অনুসারী ছিলেন, যিনি ছিলেন বরাবর সর্ব ব্যাপারে আবেগহীন, তিনি আজ সভা ত্যাগের পূর্বে ঘোষণা করলেন - প্রয়োজন হলে তিনি জেলে যেতে রাজি আছেন। পঁচাত্তর বছরের একজন বৃদ্ধ তখন উঠে দাঁড়িয়ে চিৎকার করে বলল ঃ জিন্নাহকে জেলে যেতে হবে না। তার পূর্বে আমরা আমাদের জীবন বিসর্জন দিতে প্রস্তুত। আমাদের এখনই একটি মুজাহিদ দল গঠন করতে হবে এবং পুলিশের গুলী, উন্মুক্ত বক্ষে ধারণ করার জন্য আমি হব প্রথম ব্যক্তি। জিন্নাহ জানতেন, 'কোন লক্ষ্য অর্জনের জন্য মৃত্যুবরণ করার চাইতে উক্ত লক্ষ্য অর্জনের জন্য বেঁচে থাকা অনেক বেশী সাহসের কাজ'। তাই তিনি বৃদ্ধের এ কথার কোন উত্তর দিলেন না।

১০ই জুলাই-এর প্রেস কনফারেন্সে নেহেরুর এ ক্ষতিকর বিবৃতিদানের ব্যাপারে মন্তব্য করতে গিয়ে মৌলানা আজাদ তাঁর বইতে লিখেছেন, " জওহর লালের ১৯৩৭ সনের ভুলের পরিণতি হয়েছিল দেশের জন্য মারাত্মক। তাঁর ১৯৪৬ সনের ভুল আরও অধিকতর মারাত্মক বলে প্রমাণিত হল। কেউ হয়ত জওহর লালের সমর্থনে বলবেন, মুসলিম লীগ যে প্রত্যক্ষ সংগ্রামের নীতির ঘোষণা করবে এটা নেহেরু ভাবতে পারেনি, কারণ জিন্নাহ কখনও গণ-আন্দোলনে বিশ্বাস করতেন না।"

www.amarboi.org

জিন্নাহর চরিত্র, ব্যক্তিত্ব সম্পর্কে বাংলার গভর্ণর কেসীর মন্তব্য

অনেকটা এ সময় বাংলার লাট মিঃ আর, জি, কেসী জিন্নাহর চরিত্র, ব্যক্তিত্ব ও তাঁর সাহস সম্পর্কে নিজের ডায়েরীতে তাঁর ধারণা লিপিবদ্ধ করেছিলেন। মিঃ কেসী যিনি একজন অস্ট্রেলিয়ান নাগরিক হিসাবে প্রথম জীবনে অস্ট্রেলিয়ার স্বাধীনতা আন্দোলনের সাথে জড়িত থাকায় বৃটিশ সরকার কর্তৃক নানাভাবে নির্যাতিত হয়েছিলেন কায়েদে আযমের চরিত্র, বুদ্ধিমত্তা, সাহস ও ব্যক্তিত্ব সম্বন্ধে তাঁর বিশ্লেষণ ও মতামত গভীর তাৎপর্য বহন করে।

কেসী লিখেছেন, "এটা বললে মোটেই বাড়িয়ে বলা হবে না যে, বর্তমানে ভারতীয় রাজনীতিতে মুসলমানদের মধ্যে জিন্নাহই একমাত্র অতুলনীয় ব্যক্তিত্ব। তিনি দেখতে ছিলেন অত্যন্ত শীর্ণ ও পাতলা গড়নের মানুষ। তাঁর দেহের গঠনের দিকে তাকালে তাঁকে যে কোন মুহূর্তে ভেঙ্গে পড়তে পারেন বলে মনে হলেও তিনি কয়েকটি বৎসর দিব্যি পার হয়ে যাচ্ছিলেন। তাঁকে দেখলে মনে হতো তিনি অত্যন্ত যুক্তিসিদ্ধ মতের মানুষ, তিনি তাঁর মনের কথা অত্যন্ত সঙ্গোপনে লুকিয়ে রাখতেন। কোনভাবেই তিনি উষ্ণ প্রকৃতির মানুষ ছিলেন না।

তথাপি তাঁর চোখের মধ্যে এমন কিছু ছিল যেখানে গভীরে খানিকটা কৌতুক প্রিয়তা ছিল এবং আরও গভীরে ছিল অতীত জীবনের আনন্দের স্মৃতির প্রতি আকর্ষণ। কিন্তু তিনি ছিলেন নিয়মানুবর্তিতার ব্যাপারে লৌহকঠিন। তাঁর লক্ষ্য অর্জনের জন্য প্রয়োজনীয় মানসিক একাগ্রতা বিন্দুমাত্র নষ্ট হতে পারে এরূপ জাগতিক ভোগ বিলাস তিনি সর্বোতভাবে পরিহার করতেন। তিনি অত্যন্ত জিদী, আত্মপ্রত্যয় সম্পন্ন মানুষ ছিলেন। আমার মনে হয় তাঁর কখনও ভুল হতে পারে, এটা তিনি ভাবতেই পারতেন না।

জিন্নাহর কর্ম-ক্ষমতা ও ব্যক্তিত্ব এমনই ছিল যে, এটা বললে অত্যুক্তি হবে না যে, তিনি নিজেই ছিলেন মুসলিম লীগ। তিনি যদি বলতেন পাকিস্তানই আমাদের মূলনীতি তখন সবাই একবাক্যে তা মেনে নিত। তিনি ছিলেন এমন ব্যক্তি যার সিদ্ধান্ত ও আধিপত্যের যৌক্তিকতা তাঁর সহকর্মীদের কাছে ছিল প্রশ্নাতীত।

শোনা যায় জিন্নাহ তাঁর কার্যকরী পরিষদের সদস্যদের বলতে গেলে লৌহকঠিন দৃঢ়তার সংগে নিয়ন্ত্রণ করতেন। প্রবাদ আছে, 'কোন সমস্যা এলে তাঁদেরকে বলে দিতেন কি করতে হবে এবং তারা তাঁর মতের অনুসারী হয়ে যেত; যদি কোন গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের উপর অনেকে দ্বিমত পোষণ করার মত

www.amarboi.org

পরিস্থিতির সৃষ্টি করবে বুঝতে পারতেন, তখনই তিনি পদত্যাগের হুমকি দিয়ে বসতেন। সংগে সংগে বিরুদ্ধ মতবাদীরা নিশ্চুপ হয়ে যেত।

মিঃ জিন্নাহ্ তাঁর কাঁধের উপরে বিরাট দায়িত্ব বহন করতেন। ক্ষমতা ও দায়িত্বের সংগে তিনি ছিলেন সুপরিচিত। কোন কথা তিনি সোজাসুজি এবং স্পষ্টভাবে বলতে কখনও দ্বিধা করতেন না এবং যখন তিনি কিছু বলতেন তাতে তিনি কি বুঝাতে চাচ্ছেন এ ব্যাপারে কারও মনে কোন সন্দেহ্ থাকত না। আগামী কয়েক বৎসরে যে গুরুত্বপূর্ণ ঘটনাসমূহের সম্মুখীন তাঁকে হতে হয়েছিল তার উপযুক্ত পরিচালনা ও সমাধানের উপরে একটি বিরাট জাতির ভাগ্য নির্ভর করছিল।

মিঃ কেসী আরও উল্লেখ করেন যে, মিঃ জিন্নাহ্কে অত্যন্ত দুর্বল ও শীর্ণ দেখালেও তিনি ক্লান্তির কোনরূপ লক্ষণ না দেখিয়ে কখনও কখনও ঘন্টার পর ঘন্টা আলোচনা চালিয়ে যেতে পারতেন। এক জায়গায় মিঃ কেসী লিখেছেন, ১৯৪৮ সনের মার্চ মাসে পাকিস্তান হওয়ার পর করাচীতে জিন্নাহ্র অতিথি হিসাবে খাওয়ার টেবিলে আমার স্ত্রী গোঁড়াদের সম্বন্ধে একটা বিরূপ মন্তব্য করলে জিন্নাহ বাধা দিয়ে বললেন, "গোঁড়াদের নিন্দা করবেন না। আমি যদি গোঁড়া না হতাম তবে পাকিস্তান কখনও হতো না।"

লীগের কেবিনেট মিশন প্লান প্রত্যাখানের পর ৮ই আগস্ট ১৯৪৬ সনে ভাইসরয় কংগ্রেসকে অন্তর্বর্তী সরকার গঠন করবার জন্য নিমন্ত্রণ জানালেন এবং নেহেরু তা গ্রহণ করল। অন্তর্বর্তী সরকার গঠনের ব্যাপারে জিন্নাহ নেহেরু আলোচনা হল; কিন্তু কোন ফল হলো না। নেহেরু কথা বলতে ভালবাসতেন কিন্তু জিন্নাহ্ ভাল বাসতেন কথার পিছনে যে যুক্তি রয়েছে সেটাকে। তাই দু'জনের মধ্যে চিন্তার ঐক্য সম্ভব হলো না। আগস্টের ২৪ তারিখে অন্তবর্তী সরকারে কংগ্রেস মনোনীত সদস্যদের নাম ভাইসরয় ঘোষণা করল এবং নেহেরুকে ভাইস প্রেসিডেন্ট নিযুক্ত করা হল। সেদিন সন্ধ্যায় জিন্নাহ বা লীগের সংগে কোনরূপ আলোচনা না করে লর্ড ওয়াভেল মুসলমানদের সহযোগিতা কামনা করে একটি বেতার ভাষণ দিলেন। জিন্নাহ্র জন্য এটি ছিল অত্যন্ত অপমানকর ব্যাপার। ২৯শে আগস্ট বোম্বেতে একটি বক্তৃতায় তিনি বললেন, "মুসলমান ও লীগকে দেয়া পবিত্র প্রতিশ্রুতি এভাবে পাশ কাটিয়ে যাওয়া ভাইসরয়ের পক্ষে এটা হল দ্বিতীয় বিশ্বাসঘাতকতা। আমি জানি না, বৃটিশ গভর্ণমেন্ট অথবা লেবার পার্টি এখানকার ঘটনা সম্বন্ধে তাদের

www.amarboi.org

পুরো তথ্য জানা আছে কিনা। কিন্তু আমি মনে করি বৃটিশ জনগণ এবং তাদের সংবাদ পত্রগুলো যাতে প্রকৃত ঘটনা জানতে না পারে বিশেষ মহল থেকে তার প্রচেষ্টা চালানো হচ্ছিল।

আজকে ভাইসরয়ের ক্রিয়াকর্ম ১৯৪০ সনের আগস্টে ভারত গভর্নমেন্ট শ্রমিক দলের স্বীকৃতির ভিত্তির যে ঘোষণা দিয়েছিল তার জঘন্য অস্বীকৃতি ব্যতীত আর কিছু নয়।

সেপ্টেম্বরের ২ তারিখে কংগ্রেসের অন্তর্বর্তী সরকার ক্ষমতায় এলে কায়েদে আযমের নির্দেশে কংগ্রেস বা হিন্দু সরকারের প্রতি ঘৃণা প্রদর্শনের জন্য প্রত্যেক গৃহশীর্ষে কালো পতাকা উত্তোলনের আদেশ দেয়া হল। এই কালো পতাকা উত্তোলন ভারতের কোটি কোটি হিন্দু মুসলমানের মধ্যে পার্থক্যকে আরও সুস্পষ্ট করে তুলল এবং দু'সম্প্রদায়ের মধ্যে পারস্পরিক ঘৃণা ও গভীর শত্রুতা অচিরেই পারস্পরিক আত্মঘাতী রক্তাক্ত সংগ্রামের পথ প্রশস্ত করে তুললো। অক্টোবরের প্রথমে ভাইসরয়ের সংগে আলাপের পর জিন্নাহ অন্তর্বর্তী সরকারে যোগ দিবে রাজি হলেন। অন্তবর্তী সরকারে কিছুটা পরিবর্তন ঘটিয়ে মুসলিম লীগ থেকে পাঁচজন মেম্বার নেয়ার ব্যবস্থা করা হল। জিন্নাহ লিয়াকত আলী খানকে লীগ নেতাদের নির্বাচন করে প্রথম মিটিং-এ বললেন, সাধারণ মানুষের উপকারের জন্য তাদেরকে কাজ করতে হবে, পার্টির সুবিধার জন্য লিয়াকত আলী খান বললেন, "ভারতের বর্তমান অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের মত এরূপ সরকার আজ পর্যন্ত পৃথিবীর কোথাও গঠিত হয়নি। এটি একটি সম্পূর্ণ নতুন ধরনের পরীক্ষা-নিরীক্ষা এবং আমরা সরকারে এসেছি আমাদের অপর সহযোগীদের সংগে সম্মিলিতভাবে কাজ করার জন্য, কিন্তু একহাতে তালি বাজে না।"

দুর্ভাগ্যবশতঃ তালির জন্য কিন্তু দু'হাত একত্রিত হল না। এবং অন্তর্বর্তী সরকার কোন সাফল্যই অর্জন করতে পারল না। কংগ্রেস ও লীগের ঘোরতর মতবিরোধ ও দ্বন্দ্বের ভিতর দিয়ে অন্তর্বর্তী সরকারের কাজ শুরু হয়েছিল। জিন্নাহ দাবী করলেন যে কংগ্রেস প্রতিনিধিদের মধ্যে কোন মুসলমান মেম্বারকে অন্তর্ভুক্ত করা চলবে না। ওয়াভেল জিন্নাহর এ দাবী মানতে অস্বীকার করলেন। ওয়াভেল আন্তরিকভাবে চেষ্টা করছিলেন যাতে লীগ ও কংগ্রেসের মধ্যে একটি কোয়ালিশন সরকার গঠিত হয়। ভূপালের নওয়াব যিনি গান্ধী ও জিন্নাহ উভয়ের বন্ধু ছিলেন তাঁর মধ্যস্থতায় জিন্নাহ গান্ধীর মধ্যে এক বৈঠকের আয়োজন করা হয়েছিল। বৈঠকে গান্ধী স্বীকার করলেন যে, ভারতীয়

www.amarboi.org

মুসলমানদের পক্ষ থেকে কথা বলবার অধিকার একমাত্র লীগেরই রয়েছে। অপরপক্ষে জিন্নাহ স্বীকার করলেন যে, অন্তর্বর্তী সরকারে কংগ্রেস তার ইচ্ছামত প্রতিনিধি নির্বাচন করবার পূর্ণ অধিকার রয়েছে। কিন্তু দু'জনের হৃদয়ের মিল হল না, পাকিস্তান কিংবা গ্রুপিং সম্পর্কে একমত হতে পারলেন না।

কংগ্রেস ভারতীয় মুসলমানদের প্রতিনিধিত্ব করে এটা প্রমাণ করার জন্য যখন তাদের প্রতিনিধি দলে একজন মুসলমানকে অন্তর্ভুক্ত করল তখন লীগও নিম্নবর্ণের হিন্দুদের প্রতিনিধিত্ব করে এটা প্রমাণ করার জন্য লীগের প্রতিনিধি দলে একজন তফসিলী হিন্দু নেতা যোগেন্দ্রনাথ মন্ডলকে অন্তর্ভুক্ত করে জিন্নাহ সবাইকে চমকে দিলেন।

জিন্নাহ অন্তর্বর্তী সরকারে যোগ দিলেন না। নেহেরুর অধীনে তাঁর পক্ষে কাজ করা সম্ভব নয়। তিনি পরিষ্কারভাবে বুঝিয়ে দিলেন যে, কংগ্রেসের সংগে কোয়ালিশন সরকারে যোগদান মানে ভারত ইউনিয়নের স্বীকৃতি নয় বা পাকিস্তান দাবী পরিত্যাগ নয়। এ সম্পর্কে মিঃ ইস্পাহানী যিনি আমেরিকাতে জিন্নাহর বিশেষ দূত হিসাবে কাজ করছিলেন তার মতামত হল অন্তর্বর্তী সরকারে লীগের যোগদানের অর্থ হল সরকারের ভিতর ও বাইরে থেকে পাকিস্তানের জন্য সংগ্রাম চালিয়ে যাওয়া।

নেহেরু প্রথম থেকেই অন্তর্বর্তী সরকারকে ডোমিনিয়ান কেবিনেট হিসাবে স্বীকৃতি দেয়ার দাবী জানালেন। কারণ ডোমিনিয়ান কেবিনেট হিসাবে স্বীকৃতি দিলে ভাইসরয়ের ভেটো প্রয়োগের ক্ষমতা থাকবেনা। তখন ইচ্ছামত সকল ক্ষমতা কংগ্রেসের পক্ষে করায়ত্ত করা সম্ভব হবে। বৃটিশ সরকার নেহেরুর মনোভাব আঁচ করতে পেরে সরাসরি দাবী প্রত্যাখ্যান করলেন, অন্তর্বর্তী সরকারের প্রেসিডেন্ট ছিলেন ভাইসরয় এবং নেহেরু ছিলেন ভাইস প্রেসিডেন্ট। লীগ কিন্তু প্রথমাবধি নেহেরুর প্রাধান্য কোনভাবেই মানতে রাজি ছিল না এবং নেহরুকে প্রধানমন্ত্রী হিসাবে স্বীকৃতি দিতে ছিল সম্পূর্ণ নারাজ। একটি জনসভায় জিন্নাহ পরিষ্কার বললেন, নেহেরু যদি আকাশ থেকে ভূতলে নেমে এসে ধীরে সুস্থে চিন্তা করেন তখন তিনি পরিষ্কারভাবে উপলব্ধি করতে পারবেন যে, তিনি সংসদে প্রধানমন্ত্রীও নন এবং এটি নেহেরু সরকারও নয়। তিনি মাত্র বৈদেশিক সংক্রান্ত ও কমনওয়েলথ বিভাগের একজন ভারপ্রাপ্ত মেম্বার। প্রথম দিন থেকেই কোয়ালিশন সরকার উভয় পক্ষের রণক্ষেত্রে পরিণত হল।

www.amarboi.org

অন্তর্বর্তী সরকারে প্রথম প্রবেশ করেছিল কংগ্রেস এবং স্বরাষ্ট্র বিভাগ হতে প্রায় সকল গুরুত্বপূর্ণ বিভাগ কংগ্রেস নিয়ে নিয়েছিল। থাকার মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ বিভাগ ছিল মাত্র অর্থ বিভাগ। লীগ যখন সরকারে যোগ দিতে স্বীকৃত হল তখন গুরুত্বপূর্ণ বিভাগের মধ্যে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় দাবী করে বসল। কিন্তু স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় যেহেতু প্যাটেলের অধিকারে ছিল, প্যাটেল সে বিভাগ কিছুতেই হাত ছাড়া করতে রাজি ছিলেন না। কংগ্রেস তখন অর্থ বিভাগটি মুসলিম লীগকে নেয়ার জন্য আহবান করল। কংগ্রেসের ধারণা ছিল অর্থ বিভাগ যেহেতু একটি অত্যন্ত জটিল বিষয় ঃ বাজেট প্রণয়ন ও অন্যান্য আর্থিক সম্পর্কিত বিষয়ের সংগে সংশ্লিষ্ট, তাই লীগ এ বিভাগ নিতে সহজে রাজি হবে না। সে অবস্থায় এ গুরুত্বপূর্ণ বিভাগটিও তাদের দখলে থাকবে। এ বিভাগটির ভার লীগ নেবে কি নেবে না এরূপ দ্বিধা-দ্বন্দ্বের মধ্যে যখন রয়েছে তখন অর্থ মন্ত্রণালয়ের একজন উচ্চপদস্থ মুসলমান অফিসার লিয়াকত আলী খানের সংগে দেখা করে এ বিভাগটি নেয়ার জন্য অনুরোধ জানালেন। এই অফিসারটির নাম হল চৌধুরী মোহাম্মদ আলী, যিনি পরবর্তীকালে পাকিস্তানের অর্থমন্ত্রী ও পরবর্তীতে প্রধানমন্ত্রীও হয়েছিলেন। তিনি লিয়াকত আলী খানকে অভয় দিয়ে বললেন, নির্ভয়ে আপনারা এ গুরুত্বপূর্ণ বিভাগটির ভার নিয়ে নিন। বাজেট রচনা হতে সব কিছুর ব্যাপারে আপনি আমার সর্বাত্মক সহযোগিতা পাবেন। চৌধুরী মোহাম্মদ আলীর আশ্বাসের ভিত্তিতে লীগ অর্থ মন্ত্রণালয়ের ভার নিল এবং লিয়াকত আলী খান অর্থমন্ত্রী হলেন। অর্থ মন্ত্রণালয়ের মত গুরুত্বপূর্ণ বিভাগ লীগকে ছেড়ে দিয়ে কত বড় ভুল করেছে এটা কংগ্রেস দু'দিনেই টের পেল। প্রথম বাজেটে লিয়াকত আলী খান বড় বড় শিল্পপতিদের উপর এমনভাবে ট্যাক্স চাপিয়ে দিলেন যাতে বড় বড় শিল্পপতি ও ব্যবসায়ীরা দারুণভাবে অর্থনৈতিক ক্ষতির সম্মুখীন হল এবং সাধারণ মানুষ ও ছোট ব্যবসায়ীদের উপর ট্যাক্স খুবই কমিয়ে দিলেন। ফলে এটা গরিবের বাজেট বলে চারদিক থেকে অভিনন্দিত হতে লাগল এবং লীগের মর্যাদা যথেষ্ট বৃদ্ধি পেল। বড় বড় শিল্পপতি ও ব্যবসায়ীরা যেহেতু অধিকাংশই হিন্দু ও কংগ্রেসের সমর্থক ছিল, তাই এ বাজেট তাদেরকেই আঘাত করল সবচেয়ে বেশী। যেহেতু সকল বিভাগেই তাদের যে কোন ব্যয়ের জন্য অর্থ বিভাগের মঞ্জুরীর প্রয়োজন ছিল তাই প্রত্যেক বিভাগই অর্থ বিভাগের সম্মতির উপর নির্ভরশীল ছিল। অর্থ বিভাগ মঞ্জুর না করলে কোন বিভাগেরই কোন অর্থনৈতিক ক্রিয়াকর্ম করার স্বাধীনতা ছিল না। লীগ কংগ্রেসের মধ্যে শত্রুতামূলক মনোভাব থাকায় অর্থমন্ত্রী লিয়াকত আলী খান কংগ্রেসের অধিকারভূক্ত সকল বিভাগকেই

www.amarboi.org

তদারকির অছিলায় প্রায় অচল করে তুলেছিলো। পরে দেখা গেল কংগ্রেসের কোন মন্ত্রীই অর্থ বিভাগের অনুমতি ছাড়া এট পিয়নকেও নিযুক্ত করতে পারছিল না। অন্তর্বর্তী সরকার যে কয় মাসটকেছিল সে কয় মাস প্রায় অচলাবস্থার ভিতর দিয়ে অতিবাহিত হয়েছি। অন্তর্বর্তী সরকারে যখন দু'দলের মধ্যে অর্থহীন তর্কবিতর্ক ও আলোচা চলছিল এ সময় ভাইসরয় ডিসেম্বরের ৯ তারিখে সাংবিধানিক সভা আহ্বান করলেন। নভেম্বরের ২১ তারিখে জিন্নাহ ঘোষণা দিলেন যে, সাংবিধাক সভাতে কোন মুসলমান সদস্যই আসন গ্রহণ করবে না। জিন্নাহ বললে ভাইসরয় বৃটিশ সরকার ৯ই ডিসেম্বর সাংবিধানিক সভা আহ্বান করে অ একটি বিরাট রকমের ভুল করেছেন। আমি মনে করি এটার ফলাফল অত্ত মারাত্মক হতে বাধ্য। এতে পরিষ্কার প্রতীয়মান হচ্ছে যে, ভাইসরয় কংগ্রেরে হাতে সম্পূর্ণ ক্রীড়নক হয়ে পড়েছে এবং মুসলিম লীগের স্বার্থ বিন্দুমাত্র বেচনায় না এনে কংগ্রেসকে খুশি করতে ব্যস্ত হয়ে পড়েছেন। আমি তাকে ষ্কারভাবে জানিয়ে দিতে চাই যে, কোন মুসলিম সদস্যই সাংবিধানিক সভায় সন গ্রহণ করবে না।

বিরাট বৃটিশ ভারতের সর্বত্র ইতিমধ্যে কাটি কোটি হিন্দু মুসলমান তাদের অতীতের পরস্পরিক ঘৃণা ও শত্রুতার কছে আত্মসমর্পণ করে ক্রমাগত রক্তপাত ও গৃহযুদ্ধের দিকে এগিয়ে যাচ্ছিল যেরক্তপাতকে জিন্নাহ মনেপ্রাণে ভয় করতেন।

জেনারেল স্যার ফ্রান্সিস টুকার তাঁর "hile Memory Serves" বইতে ভারতে বৃটিশ শাসনের শেষ কয়েক মসর মর্মান্তিক ঘটনার বিবরণ তিন অধ্যায় এভাবে উল্লেখ করেছেন। প্রথম আয়ে হল : দি গ্রেট ক্যালকাটা কিলিং (কোলকাতার ভয়াবহ হত্যাকান্ড আগস্ট১৯৪৬) দ্বিতীয় অধ্যায় হল : বিহারে মুসলিম নিধন (অক্টোবর-নভেম্বর,১৯৪৬) এবং তৃতীয় হলঃ গরমুখেশ্বর হত্যাকান্ড (নভেম্বর, ১৯৪৬)। এসঘটনায় বৃটিশ ভারতে ক্ষমতা ত্যাগের পূর্বে তারা আইন নিজের হাতে তুলেনয়ায় যে ভয়াবহ পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছিল তার বিবরণ পাওয়া যায়।

কোলকাতা ও বিহারে নৃশংস ন্দু-মুসলিম দাঙ্গা

১৬ই আগস্ট বর্ষাকালে একটি পূর্ণ সূর্যাল্কেত দিনে বৃহৎ কোলকাতার গড়ের মাঠে প্রত্যক্ষ সংগ্রামের তাৎপর্যের ব্যাখ্যাদের নেতৃবৃন্দের কাছ থেকে শোনবার জন্য মুসলমানেরা একত্রিত হয়। এঁন হিন্দু মুসলমানদের মধ্যে

www.amarboi.org

গড়ের মাঠে প্রত্যক্ষ সংগ্রামের তাৎপর্যের ব্যাখ্যা তাদের নেতৃবৃন্দের কাছ থেকে শোনবার জন্য মুসলমানেরা একত্রিত হয়। ঐদিন হিন্দু মুসলমানদের মধ্যে দাঙ্গা আরম্ভ হবে এটা মুসলমানরা পূর্ব থেকে কোনভাবেই অনুমান করতে পারেনি। কিন্তু প্রকৃত ব্যাপার হল হিন্দু সংখ্যাগরিষ্ঠ এলাকায় সকাল থেকেই দাঙ্গা আরম্ভ হয়ে গিয়েছিল এবং দুপুরের পর থেকে মুসলিম এলাকাতেও দাঙ্গা বিস্তৃতি লাভ করতে আরম্ভ করল। সেদিন ১৬ই আগস্ট সন্ধ্যা থেকে হিন্দু-মুসলিম এলাকায় একে অপরের সম্প্রদায়ের লোকদের প্রাণ হরণ ও সম্পত্তি ধ্বংসের জন্য কলকাতায় বিভিন্ন অংশে যে হিংস্রতা, যে নারকীয় মনোভাবের আত্মপ্রকাশ ঘটেছিল, ইতিহাসে তার ইতিপূর্বে কোন তুলনা পাওয়া যায়নি। জেনারেল স্যার ফ্রান্সিস টুকার তাঁর বইতে বলেছেন, হত্যা হানাহানি সেদিন যে রূপ নিয়েছিল তাতে মনে হয় ভ্রাতৃহত্যার ব্যাপারে নরকের দ্বার খুলে দেয়া হয়েছিল। খুনী, গুন্ডা, হত্যাকারী ও বীভৎস সমাজ বিরোধীরাই শহরের নিয়ন্ত্রণ ভার গ্রহণ করেছিল। বাজারগুলো মৃতদেহে পরিপূর্ণ হয়ে গিয়েছিল, বাজারের এক একটি দোকানে বার থেকে পনরটি পর্যন্ত মৃতদেহ স্তূপীকৃত হয়ে পড়েছিল ...... এক জায়গায় আমরা দু'টি শিশুকে জীবিতাবস্থায় উদ্ধার করেছিলাম। দু'জনই আহত অবস্থায় ছিল এবং এক জনের আহত স্থানে পচন দেখা দিয়েছিল। এ দু'টি অবুঝ শিশু বোধহীন অবস্থায় আমাদের দিকে নির্বোধের মত তাকিয়েছিল। বাজারের যারা নিহত হয়েছিল, তাদের অধিকাংশেরই বোধহয় কি ঘটতে যাচ্ছে এবং কেন ঘটছে সে সম্বন্ধে বিন্দুমাত্র ধারণা ছিল না। কলকাতার সে দাঙ্গায় প্রায় চার হাজার হিন্দু-মুসলিম নিহত হয়েছিল।

পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে 'ডাইরেকট একশন ডে' বা প্রত্যক্ষ কর্মপন্থা দিবস ঘোষণার পিছনে মুসলমানদের উদ্দেশ্য ছিল ঐ দিবসে জনগণকে জনসভা, মিছিল প্রভৃতির মারফত কংগ্রেস ও বৃটিশ সরকারের রাজনৈতিক বিশ্বাসঘাতকতা সম্পর্কে অবহিত করা। কোনরূপ দাঙ্গা-হাঙ্গামায় যাওয়া তাদের পরিকল্পনায় ছিল না। সেদিন গড়ের মাঠে অক্টর লোনী মনুমেন্টের পাদদেশে মুসলিম লীগ যে জনসভা ডেকেছিল তাতে তৎকালীন প্রাদেশিক লীগের সেক্রেটারী প্রখ্যাত মুসলিম লীগ নেতা আবুল হাশেম সাহেব তাঁর ৮ বৎসর বয়স্ক জ্যৈষ্ঠ পুত্র বর্তমানে বিশিষ্ট বামপন্থী বুদ্ধিজীবী বদরুদ্দিন ওমরকে সংগে নিয়ে ঐ জনসভায় উপস্থিত হয়েছিলেন। এতদ্ব্যতীত তৎকালীন প্রাদেশিক মুসলিম লীগের আর একজন বিশিষ্ট নেতা ফরিদপুরের মোহন মিয়া সাহেব

www.amarboi.org

তাঁর ছয় বৎসরের পুত্রকে নিয়ে ঐ জনসভায় আগমন করেন। স্বাভাবিকভাবেই এটা বোধগম্য যে, মুসলমানরা ঐদিন দাঙ্গা বাঁধবার পরিকল্পনা করেছিল এ সম্পর্কে বিন্দু মাত্র জানতে পারলে তারা কোনভাবেই তাঁদের নাবালক শিশুদের নিয়ে জনসভায় আসতেন না। তখনকার দিনে হিন্দু মুসলমান দাঙ্গা সম্পর্কে যাদের খানিকটা ধারণা আছে, তারা জানে তখনকার প্রচলিত অস্ত্রের সাহায্যে দাঙ্গায় ৫ জন মুসলমান তার তিনগুণ সংখ্যক হিন্দু দাঙ্গাবাজদের সংগে অবাধে লড়াই করতে পারতো। আনুপাতিক হারে মুসলমানরা ছিল হিন্দুদের চাইতে অনেকটা সাহসী। তাই মুসলমানরা পূর্ব পরিকল্পিতভাবে দাঙ্গা আরম্ভ করলে দাঙ্গায় মুসলমানদের চাইতে হিন্দুদের নিহতের সংখ্যা অনেক বেশী হতো। কিন্তু বাস্তবে দেখা গেল মুসলমান নিহত, আহত ও ক্ষতিগ্রস্তদের সংখ্যা ঐ দাঙ্গায় তুলনামূলকভাবে অনেক বেশী হয়েছিল। এ কথার সত্যতা প্রমাণ পাওয়া যায় রাজমোহন গান্ধী লিখিত 'আন্ডারস্ট্যান্ডিং দি মুসলিম মাইন্ড' বইয়ের ১৭০ পৃষ্ঠায় উদ্ধৃত বল্লভভাই প্যাটেলের রাজা গোপাল আচারীর নিকট লিখিত পত্র থেকে। রাজমোহন গান্ধী লিখেছেন,"Vallabhbhai Patel wrote in a letter to Rajagopalachari : This Calcutta killing) will be a good lesson for the league, because I hear that the proportion of Muslims who have suffered death in much larger"

(বল্লভভাই প্যাটেল রাজাগোপাল আচারীর কাছে একটি পত্রে লিখেছিলেন এই কোলকাতা হত্যাকান্ড মুসলিম লীগের জন্য একটি উত্তম শিক্ষার ব্যাপার হবে, কারণ আমি শুনেছি এই দাঙ্গায় হিন্দুদের চাইতে মুসলমানরা নিহত হয়েছে অনেক বেশী।"

অক্টোবর-নভেম্বরে বিহারে বিরাট বিরাট হিন্দু জনতা পূর্বাহ্নে পরিপূর্ণ প্রস্তুতি নিয়ে অকস্মাৎ মুসলমানদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। এসব মুসলমানরা যুগ যুগ ধরে তাদের প্রতিবেশীদের সংগে পরিপূর্ণ বিশ্বাস ও আস্থার সংগে বাস করে এসেছেন। এ নৃশংস হত্যাকান্ডের শিকার নারী-পুরুষ শিশু নির্বিশেষে প্রায় সাত থেকে আট হাজার হয়েছিল।

হিন্দু সংখ্যাগরিষ্ট যুক্ত প্রদেশে হত্যাকান্ড আরও নৃশংস রূপ গ্রহণ করেছিল। গর্ভবতী মহিলাদের উদর ছিন্ন বিচ্ছিন্ন করে অজাত শিশুকে বের করে ফেলা হয়েছিল এবং শিশুদের মস্তক দেওয়ালে বা মেঝেতে পিটিয়ে চূর্ণবিচূর্ণ করে মগজ বের করে দেয়া হয়েছিল। মেয়েদের ধর্ষণ করা হয়েছিল

www.amarboi.org

এ বিবরণ পাওয়া যাচ্ছে এমন একজন উচ্চপদস্থ সরকারী কর্মচারীর কাছ থেকে যার দৃষ্টি রাজনৈতিক অবাস্তব কুয়াশায় আচ্ছন্ন ছিল না, কিন্তু তিনি সমস্ত লোমহর্ষক ঘটনাকে নিজ চোখে দেখেছেন এবং তা যতদূর সম্ভব কোমলভাবে পরিবেশন করতে চেষ্টা করেছেন।

এ হত্যাকান্ড ও অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের অচলাবস্থার কাহিনী বৃটিশ সরকারের গোচরীভূত হওয়ার পর একটা শেষ আপসরফার উদ্দেশ্যে বৃটিশ সরকার লর্ড ওয়াভেল, মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ, লিয়াকত আলী খান, পন্ডিত নেহেরু এবং শিখদের প্রতিনিধি সরদার বলদেব সিংহকে বিলেতে ডেকে পাঠালেন। শেষ পর্যন্ত কেবিনেট মিশন প্লানকে রক্ষা করা যায় কিনা এ প্রচেষ্টায় বৃটিশ সরকার এদের সবাইকে ডিসেম্বরের ৩ তারিখে একত্রিত করলেন।

কংগ্রেস-লীগ নেতৃবৃন্দের বিলাত গমন

ভাইসরয় এবং ভারতীয় নেতৃবৃন্দ একই প্লেনে লন্ডন গমন করেন, কিন্তু প্লেনে নেহেরু এবং জিন্নাহ কেউ কারো সংগে তেমন কথাবার্তা বলেননি। পথে মাল্টায় কিছুক্ষণের জন্য যাত্রাবিরতি হল এবং যাত্রীরা এদিক ওদিকে কিছুক্ষণের জন্য ঘুরে বেড়াবার সুযোগ পেল। আবার যখন তারা প্লেনে উঠল এ সময় জিন্নাহ এগিয়ে এসে নেহেরুকে সহসা জিজ্ঞাসা করলেন, "Well, what have you been doing all day? " (ভাল, সারাদিন আপনার কিভাবে কেটেছে ?) নেহেরু উত্তর দিলেন, Partly reading, partly sleeping, partly walking" (কিছুটা পড়ে, কিছুটা ঘুমিয়ে, কিছুটা বেড়িয়ে) এরপর প্লেন লন্ডন বিমান বন্দরে অবতরণ করল। সেখানে বিমান বন্দরে লর্ড প্যাথিক লরেন্স এবং স্থানীয় ভারতীয়রা অতি প্রত্যুষে ট্রাক,বাস এবং সাইকেলে উপস্থিত হয়ে তাঁদের অভ্যর্থনা করলেন।

পরবর্তীতে আলোচনা যখন আরম্ভ হল,তখন দেখা গেল, সিমলা কনফারেন্সে দু'পক্ষ কংগ্রেস ও লীগ যেভাবে নিজ নিজ অবস্থানে অনঢ় ছিল, এখানেও প্রায় সে অবস্থা ঘটল- কেউ কাউকে কোন সুবিধা দিতে স্বীকৃত হলো না। ফলে তিনদিন ব্যাপী আলোচনা ব্যর্থতায় পর্যবেসিত হল। মিঃ এটলী পরিষ্কারভাবে জানিয়ে দিলেন যে, নতুন সংবিধান রচনায় মুসলমানরা যোগদান না করা পর্যন্ত তারা ভারত ত্যাগ করবে না। ভারত ত্যাগ মানে যদি কংগ্রেসের হাতে ক্ষমতা অর্পণ বুঝায় তবে বৃটিশ কর্মচারী ও সৈন্যেরা ভারত ত্যাগ করবে

www.amarboi.org

লন্ডনে মুসলিম লীগ সভায় বক্তৃতারত জিন্নাহ

নেতাজী সুভাষ বোস ও কায়েদে আযম জিন্নাহ

www.amarboi.org

মিঃ জিন্নাহ ও জওহরলাল নেহরু

www.amarboi.org

না। তিন দিন পরে নেহেরু শিখ ডেলিগেটসহ ভারতে ফিরে এলেন এবং বললেন, মাসের পর মাস আলোচনা চালিয়ে সমস্যার যদি সমাধান হয় তবে এটা নির্বুদ্ধিতা ছাড়া আর কিছু নয়।

১৫ই ডিসেম্বর হিন্দুদের পবিত্র তীর্থ-ভূমি বেনারসে নেহেরু এক ঔদ্ধতপূর্ণ বক্তব্য দিলেন।

"বৃটিশ গ্রহণ করুক বা না করুক সাংবিধানিক সভাতে আমরা যে শাসনতন্ত্র রচনা করব তাই হবে ভারতের শাসনতন্ত্র। বৃটিশ সরকার মনে করছেন শাসনতন্ত্র রচনা পরিষদের সিদ্ধান্ত তার উপর বাধ্যতামূলক নয়। কিন্তু আমরা মনে করি যে, সাংবিধানিক পরিষদে আমরা এমন মনোভাব নিয়ে যোগ দিইনি যে, আমরা আমদের সিদ্ধান্ত এক রৌপ্য পাত্রে রেখে বৃটিশদের উহা গ্রহণ করার জন্য চর্তুদিকে নেচে বেড়াতে থাকবো। আমরা এখন বিলাতের দিকে তাকিয়ে থাকার ইচ্ছা একেবারে পরিত্যাগ করেছি। আমরা কিছুতেই এবং কোনভাবেই বাইরের হস্তক্ষেপ বরদাশ্‌ত করতে রাজি নই।

এই পরিস্থিতিতে বৃটিশ শক্তির চাপে অথবা নিজেদের ইচ্ছামত অথবা উভয়ের সংমিশ্রণে ভারতীয়দের হাতে নিজেদের ব্যাপার মিটমাট করে ফেলার দায়িত্ব অর্পণ করে স্বদেশে চলে যাওয়ার সিদ্ধান্ত বৃটিশ সরকার গ্রহণ করল।

নতুন সাংবিধানিক সভা ৯ই ডিসেম্বর দিল্লীতে আরম্ভ হল। কিন্তু মুসলিম লীগ মেম্বারদের একজনও সভাতে যোগদান করলেন না। জিন্নাহ এবং লিয়াকত আলী উভয়েই তখনও বিলাতে অবস্থান করছিলেন। ১৪ই ডিসেম্বর লন্ডনে প্রবাসী মুসলমানরা জিন্নাহর বক্তৃতা শোনার জন্য 'কিংসওয়ে হল'-এ সমবেত হলেন। বৃটেনের সব এলাকার মুসলমানরা রাজধানীর মেথডিস্ট চার্চে সমবেত হলেন তাদের নেতার বাণী শোনার জন্য। হলের বাইরে শীতার্ত আবহাওয়ার মধ্যে বেসামরিক পোষাকের সাধারণ পরিচ্ছদ পরিহিত বহু পুলিশ হলের ভিতরে বাইরে অবস্থান নিল।

বৃটিশ সংবাদপত্রের ফটোগ্রাফাররা তাদের ক্যামেরা নিয়ে হাঁটুর উপর ভর করে হলের সম্মুখভাগ দখল করে নিয়েছিল। জিন্নাহ হলে প্রবেশ করামাত্র সমুদয় মুসলিম লীগ নেতারা উচ্চ কণ্ঠে শ্লোগান দিতে আরম্ভ করলঃ "পাকিস্তান-জিন্দাবাদ, পাকিস্তান-জিন্দাবাদ, কায়েদে আজম-জিন্দাবাদ।"

www.amarboi.org

লন্ডনের কেন্দ্রস্থলে মেথডিস্ট চার্চের সম্মুখে কেবিনেট মিশন ও ভাইসরয়ের বিশ্বাসঘাতকতা সম্পর্কে বড় বড় অক্ষরে লিখিত একটি ব্যানার ঝুলছিল এবং মুসলমান শ্রোতারা আশে-পাশে উপস্থিত পুলিশদের শ্রবণ দূরত্বের মধ্যেই সোচ্চারে পাকিস্তানের দাবী জানালেও কেউ আপত্তি করছিল না - এটা বৃটিশ সরকারের সহনশীলতা ও যুক্তিবাদী মনের পরিচয় বহন করে।

জিন্নাহ কথা বলার জন্য উঠে দাঁড়াতেই মুসলমানরা গর্জন করে উঠল, আমরা পাকিস্তান চাই, জিন্নাহ- জিন্দাবাদ। জিন্নাহর মলিন মুখ ভাবাবেগে কম্পিত হল এবং তিনি প্রথমে আস্তে আস্তে ও থেমে থেমে কথা বলতে আরম্ভ করলেন। তিনি বললেন, 'আমি আনন্দিত হয়েছি যে, বৃটিশরা শেষ পর্যন্ত খানিকটা জাগ্রত হয়েছে। এটা বৃটিশ জাতির ঐতিহ্য যে, তারা যখন সাংঘাতিক কিছু গড়তে যায় তখন জেগে উঠে।'

অতঃপর তিনি তাঁর দাবী সম্পর্কে যুক্তি প্রদর্শন করে বললেন, "আমরা যা চাই তা কি ? আমাদের সর্বোচ্চ দাবী কি ? এর উত্তর হ'ল পাকিস্তান, আবার জিন্দাবাদ শব্দে হল প্রতিধ্বনিত হলো। জিন্নাহ তখন বলতে লাগলেন, 'আমরা আমাদের জন্য একটি পৃথক রাষ্ট্র চাই, যেখানে আমাদের জীবন দর্শন অনুযায়ী আমরা বসবাস করতে পারি। হিন্দুদের এতে লোকসানের কি আছে? ম্যাপের দিকে তাকিয়ে দেখুন। ভারতের তিন চতুর্থাংশের অধিকারী তারা হচ্ছে এবং ভারতের ভূমির শ্রেষ্ঠ অংশের মালিক তারা হচ্ছে।

আমাদের এই প্রস্তাবে তাদের আপত্তির কি কারণ থাকতে পারে ? আমরা স্বাধীন হব। বৃটেন বেয়নেটের সাহায্যে হিন্দু সংখ্যাগরিষ্ঠের হাতে ক্ষমতা অর্পণ করে যাবে ? তা যদি হয় আপনারা সম্মান, পারস্পরিক সংহতি এবং ন্যায় বিচার সবকিছু হারাবেন।

গণতন্ত্র মুসলমানদের রক্তের মধ্যে রয়েছে। আপনাদেরকে উদাহরণ দিচ্ছি। অনেক সময় আমি যখন মসজিদে যাই আমার ড্রাইভার আমার পাশাপাশি দাঁড়িয়ে নামাজ পড়ে। মুসলমানরা ভ্রাতৃত্বে, সমতায় এবং স্বাধীনতায় বিশ্বাস করে। ভারতকে বিভক্ত করা ছাড়া দ্বিতীয় আর কোন পথ নেই। মুসলমানদের স্বাধীন আবাসভূমি এবং হিন্দুদের দিয়ে দাও তাদের হিন্দুস্থান।

লন্ডন ভ্রমনের শেষ দিকে কায়েদে আজম খুবই ক্লান্ত হয়ে পড়েছিলেন।

www.amarboi.org

বিমানে করে তিনি যখন করাচীতে এসে নামলেন তাঁর ডাক্তাররা তাঁকে বিশ্রামের উপদেশ দিলেন। মালিরে ভূপালের নওয়াবের বাসভবনে তিনি বিশ্রাম নিতে লাগলেন যেখানে রেডিওতে শ্রবণও তাঁর জন্য নিষিদ্ধ ছিল। প্রায় এক মাস পর্যন্ত তিনি কঠিন স্নায়ুবিক দুর্বলতায় ভূগছিলেন। ৪৭-এর মার্চের দিকে তিনি কিছুটা সুস্থ হয়ে বোম্বাইতে প্রত্যাবর্তন করলেন। এ সময় ফেব্রুয়ারীর ২০ তারিখে মিঃ এ্যাটলী হাউস অব কমন্স-এ ঘোষণা দিলেন যে, বৃটিশ সরকার জুন '৪৭-এ ভারতে পূর্ণ স্বাধীনতা দান করবে। বৃটিশ প্রধানমন্ত্রী তাঁর ঘোষণায় বললেন, তারা হয় বৃটিশ ভারতে সামগ্রীকভাবে কোন কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে বৃটিশ ভারতের ক্ষমতা হস্তান্তর করবে অথবা তৎকালে অবস্থিত প্রাদেশিক সরকারগুলোর কাছে ক্ষমতা হস্তান্তর করবে। এর কোনটিই যদি সম্ভব না হয় তবে এমনভাবে ক্ষমতা ত্যাগ করবে যেটা ভারতবাসীর স্বার্থের অনুকূলেও সর্বাপেক্ষা যুক্তিযুক্ত মনে হবে।

মিঃ এ্যাটলীর ঘোষণা ও ওয়াভেলের অপসারণ

মিঃ এ্যাটলী এও ঘোষণা করলেন যে, বৃটিশরাজ তার জ্ঞাতিভ্রাতা রিয়ার এডমিরাল ভিসকাউন্ট মাউন্টব্যাটেনকে শেষ ভাইসরয় হিসাবে নিযুক্ত করেছেন। বৃটিশ ভারতের জনগণের স্বার্থ এবং তাদের ভবিষ্যৎ সুখ ও শান্তি যাতে নিশ্চিত করা যায় এমনভাবে ক্ষমতা হস্তান্তরের পূর্ণ দায়িত্ব তাঁকে দেওয়া হয়েছে।

তড়িঘড়ি করে লর্ড ওয়াভেলকে অপসারণ করে তদস্থলে ভিসকাউন্ট মাউন্টব্যাটেনকে ভারতের রাজনৈতিক অচলাবস্থার অবসান করার জন্য নিযুক্তি ভারতের মুসলমানদের স্বার্থের পক্ষে অত্যন্ত ক্ষতিকর হয়েছিল। ভারতের রাজনৈতিক গগনে জটিলতা ও লীগ-কংগ্রেসের নেতাদের মনোভাব এবং এ জটিলতা সৃষ্টির পিছনে কার ভূমিকা কতটুকু ছিল এ সম্পর্কে ওয়াভেলের ধারণা ছিল অত্যন্ত স্পষ্ট। কেবিনেট মিশন প্লান শেষ পর্যন্ত পরিত্যক্ত হওয়ার পিছনে কংগ্রেসের অন্যায় আচরণ ও গ্রুপিং-এর ব্যাপারে ইচ্ছাকৃত ভুল ব্যাখ্যাই যে দায়ী এ সম্বন্ধে ওয়াভেল নিশ্চিত ছিলেন। গ্রুপিং-এ প্রদেশগুলির অন্তর্ভূক্তি বাধ্যতামূলক কি-না, এ ব্যাপারে বৃটিশ পার্লামেন্টের আইন বিভাগও বাধ্যতামূলক বলে অবশেষে মত্‌ দিলেও কংগ্রেস তা মানতে রাজী না হওয়ায় শেষ পর্যন্ত প্লান পরিত্যক্ত হয়েছিল। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় ভারতীয়

www.amarboi.org

মুসলমানরা নিঃশর্তভাবে বৃটিশ সরকারকে সাহায্য করায় মুসলিম দাবীর প্রতি ওয়াভেল মোটামুটি সহানুভূতিশীল ছিলেন। সে সময় তৎকালীন বৃটিশ সরকার যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন যুদ্ধশেষে ভারত সরকার রাজনৈতিক ক্ষেত্রে এমন কোন পরিবর্তনে সম্মত হবে না যাতে ভারতীয় মুসলমানদের স্বার্থের গুরুতর হানি হয় এই প্রতিশ্রুতি সম্পর্কে ওয়াভেল সচেতন ছিলেন এবং ওর মর্যাদা রক্ষায়ও তিনি ছিলেন আগ্রহী।

এ্যাটলীর শ্রমিক সরকারের অনেকেই কংগ্রেসের স্বাধীনতার আন্দোলনের প্রতি সহানুভূতিশীল ছিলেন এবং অনেক সদস্যের সংগেই জওহরলাল ও কৃষ্ণমেনন প্রমুখ কংগ্রেস নেতাদের সংগে ব্যক্তিগত হৃদ্যতা ছিল। যুদ্ধকালীন সময় থেকে ১৯৪৫ সাল পর্যন্ত ভারতীয় রাজনীতির গতিধারা সম্পর্কে প্রচুর অভিজ্ঞতাসম্পন্ন লর্ড ওয়াভেল যিনি ব্যক্তিগত জীবনেও ছিলেন অত্যন্ত সৎ ও ন্যায়পরায়ণ তাঁকে হঠাৎ করে অত্যন্ত অসম্মানজনকভাবে এরূপ সংকটময় মুহূর্তে অপসারণ ন্যায়নীতি ও ভারতীয় মুসলমানদের স্বার্থের পক্ষে অত্যন্ত ক্ষতিকর হয়েছিল। জিন্নাহ্ ও লীগের জন্য এটাই ছিল একটি চরম বিপর্যয়।

মাউন্টব্যাটেনের ভারত আগমন

মাউন্টব্যাটেন তাঁর সুন্দরী স্ত্রী এডুইনা মাউন্টব্যাটেন ও কন্যা পামেলা মাউন্ট ব্যাটেনসহ ২০শে মার্চ তারিখে দিল্লী বিমান বন্দরে পৌঁছিলেন। জুন '৪৭ এর মধ্যে ক্ষমতা হস্তান্তর করে ভারত থেকে বৃটিশ সরকারের অপসারণের প্রয়োজনীয় যে কোন ব্যবস্থা নেওয়ার পূর্ণ অধিকার তাঁকে দেয়া হয়েছিল। যদি সম্ভব হয় তিনি ভারতের অখন্ডতা বজায় রেখে প্রদেশগুলিকে যতদূর সম্ভব ক্ষমতা দিয়ে লীগ-কংগ্রেসের গ্রহণযোগ্য কোন সমাধানে উপনীত হওয়ার চেষ্টা করবেন। হিন্দু-মুসলিম তথা কংগ্রেস-লীগের সমঝোতার ভিতর দিয়ে যদি কোন সমাধান সম্ভব না হয় তবে মাউন্ট ব্যাটেন ইচ্ছা করলে ভারত বিভাগ করে উপযুক্ত হস্তে ক্ষমতা হস্তান্তর করে ভারত থেকে বৃটিশ শক্তির অপসারণের ব্যবস্থা সম্পন্ন করবেন।

লর্ড মাউন্টব্যাটেন ভাইসরয় হিসেবে এসে প্রথমে কংগ্রেস ও লীগের নেতৃস্থানীয় নেতৃবৃন্দের সংগে আলাপ করলেন। তিনি প্রথম থেকে ভারতের অখন্ডতা বজায় রেখে লীগ-কংগ্রেসের সমঝোতার মধ্য দিয়ে ভারতের হিন্দু-মুসলমান সমস্যা সমাধান করার চেষ্টা করছিলেন। তিনি সর্ব প্রথম

www.amarboi.org

কেবিনেট মিশন প্লানকে পুনরুজ্জীবিত করে সঠিকভাবে কার্যকরী করে সমস্যার সমাধান করার পরিকল্পনা করছিলেন। কিন্তু দুই পক্ষের সঙ্গে আলাপ করে বুঝতে পারলেন যে এভাবে সমস্যার সমাধান হবে না। এ ব্যাপারে কংগ্রেস রাজী হলেও জিন্নাহ রাজী হলেন না। কারণ তিনি ইতিমধ্যে কংগ্রেস নেতৃবৃন্দের সর্বপ্রকার প্রতিশ্রুতি ও সদিচ্ছার উপর সম্পূর্ণ আস্থা হারিয়ে ফেলেছিলেন। তখনকার রাজনৈতিক অবস্থাদৃষ্টে অচিরেই লর্ড মাউন্টব্যাটেন বুঝতে পারলেন পাঞ্জাব, যুক্তপ্রদেশ ও ভারতের অন্যান্য স্থানে হিন্দু-মুসলিম দাঙ্গা, যেভাবে ছড়িয়ে পড়ছে তাতে ভারতকে এক রেখে সমস্যা সমাধান সম্ভব হবে না। ভারতবর্ষ তখন মনে হচ্ছিল হিন্দু-মুসলিম গৃহ যুদ্ধের দ্বারপ্রান্তে এসে দাঁড়িয়েছে যেটা এড়াতে গেলে দেশ বিভাগ ছাড়া গত্যন্তর নেই।

ভারতের জটিল রাজনৈতিক সমাধানের জন্য মাউন্টব্যাটেনকে যাদের সংগে আলোচনা করতে হয়েছিল তার মধ্যে প্যাটেল ও নেহরু বয়সের দিক থেকে প্রায় কাছাকাছি। মাউন্টব্যাটেনের বয়স ৪৬। নেহরুর বয়স ৫২ এবং প্যাটেলও তার কাছাকাছি। কিন্তু জিন্নাহর বয়স ছিল তখন ৭০-এর উর্ধ্বে। জওহরলালের সংগে মাউন্ট ব্যাটেনের পূর্ব পরিচয় ও বন্ধুভাবাপন্ন সম্পর্ক ছিল বলে কংগ্রেস নেতৃবৃন্দের সঙ্গে আলোচনা অনেকটা উষ্ণ পরিবেশের মধ্য দিয়ে অগ্রসর হতে থাকে। কিন্তু জিন্নাহর বয়সের পার্থক্য ও অতীব শীতল মনোভাবের জন্য আলোচনা প্রথম থেকেই বাধাগ্রস্থ হচ্ছিল। ভারত সাম্রাজ্যকে বৃটিশ কমনওয়েলথ-এর মধ্যে ধরে রাখার মানসে মাউন্টব্যাটেন কংগ্রেসের দাবীর অনুকূলে ভারতের অখন্ডতা বজায় রেখে সমাধানের প্রস্তাব দিলে জিন্নাহ বারে বারে সে প্রস্তাব প্রত্যাখান করে। তিনি জোর দিয়ে বলেন যে, ভারতের বর্তমান অবস্থায় দেশ বিভাগ ছাড়া অন্য কোন পথে হিন্দু-মুসলমান সমস্যার সমাধানের কোন উপায় নেই। জিন্নাহ বেশ বুঝতে পেরেছিলেন যে, কংগ্রেসের দ্বারা মাউন্ট ব্যাটেন বেশ খানিকটা প্রভাবিত হয়েছে এবং তার কাছ থেকে সুবিচার পাবে কিনা এ ব্যাপারে তার মনে সন্দেহ দেখা দিয়েছিল। তাই প্রথমাবধি মাউন্ট ব্যাটেনের সঙ্গে আলোচনায় তিনি বেশ খানিকটা কঠিন মনোভাব গ্রহণ করলেন।

বৃটিশ প্রধানমন্ত্রী এ্যাটলীর ঘোষণায় এও ছিল যে, লীগ কংগ্রেস সমঝোতার ভিতর দিয়ে যদি কোন কেন্দ্রীয় সরকারের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তর সম্ভব না হয় তবে প্রদেশগুলিতে কোন দায়িত্বশীল প্রতিনিধিদের হাতে ক্ষমতা

www.amarboi.org

হস্তান্তর করা যেতে পারবে। এ অবস্থায় লীগ পাঞ্জাব ও উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশে ক্ষমতা দখলের জন্য জোর প্রচেষ্টা চালাল। লীগের জোর আইন অমান্য আন্দোলনের ফলে পাঞ্জাবে মার্চের ২ তারিখে খিজির হায়াত খান যিনি ইউনিয়নিস্ট পার্টির নেতা হিসাবে হিন্দু ও শিখদের সমর্থনে এত দিন লীগের প্রবল চাপের মুখে সরকার চালিয়ে আসছিলেন তিনি পদত্যাগ করতে বাধ্য হলেন। পরদিনই লীগ নেতা মামদোত-এর খান সরকার গঠন করলেন। শিখেরা এতদিন খিজির হায়াতকে অকুণ্ঠভাবে সমর্থন দিয়ে আসছিল। তার পদত্যাগে তারা দারুণভাবে আতঙ্কিত হয়ে পড়ল। তাদের নেতা তারা সিং মুসলমানদের বিরুদ্ধে হিন্দু যুবকদের সংগ্রাম আরম্ভের আহবান জানাল। ফলে সমগ্র পাঞ্জাবে মারাত্মক আকারে দাঙ্গা ছড়িয়ে পড়ল। এদিকে দিল্লী, যুক্ত প্রদেশ, আলওয়ার প্রভৃতি স্থানে মারাত্মক দাঙ্গায় সংখ্যালঘু হাজার হাজার মুসলমান নিহত হতে আরম্ভ হল। এদিকে পূর্ব এবং পশ্চিম পাঞ্জাবে দাঙ্গা মারাত্মক আকার ধারণ করল। পশ্চিম পাঞ্জাবের মুলতান, লাহোর, রাওয়ালপিন্ডি এবং পূর্ব পাঞ্জাবের অমৃতসর আরও কয়েকটি শিখ প্রধান এলাকায় দাঙ্গা ভয়াবহ রূপ নিল। যার ফলে পূর্ব-পশ্চিম পাঞ্জাবে বহু হিন্দু, মুসলমান ও শিখ সংখ্যালঘুরা নৃসংশভাবে নিহত হতে লাগল।

ভারতের পূর্ব প্রান্তে বিহার এবং নোয়াখালীতেও দাঙ্গা ছড়িয়ে পড়ার ফলে গান্ধীজী প্রথমে নোয়াখালী ও পরে বিহারে শান্তি স্থাপনের উদ্দেশ্যে বিভিন্ন জায়গায় পদযাত্রায় বের হলেন।

ভারত বিভাগের প্রক্রিয়া আরম্ভ ও সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার বিস্তৃতি

ইতিমধ্যে কংগ্রেস নেতৃবৃন্দ বুঝতে পারলেন যে, সাংবিধানিক সভায় কোন গঠনতন্ত্র প্রণীত হলেও তা মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ প্রদেশগুলিতে বাস্তবায়ন করা সম্ভব হবে না। তাই ৫ই মার্চ কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটি গান্ধীকে জিজ্ঞাসা না করেই পাঞ্জাব ও বাংলা বিভাগের প্রস্তাব গ্রহণ করল। এবং সিদ্ধান্ত নিল যে, তাদের প্রণীত শাসনতন্ত্র যে যে এলাকা গ্রহণ করবে শুধু সেখানে বলবৎ করা হবে।

গান্ধী বরাবরই ভারত বিভাগের বিরোধী ছিলেন। চারদিকের রাজনৈতিক অবস্থা দর্শনেও তিনি ভারত বিভাজনে কোনভাবেই সম্মত হলে রাজী হলেন না।

www.amarboi.org

শেষ চেষ্টা হিসাবে তিনি মাউন্টব্যাটেনকে প্রস্তাব দিলেন যে, অর্ন্তবর্তী সরকারকে বরখাস্ত করে তিনি যেন জিন্নাহকে নিজের মনমতো লোক নিয়ে মন্ত্রীসভা গঠনের জন্য অনুরোধ করেন। শুধু মাউন্টব্যাটেন ভাইসরয় হিসাবে দেখবেন ভারতের স্বার্থবিরোধী ও গণবিরোধী কোন আইন প্রণয়ন বা কাজ যেন লীগ সরকার না করে। ইতিমধ্যে প্যাটেল ও জওহরলাল ভারতের মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ এলাকা বাদ দিয়ে সঙ্কুচিত ভারত যেখানে তারা নিজেদের মনমতো সরকার পরিচালনা করতে পারবে এরূপ এলাকা নিয়ে ভবিষৎ ভারত গঠনের জন্য মনস্থির করে ফেলেছিলেন। তাই গান্ধীর এ প্রস্তাবে তাঁরা রাজী হলেন না এবং তাদের বিরোধীতার ফলে মাউন্টব্যাটেন জিন্নাহকে এ প্রস্তাব দেওয়া থেকে বিরত রইলেন। কংগ্রেসের বঙ্গ এবং পাঞ্জাব বিভাগের রাজী হওয়া মানে প্রকারান্তরে পাকিস্তানকে স্বীকার করে নেওয়া।

পাঞ্জাব, যুক্ত প্রদেশ ও ভারতের বিভিন্ন স্থানে যখন মারাত্মকভাবে দাঙ্গা চলছিল তখন দেখা গেল প্রশাসন, পুলিশ, শান্তি ও আইন -শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বিভিন্ন বিভাগগুলোতে সাম্প্রদায়িকতার বিষ দারণভাবে অনুপ্রবেশ করেছে। এমনকি সৈন্য বাহিনীও এ বিষের দ্বারা আক্রান্ত হচ্ছে এরূপ প্রমাণ পাওয়া যেতে লাগল। এই ভয়াবহ পরিণতিতে সকল রাজনৈতিক দলের নেতৃবৃন্দই দারুণভাবে আতঙ্কিত হয়ে পড়লেন। পাঞ্জাব ও উত্তর পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশের গভর্ণরদ্বয় ভাইসরয়কে জানালেন যে, অবস্থা তাদের দ্রুত আয়ত্বের বাইরে চলে যাচ্ছে। মাউন্ট ব্যাটেন তখন দেশ বিভাগ ছাড়া গত্যন্তর নেই এ সম্বন্ধে স্থির নিশ্চিত হলেন। এখন ভারত কিভাবে ভাগকরা হবে সেটাই প্রশ্ন।

ভারত বিভক্তির ব্যাপারে জিন্নাহর বরাবরই দাবী ছিল যে, অখন্ড পাঞ্জাব, অখন্ড বাংলা এবং পুরো আসাম প্রদেশ পাকিস্তানে আসবে। মাউন্টব্যাটেন যখন পাঞ্জাব ও বঙ্গের হিন্দু সংখ্যা গরিষ্ঠ এলাকা পাকিস্তান থেকে বাদ দেওয়ার প্রস্তাব করলেন তখন জিন্নাহ সম্পূর্ণ অস্বীকৃতি জানালেন এবং প্রাণ-পণে এরূপ বিভাজন থেকে মাউন্টব্যাটেনকে নিভৃত করবার চেষ্টা করতে লাগলেন। কিন্তু তিনি সফল হলেন না। এ ব্যাপারে মাউন্টব্যাটেন অনড়।

কিভাবে ভারত বিভক্তি হবে এ নিয়ে যখন আলোচনা চলছে তখন ভারতের উত্তর প্রদেশ, পাঞ্জাব, উত্তর পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশে দাঙ্গা এরূপ ভয়াবহ আকার ধারণ করল যে, মাউন্টব্যাটেন অনর্থক রক্তপাত ও দাঙ্গা বন্ধের

www.amarboi.org

জন্য দেশব্যাপী জনগণের কাছে আবেদন করার জন্য গান্ধী ও জিন্নাহকে অনুরোধ জানালেন। তদনুসারে গান্ধী ও জিন্নাহ দেশবাসীর কাছে শান্তির জন্য আকুল আবেদন জানালেন। রেডিওতে গান্ধী ইংরেজী, উর্দু ও হিন্দিতে ভাষণ দিলেন। জিন্নাহ দিলেন ইংরেজীতে। তাঁদের আবেদন বিভিন্ন পত্র পত্রিকায় ও সিনেমা হলগুলিতে প্রদর্শিত হয়েছে। সে মুহূর্তে দেশব্যাপী সাম্প্রদায়িকতার আগুণ যেভাবে প্রজ্জ্বলিত হয়ে উঠেছিল তাতে এ দুই নেতার আবেদনে খুব বেশী কাজ হয়েছিল বলে মনে হয় না।

গান্ধী-জিন্নাহর আবেদন প্রধানতঃ পাঞ্জাবকে লক্ষ্য করে দেওয়া হয়েছিল যেখানে হিন্দু, শিখ ও মুসলমানরা একে অপরের প্রাণ সংহারে এমনভাবে উম্মত্ত হয়ে উঠেছিল যে, গভর্ণর মন্ত্রীসভা বাতিল করে স্বহস্তে শাসনভার গ্রহণ করলেন। উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশেও লীগের চাপে কোণঠাসা হয়ে ডাঃ খানের কংগ্রেসী মন্ত্রীসভা পদত্যাগ করতে বাধ্য হল। শান্তির বাণীতে বিশেষ কোন কাজ হল না। পাঞ্জাবের শিখ বিদ্রোহীদের নেতা তারাসিং তার অনুগামীদের তাদের রাজ্য থেকে মুসলমানদের ধ্বংস করার জন্য উৎসাহিত করতে লাগলেন। সামরিক বাহিনীর লোকদের দ্বারা অস্ত্রশস্ত্র ও যানবাহনের পরিকল্পনা তৈরী করা হয়েছিল। মুসলমানরা শিখদের এ পরিকল্পনা জানতে পেরে জিন্নাহ সাহেবের কাছে অর্থ প্রদান ও শিখদের মোকাবিলা করার উদ্দেশ্যে একটি স্বেচ্ছাসেবক বাহিনী গঠন করার জন্য অনুমতি প্রার্থনা করল। জিন্নাহ সাহেবের উত্তর ছিল তাঁর সারাজীবনের সৎ নীতির সংগে সম্পূর্ণ সঙ্গতিপূর্ণ। তিনি বললেন, তোমরা কি করে আশা কর আমি এরূপ আবেদন সমর্থন করতে পারি ? আমি একজন ভন্ড বা মোনাফেক নই। আমি এই মাত্র শান্তির আবেদনে দস্তখত করেছি। এবং আমি আশা করি যে, মুসলমানরা আমার আবেদনে যথাযথভাবে সাড়া দিবে। এরূপ কঠিন সময়েও জিন্নাহ কাজে ও কথায় কিরূপ সদাচারী ছিলেন উপরোক্ত ঘটনা তার পরিচয় বহন করে।

পাঞ্জাব, বঙ্গ ও আসামের কোন কোন এলাকা হিন্দুস্থান ও পাকিস্তানে যাবে এটা স্থির করার জন্য স্যার সিরিল র‍্যাডক্লিপকে চেয়ারম্যান করে একটি বাউন্ডারী কমিশন করা হল। স্যার র‍্যাডক্লিপ এ ব্যাপারে যে সিদ্ধান্ত ও রায় দিবেন তা মেনে নিতে জিন্নাহ ও কংগ্রেস নেতৃবৃন্দ স্বীকৃত হলেন।

পাকিস্তান সম্পর্কে জিন্নাহ তাঁর অনুগামীদের বরাবরই ধারণা দিয়েছিলেন যে, অখন্ড পাঞ্জাব, বঙ্গ ও আসাম নিয়ে পাকিস্তান গঠিত হবে। এখন এ ৩টি

www.amarboi.org

প্রদেশের বিভক্তি যে ভাবে করা হতে লাগল তাতে তাঁর অনুগামীরা মর্মাহত হয়ে বিদ্রোহ করবার মতো অবস্থার সৃষ্টি করল। জিন্নাহ নিজেও দারুণভাবে হতাশ হয়েছিলেন ও প্রচন্ড মানসিক আঘাত পেয়েছিলেন। মাউন্টব্যাটেনের এই পক্ষপাত মূলক মনোভাবের পরিচয় পেয়ে বিভাগের রূপরেখা সম্বন্ধে ভীত হয়ে যখন জিন্নাহ ভাইসরয়ের প্লান মানতে অস্বীকার করেন তখন মাউন্টব্যাটেন জিন্নাহকে ভয় দেখালেন যে, এ ৩টি প্রদেশ ভাইসরয়ের ইচ্ছামত বিভক্তিতে তিনি যদি সম্মত না হন তবে কংগ্রেসের হাতে পূর্ণ ক্ষমতা অর্পণ করে বৃটিশ ভারত ত্যাগ করবে। এ অবস্থায় অনন্যোপায় হয়ে জিন্নাহ ও তাঁর অনুগামীদের খন্ডিত পাকিস্তান মেনে নিতে হল। পাকিস্তান একেবারে না পাওয়ার চাইতে কীটদ্রষ্ট পাকিস্তান মেনে নিতে তিনি অনিচ্ছা সত্ত্বেও রাজী হলেন। মার্চের ১০ তারিখে মুসলিম লীগ ওয়ার্কিং কমিটি মাউন্টব্যাটেন পরিকল্পনা গ্রহণ করতে স্বীকৃত হল। বৃটিশ সরকার কর্তৃক সর্বশেষ অনুমোদিত ভারত বিভাগের খসড়া অনুমোদনের জন্য যখন উপস্থাপিত করা হল জিন্নাহ তাতে সই করলেন না।

তাঁর পক্ষ থেকে পরিকল্পনায় তাঁর সম্মতি আছে এভাবে লিখে মাউন্টব্যাটেন সই করলেন। জিন্নাহকে যখন জিজ্ঞাসা করা হল তিনি শুধু মাথা নাড়লেন। এবং এটাকে তাঁর সম্মতি বলে ধরে নেওয়া হল। জিন্নাহর মতো ব্যক্তিত্ব সম্পন্ন ও উঁচু স্তরের আত্মসম্মান সম্পন্ন ব্যক্তির পক্ষে এরূপ দুঃখজনক ও অপমানকর ও মুসলিম জাতির স্বার্থের পরিপন্থী একটি কাজের এভাবে সমাপ্তি টানা ছাড়া আর উপায় ছিল না।

স্যার সিরিল, র‍্যাডক্লিপ বঙ্গ এবং পাঞ্জাবের হিন্দুস্থান পাকিস্তান এলাকার সীমারেখা যেভাবে টানলেন তা দেখে জিন্নাহ ও লীগ নেতৃবৃন্দ বিশেষভাবে মর্মাহত হলেন। অনেক মুসলিম অধ্যুষিত সংখ্যাগরিষ্ঠ এলাকা অন্যায়ভাবে হিন্দুস্থানে দিয়ে দেয়া হয়েছে। পাঞ্জাবের চাইতেও বঙ্গ বিভাজনে র‍্যাডক্লিপ কংগ্রেসের প্রতি পক্ষপাতিত্ব করেছিলেন অনেক বেশী। চব্বিশ পরগনা, মালদহ, মুর্শিদাবাদ প্রভৃতি মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ জেলা গুলি পূর্ণভাবে এবং দিনাজপুর, নদীয়া প্রভৃতি মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ জেলাগুলির একটি বিরাট অংশ অন্যায়ভাবে ভারত ভূক্তি করা হল। আসামের কাছাড়, ধুবরী ও নওগাঁ এ তিনটি মুসলিম এলাকা ও সিলেটের করিমগঞ্জসহ দশটি থানা অন্যায়ভাবে হিন্দুস্তানের অন্তর্ভুক্তির পিছনে মাউন্টব্যাটেন তার স্ত্রীর দ্বারা যথেষ্ট প্রভাবিত

www.amarboi.org

হয়েছিলেন বলে লীগ নেতৃবৃন্দ ও তৎকালীন ইংরেজ ইচ্চপদস্থ রাজ কর্মচারী এবং মাউন্টব্যাটেনের সহকর্মীরা মনে করেন। মাউন্টব্যাটেনের পত্নী লেডী এডুউইনার সংগে নেহরুর গভীর অন্তরঙ্গতা ও ঘনিষ্ঠতা ছিল। পরবর্তীকালে মাউন্টব্যাটেন পত্নীর জওহরলালকে লেখা অনেক প্রেমপত্র আবিষ্কৃত হয়।

ভারত বিভাগের ব্যাপারে মাউন্টব্যাটেন ও র‍্যাডক্লিপের বিশ্বাসঘাতকতা

মাউন্টব্যাটেন ও সিরিল র‍্যাডক্লিপের এরূপ বিশ্বাসঘাতকতা ও অন্যায়ের প্রতিবাদে জিন্নাহর সহচররা যখন দারুণ ক্রুদ্ধ হয়ে এরূপ বিভাগ গ্রহণে অস্বীকৃতি জানাল তখনও কিন্তু জিন্নাহ কঠোর সাংবিধানিক মনোভাব প্রকাশ করলেন। তিনি সিরিল র‍্যাডক্লিপকে বাউন্ডারী কমিশনের চেয়ারম্যান হিসাবে স্বীকার করে নিয়েছেন। অতএব একজন এডভোকেট হিসাবে তিনি জজের রায় মানতে বাধ্য। তাঁর অনুগামীরা তাঁকে যখন প্রতিবাদ করতে বললেন, তিনি বললেন, না, আমরা যখন তাঁকে মধ্যস্থতাকারী হিসাবে স্বীকার করে নিয়েছি, তাঁর সিদ্ধান্ত আমরা মানতে বাধ্য।

দেশ বিভাগের ব্যাপারে লর্ড মাউন্টব্যাটেন যে কংগ্রেসের প্রতি অত্যন্ত পক্ষপাতিত্বমূলক মনোভাব গ্রহণ করেছিলেন তার প্রমাণ পাওয়া যায় দেশ বিভাগের দু'মাস পরে দি স্টেটস ম্যান পত্রিকার সম্পাদক আয়ান স্টীপেনস এর লেখা থেকে। মাউন্ট ব্যাটেনের অতিথি হিসাবে খাওয়ার টেবিলে মাউন্ট ব্যাটেনের এক তরফা বক্তব্য শুনে তিনি আমর্যান্বিত হয়ে গিয়েছিলেন। মিঃ স্টীপেনস্ তার 'হর্ণড মুন' পুস্তকের ১০৯ পৃষ্ঠায় লিখেছেন, "লর্ড ও লেডী মাউন্ট ব্যাটেনের কথায় মনে হলো তারা পুরো মাত্রায় হিন্দুঘেষা হয়ে গেছেন। সেদিন রাত্রে গভর্ণমেন্ট হাউসের আবহাওয়া ছিল যেন যুদ্ধের মতো। পাকিস্তান, মুসলিম লীগ এবং মিঃ জিন্নাহ ছিল শত্রুপক্ষ"। এ সময়টা ছিল ১৯৪৭ সন যখন কাশ্মীরের মহারাজার ভারতে যোগদানের নাটক সমাপ্তির দিকে এগিয়ে যাচ্ছিল।

জিন্নাহ মাউন্ট ব্যাটেনের কংগ্রেস প্রীতি ও তাঁর পক্ষপাকিত্বমূলক মনোভাবের ব্যাপারটা প্রথম থেকেই আঁচ করতে পেরেছিলেন। তাই তিনি প্রথম থেকে কখনও কঠিন মনোভাব কখনও নমনীয় মনোভাব দেখিয়ে মুসলমানদের প্রতি কোন অন্যায় না করার জন্য ভাইসরয়কে অনুরোধ

www.amarboi.org

জানাচ্ছিলেন। আলোচনাকালীন একসময় তিনি মাউন্ট ব্যাটেনকে বলেছিলেন, "Frankly, your excellency, the Hindus are impossible. They always want seventeen annas for the rupee" (Hector Bolitho).

"সত্যি বলতে কি, ইউর এক্সিলেন্সি, হিন্দুদের সংগে কাজ করা অসম্ভব ব্যাপার। তারা সব সময় এক টাকায় সতের আনা দাবী করে।"

অখন্ড বাংলার জন্য সোহরাওয়ার্দী, শরৎ বসুর প্রচেষ্টা

বঙ্গ ও আসাম বিভাজন যখন অনিবার্য বলে জিন্নাহ্ বুঝলেন তখন পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের মধ্যে আটশত মাইল লম্বা তিনি একটি সংযোগস্থল বা কড়িডোর দাবী করলেন, কিন্তু এদাবী মাউন্ট ব্যাটেন প্রত্যাখান করলেন।

পাকিস্তান আন্দোলনের প্রথমাবধি বাংলাদেশে মুসলমান নেতৃবৃন্দ স্থির নিশ্চিত ছিলেন যে, সম্পূর্ণ বঙ্গই পাকিস্তানের অর্ন্তভূক্ত হবে। কিন্তু পরবর্তীতে বাংলা যখন ভাগ হওয়ার উপক্রম হলো তখন অনেক হিন্দু ও মুসলিম নেতা বাংলাকে অখন্ড রাখবার প্রয়াস পেলেন। হিন্দু নেতাদের মধ্যে শরৎচন্দ্র বসু ও কিরণ শংকর রায় এবং মুসলিম লীগ নেতা সোহরাওয়ার্দী ও আবুল হাশেমের নেতৃত্বে অখন্ড বাংলার এক আন্দোলন গড়ে উঠল। সোহরাওয়ার্দী ও আবুল হাসেম সাহেব জিন্নাহও গান্ধীর সংগে আলাপ করে অখন্ড বাংলার পক্ষে সমর্থন আদায় করার চেষ্টা করলেন। জিন্নাহ্ সাহেব সম্মতি দিলেন। ঐ সময় জিন্নাহ্ বলেছিলেন যে পাকিস্তানে যোগ না দিয়ে বাংলা যদি অবিভক্ত থাকে তবে তিনি খুশি হবেন। কারণ কোলকাতা ছাড়া বঙ্গের সার্থকতা কি? বরং তারা ঐক্যবদ্ধ ও স্বাধীন হয়েই থাকুক। আমার দৃঢ় বিশ্বাস তারা আমাদের সঙ্গে বন্ধুভাবাপন্ন হয়ে থাকবেন" "Transfer of Power" দশম খন্ড পৃষ্ঠা ৪৬২। সংবাদ পত্রের বিবরণ থেকেও জানা যায় যে, এমনকি ১৯৪৭ সালের মে মাসেও পুরা পাঞ্জাবসহ সমগ্র পশ্চিম পাকিস্তান পেলে জিন্নাহ্ বঙ্গের উপর তার দাবী ছেড়ে দিতে প্রস্তুত ছিলেন (দ্রঃ প্যারিলাল সমগ্রন্থ পৃষ্ঠা ১৭৮)।

কিন্তু জওহরলাল ও প্যাটেল কিছুতেই সম্মত হলেন না। যার ফলে গান্ধী ও সমর্থন দিতে সাহস করলেন না। সোহরওয়ার্দী ও শরৎ বসুর নেতৃত্বে অখন্ড বাংলারদাবী বেশ জোরদার হয়ে উঠেছিল। সোহরাওয়ার্দী হাশিম সাহেবকে

www.amarboi.org

সংগে নিয়ে শরৎ বসু ও কিরণ শংকর রায়ের সংগে ১৯৪৭-এর জানুয়ারীতে অনেকগুলি বৈঠকে মিলিত হয়ে সার্বভৌম বঙ্গের প্রস্তাবের খসড়া রচনাকরেন। এর মূল কথা হল বঙ্গের বিভাজন নয়, এক স্বতন্ত্র সার্বভৌম রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠা। কিন্তু হিন্দু মহাসভার নেতা ডঃ শ্যামা প্রসাদ মুখার্জী এর বিরুদ্ধে ছিলেন। তিনি প্রথম থেকেই বাংলার হিন্দু সংখ্যাগরিষ্ঠ এলাকাগুলিকে বিচ্ছিন্ন করে ভারতীয় ইউনিয়নের সংগে যুক্ত করে দেওয়ার জন্য জোর দাবী জানালেন। ক্রমশঃ হিন্দু মালিকানাধীন সংবাদপত্রগুলি ও কংগ্রেসের একাংশ হিন্দু মহাসভার দাবীকে সমর্থন জানাতে লাগল।

মুসলিম লীগ নেতাদের মধ্যে মাওলানা আকরম খাঁ ও খাজা নাজিম উদ্দিন অখন্ড বাংলার আন্দোলন সমর্থন করলেও সোহরাওয়ার্দী-বোস পরিকল্পনার সংগে পুরাপুটি একমত হতে পারছিলেন না। তাঁদের ইচ্ছা ছিল অখন্ড বাংলা যেন ভবিষ্যতে পাকিস্তানে যোগ দেয়। যা হোক সার্বভৌম অখন্ড বাংলার পক্ষে জিন্নাহর সমর্থন পাওয়া গেলেও কংগ্রেস সমর্থনের অভাবে শেষ পর্যন্ত অখন্ড বাংলার সকল প্রচেষ্টা, সকল স্বপ্ন ধূলিসাৎ হয়ে গেল।

এখানে অবশ্য উল্লেখ করা যেতে পারে যে, এ সময় যদি সুভাষ বোস বা সি, আর দাস জীবিত থাকতেন তা'হলে হিন্দু মহাসভার পক্ষে বাংলা ভাগ করার পক্ষে জনমত সৃষ্টি করা মোটেই সম্ভব হত না। এই দু'নেতাই হিন্দু মুসলমানের মধ্যেকার রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামাজিক সমস্যাগুলির প্রকৃত রূপ অনুধাবন করতে পেরেছিলেন এবং তার বাস্তব সম্মত সমাধান করতেও তারা দৃঢ় প্রতিজ্ঞ ছিলেন। মুসলমানদের ন্যায্য দাবী দাওয়া স্বীকার করে নিয়ে এক অখন্ড বাঙালী জাতি ও স্বাধীন বাংলা রাষ্ট্রের পরিকল্পনা তাদের ছিল। দুর্ভাগ্যক্রমে সি, আর, দাস ১৯২৪ সনে অকালে মৃত্যুবরণ করেছিলেন এবং সুভাষ বোস ১৯৪২ সনে দেশ ত্যাগ করে জাপানের সহায়তায় আজাদহিন্দ ফৌজ গঠন করে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে জাপানের পরাজয়ের পর বিমান দুর্ঘটনায় নিহত হয়েছিলেন। হিন্দু-মুসলিম সমস্যা সমাধানের জন্য সুভাষ বোসের যে কি ঐকান্তিক আগ্রহ ছিল তা নিম্নোক্ত ঘটনা থেকে প্রমাণ হয়।

১৯৪২ সনে তিনি কোলকাতা মুসলিম লীগ ও কোলকাতা কংগ্রেসের মধ্যে এক চুক্তি করেন। সেই চুক্তির ভিত্তিতে সুভাষ বাবু কোলকাতা কর্পোরেশনের সাধারণ নির্বাচন করেন। প্রায় সবগুলি আসনই তারা দখল

www.amarboi.org

করেন। এই দু'দলের মৈত্রী ভোটারদের মধ্যে বিপুল উৎসাহ উদ্দীপনা সৃষ্টি করে। নির্বাচনে জয়ের ফলে মুসলিম লীগ নেতা আবদুর রহমান সিদ্দিকী মেয়র হন। স্বয়ং সুভাষ বাবু তাঁর নাম প্রস্তাব করেন। মেয়র ছাড়া ৫ জন অল্ডারম্যানের মধ্যে দু'জনই হল মুসলিম লীগের। এ ছাড়াও শর্ত হল পর্যায়ক্রমে ৩ বছরে মুসলিম মেয়র হবেন, মুসলিম লীগের জন্য এটা সুস্পষ্ট বিজয়।

সুভাষ বাবু মনে প্রাণে বুঝেছিলেন যে, হিন্দু-মুসলিম ঐক্য ছাড়া ভারতের মুক্তি সম্ভব নয়। মুসলিম লীগ মুসলমানদের মন জয় করেছে। সর্বভারতীয় ক্ষেত্রে মুসলমানদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা স্থাপন ও তাদের একজন হওয়ার উপায় বের করার জন্য তিনি তদানীন্তন কৃষক প্রজা পার্টির জাতীয়তাবাদী নেতা আবুল মনসুর আহম্মদের সঙ্গে আলাপ করেন। আবুল মনসুর সাহেব তাঁকে জিন্নাহ্ সাহেবের সঙ্গে আলাপ করার পরামর্শ দেন।

আবুল মনসুর আহম্মদের কাছ থেকে পাকিস্তান প্রস্তাবের সত্যিকার ব্যাখ্যা শুনে সুভাষ বসু বলেন, "আপনার ব্যাখ্যা যদি ঠিক হয়, তবে তার সবটুকু আমি মেনে নিলাম। এমনকি আমি আরও বেশী যেতে রাজি। যদি পাঁচটা মুসলিম প্রদেশের মেজরিটি আলাদা ইউনিয়ন করতে চায়, তবে তাতে আমি রাজি আছি, এমনকি একটা প্রদেশও যদি সিসিড করতে চায়, আমি তাতেও রাজি" (রাজনীতির পঞ্চাশ বছর, পৃষ্ঠা-১৮০)।

অতঃপর আবুল মনসুর আহম্মদের পরামর্শে জিন্নাহর সঙ্গে মিলিত হওয়ার জন্য সময় প্রার্থনা করে তিনি আব্দুর রহমান সিদ্দিকীর মারফত বোম্বেতে পত্র পাঠান। সপ্তাহ্ দু'য়েক পরে জিন্নাহর কাছ থেকে চিঠি আসলে তিনি বোম্বেতে গিয়ে কয়েকদিন জিন্নাহর সঙ্গে আলাপ করেন। প্রতিদিন দু'তিন ঘন্টা ধরে আলাপ হয়। এক রাতে সুভাষ বাবু জিন্নাহ্ সাহেবের বাড়ীতে ডিনারও খান। ইতিমধ্যে সুভাষ বাবু কয়েকবার সরদার প্যাটেল ও ভুলাভাই দেশাই এর সঙ্গেও আলাপ করেন।

যাহোক জিন্নাহ-সুভাষ আলোচনা শেষ পর্যন্ত তেমন ফলপ্রসূ হয়নি। সুভাষ বাবু স্বীকার করেছিলেন যে, মনসুর সাহেবের দেওয়া পাকিস্তানের ব্যাখ্যা আর জিন্নাহর ব্যাখ্যা একই ছিল। জিন্নাহ্ জানান যে, সুভাষ বাবুর ফরোয়ার্ড ব্লকের সঙ্গে আপোষ করে কোন কাজ হবে না। সমস্যাটা শুধু বাংলার নয়।

www.amarboi.org

সমস্যাটা সর্ব ভারতীয়, তাই তিনি কংগ্রেসের সঙ্গে আপোষ চান। এর জন্য জিন্নাহ সুভাষ বাবুকে কংগ্রেসে ফিরে গিয়ে জওহরলাল নেহেরুর সাথে হাত মিলিয়ে কংগ্রেস দখল করে জিন্নাহকে প্রস্তাব দেওয়ার জন্য পরামর্শ দেন।

যাহোক বঙ্গ বিভাগ যখন অনিবার্য হলো তখন শেষের দিকে শরৎ বোস প্যাটেলকে অনুরোধ জানালেন কোলকাতাকে যেন ফ্রি সিটি বা উম্মুক্ত শহর হিসাবে ছয় মাসের জন্য রাখার অনুমতি দেওয়া হয়। এর উত্তরে প্যাটেল জানালেন, "ছ' মাস ত দূরের কথা ছয় দিনের জন্যও নয়। পূর্ব বাংলা অর্থনৈতিক দিক দিয়ে কোন ভাবেই অস্তিত্ব রক্ষা করতে সমর্থ হবে না। আজ হোক কাল হোক আমাদের সংগে তাদের মিলতেই হবে-" (দি গ্রেট ডিভাইড এইচ. ডি. হডসন্)।

প্যাটেলের উপরোক্ত বক্তব্য থেকে স্পষ্ট ধারণা করা যায় যে, তারা শুধু পূর্ব বঙ্গ নয় পশ্চিম পাকিস্তানও অর্থনৈতিক দিক থেকে টিকে থাকতে পারবেনা, এটা তাদের বদ্ধমূল ধারণা ছিল এবং এ কারণেই তারা শেষ পর্যন্ত ভারত বিভাজনে সম্মত হয়েছিল। যেহেতু পূর্ব বঙ্গে তখন পর্যন্ত কোনরূপ খনিজ সম্পদের অস্তিত্ব জানা ছিল না এবং পশ্চিম পাকিস্তানের প্রদেশ গুলিতেও লোহা, কয়লা, প্রভৃতি অত্যন্ত প্রয়োজনীয় দ্রব্যগুলির কোন খনির অস্তিত্ব ছিল না তাই অর্থনৈতিক দিক থেকে এ অঞ্চলগুলি নিজের পায়ে কোন দিনই দাঁড়াতে পারবে না এবং কয়েক মাসের মধ্যেই ভারতীয় ইউনিয়নের সংগে যোগ দেবার আবেদন জানাবে এ সম্পর্কে কংগ্রেস নেতৃবৃন্দ প্রায় সুনিশ্চিত ছিল। কিন্তু কংগ্রেস নেতাদের সম্পূর্ণ হতাশ করে পরবর্তীতে বাংলাদেশে অত্যন্ত মূল্যবান গ্যাসের খনি আবিস্কৃত হল এবং পশ্চিম পাকিস্তানেও গ্যাস ও স্বল্প পরিমাণ হলেও তৈল খনি আবিস্কৃত হল। ফলে অর্থনৈতিক দিক থেকে পাকিস্তান ভেঙ্গে পড়ার কোন লক্ষণই দেখা গেল না।

পাকিস্তানের স্থায়ীত্ব সম্বন্ধে কংগ্রেসের সন্দেহ

পাকিস্তানের স্থায়ীত্ব সম্বন্ধে কংগ্রেস নেতৃবৃন্দ ও মাউন্টব্যাটেনের যে গভীর সন্দেহ ছিল বৃটিশ সরকারকে মাউন্টব্যাটেন কর্তৃক ১৯শে মে, ১৯৪৭ সনে লেখা চিঠি থেকে পরিস্কার প্রমাণ হয়। এইচ, এম. সিরভাই তাঁর 'পার্টিশন অব ইন্ডিয়া' বইতে লিখেছেনঃ On 19 May 1947, Mountbatten reported to the British Cabinet that It had become clear that the Muslim League would resort to arms if Pakistan in

www.amarboi.org

some form was not conceded. In the face of this threat, the congress leaders had modified their former attitude; indeed they were now inclined to feel that it would be to their advantage to be relived of responsibility for the Provinces that would form Pakistan, while at the same time they were confident that those Provinces would ultimately have to seek reunion with the remainder of India" Jinna left India for Pakistan on 7 August 1947, with an appeal to both Hindus and muslims to "bury the past" and wished India success and prosperity. The next day Patel said in Delhi " The Poison had been removed from the body of India. We are now one and indivisible. You can not divide the sea or the waters of the river. As for the Muslims they have their roots, their sacred places and their centres here. I do not know what they can possibly do in Pakistan. It will not be long before they return to us" (page 134).

এটা পরিস্কার হয়ে গেল যে, মুসলিম লীগকে যদি কোন না কোন ধরনে পাকিস্তান দেওয়া না হয় তবে তারা অস্ত্র হাতে তুলে নিবে। এরূপ হুমকির পরিপ্রেক্ষিতে কংগ্রেস নেতৃবৃন্দ তাদের পূর্বেকার মনোভাব খানিকটা পরিবর্তন করল। এখন তারা ভাবতে আরম্ভ করল, যে সমস্ত মুসলিম প্রদেশ নিয়ে পাকিস্তান হবে সে সমস্ত প্রদেশের দায়িত্ব গ্রহণ থেকে মুক্তি পেলে তাদের পক্ষে সুবিধাই হবে। একই সময় তারা স্থির নিশ্চিত ছিল যে, প্রদেশগুলি শেষ পর্যন্ত ভারত ইউনিয়নের সংগে পুনর্মিলনের জন্য প্রার্থনা জানাবে। জিন্নাহ্ ৭ই আগষ্ট হিন্দু-মুসলমান উভয়ের কাছে অতীতকে ভুলে যাবার জন্য এবং ভারতের সাফল্য ও উন্নতি কামনা করে আবেদন জানিয়ে পাকিস্তানের উদ্দেশ্যে ভারত ত্যাগ করলেন। পরদিনই প্যাটেল দিল্লিতে বললেন, "ভারতের দেহ্ থেকে বিষাক্ত ক্ষতটি বের করে ফেলা হয়েছে। আমরা এখন এক ও অবিভাজ্য। সাগর অথবা নদীর জলকে ভাগ করা যায় না। মুসলমানদের শিকড় তাদের তীর্থক্ষেত্র এবং তাদের কেন্দ্রগুলি রয়েছে ভারতে। আমি জানি না এগুলি বাদ দিয়ে পাকিস্তানে তারা কি করে থাকবে। আমাদের সঙ্গে মিলিত হতে তারা নিশ্চয় বিলম্ব করবে না (পৃষ্ঠা ১৩৪)।

www.amarboi.org

প্যাটেলের পূর্বোক্ত বক্তব্য থেকে পাকিস্তান ও মুসলমানদের প্রতি কংগ্রেস নেতৃবৃন্দ কিরূপ বিদ্বেষপূর্ণ মনোভাব পোষণ করত তার পরিচয় পাওয়া যায়। জিন্নাহ যেখানে ভারত ত্যাগের পূর্বে হিন্দু মুসলমানকে অতীতের সমস্ত তিক্ততা ভুলে যাওয়ার জন্য অনুরোধ জানিয়েছেন, সেখানে প্যাটেল পাকিস্তান সৃষ্টিকে বিষাক্ত ক্ষত হিসাবে অবহিত করেছেন। এ মনোভাবের জন্যই হিন্দু-মুসলমান মিলনের জিন্নাহর সুদীর্ঘ দিনের আপ্রাণ চেষ্টা সফল হতে পারেনি।

৩রা জুন, ১৯৪৭ সালে বিকালে ভাইসরয় অল ইন্ডিয়া রেডিও'র মারফত তার প্লান ধীরে ধীরে ঘোষণা করলেন। এরপর পণ্ডিত নেহেরু রেডিওতে তাঁর ভাষণ দিলেন ইংরেজী ও হিন্দীতে। তিনি বললেন, "আমরা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মানুষেরা অনেক মহৎ কাজ সমাধা করতে যাচ্ছি। তবে যেহেতু কাজটি মহৎ তাই সেই মহত্বের কিছু অংশ আমাদের মত ক্ষুদ্র মানুষের উপরও বর্তায়।" এরপর কায়েদে আযম অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত, গভীর সমস্যাবলী এবং জটিল রাজনৈতিক সমস্যার উপরে বক্তব্য রাখলেন। তিনি ইংরেজীতে বললেন এবং সেটা উর্দুতে অনুবাদ হয়ে প্রচারিত হল যাতে তাঁর লোকেরা, যাদেরকে তিনি একটি জাতি হিসাবে প্রতিষ্ঠা করেছেন তাঁর কথা জানতে পারে। জিন্নাহ তাঁর শ্রোতাদেরকে অনুরোধ জানালেন তারা যেন তাদের সমস্ত শক্তি নিয়োগ করে যাতে সর্বক্ষণ ক্ষমতা হস্তান্তর শান্তিপূর্ন ও শৃঙ্খলার সংগে সম্পন্ন হয়। তিনি আরও বললেন, যে কঠিন ও দায়িত্বপূর্ণ কাজ আমাদের সমাধা করতে হয়েছে পৃথিবীর ইতিহাসে তার তুলনা নাই। এরপর তিনি বিশেষ আন্তরিকতার সংগে এবং একই সময় অনাগত দিনগুলির ব্যাপারে কূটনৈতিক আশা প্রকাশ করে মাউন্ট ব্যাটেনের সম্বন্ধে কিছুটা প্রশংসা কীর্তন করলেন। তিনি বললেন, " I must say that I feel that the Viceroy has battled against various forces very bravely,and the impression that he has left on may mind is that he was actuated by a high sense of fairness and impartiality; and it is up to us now to make his task less difficult and help him as far as lies in our power .. .."

আমাকে বলতেই হবে এবং আমি অনুভব করি যে, ভাইসরয়কে বিভিন্ন ধরনের শক্তির সংগে অত্যন্ত সাহসের সংগে লড়াই করতে হয়েছে এবং তিনি আমার মনে যে ধারণা সৃষ্টি করেছেন তাকে মনে হয় তিনি অত্যন্ত উচ্চ স্তরের ন্যায়পরায়ণ ও পক্ষপাতহীন মনোভাবের দ্বারা উদ্বুদ্ধ হয়েছেন। এখন আমাদেরই

www.amarboi.org

কর্তব্য আমাদের যতটুকু ক্ষমতা আছে তৎদ্বারা তাঁর কাজকে যতদূর সম্ভব সহজ করা এবং তাঁকে সাহায্য করা"

জিন্নাহ্ মাউন্টব্যাটেনের প্রশংসা কীর্তন করলেও ভাইসরয়-এর নিরপেক্ষতা সম্বন্ধে তাঁর মনে প্রথমাবধি সন্দেহ ছিল। ভাইসরয়-যে গোপনে নেহেরু ও কৃষ্ণমেননের সঙ্গে ভারত বিভক্তি সম্বন্ধে আলোচনা করতেন এবং বিলাতে পাঠাবার পূর্বে সব ডকুমেন্ট নেহেরুকে দেখাতেন এটা জিন্নাহ্ জানতেন না। ভাইসরয়ের পক্ষে এটা একটা বিশ্বাসঘাতকতা ছাড়া আর কিছু ছিলনা। মাউন্টব্যাটেন যখন বুঝতে পেরেছিলেন যে, কেবিনেট মিশন প্লানকে পুনরুজ্জীবীত করার আর কোন সম্ভাবনা নেই, তখন থেকেই ভাইসরয় হিসাবে নিরপেক্ষতা বর্জন করে তিনি কংগ্রেসের পক্ষে বিশেষভাবে পক্ষপাতিত্ব করতে আরম্ভ করেছিলেন। এ সম্বন্ধে এইচ, এম, সিরভাই তাঁর 'পার্টিশন অব ইন্ডিয়া' বইতে ১২৪ পৃষ্ঠায় লিখেছেনঃ

Once Mountbatten decided that the Cabinet Mission Plan was dead, it became necessary to plan for the partition of India. The official documents show that in framing his plan he gave up all pretence of treating Congress and the Muslim League impartially. He showed documents to Nehru in "an act of friendship," accepted Nehru's suggestions and embodied them in the documents without showing those documents and the suggestions to Jinnah, and obtaining Jinnah's reactions.

It does not help to refer to Jinnah's statements of his belief in Mountbatten's impartiality, since Jinnah could not have known what was going on in private behind the scenes as set out above. It is clear that Mountbatten departed widely from the duty of the Viceroy to hold the scales even between the two great communities of India.

মাউন্টব্যাটেন যখন বুঝলেন ক্যাবিনেট মিশন প্লান নিঃশেষ হয়ে গেছে তখন ভারত বিভাগের প্লান তৈরী করা প্রয়োজন হয়ে পড়ল। সরকারী নথি পত্রে দেখা যায় প্লান প্রস্তুত করার ব্যাপারে তিনি কংগ্রেস এবং মুসলিম লীগের সঙ্গে ব্যবহারে নিরপেক্ষতার ভণিতা সম্পূর্ণ পরিত্যাগ করলেন। তিনি নেহেরুর সঙ্গে বন্ধুত্বের খাতিরে সকল দলিলাদি নেহরুকে দেখাতে লাগলেন এবং

www.amarboi.org

নেহরুর সকল পরামর্শ গ্রহণ করতে লাগলেন এবং জিন্নাহকে ঐ সমস্ত দলিলপত্র না দেখিয়ে বা তাঁর প্রতিক্রিয়া জানার প্রয়োজন বোধ না করে নেহরুর প্রস্তাব ও অভিমতগুলি দলিলে সন্নিবেশিত করতে লাগলেন।

জিন্নাহ্ যে মাউন্টব্যাটেনের নিরপক্ষেতা সম্বন্ধে তাঁর বিশ্বাসের কথা বলেছিলেন তাঁর কারণ গোপনে পর্দার অন্তরালে কি খেলা চলছিল সেটা সম্বন্ধে তিনি কিছুই জানতেন না। এতে পরিষ্কার প্রমাণিত হয় যে, মাউন্টব্যাটেন ভাইসরয় হিসাবে ভারতে দু'টি প্রধান সম্প্রদায়ের সঙ্গে যথাযথভাবে ন্যায়দন্ড রক্ষার ব্যাপারে তাঁর কর্তব্য থেকে তিনি অনেকখানি সরে গিয়েছিলেন।

জিন্নাহ্ তাঁর ভাষণ অত্যন্ত সাবধানতার সাথে লিখেছিলেন। কিন্তু এই ভাষণ পড়তে গিয়ে উৎসাহ্ বশতঃ তিনি শেষদিকে একটু উচ্চ কণ্ঠে পাকিস্তান জিন্দাবাদ বলে ফেললেন; যদিও তাঁর লিখিত ভাষণে সেটা ছিল না।

১০ই জুন ও ১৩ই জুন যথাক্রমে মুসলিম লীগ ও কংগ্রেস ভাইসরয়-এর প্লান অনুমোদন দান করলেন। ২০শে জুলাইয়ের মধ্যে প্লান এর শর্ত অনুযায়ী বৃটিশ ভারতের বিভিন্ন মুসলিম অঞ্চলে গণভোটের ফলাফল জানা গেল এবং সর্বত্র পাকিস্তান প্লান অনুমোদিত হল। বৃটিশ ভারতের ম্যাপ পরিবর্তিত হয়ে গেল। পূর্ব এবং পশ্চিম প্রান্তে দুই মুসলিম এলাকার মধ্যে বৃহৎ দ্বৈতাকৃতি বৃহৎ ভারত আত্মপ্রকাশ করল। দুই মুসলিম রাষ্ট্র যাদের ভাষা সম্পূর্ণ ভিন্ন-একটির দৃষ্টি রয়েছে পূর্বদিকে অন্যটির পশ্চিম দিকে এবং দু'টির মধ্যে যাতায়াতের কোন করিডোর নেই এরূপ দু'টি ভূ-খন্ডের সমন্বয়ে 'পাকিস্তান' নামে একটি রাষ্ট্র গঠিত হল। দু'টি রাষ্ট্রের মধ্যে ঐক্যের একমাত্র সূত্র হল অখন্ড ভারতে হিন্দু আধিপত্যের ভীতি বিশ্বাস।

বৃটিশ ভারতের স্থল, নৌ ও বিমান বাহিনীর যাবতীয় সম্পদ ভাগ করতে হবে। বৃটিশ অফিসার যারা বহুদিন যাবৎ ভারতে রয়েছে এবং এ সমস্ত বাহিনীতে অফিসার হিসেবে কাজ করে এসেছে এবং যারা ভারতীয় বাহিনীতে মুসলিম, শিখ ও হিন্দু সৈন্যদের যোগ্যতা নিয়ে গর্ব করত এবং ভারতীয় সশস্ত্র বাহিনীকে পৃথিবীর একটি শ্রেষ্ঠ বাহিনী হিসাবে অভিহিত করে গর্ববোধ করত তারা এর বিভাজনে আন্তরিকভাবে ব্যথিত হল।

লর্ড ইজমে এরূপ চমৎকার একটি সৈন্যবাহিনীকে বিভক্ত করতে আপত্তি জানিয়ে জিন্নাহকে এটি ভাগ করা থেকে নিভৃত থাকতে অনুরোধ জানালেন।

www.amarboi.org

জিন্নাহ দৃঢ়ভাবে বললেন, ভাগ করা ছাড়া গত্যন্তর নেই। তিনি বললেন, বিরুদ্ধ মনোভাবের লোকদের মনস্তত্ত্ব আপনি জানেন না।

অতএব, সৈন্যবাহিনী তাদের কামান, বন্দুক, গোলাবারুদসহ ভাগ হল এবং তারা একে অন্যের শত্রু হয়ে গেল। খেলার টেবিলে যেভাবে তাস ভাগ হয় তেমনিভাবে বিমান, রাজকীয় নৌবাহিনীর জাহাজ ভাগ করা হল। করাচীতে যে সমস্ত জাহাজ এসে পৌঁছাল সেগুলিতে চলবার মত তৈলও ছিল না। সেগুলি এসে করাচী ডকে অরক্ষণীয় ও সহায় সম্বলহীন অবস্থায় পড়ে রইল। দেশ বিভাগের সময় রাজকীয় নৌবাহিনীতে পাকিস্তানের ভাগে পাওয়া শত শত টন তেলের কিছুই জাহাজগুলোতে দেওয়া হল না। শুধু কোনভাবে করাচী পর্যন্ত পৌঁছার জন্য প্রয়োজনীয় তেল দেওয়া হল। যুদ্ধজাহাজগুলোতে ভাগে পাওয়া গোলা বারুদের কিছুই দেওয়া হল না।

ডেস্ক ও টাইপ রাইটার এর মত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জিনিসও ভাগ করা হল এবং এই খেলায় "একটি তোমার ও দু'টি আমার" মুসলমানরা খুব ক্ষতিগ্রস্থ হল। ভারতে ছোট ছোট অফিসার, ম্যানেজার এবং কেরানী সবাই প্রায় ছিল হিন্দু, যাদের ব্যবসা-বাণিজ্য সম্বন্ধে ছিল প্রচুর দক্ষতা ও আধিপত্য। মুসলমানদের সাধারণতঃ এ সব ব্যাপারে বিশেষ জ্ঞান ছিল না। তাই পাকিস্তানের নূতন শহরগুলিতে তারা যখন তাদের ভাগে পাওয়া স্বাধীনতার উপহারগুলি খুলল তখন তারা অত্যন্ত দুঃখের সঙ্গে দেখতে পেল একটি নূতন সরকারকে চালু করার মত তাদেরকে প্রায় বিশেষ কিছুই দেওয়া হয়নি। সমস্ত ব্যাপারেই তাদেরকে ন্যায্য হিস্যা থেকে বঞ্চিত করা হয়েছে। জাহাজ, বিমানের চাইতে মারাত্মক ছিল হাসপাতালে ব্যবহৃত যন্ত্রপাতির ব্যাপারে বঞ্চনা। করাচীর বিভিন্ন হাসপাতালে বিব্রত বিপর্যস্ত ডাক্তাররা দেখতে পেল সার্জিকেল যন্ত্রপাতির বহু গুরুত্বপূর্ণ অংশ বের করে নেওয়া হয়েছে। হাজার হাজার পঙ্গু ও মৃত প্রায় উদ্বাস্তুরা যখন করাচীর হাসপাতালে এসে উপস্থিত হচ্ছিল তখন টেকনিশিয়ানরা জ্ঞান ও কৌশলের চাইতে শুধু আগ্রহ, উৎসাহ ও ঐকান্তিক নিষ্ঠা ও দেশপ্রেমের অনুভূতিতে উজ্জীবিত হয়ে হাসপাতালগুলিকে চালু রাখতে সমর্থ হয়েছিল।

বাংলা বিভাগকালে সম্পদ বন্টনে বঞ্চনা

শুধু পশ্চিম প্রান্তে নয়, পূর্ব প্রান্তেও একই ব্যাপার ঘটেছিল। যুক্ত বাংলার সম্পদ ভাগের সময় পূর্ব বাংলার যা পাওনা ছিল তাদেরকে তা দেওয়া হয়নি।

www.amarboi.org

কোলকাতায় অবস্থিত যুক্ত বাংলার অফিসগুলির টেবিল, চেয়ার, টাইপ রাইটার ও আরও বিবিধ সম্পদের অর্ধেক তো দূরের কথা এক চতুর্থাংশও শেষ পর্যন্ত পাওয়া যায়নি। রেলওয়ের ইঞ্জিন, কম্পার্টমেন্ট প্রভৃতি বহুবিধ সম্পদের ন্যায্য অংশের বিশেষ কিছু আমাদের দেওয়া হয়নি। পূর্ব বাংলার রাজধানী ঢাকায় এসে পাকিস্তানের পক্ষে 'অপশন' দেওয়া সরকারী অফিসার ও কেরাণীবৃন্দ প্রায় খড়কুটা থেকে নতুন সরকারকে চালু করার মাল মসলা যোগাড় করেছিলেন। ঢাকায় তখন আবাসিক গৃহের দারুণ সংকট। হিন্দুদের পরিত্যক্ত বাড়ীগুলোতে অফিসারদের থাকতে দেওয়া হয়েছিল। এক একটি দালানে চার পাঁচ জন অফিসারকে থাকতে দেওয়া হয়েছিল। খুব উচ্চ পদস্থ অফিসার ছাড়া দু'তিন কামরা নিয়ে পরিবারসহ থাকার কারোরই প্রায় সুযোগ হয়নি। পিয়ন চাপরাশি, লোয়ার ও আপার ডিভিশন ক্লার্কদের জন্য পলাশী, নীলক্ষেত অঞ্চলে বহু বাঁশের তৈরী ঘর নির্মাণ করা হয়েছিল। সেগুলিতে এক একটি বড় বড় কামরায় বিশ পঁচিশ জন করে লোক থাকার ব্যবস্থা করা হয়। দুপুরে এবং রাত্রে রং উঠা এনামেলের বাসনে তাদেরকে তরকারি ও ডাল দিয়ে ভাত দেওয়া হত। বাঁশের ঝুড়িতে করে ভাত এনে থালায় বেড়ে দেওয়া হত এবং বালতিতে করে তরকারী ও ডাল এনে হাতায় করে প্লেটের মাঝে ফেলে দেওয়া হত। নতুন পাকিস্তান রাষ্ট্রকে গড়ে তোলার দৃঢ় সংকল্পে মন প্রাণ সমর্পিত এসব অফিসার কর্মচারীরা থাকা খাওয়ার কষ্টকে হাসিমুখে সহ্য করেছিলেন। কেউ বিন্দুমাত্র দুঃখ বা অসন্তোষ প্রকাশ করেনি। কত লোকের আত্মত্যাগে লক্ষ লক্ষ লোকের জীবনাহুতির বিনিময়ে অর্জিত পাকিস্তানে জিন্নাহর মৃত্যুর পরবর্তীকালে নেতাদের কার্যক্রম বিবেচনা করলে মন বিষাদে পরিপূর্ণ হয়ে যায়।

পূর্ব প্রান্তে আমরা সবচাইতে ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছিলাম কোলকাতার ক্ষতিপূরণ হিসাবে প্রাপ্য ত্রিশ কোটি টাকা হারিয়ে, হিসাবের কারচুপিতে আমাদেরকে কিভাবে ঠকানো হয়েছিল তা মরহুম আবুল মনসুর আহম্মদ সাহেবের 'রাজনীতির পঞ্চাশ বছর' বইয়ের ২০৭ পৃষ্ঠায় তিনি এভাবে বর্ণনা করেছেনঃ "নলিনীরঞ্জন সরকার হিসাব নিকাশ করিয়া দেখাইলেন যে, পূর্ব বাংলার পাওনা হইয়াছে মোট ৩ কোটি, আর পূর্ব বাংলার কাছে ভারত ও পশ্চিম বাংলার পাওনা হইয়াছে ৯ কোটি। পূর্ব বাংলা আগে পশ্চিম বাংলা ও ভারতের ৯ কোটি শোধ করিবে; তারপর তার পাওনা ৩ কোটি পাইবে, অর্থাৎ ওজেবাদ করিয়া শেষ পর্যন্ত পূর্ব বাংলার দেনা থাকিল ৬ কোটি, হায় কপাল; ৩৩ কোটি যোগের বদলে ৬ কোটি বিয়োগ; নলিনী বাবুর এই ঘোষণায় মিঃ হামিদুল হক

www.amarboi.org

চৌধুরী কেন মুর্চ্ছা গেলেন না, আমরাই বা বাঁচিয়া থাকিলাম কিরূপে আমি আজিও তা বুঝি নাই। বোধ হয় এই সান্তনায় যে শুধু রেডক্লিফ একা আমাদের ঠকাইতে পারেন নাই, আমরা সকলে মিলিয়াই আমাদের ঠকাইয়াছি। তার উপর সত্যযুগ কলিযুগ হইয়াছে। সত্যযুগে ছিলঃ শুভঙ্করের ফাঁকি, ৩৩ থনে ৩০০ গেলে ৩০ থাকে বাকি; আর কলিযুগে শুভঙ্করের ফাঁকি ৩৩ থনে শুন্য গেলে দেনা থাকে বাকি।"

মাউন্টব্যাটেনকে পাকিস্তানের গভর্ণর জেনারেল করতে জিন্নাহর অস্বীকৃতির প্রতিশোধ

পাকিস্তান ও হিন্দুস্থান দু'টি আলাদা স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্র গঠনে সিদ্ধান্ত পাকাপাকি হওয়ার পর স্থির হল দু'টি রাষ্ট্রই বৃটিশ কমনওয়েলথের মেম্বার থাকবে দু'টি স্বাধীন ডোমিনিয়ন হিসাবে। এখন প্রশ্ন দেখা দিল দুই ডোমিনিয়নে একজন কমন গভর্ণর জেনারেল থাকবে না দু'টি ডোমিনিয়নে দু'জন আলাদা গভর্নর জেনারেল হবে। কংগ্রেস মাউন্টব্যাটেনকে গভর্নর জেনারেল হিসাবে মনোনয়ন দিয়ে মতামত প্রকাশ করল। মাউন্টব্যাটেন পাকিস্তানের গভর্নর জেনারেল হলেও তাদের আপত্তি নেই। এ সম্পর্কে জিন্নাহর মতামত যখন চাওয়া হল তিনি পাকিস্তানের জন্য আলাদা গভর্নর জেনারেলের জন্য মত প্রকাশ করলেন। তিনি মাউন্টব্যাটেনকে উভয় রাষ্ট্রের মধ্যে সম্পদ ভাগাভাগির ব্যাপারে পরিদর্শক ও মধ্যস্থতাকারী হিসাবে বৃটিশ রাজের একজন প্রতিনিধি রূপে পেতে চাইলেন। কিন্তু মাউন্টব্যাটেন দু'টি রাষ্ট্রেরই গভর্ণর জেনারেল হওয়ার ইচ্ছা প্রকাশ করলেন। এ গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপারে জিন্নাহর সঙ্গে মাউন্টব্যাটেনের গভীর মতবিরোধ দেখা দিল। জিন্নাহ মাউন্টব্যাটেনকে জানালেন লীগ নেতৃবৃন্দ জিন্নাহকেই তাদের গভর্নর জেনারেল করার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। গর্ভণর জেনারেল নিযুক্তির ব্যাপারে মতভেদের ঘটনাটি এইচ, এম সিরভাই তাঁর 'পার্টিশন অব ইন্ডিয়া' বইতে ১৩০-১৩১ পৃষ্ঠায় এভাবে বর্ণনা করেছেনঃ "লীগ নেতৃবৃন্দ মাউন্টব্যাটেনের পাকিস্তান হিন্দুস্থান দুই রাষ্ট্রেরই গভর্নর জেনারেল হওয়ার সুস্পষ্ট ইচ্ছা প্রকাশের পরেও তাঁকে গভর্নর জেনারেল করতে অস্বীকার করে জিন্নাহকে গভর্নর জেনারেল করার সিদ্ধান্ত নেওয়ায় মাউন্টব্যাটেন ভীষণভাবে অপমানিত বোধ করলেন। তিনি উভয় রাষ্ট্রের গভর্ণর জেনারেল হয়ে যখন দিল্লীতে থাকবেন তখন জিন্নাহ করাচীতে অফিসিয়েটিং গভর্নর জেনারেল হিসাবে কাজ করবেন এভাবে জিন্নাহর সঙ্গে আপোযরফা

www.amarboi.org

করতে চাইলেন। জিন্নাহ্ এ ব্যবস্থায় রাজি হলেন না। এতে ক্ষুদ্ধ হয়ে মাউন্টব্যাটেন জিন্নাহকে বললেন, "আপনি জানেন কি এতে আপনার কি পরিমাণ ক্ষতি হবে?" জিন্নাহ দুঃখিতভাবে বললেন আমি জানি এতে আমি কয়েক কোটি টাকার সম্পত্তি হারাব। এ কথার উত্তরে মাউন্টব্যাটেন অত্যন্ত তিক্তস্বরে বললেন, "না, এতে আপনি আপনার সমস্ত সম্পদ এমনকি পাকিস্তানের ভবিষ্যৎও হারাতে পারেন।" অতঃপর মাউন্টব্যাটেন রাগ করে কামরা থেকে বেরিয়ে গেলেন।"

মাউন্টব্যাটেন সেদিন ক্রোধ প্রদর্শনের ভিতর দিয়ে জিন্নাহকে যে ভীতি প্রদর্শন করেছিলেন তা শুধু হুমকি ছিল না। পরবর্তীতে পাঞ্জাব, বাংলা ও আসামের বহু মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ এলাকা হিন্দুস্থানে দিয়ে জিন্নাহর প্রতি তাঁর ক্রোধের প্রতিশোধ নিয়েছিলেন। তখন থেকেই আমরা দেখতে পাই কাশ্মীর, কুঁচবিহার, ত্রিপুরা এবং আরও কয়েকটি মুসলিম অধ্যুষিত দেশীয় রাজ্যগুলিকে হিন্দুস্থানে যোগ দিতে প্ররোচিত বা বাধ্য করে তিনি প্রতিশোধ নিয়েছিলেন।

অনেক শাসনতান্ত্রিক অভিজ্ঞ ব্যক্তির মত অনুযায়ী উভয় ডোমিনিয়নের গভর্নর জেনারেল হওয়ার মাউন্টব্যাটেনের আকাঙ্খা যুক্তিযুক্ত ছিল না। প্রতিটি ডোমিনিয়নের গভর্নর জেনারেল তার মন্ত্রীবর্গের ইচ্ছা অনুযায়ী শাসনতান্ত্রিকভাবে কাজ করতে বাধ্য ছিল। এমতাবস্থায় দুই ডোমিনিয়নের স্বার্থে যখন বৈপরীত্ব বা সংঘর্ষ দেখা দিত তখন এবং গভর্নর জেনারেলকে যখন তাঁর মন্ত্রীবর্গের পরামর্শ অনুযায়ী কাজ করতে হত তখন এক গভর্নর জেনারেল হলে তিনি কার পরামর্শ গ্রহণ করতেন ? এ অবস্থায় অনিবার্যভাবে সংকট দেখা দিত। সুক্ষ্ম শাসনতান্ত্রিক জ্ঞান সম্পন্ন জিন্নাহর কাছে এ ব্যাপারটা স্পষ্ট ছিল বলে তিনি উভয় ডোমিনিয়নে একজনকে গভর্নর জেনারেল হওয়ার ব্যাপারে অস্বীকৃতি জানিয়েছিলেন।

কারও কারও মতে জিন্নাহ্ শেষ জীবনে ক্ষমতার স্বাদ উপলব্ধি করার জন্য পাকিস্তানের গভর্নর জেনারেল হওয়ার আকাঙ্খা প্রকাশ করেছিলেন। তাদের মতে মাউন্টব্যাটেনকে পাকিস্তানের গভর্নর জেনারেল করতে স্বীকৃত হলে আক্রোশ বশতঃ ভারত পাকিস্তানের সীমা নির্ধারণের ব্যাপারে মাউন্টব্যাটেন যে গুরুতর অন্যায় করেছিলেন এবং কাশ্মীরকে ভারতভূক্তির সুযোগ দিয়ে যে অন্যায় পক্ষপাতিত্ব করেছিলেন তা তিনি করতেন না। জিন্নাহ্ পাকিস্তানের

www.amarboi.org

গভর্নর জেনারেল হওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়ে বিরাট ভুল করেছিলেন এবং তাতে পাকিস্তান প্রভূত ক্ষতির শিকার হয়েছিল।

ব্যাপারটি গভীরভাবে তলিয়ে দেখলে মনে হয় জিন্নাহর সিদ্ধান্ত সঠিকই হয়েছিল। '৪৭ সনের জুন জুলাই থেকে মাউন্টব্যাটেনের আচরণে জিন্নাহ দারুণভাবে সন্দিহান হয়ে পড়েছিলেন। আগস্টে দেশ ভাগের অব্যবহিত পূর্বে জিন্নাহ বুঝতে পেরেছিলেন যে, মাউন্টব্যাটেন বাধ্য হয়ে দেশ বিভাগে রাজী হলেও অখন্ড ভারতের আদর্শের প্রতি তার সহানুভূতি ছিল পূর্ণমাত্রায়। এই অবস্থায় ভারত পাকিস্তান দুই অঞ্চলের গভর্নর জেনারেল হিসাবে সৈন্য বাহিনীর উপর তাঁর আধিপত্য থাকত পুরোপুরি। এই আধিপত্যের সুযোগ নিয়ে মাউন্টব্যাটেন যদি দুই ডোমিনিয়নকে এক করে ফেলার পরিকল্পনা নিতেন তবে মারাত্মক পরিস্থিতির সৃষ্টি হত। দেশ বিভক্তির পরে উভয় অঞ্চলেই প্রেসিডেন্টশিয়াল পদ্ধতির সরকার চালু হয়েছিল যেখানে প্রেসিডেন্ট প্রচুর ক্ষমতার অধিকারী ছিলেন। জওহরলালের প্রেমে মুগ্ধ এডুইনা মাউন্টব্যাটেনের প্রভাবে লর্ড মাউন্টব্যাটেন যেরূপ কংগ্রেস প্রীতি দেখাচ্ছিলেন তাতে পাকিস্তানের গভর্নর জেনারেল হিসাবে দুই রাষ্ট্রকে এক করে ফেলার কোন পরিকল্পনা নেওয়া তাঁর পক্ষে হয়ত অস্বাভাবিক ছিল না। এমতাবস্থায় মাউন্টব্যাটেন পাকিস্তানের বিলুপ্তি ঘটাতে চাইলে পাকিস্তান সরকার বৃটিশ সরকারের কাছে আবেদন করে কোন ফল পেত না।

উপরোক্ত অবস্থার প্রেক্ষিতে মনে হয় মাউন্টব্যাটেনকে গভর্নর জেনারেল না করলে ভূ-খন্ডের দিক দিয়া বেশ কিছুটা ক্ষতির আশংকা থাকলেও (মাউন্টব্যাটেনকে গভর্নর জেনারেল না করলে পাকিস্তানের যে ক্ষতি হবে বলে ভাইসরয়ের পূর্বাহ্নে ভীতি প্রদর্শন এখানে স্মরণযোগ্য) ভবিষ্যৎ বিপদের আশংকা বিবেচনা করে মাউন্টব্যাটেনকে পাকিস্তানের গভর্নর জেনারেল করার ঝুঁকি নিতে জিন্নাহ সম্মত হননি।

www.amarboi.org

গভর্ণর জেনারেল হিসাবে জিন্নাহর করাচী আগমন

৭ই আগস্ট জিন্নাহ তাঁর ভগ্নি ফাতেমাকে নিয়ে পাকিস্তানের গভর্ণর জেনারেল হওয়ার জন্য ভাইসরয়ের রূপালী ডাকোটাতে তাঁর নেভাল এডিসি লেফটেন্যান্ট এস, এম, আহসান ও এয়ার এডিসি ফ্লাইট লেফটেন্যান্ট আতা রাব্বানীসহ করাচী বিমান বন্দরের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হলেন।

এই করাচী হলো নতুন রাষ্ট্রের রাজধানী যেখানে জিন্নাহ সত্তর বৎসর আগে জন্মেছিলেন। করাচী পৌঁছুতে চার ঘন্টা সময় লাগল। এ সময় বাস্কেটে করে আনা প্রাতঃরাশ সেরে জিন্নাহ সংবাদ পত্রগুলি পড়তে আরম্ভ করলেন। তাঁর এডিসিদ্বয় পূর্বে তাদের নেতার কোন কার্য-কলাপ অবলোকনের সুযোগ ঘটেনি। তারা দেখল কায়েদে আযম একটি খবরের কাগজ তুলে পড়ার পর সেটি আবার নিখুঁতভাবে অপর পার্শ্বে রেখে দিচ্ছেন। নতুন রাষ্ট্র সৃষ্টির ব্যাপারে তাঁর কৃতিত্বের কাহিনী ও বিবরণে অধিকাংশ পত্রিকার পাতা ভর্তি ছিল কিন্তু পত্রিকাগুলো পড়তে পড়তে তাঁর মধ্যে কোন আবেগ বা উচ্ছ্বাসের কোন লক্ষণ তেমন দেখা যাচ্ছে না। মাঝে মাঝে তাঁর মুখ মন্ডলে আনন্দের খানিকটা আভাষ দেখা দিলেও তা ছিল খুবই পরিমিত।

সমগ্র যাত্রা পথে তিনি একবার মাত্র কথা বললেন। তার এডিসি রাব্বানীর দিকে কাঁধ ফিরিয়ে কয়েকটি পত্রিকা তার হাতে দিয়ে বললেন, তুমি কি এগুলি পড়ে দেখবে? সমগ্র পথে আর তিনি কোন বাক্যালাপ করেননি। আশ্চর্য মানুষ ছিলেন এই জিন্নাহ। বিনা সৈন্য বাহিনীর সহায়তায় বিশ্বের সর্ববৃহৎ মুসলিম রাষ্ট্রের অধিকারী হয়েও কোনরূপ উত্তেজনা ভাবাবেগ প্রদর্শন তিনি করলেন না। অন্য কোন লোক এ কৃতিত্বের অধিকারী হলে যেখানে উদ্বাহু হয়ে নৃত্য করত, আনন্দে আত্মহারা হয়ে অন্যের প্রশংসা শোনার জন্য অস্থির হয়ে উঠত সেখানে তিনি কোন প্রকার ভাবাবেগ প্রকাশ করলেন না। এতে প্রমাণ হয় নিজের আবেগ, উচ্ছ্বাস, মনোভাবকে নিজের মধ্যে ধরে রাখার মত কি অসীম, কত বড় সংযম শক্তি আল্লাহ তাঁকে দিয়েছিলেন। এখানেই ছিল তাঁর প্রধান শক্তির কেন্দ্র যা থেকে বিচ্ছুরিত শক্তি তাঁর অনুসারী, শত্রু-মিত্র সবাইকে সম্মোহিত করে রাখত।

কায়েদে আযমকে বহনকারী বিমানটি করাচীর সন্নিকটবর্তী হলো। বিমান থেকে নিচের দিকে তাকিয়ে জিন্নাহ দেখলেন যাদেরকে তিনি মুক্ত করেছেন

www.amarboi.org

সেসব লোক সাদা পোশাকে মরুভূমির প্রান্তে হাজারে হাজারে দাঁড়িয়ে রয়েছে- দূর হতে প্রতীয়মান হচ্ছিল যেন শুভ্র তূষার প্রান্তর। উদ্বাস্তুরা হাজারে হাজারে বিভিন্ন পথে শহরে ঢুকে পড়ছিল। তাদের গরু বা মহিষের গাড়ীতে করে যা কিছু সামান্য সম্পদ তারা পালিয়ে আসার সময় সঙ্গে নিয়ে আসতে পেরেছিল তাই নিয়ে। যেখানেই পুকুর পাড়, ডোবা তারা পাচ্ছিল তাতেই তাদের সাদা শার্ট ধুয়ে রোদে শুকিয়ে তারা বিমান বন্দরের দিকে অগ্রসরমান জনতার ভিড়ে মিশে যাচ্ছিল। এডিসিদের মধ্যে একজন বলেছে, কায়েদে আযম যখন নিচের দিকে তাকিয়ে তাদের দেখলেন তখন তিনি হঠাৎ যেন ক্ষণিকের জন্য উচ্ছ্বাসপ্রবণ ও যৌবনদীপ্ত হয়ে উঠেছিলেন।

বিমানটি অবতরণ করল এবং জিন্নাহ সর্বপ্রথম বিমান থেকে তাঁর বোনসহ বেরিয়ে এলেন। জনতা চিৎকার করে উঠলঃ পাকিস্তান-জিন্দাবাদ, পাকিস্তান-জিন্দাবাদ, তারা সামনের দিকে এগিয়ে এসে তাদের মুক্তিদাতার যতদূর সম্ভব নিকটবর্তী হওয়ার চেষ্টা করল।

জিন্নাহ ছিলেন দৃঢ় চিত্ত, নিঃসঙ্গ এবং একাকী। তিনি তাঁর নেভাল এ্যাটাচীকে একটি কাগজপূর্ণ ব্যাগ দিয়ে বললেন, "আমি আশা করি এখন থেকে তুমি এগুলির যথাযথ রক্ষণাবেক্ষণ করবে।" তারপর তিনি তাঁর নিকটবর্তী মুসলিম লীগ নেতাদের সঙ্গে করমর্দন করলেন। তাদের অনেকেই কাঁদছিলেন যখন তিনি তাদের পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন। বিমান বন্দর থেকে করাচী শহর পর্যন্ত শুভ্র জনতার বিশাল সমুদ্র বিস্তৃত হয়ে পড়েছিল। তার মধ্যদিয়ে অতি কষ্টে তাঁকে বহনকারী মোটর গাড়িটি এগিয়ে যাচ্ছিল। সমস্ত পথ পাকিস্তান-জিন্দাবাদ ধ্বনিতে মুখরিত হচ্ছিল। পথিমধ্যে শুধু এক জায়গায় সামান্য একটু সময়ের জন্য নিস্তব্ধতা বিরাজ করছিল। তাঁর গাড়ী যখন এক রাস্তার মোড়ে এসে পৌঁছালো তখন দেখলেন, কিছু লোক তাদের গৃহের বাইরে গম্ভীর ও নীরবে দাঁড়িয়ে আছে। জিন্নাহ এর কারণ জিজ্ঞাসা করলেন, তাঁকে বলা হলঃ এরা হিন্দু সম্প্রদায়ের লোক। তাই তাদের আনন্দ করার বিশেষ কারণ ছিল না।

হাজার হাজার করাচীবাসী যারা সেদিন তাঁকে উচ্চকণ্ঠে সম্ভাষণ জানিয়েছিল তাদের মধ্যে ছিল বৃদ্ধা ফাতেমা বাঈ যিনি জিন্নাহকে অধিক রাত পর্যন্ত বই পড়ার জন্য ভৎসনা করতেন। তাদের মধ্যে আরও ছিল নানজি জাফর যে শৈশবে জিন্নাহর সঙ্গে রাস্তায় মার্বেল খেলত। জিন্নাহ মার্বেল খেলা

www.amarboi.org

ছেড়ে দিয়েছিলেন এবং প্রতিজ্ঞা করেছিলেন; যে খেলা কাপড় চোপড় ও দু'হাতকে ময়লা করে সে খেলা তিনি আর খেলবেন না। জিন্নাহ্ শেষ পর্যন্ত তাঁর প্রতিজ্ঞা রক্ষা করে ভবিষ্যত যে মহান গুরু দায়িত্ব তাঁর হাতে এসে পড়েছিল সেগুলি সঠিকভাবে সমাধা করার জন্য তাঁর হাতকে পরিস্কার পরিচ্ছন্ন রাখতে সক্ষম হয়েছিলেন।

কায়েদে আযম গভর্ণর হাউসে এসে পৌঁছালেন। সিঁড়ি দিয়ে উঠার সময় তিনি এমন একটি কথা বললেন, যা ছিল সত্যিই বিস্ময়কর। তিনি লেঃ আহ্সানকে বললেন, "জান! আমার জীবনে আমি পাকিস্তান দেখে যেতে পারব এটা কখনও ভাবিনি। আমরা যা অর্জন করেছি তার জন্য আল্লাহ্‌র কাছে আমাদের কৃতজ্ঞ থাকা উচিত"।

এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে যে, ১৯১৮ সনে বোম্বের তাজমহল হোটেলে জনৈক আইরিশ মহিলা ভবিষ্যৎবাণী করেছিলেন যে, জিন্নাহ্ ভবিষ্যতে কোন একদিন একটি রাষ্ট্র গঠন করবেন। ঘটনাটি ঘটেছিল এভাবে— ভবিষ্যৎ বক্তা মহিলাটি মিসেস সরোজিনী নাইডুকে জিন্নাহ তাঁর বাহুতে কোনরকম ব্যাথা অনুভব করেন কিনা জিজ্ঞাসা করতে বলেছিলেন। জিন্নাহ্ নিজে ব্যক্তিগত সুখ-দুঃখ বা অনুভূতির ব্যাপারে কাউকে কখনও কিছুই জানতে দিতে চাইতেন না বলে মিসেস নাইডুর প্রশ্নে বিব্রতবোধ করলেও স্বীকার করেছিলেন যে, কখনও কখনও তিনি তাঁর বাহুতে ব্যাথা অনুভব করেন। মিসেস নাইডু আইরিশ মহিলাটিকে খবরটি বলার পরে তিনি উত্তর দিয়েছিলেন— "হ্যাঁ আমি জানি, এবং আমি এও জানি যে, একদিন এই লোকটি তাঁর নিজের জন্য একটি রাষ্ট্র গঠন করতে সক্ষম হবেন। সেদিন করাচীতে প্রসিডেন্ট প্রাসাদের সিঁড়ি দিয়ে উঠতে উঠতে জিন্নাহ্ যে কথা বললেন, তাতে ২৯ বৎসর আগে উক্ত আইরিশ মহিলার ভবিষ্যৎ বাণী সত্যি ছিল বলে প্রমাণিত হল। (হেকটর বলিথো, পৃষ্ঠা-৭৪)।

সারাদিন ও গভীর রাত্রি পর্যন্ত বিমান বন্দর থেকে হাজার হাজার উত্তেজিত জনতা গভর্ণমেন্ট হাউসের চারদিকে ঘুরে বেড়াতে লাগল। কিন্তু এত লোকের এত শ্রদ্ধাভক্তি, প্রশংসা কিছুই এ লোকটিকে বিশেষ স্পর্শ করছিল না। তাঁর আগমন সাধারণ লোকের মধ্যে কিরূপ উত্তেজনার সৃষ্টি করেছে সে সম্বন্ধে তিনি সম্পূর্ণ নির্বিকার ও নির্লিপ্ত রইলেন।

www.amarboi.org

এডিসিকে নিয়ে তিনি গভর্ণমেন্ট হাউসের কামরাগুলি দেখতে লাগলেন এবং কোন্ কোন্ কামরা কোন উদ্দেশ্যে ব্যবহার করতে হবে তার নির্দেশ দিতে লাগলেন। প্রাসাদের কোন্ অংশে তিনি ও ফাতেমা জিন্নাহ্ থাকবেন তাও দেখিয়ে দিলেন।

দিবাবসানের প্রাক মুহূর্তে জিন্নাহ যেন হঠাৎ বাস্তববাদী হয়ে উঠলেন। তিনি কর্মচারীদের একজনকে বললেন, "আমার জন্য এখনই একটি রেডিও ফিট করে দাও যাতে আমি খবর শুনতে পাই। কর্মচারীটি তাঁর মনিবের স্বভাব ও মন মেজাজের সম্বন্ধে পূর্ব কোন অভিজ্ঞতা ছিল না বলে উত্তর দিল, "স্যার, আপনি এখন খুব ক্লান্ত। এই কাজটা আগামী দিন সকালে করলে হয় না?" কায়েদে আযম তৎক্ষণাৎ উত্তর দিলেন, "কোন কাজকে বিলম্বিত করার কৌশল ভবিষ্যতে আর আমার কাছে করো না।"

নূতন রাষ্ট্র গঠনে জনগণের নিষ্ঠা

পরবর্তী দিনগুলিতে অনেক কিছু করার ছিল। একটি সরকার গঠনের উদ্দেশ্যে আমলাতন্ত্রের জন্য আবশ্যকীয় সবকিছুই তৈরী করে নিতে হবে। টেবিল চেয়ার হতে শুরু করে যাবতীয় আসবাবপত্র যোগাড় করা হল। টেলিফোন লাইনগুলি দ্রুত বসানো হল। টাইপ রাইটারগুলো খটাখট শব্দ তুলে চলতে আরম্ভ করল। ডেস্ক, চেয়ার, কাগজ, পেন্সিলের সব কিছুর অভাব ছিল। কিন্তু সদ্য স্বাধীনতাপ্রাপ্ত নিবেদিত প্রাণ সরকারী অফিসারদের আগ্রহ উদ্যম ও উৎসাহ সব অভাবকে পূরণ করে দিল। রাতারাতি পাকিস্তানীরা তাদের প্রশাসন মহল সৃষ্টি করে ফেলল। ভুল ভ্রান্তি যে, প্রথম প্রথম কিছু কিছু না হয়েছিল এমন নয়। তবে ইউরোপীয়দের মধ্যে যারা পাকিস্তানকে সাহায্য করার জন্য থেকে গিয়েছিল এবং যারা ভারতীয়দের স্বভাবের সঙ্গে বহুদিন যাবৎ পরিচিত ছিল তারা অবাক বিস্ময়ে দেখল, ঘোর বিশৃঙ্খলা থেকে দ্রুত শৃঙ্খলা ফিরে আসছে। তারা দারুণভাবে বিস্মিত হল।

একজন স্কটিশ ব্যবসায়ী করাচী থেকে দু'মাইল দূরে রেল লাইনের পাশে থাকতেন। তিনি একদিন দেখলেন, অন্ধকারে শান্টিং করতে গিয়ে একটি রেল ইঞ্জিন লাইনচ্যুত হলে পাকিস্তান-জিন্দাবাদ, পাকিস্তান-জিন্দাবাদ ধ্বনির মাধ্যমে দু'ঘন্টার মধ্যে রেলওয়ে কর্মীরা অমানুষিক পরিশ্রম ও স্রেফ মনের জোরে ইঞ্জিনকে রেল লাইনের উপর সঠিকভাবে স্থাপন করে ফেলেছে। স্কটিশ

www.amarboi.org

ভদ্রলোক বলেছেন, "আমি ভারতবর্ষে আজ একুশ বছর যাবৎ থাকলেও এরূপ অভূতপূর্ব ব্যাপার আর আমি পূর্বে কখনও দেখিনি। পাকিস্তানের স্থায়ীত্ব সম্পর্কে আমার বিশ্বাস সেদিন থেকে আমার মনে বদ্ধমূল হয়ে গেল।

নূতন সরকার গঠনের ব্যাপারে মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ্ ছিলেন নূতন জাতির প্রাণকেন্দ্র। তিনি ছিলেন প্রত্যেকের প্রেরণার কেন্দ্রবিন্দু। তথাপি তিনি সকলের থেকে দূরে থাকতেন। তাঁর অনুসারী বা জনগণ কারও সঙ্গে তাঁর উষ্ণ সম্পর্ক ছিল না। তিনি দিনের অধিকাংশ সময় গভর্ণমেন্ট হাউসের মধ্যে ক্লান্ত অসুস্থভাবে কাটালেও সম্পূর্ণ অবিচলিত ও স্বীয় শক্তিতে পূর্ণ আস্থাবান ছিলেন। তাঁকে কেন্দ্র করে যখন বিশ্বের সর্ববৃহৎ মুসলিম রাষ্ট্রের সরকার গঠনের প্রক্রিয়া চলছিল তখনও তিনি প্রাসাদের প্রত্যেক কামরায় গিয়ে প্রত্যেকটি খুঁটিনাটি ব্যাপার দেখবার চেষ্টা করতেন। তিনি লাইব্রেরীতে গিয়ে দেখলেন, বইয়ের তাকগুলি খালি। জিজ্ঞাসা করলেন, বইগুলি গেল কোথায়? উত্তর এলো সিন্ধুর গভর্ণর যাওয়ার সময় সেগুলি নিয়ে গেছেন। জিন্নাহ্ বললেন, "সেগুলি এখানে থাকবে। যাও সেগুলি ফিরিয়ে নিয়ে এস।"

একদিন গৃহের আসবাবপত্রের তালিকা পরীক্ষা করতে গিয়ে দেখলেন, একটি ক্রোকারী সেট পাওয়া যাচ্ছে না। তাঁকে বলা হল যে, পাঞ্জাবের গভর্ণরের মিলিটারী সেক্রেটারী সেটা নিয়ে গিয়েছে। তিনি সঙ্গে সঙ্গে সেটা ফিরিয়ে আনার আদেশ দিলেন।

গণপরিষদে জিন্নাহর প্রথম ভাষণ

এ সমস্ত খুঁটিনাটি জিনিসের প্রতি মনোযোগ দেওয়ার মাঝখানেও তিনি ১১ই আগস্ট '৪৭ পাকিস্তানের গণ-পরিষদে তাঁর সভাপতির ভাষণ প্রস্তুত করতে ব্যস্ত ছিলেন। যে ভাষণকে তাঁর জীবনের শ্রেষ্ঠ ভাষণ বলা চলে। সেদিন তিনি তাঁর জাতিকে বলেছিলেন,

You are free ; you are free to go to your temples, you are free to go to your mosques or to any other place of worship in this State of Pakistan. You may belong to any religion or caste or creed—that has nothing to do with the fundamental principle that we are all citizens and equal citizens of one State ... Now, I think we should keep that in front of us as our ideal, and you will find that in course of time, Hindus would cease to be Hindus, and Muslims would cease to be

www.amarboi.org

Muslims, not in the religious sense, because that is the personal faith of each individual, but in the political sense as citizens of the State.

আপনারা এখন স্বাধীন; আপনারা এখন স্বাধীনভাবে আপনাদের মন্দিরে, মসজিদে বা পাকিস্তানের যে কোন উপসনালয়ে যেতে পারেন। আপনারা যে কোন ধর্ম, সম্প্রদায় বা বিশ্বাসের অর্ন্তভূক্ত হতে পারেন, কিন্তু তাতে আমরা যে সবাই একই রাষ্ট্রের সমান অধিকার সম্পন্ন নাগরিক এই মৌলিক নীতির সঙ্গে তার কোন বিরোধ নেই। আমি মনে করি আমাদের সামনে এখন আদর্শ হিসাবে একটি মাত্র লক্ষ্য থাকবে যে, কালক্রমে হিন্দু আর হিন্দু থাকবে না, মুসলমান আর মুসলমান থাকবে না- ধর্মীয় হিসাবে অবশ্য নয়- কারণ, ধর্ম বিশ্বাস হল প্রত্যেকের ব্যক্তিগত ব্যাপার— তবে সেটা হবে রাজনৈতিক অর্থে, একই রাষ্ট্রের নাগরিক হিসাবে।

কথাগুলি ছিল জিন্নাহর। কিন্তু চিন্তা ও বিশ্বাস ছিল নবীর কাছ থেকে উত্তরাধিকার সূত্রে পাওয়া যিনি ১৩০০ বৎসর পূর্বে বলেছিলেন, "আল্লাহর দৃষ্টিতে সব মানুষ সমান। তোমাদের জীবন ও সম্পত্তি সবই পবিত্র। কোন কারণেই তোমরা অপরের জীবন ও সম্পত্তির উপর আক্রমণ করবে না। আজ আমি গোত্র, বর্ণ ও জাতির সর্ব প্রকার বিভেদ রেখা পদদলিত করলাম।

জিন্নাহর উপরোক্ত ভাষণ থেকে পরিষ্কার মনে হয় পাকিস্তানের ভবিষ্যত গঠনতন্ত্র সম্পূর্ণরূপে গণতান্ত্রিক ও ধর্ম নিরপেক্ষ হবে এটাই তিনি কল্পনা করেছিলেন। পাকিস্তান কখনও ধর্মভিত্তিক, ধর্মগুরু সম্প্রদায় কর্ত্তৃক পরিচালিত রাষ্ট্র হবে না এ সম্বন্ধে তিনি স্থির নিশ্চিত ছিলেন।

কায়েদে আযম তাঁর সাত কোটি দেশবাসীর কাছে সহিষ্ণুতা ও ধৈর্য্য ধারণের আবেদন ইংরেজীতে জানিয়েছিলেন, যদিও শ্রোতাদের মধ্যে এক দশমাংশের বেশী ইংরেজী ভাষায় শিক্ষিত ছিলনা বলে তাঁর আবেদন তাদের কাছে বোধগম্য ছিল না। তথাপি তাঁর এ ভাষণ তাঁর উদার মনের পরিচয় বহন করে এবং বিমান বন্দর থেকে আসার সময় যে নীরব হিন্দু সম্প্রদায়ের লোকদের তিনি দেখে এসেছিলেন তাদের কথাও যে তিনি বিস্মৃত হননি এটাতে তার পরিচয় পাওয়া যায়।

কায়েদে আযমের শান্তির জন্য আন্তরিক আবেদনের বিশেষ মূল্য বা ফলাফল তখন তেমন পাওয়া যায়নি। এর কারণ সময়ও তখন উপযুক্ত ছিল

www.amarboi.org

না। হিন্দু মুসলমান শিখদের কাফেলা তখনও নির্মম নিষ্ঠুরতার সম্মুখীন হচ্ছিল, যা ভারত বা পাকিস্তান সরকার কারও পক্ষে দমন করা সম্ভব হচ্ছিল না। লর্ড ইজমে লিখেছেন, দিল্লীতে নেহেরু খালি হাতে হত্যাকারীদের মাঝে গিয়ে দাঙ্গা বন্ধ করার প্রয়াস পেয়েছিলেন। নেহেরুও এ উম্মত্ত হত্যাকান্ডের দৃশ্যে জিন্নাহর মতই মর্মাহত ও কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে পড়েছিলেন এবং যতক্ষণ না উভয় পক্ষের সমাজ বিরোধীরা পৈশাচিক উন্মত্ত আচরণ করতে করতে ক্লান্ত হয়ে যুক্তির ভাষা খুঁজে না পাচ্ছিল ততক্ষণ জিন্নাহ-নেহেরু উভয়কেই অপেক্ষা করতে হয়েছিল। ভাইসরয়ের উপস্থিতিতে ১৪ই আগস্ট স্বাধীনতার ঘোষণার লগ্নে যখন কায়েদে আযম গভর্ণর হিসাবে শপথ নিলেন, তখনও এই সহনশীলতার আবেদন পুনঃ ব্যক্ত করা হল। তিনি ও লিয়াকত আলী খান পাকিস্তানের জন্য পতাকা নির্বাচিত করেছিলেন, যা তাদের মাথার উপরে উড়তে আরম্ভ করল। এটি ছিল চারভাগের তিনভাগ সবুজ ও একভাগ সাদা। তিনভাগ সবুজ ছিল সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলমানদের প্রতীক এবং একভাগ সাদা তাদের মধ্যকার সংখ্যালঘুদের প্রতিনিধিত্বের প্রতীক। লিয়াকত আলী খান তাঁর শ্রোতাদের স্মরণ করিয়ে দিলেন যে, এটা কোন একক রাজনৈতিক দলের বা গোষ্ঠীর পতাকা নয়। তিনি বললেন, ভবিষ্যতের ব্যাপারে আমি যতটুকু দেখতে পাচ্ছি পাকিস্তান এমন একটি রাষ্ট্র হবে যেখানে কোন ব্যক্তি বিশেষের বা বিশেষ সম্প্রদায়ের জন্য কোন বিশেষ সুযোগ-সুবিধা সংরক্ষিত থাকবে না। এটি এমন একটি রাষ্ট্র হবে যেখানে প্রত্যেক নাগরিক সমান সুযোগ-সুবিধা পাবে এবং প্রত্যেক ব্যক্তির উপর পাকিস্তানের নাগরিক হিসাবে রাষ্ট্রের দায়-দায়িত্ব অর্পিত হবে।

১৫ই আগষ্ট পাকিস্তানের মন্ত্রীমন্ডল শপথ গ্রহণ করল। মন্ত্রীমন্ডলের সদস্যরা যখন শপথ গ্রহণের জন্য সমবেত হল তখন লেঃ রাব্বানী জিন্নাহ সাহেবকে নিয়ে যাওয়ার জন্য এগিয়ে এল। নিচে উন্মুক্ত স্থানে অনুষ্ঠানের আয়োজন হয়েছিল। এডিসিসহ যখন তিনি দোতালায় এলেন নিচে উপস্থিত অভ্যাগতদের দেখে তিনি একটু থামলেন। তিনি উপর থেকে তাদেরকে দেখছিলেন, কিন্তু তারা তাঁকে দেখছিল না। এ সময় তিনি একটু হাসলেন। এই প্রথম তাঁর মুখে আনন্দের একটুখানি রেখা দেখা গেল। তাঁর এডিসি বলল, 'স্যার আকাশে মেঘ করেছে, বোধহয় বৃষ্টি হতে পারে।' জিন্নাহ বললেন, 'আমি করাচীর মেঘকে ভালভাবেই চিনি। এ মেঘে বৃষ্টি থাকে না।'

www.amarboi.org

এডিসি বলল, 'তাঁকে নিয়ে নিচে নেমে এলাম,' জিন্নাহ্ সমস্ত অনুষ্ঠানটি শেষ হওয়া পর্যন্ত বিন্দুমাত্র ভাবাবেগ প্রকাশ করলেন না। তারপর আমি যখন তাঁকে তাঁর কামরায় রেখে এলাম তখন তিনি আবার মৃদু হাসলেন, তবে সেই হাসিটি ছিল সম্পূর্ণ তাঁর নিজের জন্য।

পাকিস্তান সরকার গঠনে বৃটিশ কর্মচারীদের অবদান

কায়েদে আযম বৃটিশ সরকারকে অনুরোধ জানিয়েছিলেন, শাসন বিভাগ গড়ে তোলা ও বিভিন্ন প্রদেশে গভর্ণরের পদে কাজ করার জন্য কিছুসংখ্যক ইংরেজ অফিসারকে রেখে দিতে এবং বৃটিশ সরকার সে অনুরোধ রক্ষা করতে রাজী হয়েছিলেন। তদানুসারে বৃটিশ কর্মচারীদের অধীনে স্থল, বিমান ও নৌবাহিনী যথাশীঘ্র গড়ে উঠতে লাগল। দেশ বিভাগের বহু পূর্ব থেকে নতুন রাষ্ট্রের অধিকারী হলে ইংরেজ কর্মচারীদের সাহায্য নেওয়ার কল্পনা জিন্নাহর ছিল। ইংরেজ কর্মচারীরা বহুদিন ভারতে কাজ করে ক্লান্ত হয়ে দেশে ফেরার জন্য অধীর হয়ে পড়লেও যখন তাদেরকে থাকার জন্য অনুরোধ জানানো হল তারা স্বীকৃত হলেন। জিন্নাহ জানালেন, তাদের সেবা সর্বোচ্চ দশ বৎসরের জন্য প্রয়োজন হবে। তদানুসারে লর্ড ইজমের সাহায্যে তিনি স্যার আর্চিবল্ড রাওল্যান্ডকে অর্থ উপদেষ্টা করলেন, স্যার জর্জ ক্যানিংহামকে উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশের গভর্ণর করলেন, স্যার ফ্রান্সিস মোদীকে পশ্চিম পাঞ্জাবের গভর্ণর করলেন। স্যার ফ্রেডারিক বোর্ণকে পূর্ব বাংলার গভর্ণর করলেন। এরূপ আরো অনেকের সাহায্য তিনি নিয়েছিলেন।

দেশ বিভাগের দু'দিন পরেই জিন্নাহ প্রমাণ করলেন যে, বৃটিশ অফিসারদের আনুগত্যের ও সেবার বিনিময়ে তাদেরকে যথাযথ সম্মান ও মর্যাদা দিয়ে তাদের মন জয় করা সম্ভব। ১৭ই আগস্ট রোববার করাচীর এ্যাংলীকান ক্যাথেড্রাল চার্চে একটি বিশেষ ধন্যবাদ জ্ঞাপন ও প্রার্থনার আয়োজন করা হয়েছিল, যে অনুষ্ঠানে কায়েদে আযমের নামোল্লেখের ব্যবস্থা ছিল। জিন্নাহ্ এ খবর জানতে পেরে অনুষ্ঠানে সরকারীভাবে স্বশরীরে উপস্থিত থাকার অনুমতি প্রার্থনা করলেন। এতে সমস্ত বৃটিশ অফিসার ও পাকিস্তানের খ্রীষ্টান নাগরিকেরা সম্মানিত বোধ করল। মিঃ উইলফ্রেড রাসেল নামে একজন ইংরেজ লেখক লিখেছেন জিন্নাহ্ এভাবে খ্রীস্টানদের চার্চে প্রার্থনা অনুষ্ঠানে যোগ দিতে গিয়ে যে তার গোঁড়া মুসলমান সম্প্রদায়ের বিরাগ ভাজন হওয়ার মত একটি বিরাট রাজনৈতিক ঝুঁকি নিতে যাচ্ছেন এটা জানা সত্ত্বেও তিনি করাচীর খ্রীস্টান সম্প্রদায়কে খুশী করতে দ্বিধা করেননি।

www.amarboi.org

জিন্নাহ্ বিমান বা স্থল বাহিনীর চাইতে নৌ বাহিনীকে বেশী গুরুত্ব দিতেন। পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের মধ্যে সংযোগ রক্ষার জন্য নৌ পথই একমাত্র উপায় বলে সম্ভবতঃ নৌ বাহিনীকে শক্তিশালী করার আগ্রহ্ তাঁর বেশী ছিল। রিয়ার এডমিরাল জে. ডব্লিউ. জেফোর্ড ১৩ই আগষ্ট পাকিস্তান নেভীর দায়িত্ব গ্রহণ করলেন। তিনি দুটি ফ্রিগেট, দুইটি মাইন সুইপার ও কয়েকটি নৌযান নিয়ে কাজ আরম্ভ করলেন। বোম্বে পোর্টে তখনও আরও দুইটি ফ্রিগেট ও দুইটি মাইন সুইপার সংযোগের প্রতীক্ষায় পড়েছিল। হাজার মাইল দূরে পূর্বে পাকিস্তানে কোন নেভাল বেস ছিল না। এডমিরাল জেফোর্ড তাই ক্রুসহ্ একটি গোটা বেতার স্টেশন চট্টগ্রামে আকাশ পথে নিয়ে এসে বসালেন।

এই এডমিরাল পাকিস্তানে পাঁচ বৎসর ছিলেন। এর মধ্যে তিনি একটি কর্মক্ষম নৌবাহিনী উপযুক্ত দক্ষ স্থানীয় অফিসারদের সাহায্যে গড়ে তুলতে সক্ষম হয়েছিলেন। এই দক্ষ বিচক্ষণ অফিসারটি কায়েদে আযমের পরিপূর্ণ আস্থা অর্জন করতেও সক্ষম হয়েছিলেন।

এডমিরাল জেফোর্ড মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ্ সম্বন্ধে লিখেছেন, "তিনি ছিলেন বিরাট মাপের মানুষ" পাকিস্তান অর্জনের পর তিনি জনগণের কাছে অর্ধ ইশ্বর বনে গিয়েছিলেন। কিন্তু তিনি কোন প্রকার আন্দোলনকারী, রাজনৈতিক ডেমাগগ ছিলেন না। তিনি লিয়াকত আলী খানের ন্যায় সাধারণ মানুষের সংস্পর্শে আসতে পারতেন না। কায়েদে আয়ম কোনভাবেই জনপ্রিয়তা অর্জনের চেষ্টা করতেন না। প্রকৃতিগত ভাবেই তিনি ছিলেন অত্যন্ত শীতল প্রকৃতির নির্লিপ্ত স্বভাবের মানুষ। তথাপি মাঝে মাঝে তাঁর মধ্যে মানবতাবোধের ঝিলিক কখনও কখনও পরিদৃষ্ট হত। তোষামোদকারীদের তিনি দারুণভাবে ঘৃণা করতেন। ১৪ই আগস্টের অনুষ্ঠান শেষে ভাইসরয়ের দিল্লীর উদ্দেশ্যে যাত্রা করার পর কায়েদে আযম তাঁর কয়েকজন পাকিস্তানী বন্ধুসহ্ গভর্ণমেন্ট হাউসে বসেছিলেন। যেহেতু মাউন্টব্যাটেন বৃটিশ সরকারের প্রতিনিধিত্ব করছিলেন তাই পাকিস্তানী পতাকার পার্শ্বে ইউনিয়ন জ্যাকও উড়ছিল। জিন্নাহকে খুশী করার জন্য তাঁর অনুগামীদের একজন বলল, যেহেতু ভাইসরয় এখন আর পাকিস্তানের ভূমিতে নেই, তাই ইউনিয়ন জ্যাক এখন নামিয়ে ফেলা যেতে পারে। কায়েদে আযম তাঁর প্রতি স্বীয় শীতলতম প্রজ্জ্বলিত দু'টি চোখ নিবদ্ধ করে বললেন, "ফ্লাগ নামিয়ে ফেলার সঠিক সময় হল সূর্যাস্তের

www.amarboi.org

পর। তার পূর্বে করলে রাজার প্রতি অসম্মান প্রদর্শন করা হবে— যিনি আমাকে এই মাত্র গভর্ণর জেনারেল করেছেন এবং পাকিস্তান সৃষ্টির দলিলে দস্তখত করেছেন।"

কায়েদে আযমের মৃত্যু পর্যন্ত মিলিটারী সেক্রেটারী দু'জনই ছিল বৃটিশ অফিসার। তারমধ্যে প্রথম ছিলেন কর্ণেল বার্ণি। দেশ বিভাগের পূর্বেই ২২শে জুলাই গভর্ণর জেনারেলের আগমনের পূর্ব প্রস্তুতিসম্পন্ন করার জন্য কর্ণেল বার্ণিকে করাচীতে পাঠানো হয়েছিল। তিনি ২৩শে জুলাই তাঁর ডায়েরীতে জিন্নাহ সম্বন্ধে তাঁর অভিজ্ঞতা ব্যক্ত করতে গিয়ে লিখেছেন, "তিনি এত আন্তরিকতা ও চমৎকারভাবে বৃটিশদের সম্বন্ধে কথা বললেন যে, তাঁর জন্য আমার সাধ্যমত সবকিছু করতে আমি রাজী না হয়ে পারলাম না।" পাঁচ সপ্তাহ পরে করাচীতে তিনি লিখেছেন, "আজ রাত্রে ডিনার খেতে খেতে তিনি (জিন্নাহ) তাঁর অতীত সম্বন্ধে অত্যন্ত হৃদয়গ্রাহীভাবে সবকিছু বর্ণনা করলেন। তাঁর সরলতা ও অকপটতা সেদিন ঘরে উপস্থিত সকলকেই সম্মোহিত করে ফেলেছিল।

বার্ণির ২৯শে আগস্টের ডায়েরী থেকে সে সময় হিন্দুস্থান পাকিস্তানে কি পৈশাচিক অবস্থা বিরাজ করছিল তার ভয়াবহ বিবরণ পাওয়া যায়। সেপ্টেম্বরের ৭ তারিখে কুয়েতের আমীরের করাচী আগমন উপলক্ষ্যে গভর্ণমেন্ট হাউসে একটি উচ্চ পর্যায়ের পার্টিতে প্রায় ৫০ জনের একটি দল কুয়েতের শেখের সঙ্গে দেখা করতে এল। এ সময় গেইটে একটি বিক্ষোভ প্রদর্শিত হচ্ছিল। বার্ণি পার্টি থেকে উঠে এসে সেক্রেটারীয়েটের প্রায় তিনশত কর্মচারীকে শান্ত করবার চেষ্টা করতে লাগলেন কিন্তু সক্ষম হলেন না। তারা কায়েদে আযমের সঙ্গে দেখা করতে পীড়াপীড়ি আরম্ভ করল। তাদেরকে বলা হল তোমরা দু'চার জনকে নেতা ঠিক কর কায়েদের সঙ্গে কথা বলার জন্য। দেখালাম তাদের নেতা কেউ নেই। পূর্ব পাঞ্জাবে তাদের পরিবারের সবাই নিহত হয়েছে এই আশংকায় তারা সবাই সম্পূর্ণ উদ্ভ্রান্ত। এ অবস্থায় তাদেরকে শান্ত্বনা দেওয়ার কোন উপায় ছিল না। তারা দাবী করল কায়েদে আযম স্বয়ং এসে দেখা না করলে তারা যাবে না।

শেষ পর্যন্ত কায়েদে আযম এসে বারান্দায় দাঁড়ালেন। সামান্য দু'চার কথায় তাদের শান্ত্বনা দিয়ে বললেন, তাদের পরিবারবর্গকে রক্ষা করার জন্য যতটুকু সম্ভব চেষ্টা করা হবে। তিনি তাদেরকে শৃঙ্খলা রক্ষা করে স্থান ত্যাগের উপদেশ দিলেন।

www.amarboi.org

সঙ্গে সঙ্গে 'কায়েদে আযম জিন্নাহ্—জিন্দাবাদ' ধ্বনিতে চর্তুদিক মুখরিত হয়ে উঠল। জনতা তারপর আর বাড়াবাড়ি না করে স্থান ত্যাগ করল। জনগণের উপর জিন্নাহর উপরিসীম প্রভাব ছিল। আমি চিন্তা করলাম এরপর তাঁর শূন্যস্থান পূরণ করবে কে?

জিন্নাহর চরিত্রের বৈশিষ্ট্য ঃ

জিন্নাহ্ যে সাধারণ মানুষের সংস্পর্শ থেকে দূরে থাকতে চাইতেন, সহজে লোকের সাথে মিশতে চাইতেন না, প্রচার বিমুখ ও জনপ্রিয়তা লাভের জন্য তেমন উন্মুখ ছিলেন না এসব ছিল তাঁর অসাধারণ ব্যতিক্রমধর্মী চরিত্রের প্রকাশ। সাধারণ মানুষ, বিশেষ করে রাজনীতিবিদ হলে তো কথাই নেই, প্রচার ও জনপ্রিয়তার জন্য উৎগ্রীব হয়ে উঠে। জনপ্রিয়তা অর্জনের জন্য সাধারণ মানুষের সংস্পর্শে আসার আগ্রহ্ হয় তাদের প্রচুর। সাধারণ লোকের চরিত্রের তুলনায় এই সম্পূর্ণ বিপরীতধর্মী চরিত্রের জন্যই সকল রাজনৈতিক নেতারা জিন্নাহকে বিশেষ সম্মানের চোখে দেখতেন। দৈহিকভাবে অপরূপ সৌন্দর্যের অধিকারী, কথা বার্তায় চৌকস তরুণ ব্যারিস্টার জিন্নাহর আশেপাশে শিক্ষিতা সুন্দরী মহিলারা তাঁর মন পাওয়ার আগ্রহে ঘুরে বেড়াতেন কিন্তু তিনি কারো দিকে বিশেষ ফিরে তাকাতেন না। এটাও ছিল একটা দারুণরকম কৌতুহলোদ্দীপক ব্যতিক্রমধর্মী ব্যাপার যেটা অন্য সাধারণ দশজনকে প্রভাবিত করে স্মরণ করিয়ে দিত যে, জিন্নাহ্ চরিত্রের দিক থেকে তাদের চাইতে কত স্বতন্ত্র ধরনের মানুষ। সাধারণ মানুষের মধ্যে বীর পূজার একটা প্রবণতা থাকে। অধিকাংশ রাজনৈতিক নেতা বা সাধারণ লোক যখন লক্ষ্য করে তাদের মধ্যে যে চারিত্রিক দোষ বা নারী ঘটিত দুর্বলতা রয়েছে বিশেষ একজন সেসব মানবিক দোষত্রুটি বা দুর্বলতার অনেক উর্ধ্বে তখন সাধারণ ভাবেই মনের অগোচরে তার শ্রেষ্ঠত্ব স্বীকার করে তার নেতৃত্ব মেনে নিতে দ্বিধা করে না।

এই অস্বাভাবিক গুণ ও চরিত্রের জন্যেই বিশাল ভারতের শত ভাগে বিভক্ত মুসলমান সম্প্রদায়কে তিনি এক প্রতিষ্ঠান ও পতাকার নীচে আনতে সক্ষম হয়েছিলেন। মুসলমানদের মধ্যে তখন রাজা উজির নাজির নাইট নবাব জমিদার কৃষক শ্রমিক ছাত্র বিভিন্ন শ্রেণী ও স্বার্থের লোক ছিল। তাদেরকে এক চিন্তায় উদ্বুদ্ধ করে একতাবদ্ধ করা সহজ সাধ্য ব্যাপার ছিল না। ভারতের বিভিন্ন প্রদেশের প্রতিভাবান শক্তিধর নেতারা প্রত্যেকে মনে প্রাণে অনুভব করতেন জিন্নাহ্ শুধু জ্ঞানের দিক থেকে তাদের চাইতে বড় ছিলেন না, যে

www.amarboi.org

সমস্ত মানবিক ও চারিত্রিক দুর্বলতা তাদের ছিল, জিন্নাহ্ ছিলেন তার থেকে মুক্ত ও অনেক উর্ধ্বে। তাই সহজাতভাবেই তাঁরা জিন্নাহর নেতৃত্ব মেনে নিতে একটা মানসিক তাগিদ বোধ করতেন।

ইংরেজীতে একটি কথা আছে Familiarity breeds contempt—অতিরিক্ত ঘনিষ্ঠতা ঘৃণার জন্ম দেয়। তাই জিন্নাহ্র সাধারণ মানুষ থেকে দূরে থাকার এ সহজাত প্রবণতা সকল শ্রেণীর মানুষের মনে তিনি তাদের চাইতে অনেক নির্মল, পূত চরিত্রের মানুষ এবং তাই শ্রেষ্ঠ এ ধারণা সঞ্চারিত করতে সাহায্য করেছিল। বিধাতা পুরুষ বা নিয়তি মনে হয় নিজ ইচ্ছা পূরণের জন্যই জিন্নাহর মত ব্যতিক্রমধর্মী গুণাগুণ ও মানসিক গঠন দিয়ে এরূপ একজন মানুষকে বিশেষভাবে সৃষ্টি করেছিলেন।

তবে সাধারণ মানুষের সঙ্গে সংশ্রবহীন হিমশীতল জীবন-যাপন করার মধ্যে অনেক দুঃখ-কষ্ট জড়িত থাকে। এই চরিত্রের মানুষ সমাজ জীবনে খুব নিঃসঙ্গ হয়ে পড়ে। তাদের বন্ধু-বান্ধব বলতে বিশেষ কেউ থাকে না। এরা জীবনে নিজের দুঃখের ভাগীও যেমন কাউকে করতে চায় না তেমনি অন্যের দুঃখের ভাগীও হয় না। এদের ব্যক্তিগত জীবন তাই খুব দুঃখের হয়ে পড়ে। এদের ব্যক্তিত্ব এমন ধরনের হয় যে সহজে কেউ কাছে আসতে চায় না। সবাই দূরে থেকে সম্মান দেখায়, কেউ ভালবেসে কাছে আসে না। বেগম লিয়াকতও বলেছেন জিন্নাহর ব্যক্তিত্ব ছিল ভীতিপ্রদ।

জিন্নাহর এ স্বভাবের জন্যই লিয়াকত আলী খানসহ সব মুসলিম লীগ নেতা তার থেকে দূরে অবস্থান করতেন। তার সঙ্গে কারো গভীরভাবে বন্ধুত্ব গড়ে উঠেনি। মনের দিক থেকে ভাবের আদান প্রদান কারো সঙ্গে হতো না বলে মন সর্বদা বিষাদ ভারাক্রান্ত হয়ে থাকত। তাই জিয়ারতে অত্যন্ত অসুস্থ অবস্থার সময় দেখা যায় নেতৃস্থানীয় কোন নেতাই তাকে দেখতে যেতেন না। এটা যে তাকে তাচ্ছিল্য করার কারণে হয়েছিল তা নয়, তারা জানতেন যে জিন্নাহ্ তার সম্বন্ধে বেশী খোঁজ-খবর নেওয়া পছন্দ করেন না। তাই তারাও অসুস্থ জিন্নাহ্কে দেখতে যাওয়ার কোন মানসিক তাগিদ বোধ করেননি।

জিন্নাহর এ স্বভাবের অবশ্য একটা অত্যন্ত ভালো ও উজ্জ্বল দিক ছিল। তোষামোদকারীরা কখনও তাঁর কাছে ভীড়তে সাহস করত না। ঘনিষ্ঠতার সুযোগ নিয়ে একে অপরের বিরুদ্ধে তাঁর কান ভারী করে, কান কথা বলে প্রতিষ্ঠানকে দুর্বল করার সুযোগ পেত না। এটা ছিল নিঃসন্দেহে একটি মঙ্গলকর দিক।

www.amarboi.org

জিন্নাহর বোন মিস্ ফাতেমা জিন্নাহও ছিলেন বেশ সুন্দরী ও শিক্ষিতা দন্ত চিকিৎসক কিন্তু ভাইয়ের মত অতিমাত্রায় আত্মসচেতন ও ব্যক্তিত্বসম্পন্না মহিলা হওয়াতে বিয়ে করে সংসারী হতে পারেননি। এত রূপবান পুরুষ হওয়া সত্ত্বেও জিন্নাহ্ যেমন নিষ্কলঙ্ক চরিত্রের মানুষ ছিলেন তেমনি যথেষ্ট সুন্দরী হয়ে অবিবাহিত জীবন-যাপন সত্ত্বেও ফাতেমার জীবনে কোনকালে বিন্দুমাত্র কলঙ্ক স্পর্শ করেনি। ভাই-বোন দুই জনই ছিলেন নিয়তির কারণে এক ধাঁচে গড়া। ফাতেমা একমাত্র ভাই জিন্নাহকে দেখাশুনা করার জন্যই নিজ জীবন উৎসর্গ করেছিলেন বলে মনে হয়। তাই বিধাতা তাঁকেও ভাইয়ের মত মানসিক গঠন দিয়েই তৈরী করেছিলেন। বিবাহিত জীবনের ব্যর্থতা ও পরবর্তীকালে রতন বাঈয়ের মৃত্যুর পর জিন্নাহকে ফাতেমা ছায়ার মত সঙ্গ দিয়ে দেখাশুনা করে জিন্নাহকে সজীব ও কর্মক্ষম রেখে তাঁর আরব্ধ কার্য সম্পাদনে সাহায্য করেছিলেন। তাই জিন্নাহর পাকিস্তানের জন্য সংগ্রাম ও শেষ পর্যন্ত বিজয়ের পিছনে মিস্ ফাতেমা জিন্নাহরও গুরুত্বপূর্ণ অবদান ও ভূমিকা রয়েছে এ কথা নিঃসন্দেহে বলা চলে।

কায়েদে আযম নিজের ক্লান্তি কারো কাছে স্বীকার করতেন না, এমনকি নিজের কাছেও না। গভীর রাত্রি পর্যন্ত তিনি শরণার্থীদের ক্রোধ ও ঘৃণা অপনোদনের উদ্দেশ্যে মনোযোগ সহকারে শান্তির আবেদন লিখতেন। প্রতিদিন যেসব খবর এসে পৌঁছাচ্ছিল তা ছিল ভয়াবহ। কর্ণেল বার্ণি ৭ই সেপ্টেম্বর তার ডায়েরীতে লিখেছেন, "এ সপ্তাহ ছিল দিল্লীর জন্য একটি অত্যন্ত খারাপ সপ্তাহ। এইসময় প্রায় দুইশত শিখ দলবদ্ধ হয়ে মুসলমানদের দোকানগুলির দরজা ভেঙ্গে লুট করতে আরম্ভ করল। রাস্তায় গাড়ী থামিয়ে মুসলমান আরোহীদের টেনে বের করে হত্যা করতে লাগল। একমাত্র দিল্লীতেই দেড় হাজার থেকে দু'হাজার মুসলমান সেদিন নিহত হয়েছিল।

মিঃ বার্ণি তার ডায়েরীতে আরও লিখেছেন, "নতুন ডোমিনিয়ন সৃষ্টির ব্যাপারে আমাদের বহুবিধ অসুবিধা ও কষ্টের মধ্যে নতুন বিপদ হিসাবে দেখা দিল ভারত থেকে আগত লক্ষ লক্ষ শরণার্থীদের জন্য আহার, বাসস্থান ও ঔষধের ব্যবস্থা করা। এখানে বলতে গেলে লক্ষ লক্ষ রিফিউজী যারা ভারতে সর্বস্ব ফেলে পালিয়ে এসেছিল তাদেরকে মাথা গোঁজতে দেওয়ার মত কোন ঘরই ছিল না। তাদের মধ্যে অনেকেই হয়ত তখন ভাবছিল যে অভাবনীয় দুঃখ দুর্দশার সম্মুখীন সেদিন তারা হয়েছিল সে তুলনায় বৃটিশ শাসনের অধীনে তারা কতটাই না সুখে শান্তিতে বাস করছিল।

www.amarboi.org

কাশ্মীর সমস্যা ও কায়েদে আযম

জিন্নাহ্ জীবনের শেষ বৎসরটি কাশ্মীরের ঘটনার অচিন্তনীয় মোড় নেওয়ার ফলে দুঃখ ভারাক্রান্ত হয়ে পড়েছিল। মাউন্টব্যাটেন ৬৬৫টি দেশীয় রাজ্যকে উপদেশ দিয়েছিলেন ক্ষমতা হস্তান্তরের পূর্বে তারা যেন হিন্দুস্থান বা পাকিস্তান কোন একটি ডোমিনিয়নে যোগ দেয় এবং যোগ দেওয়ার ব্যাপারে শাসনকর্তা জনগণের মনোভাব, উভয় ডোমিনিয়নের সঙ্গে তাদের আঞ্চলিক নৈকট্য ইত্যাদির দিক গুরুত্বের সঙ্গে বিবেচনা করতে হবে। তদনুসারে হায়দ্রাবাদ, জুনাগড়, মান্ডেভার ও কাশ্মীর ব্যতীত সকল রাজ্যই কোন না কোন ডোমিনিয়নে যোগ দিয়েছিল। হায়দ্রাবাদ বেশ বড় একটি হিন্দু প্রধান রাজ্য যার শাসক ছিল নিজাম একজন মুসলমান নৃপতি। জুনাগড় ও মান্ডেভার ছিল দু'টি হিন্দু প্রধান দেশীয় রাজ্য যার অধিপতি ছিল মুসলমান নওয়াব। এ দু'টি রাজ্যের শাসনকর্তারা পাকিস্তানে যোগ দিলেও যেহেতু প্রজারা ছিল অধিকাংশ হিন্দু তাই ভারত দু'টি রাজ্যই সৈন্য পাঠিয়ে দখল করে নিল। পাকিস্তান সদ্য গঠিত রাষ্ট্র যার সৈন্যবাহিনী ছিল তখনও অসংগঠিত দুর্বল। তাই জুনাগড় ও মান্ডেভার হিন্দুস্থান দখল করে নিলেও প্রতিবাদ করা ছাড়া পাকিস্তান আর কিছু করতে পারল না।

কাশ্মীরের জনসংখ্যার আশি ভাগ মুসলমান। কিন্তু রাজা ছিল হিন্দু। জনসংখ্যার অধিকাংশ মুসলমান এবং পাকিস্তানের সংলগ্ন রাজ্য এই কারণে জিন্নাহ্ আশা করেছিলেন যে, কাশ্মীর শেষ পর্যন্ত পাকিস্তানে যোগ দিবে। কিন্তু কাশ্মীরের রাজা হরি সিং যেমনই ছিল বিলাসী, লম্পট ও অর্থশালী তেমনি ছিল নীতিহীন, নিষ্ঠুর ও ধূর্ত। হিন্দুস্থান-পাকিস্তান কোথাও যোগ না দিয়ে কাশ্মীরের উপর তার অধিপত্য কোনভাবে বজায় রাখা যায় কিনা রাজা হরি সিং সেই চেষ্টাই করে যাচ্ছিলেন। মাউন্টব্যাটেন তাকে ভারতে যোগ দেওয়ার জন্য চাপ দিয়ে যাচ্ছিল কিন্তু রাজা নানাভাবে সেই চাপ এড়িয়ে যাচ্ছিল। জিন্নাহ সাহেবও গোপনে দূত পাঠিয়ে তাকে পাকিস্তানে যোগ দেওয়ার আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন কিন্তু রাজা সে আমন্ত্রণে তেমন সাড়া দেয়নি।

এই অবস্থায় আগস্টের শেষ দিকে কাশ্মীরের উত্তরাঞ্চলের পুঞ্চ এলাকার মুসলমান অধিবাসীরা হঠাৎ বিদ্রোহ করে স্বাধীনতা ঘোষণা করল। এই

www.amarboi.org

এলাকাটি পাকিস্তানের অত্যন্ত সংলগ্ন। রাজা হরি সিং বিদ্রোহ দমনের জন্য সৈন্য পাঠালেন এবং জম্মু এলাকার সকল মুসলমানকে বিতাড়িত করার আদেশ দিলেন তার সৈন্যদলকে। মুসলমানদের উপর নেমে এল অমানুষিক নির্যাতন।

অক্টোবরের ২৪ তারিখে জিন্নাহর কাছে খবর এলো উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ থেকে প্রায় ৫ হাজার পাঠান গেরিলা তাদের মুসলমান ভাইদের রক্ষার জন্য কাশ্মীরে ঢুকে পড়েছে এবং তারা শ্রীনগরের দিকে অগ্রসর হচ্ছে। গেরিলা আক্রমণ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে রাজা হরি সিং ভারতে যোগদানের সিদ্ধান্ত ঘোষণা করে ভারতের সৈন্যবাহিনীর সাহায্য প্রার্থনা করল এবং ভারত সঙ্গে সঙ্গে কাশ্মীরে বিমানযোগে সৈন্য পাঠাতে আরম্ভ করল।

কাশ্মীর মুসলমান প্রধান রাজ্য হলেও সেখানকার ব্যবসা-বাণিজ্য, অর্থনীতি, শাসন ব্যবস্থা সবকিছুই ছিল হিন্দুদের হাতে। মুসলমানরা ছিল গরীব, অশিক্ষিত; চাষাবাদ ও ফলমূল বিক্রী করেই তারা প্রধানত জীবিকা নির্বাহ করত। দেশের প্রকৃত ক্ষমতা ছিল কাশ্মীরী ব্রাহ্মণদের হাতে। তারাই বলতে গেলে দেশ শাসন করত। পণ্ডিত জওহর লাল ও তাঁর পিতা মতিলাল নেহেরু ছিলেন এই কাশ্মীরী ব্রাহ্মণদেরই বংশধর। তাই কাশ্মীরের প্রতি ছিল জওহর লালের সুগভীর নাড়ীর টান। যেভাবে হোক কাশ্মীরকে ভারতভূক্ত করার জন্য প্রথম থেকে মাউন্টব্যাটেনের সহযোগীতা পেতে তিনি তাই সচেষ্ট ছিলেন।

জিন্নাহ যখন কাশ্মীরে মুসলমানদের উপর অত্যাচারের কাহিনী শুনতে পেলেন তখন তিনি খুবই বিচলিত বোধ করলেন। তাই তাদেরকে সাহায্য করার জন্য তিনি উপায় খুঁজতে লাগলেন। এরপর যখন তিনি জানতে পারলেন ভারত সৈন্য পাঠিয়ে কাশ্মীর দখল করে নিচ্ছে তখন ভারতীয়দের ঠেকাবার জন্য তিনি সৈন্য পাঠাতে চাইলেন। কিন্তু হিন্দুস্থান-পাকিস্তান বাহিনীর সর্বাধিনায়ক ফিল্ড মার্শাল স্যার ক্লড অচিলনেক বাধা দিলেন। তিনি যুক্তি দেখালেন মহারাজা ভারতে যোগদান করেছে এই কারণে ভারতের কাশ্মীরে সৈন্য প্রেরণ আইনতঃ সিদ্ধ হয়েছে। তিনি কায়েদে আযমকে ভয় দেখালেন যে, কাশ্মীরে সৈন্য প্রেরণ করতে পীড়াপিড়ি করা হলে তিনি পাকিস্তান থেকে সমস্ত বৃটিশ কর্মচারীকে অপসারণের নির্দেশ দিবেন। স্যার অচিলনেকের এই সিদ্ধান্তে জিন্নাহ অত্যন্ত মর্মাহত হলেন। পাকিস্তান স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্র হলেও এখানকার ইংরেজ কর্মচারীরা মাউন্টব্যাটেনের ইচ্ছার বিরুদ্ধে কোন কাজ

www.amarboi.org

করতে ইচ্ছুক নয় এটা তিনি বুঝতে পারলেন। কাশ্মীরের রাজা হিন্দুস্থানে যোগ দিয়েছে তাই সেটা আইনতঃ সিদ্ধ হয়েছে, আর জুনাগড় ও মান্ডেভার যখন পাকিস্তানে যোগ দিল তখন সেটা আইনতঃ সিদ্ধ হয়নি সেনাপ্রধান অচিলনেকের যুক্তির ব্যাপারে এই ডবল স্টান্ডার্ড জিন্নাহ্‌কে মর্মাহত করল। কাশ্মীরের ঘটনাবলী খুব কাছে থেকে অবলোকনের সুবিধার্থে এ সময় জিন্নাহ্ করাচী থেকে ফাতেমা জিন্নাহ্‌সহ লাহোরে এসে অবস্থান গ্রহণ করেছিলেন।

কাশ্মীরের এই সংকটজনক পরিস্থিতির কারণে দারুণ মানসিক চাপের ফলে জিন্নাহ্ খুব অসুস্থ হয়ে পড়েছিলেন। এই অসুস্থ অবস্থায় তিনি পাঞ্জাবের গভর্ণর স্যার ফ্রান্সিস মোদীর অতিথি হিসাবে লাহোরে অবস্থান করছিলেন। ফ্রান্সিস মোদীর সঙ্গে জিন্নাহ্ প্রায় ৩০ বছর ধরে ঘনিষ্ঠভাবে পরিচিত ছিলেন। মোদী জিন্নাহ্‌র চরিত্রের প্রশংসা করতে গিয়ে বলেছেন,

Jinnah Impressed me more, I think, than anyone else I have ever met, and I was very fond of him. ... It is difficult to say why ... He was cold- at least, that was the impression he gave- but I never found him harsh. He was, of course, hard. He never, if he could help it, compromised. ... Officially, until the end, when he was obviously very ill, I found him open to reason, or at least to argument ... I got to know that I could trust him absolutely. He was thoroughly loyal to those who had supported him in the past.

'In judging Jinnah, we must remember what he was up against. He had against him not only the wealth and brains of the Hindus, but also nearly the whole of British officialdom, and most of the Home politicians, who made the great mistake of refusing to take Pakistan seriously. Never was his position really examined.'

জীবনে যত লোকের সঙ্গে আমি মিশেছি জিন্নাহ্‌ই বোধহয় আমার মনে সব চাইতে বেশী রেখাপাত করেছে। তাঁকে আমার খুব ভাল লাগত। ... এটা কি জন্য তা আমি ঠিক বলতে পারব না। ... তিনি ছিলেন অত্যন্ত শীতল আবেগহীন মানুষ ... অন্ততঃ সে ধারণাই তিনি দিয়েছিলেন ... কিন্তু আমি তাঁকে কখনও কর্কশ হতে দেখিনি যদিও তিনি কঠোর প্রকৃতির মানুষ ছিলেন। তিনি পারতপক্ষে কখনও আপোষ রফায় রাজী হতেন না ... । সরকারীভাবে

www.amarboi.org

শেষাবধি— যতক্ষণ পর্যন্ত না তিনি দারুণভাবে অসুস্থ হয়ে পড়েছিলেন, আমি তাঁকে সর্বদা যুক্তিবাদী মানুষ হিসাবে দেখেছি, তর্কের কাছে হার মানতে দেখেছি। আমি জানতাম তাঁকে পরিপূর্ণভাবে বিশ্বাস করা চলে। অতীতে যারা তাঁকে সমর্থন দিয়েছিল তাদের প্রতি তিনি পরিপূর্ণভাবে অনুগত ছিলেন।

"জিন্নাহকে বুঝতে গেলে আমাদের স্মরণ রাখতে হবে কি শক্তির বিরুদ্ধে তিনি লড়েছিলেন। তাঁর বিরুদ্ধে শুধু হিন্দুদের মস্তিস্ক ও অর্থ সম্পদই ছিল না, ছিল প্রায় সমস্ত ইংরেজ রাজকর্মচারীদের মিলিত বিরুদ্ধতা, আর ছিল দেশের সমস্ত রাজনীতিবৃন্দ যারা তাঁর পাকিস্তান আন্দোলনকে উপযুক্ত গুরুত্ব দিয়ে বুঝবার চেষ্টা না করার মত বিরাট ভুল করেছিল। তাঁর অবস্থানকে কেউ ভালভাবে খতিয়ে দেখেনি।

ফ্রান্সিস মোদী আরও বলেছেন, জিন্নাহ আমার গৃহে যে তিন সপ্তাহ ছিলেন, ততদিন আকারে ইঙ্গিতে কোনভাবেই তিনি আরোগ্য লাভ করতে বিলম্ব করবেন এমন কোনরকম ভাব দেখাননি। তাঁর মানসিক শক্তি ও মনোভাব গোপন করার ক্ষমতা ছিল অসাধারণ।

১লা ডিসেম্বর জিন্নাহ লাহোর থেকে করাচী ফিরে এলেন। কর্নেল বার্ণি লিখেছেন, জিন্নাহকে দেখে আমি মর্মাহত হলাম। পাঁচ সপ্তাহ পূর্বে এখান থেকে যাওয়ার সময় তাঁকে ষাট বৎসর বয়স্ক মনে হয়েছিল, ফেরার পর এখন যেন তাঁকে আশি বৎসরের উপর মনে হচ্ছিল। এয়ার পোর্টে তাঁর সঙ্গে আসতে আসতে তাঁর বোন আমাকে বললেন তিনি খুব অসুস্থ এবং বেশ কিছুদিন তিনি এমন কোন স্থানে থাকতে চান যেখানে কেউ তাকে বিরক্ত করবে না। দু'দিন পরে গভর্ণর জেনারেলকে কিছুটা সুস্থ মনে হল। বার্ণির সঙ্গে জিন্নাহর এক ব্যাপারে প্রায় মতভেদ হচ্ছিল। গভর্ণর হাউসের যে অংশে জিন্নাহ থাকতেন নিরাপত্তার খাতিরে সে অংশটি দেয়াল দিয়ে ঘিরে দেওয়ার বার্ণির প্রস্তাব তিনি বার বার প্রত্যাখ্যান করতেন। তিনি বলতেন, আমি আমার নিজের লোকদের মধ্যে রয়েছি, আমার ভয়ের কোন কারণ নেই। পরে ৩০শে জানুয়ারী যখন দিল্লীতে মহাত্মা গান্ধী একজন হিন্দু নাথুরাম গড্সের হাতে নিহত হলেন তখন জিন্নাহ দেয়াল তুলবার অনুমতি বার্ণিকে দিতে আর দ্বিধা করলেন না।

গান্ধী-জিন্নাহ ব্যক্তিগত সম্পর্ক

গান্ধী ও জিন্নাহ রাজনৈতিকভাবে পরস্পরের ঘোর প্রতিদ্বন্দ্বী হলেও ব্যক্তিগতভাবে উভয়ে উভয়ের প্রতি শ্রদ্ধাশীল ছিলেন। কেউ কারো প্রতি কখনও অসৌজন্যমূলক ভাষা ব্যবহার করতেন না। মানুষ হিসাবে দু'জনই খুব উচ্চ

www.amarboi.org

কোটির লোক একথা উভয়ই স্বীকার করতেন। ব্যতিক্রমধর্মী দু'একটি ঘটনা ছাড়া জিন্নাহ্ সবসময় গান্ধীকে মহাত্মারূপে সম্বোধন করতেন এবং গান্ধীও জিন্নাহকে সর্বদা কায়েদে আযমরূপে অভিহিত করতেন। নির্বাচনী বক্তৃতায় কোন কোন সময় জিন্নাহ গান্ধীর রাজনীতি নিয়ে সমালোচনা করতে গিয়ে ব্যঙ্গসূচক মন্তব্য করলেও গান্ধীর মানব ও দেশপ্রেম সম্বন্ধে কখনও সন্দেহ প্রকাশ করেননি। জিন্নাহর প্রতিও গান্ধীর মনোভাব ছিল একইরকম, তাঁকে একজন সাচ্চা বৃটিশবিরোধী যোদ্ধা ও খাঁটি দেশপ্রেমিক মনে করতেন।

১৯৪৪ সনের অক্টোবরে গান্ধী-জিন্নাহ্ আলোচনা ব্যর্থ হওয়ার পর জিন্নাহ যখন দুঃখ করে বলছিলেন, "গান্ধীর যখন আমাকে যথেষ্ট কিছু দেওয়ার ইচ্ছা ছিল না তখন তিনি কেন আমার সংগে দেখা করতে এলেন"? ।তখন তার হিন্দু বন্ধু কান্জী দ্বারকা দাস যখন বললেন গান্ধী হয়ত এসেছিলেন আলোচনার ব্যর্থতার দোষ আপনার ঘাড়ে চাপিয়ে দিয়ে আপনার বিরুদ্ধে জনমত সৃষ্টির জন্য, তখন জিন্নাহ্ বলেছিলেন, "না- না তা কখনও হতে পারে না। গান্ধী আমার সঙ্গে খুব খোলামেলাভাবেই আলোচনা করেছেন এবং আমাদের আলোচনা খুব ভাল হয়েছিল। মানুষ হিসাবে তিনি সন্দেহের ঊর্ধ্বে।"

গান্ধীর সঙ্গে জিন্নাহর ব্যক্তিগত সম্বন্ধ যে খুব বন্ধুত্বপূর্ণ ছিল তার আর একটি প্রমাণ হলো গান্ধীজি যখন গণ-সত্যাগ্রহ করতে উদ্বত হলেন তখন জিন্নাহ্ স্বতঃপ্রণোদিত হয়ে বারদোলি গিয়ে রাত্রি বেলা গান্ধীজির সঙ্গে দেখা করে তাঁকে গণ-সত্যাগ্রহ বন্ধ করতে অনুরোধ করেন। তিনি বলেন বৃটিশ সরকার পুলিশ-মিলিটারী নিয়ে অপেক্ষা করছে। আন্দোলন শুরু হলেই গুলী চলবে। সুতরাং আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়ার পূর্বে বড় লাটের সঙ্গে দেখা করা দরকার। তাঁকে ও মালিব্যকে নিয়ে তিনি লর্ড রিডিংএর সঙ্গে বসার ইচ্ছা প্রকাশ করলেন। কিন্তু গান্ধী রাজি হলেন না। যা হোক, চৌরিচেরার হিংসাত্মক ঘটনার পর গান্ধী সত্যাগ্রহ প্রত্যাহার করেছিলেন। এতে বুঝা যায় গান্ধীর ব্যক্তিগত নিরাপত্তার জন্য জিন্নাহ্ কতখানি উৎগ্রীব ছিলেন।

হিন্দু কট্টর সাম্প্রদায়িকতা গোষ্ঠী গান্ধীকে অযৌক্তিকভাবে মুসলমানদের প্রতি পক্ষপাতী ও পাকিস্তানের দালালরূপে অভিহিত করে গান্ধীকে হত্যার সিদ্ধান্ত নিয়েছিল কারণ আমরণ অনশন করে তিনি দিল্লীর মুসলমানদের হিন্দু ও শিখ দাঙ্গাকারীদের হাতে পাইকারী হারে নিহিত হওয়া বন্ধ করেছিলেন।

www.amarboi.org

এছাড়া পাকিস্তানকে অর্থনৈতিক দিক থেকে অচল করে দেওয়ার জন্য দেশ বিভাগের সময় পাকিস্তানকে প্রতিশ্রুত ৪০ কোটি টাকা দিতে যখন প্যাটেল অস্বীকার করলো, তখন গান্ধী আমরণ অনশন করে প্যাটেলকে সে টাকা দিতে বাধ্য করেছিলেন। এ সমস্ত কারণে গান্ধীকে পাকিস্তান দরদী আখ্যা দিয়ে হিন্দু মহাসভার অঙ্গসংগঠন আর, এস, এস সদস্য নাথুরাম গড়্‌সে যখন গান্ধীকে ৩০শে জানুয়ারী সন্ধ্যায় প্রার্থনাসভায় গুলী করে হত্যা করল তখন জিন্নাহ্ গান্ধী হত্যার ব্যাপারে মর্মাহত হয়ে এক শোকবার্তায় বলেছিলেন, "তিনি হিন্দু সম্প্রদায়ের অন্যতম শ্রেষ্ঠ সন্তান ছিলেন এবং এই ঘটনা হলো হিন্দু জাতির জন্য এক বিরাট ক্ষতি"। এর পরপরই এক বিদেশী সাংবাদিকের সংগে আলোচনা প্রসংগে তিনি প্রকাশ্যে বলেছিলেন যে, গান্ধী হত্যা মুসলমানদের জন্য এক অপূরণীয় ক্ষতির কারণ হয়েছে। দেশ বিভাগের পরও এক হিন্দু সাংবাদিক মিঃ শর্মা যিনি পাকিস্তান হওয়ার পরও এক বৎসর করাচীতে রয়ে গিয়েছিলেন তার কাছ থেকে গান্ধীর প্রতি জিন্নাহর পরিবর্তিত মনোভাবের অনেক তথ্য অবগত হওয়া যায়।

এ সময় জিন্নাহ সত্যিই অত্যন্ত অসুস্থ ও দুর্বল হয়ে পড়েছিলেন এবং গভর্ণমেন্ট হাউসের সম্মুখস্থ বাগানে দুপুর বেলা মাঝে মাঝে বিশ্রাম নিতেন এবং সময় সময় খানিকটা নিদ্রা যেতেন। কিন্তু তাঁর কাজের কোনরূপ বিরাম ছিল না। সরকারী গুরুত্বপূর্ণ কাগজ ও দলিলগুলি তাঁর দস্তখতের জন্য পাঠানো হত। এ অসুস্থ শরীর নিয়েও তিনি প্রতিটি কাগজ, প্রস্তাব, পরিকল্পনা পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে পরীক্ষা করে দেখতেন এবং কখনও দ্বিমত পোষণ করলে ত্রুটিপূর্ণ জায়গাটি নির্দেশ করে সংশোধনের পর পুনরায় পাঠাবার নির্দেশ দিতেন। রাষ্ট্রের আয়-ব্যয় সবকিছু যতদূর সম্ভব তিনি পরীক্ষা করে দেখতেন যাতে কোনভাবে কোন অপচয় না ঘটে। তাঁর নিজের ব্যবহারের জন্য যে সমস্ত জিনিষ কেনা হত সেগুলো বাজার যাচাই করে যথাসম্ভব উপযুক্ত মূল্যে ক্রয়ের জন্য তিনি পরামর্শ দিতেন।

এ সময় রোগের আক্রমণ ক্রমাগত বৃদ্ধি পেতে থাকলেও তিনি যে গভীরভাবে রোগাক্রান্ত হয়েছেন এটা তিনি স্বীকারই করতে চাইতেন না। তিনি বরাবর বলতেন গুরুতর পরিশ্রমের ফলে তিনি ক্লান্তবোধ করছেন। একটুখানি বিশ্রাম নিতে পারলেই তিনি সুস্থ হয়ে উঠবেন। এ সময় 'স্টেটস্‌ম্যান' পত্রিকার সম্পাদক মিঃ আয়ান স্টিফেনস্ তাঁর সঙ্গে দেখা করেন। মিঃ স্টিফেনস্

www.amarboi.org

লিখেছেন, ফেব্রুয়ারী মাসের এক সকালে আমি তাঁকে দেখতে গেলাম। আমাদের মধ্যে প্রায় সত্তর মিনিট কথা হল। এত দীর্ঘসময় তিনি আমার সঙ্গে কথা বলছেন দেখে তাঁর এডিসিরা আশ্চর্যবোধ করছিল। তিনি এ সময় গত সাত মাসের ইন্দো-পাকিস্তানী নাটকীয় ঘটনাসমূহের চিত্তাকর্ষক বিবরণ দিয়ে যাচ্ছিলেন। আলাপশেষে কায়েদে আযম বললেন, "মিঃ স্টিফেনস্‌, আপনাকে ধন্যবাদ। আমি ভাল এবং অনেকটা ভাল আছি। তারা বলে আমি অসুস্থ, যা আমি মোটেই নই। আমি জানি আমি শুধু ক্লান্ত হয়ে পড়েছি। জিন্নাহ সাহেবের অপূর্ব সুন্দর পাতলা ওষ্ঠদ্বয় কথা বলবার সময় কম্পিত হচ্ছিল এবং তাঁর বৈশিষ্ঠ্যপূর্ণ মৃদুহাসি মুখে ফুটে উঠছিল যখন তিনি বলেছিলেন, স্টিফেনস্‌, আমি জানি এটা স্বাভাবিক। আমি আর যুবক নই। আমার প্রচুর দায়িত্ব রয়েছে ... । তাই আমি যখন ক্লান্ত হয়ে পড়ি আমি বিশ্রাম নেই। এটা খুব স্বাভাবিক। আমি ডাক্তারদের বলি তোমরা চলে যাও। আমি জানি আমার কি করা উচিত। আমার কাছে তারা বকবক করুক আমি এটা চাই না, তাতে আমি বিরক্ত বোধ করি। না, আমি মোটেই অসুস্থ নই। এ সময় কায়েদে আযম যে ধীরে ধীরে মৃত্যুর দিকে এগিয়ে যাচ্ছেন এবং তাঁর উভয় ফুসফুসই যক্ষ্মার জীবানুতে যে খেয়ে ফেলছে এটা সে সময় অনেকেই জানত না। কায়েদে আযম এটা সম্পূর্ণ গোপন রেখেছিলেন। যে গোপন তথ্য সাড়ে তিন বৎসর পূর্বে তাঁর বোম্বের ডাক্তার মিঃ জাল তাঁকে জানিয়েছিলেন। এর কয়েক দিন পরেই মৃত্যুর কাছে তাকে আত্মসমর্পণ করতে হয়েছিল।

জিন্নাহ যে মারাত্মক ব্যাধিতে আক্রান্ত হয়েছিলেন এবং এর আক্রমণ যে কিভাবে তাঁর জীবন-শক্তিকে নিঃশেষ করে নিয়ে আসছিল সে সম্বন্ধে তিনি সম্পূর্ণ সচেতন্‌ থাকলেও একথা ঘূণাক্ষরেও কাউকে তিনি জানতে দিতেন না। এর কারণ হলো জিন্নাহ জানতেন কংগ্রেস নেতৃবৃন্দ এ কথা জানতে পারলেই জিন্নাহর অবর্তমানে নেতৃত্বহীন মুসলমানদের ন্যায্য দাবী-দাওয়া অস্বীকার করা অনেক সহজ হবে মনে করে মীমাংসার আলোচনা অনবরত বিলম্বিত করার নীতি গ্রহণ করবে। রাজনৈতিক আলোচনার ব্যাপারে যুক্তি-তর্ক প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব ও কুটকৌশলে লীগের অন্য কোন নেতাই জিন্নাহর সমকক্ষ ছিল না। এ অবস্থায় ভারতের রাজনৈতিক সমস্যার শেষ ও চরম সমাধানের পূর্ব-মুহূর্তে জিন্নাহর মৃত্যু ভারত উপমহাদেশের মুসলমানদের স্বার্থের পক্ষে অতীব ক্ষতি ও বিপর্যয়ের কারণ হবে এটা বুঝতে পেরেই জিন্নাহ তাঁর রোগের

www.amarboi.org

প্রকৃতি, গভীরতা সম্পর্কে ঘূণাক্ষরেও কাউকে কিছু জানতে দেননি জাতীয় স্বার্থের কথা বিবেচনা করে। উপযুক্ত বিশ্রাম নিতে পারলে হয়ত তাঁর পক্ষে আরও কিছুদিন বেঁচে থাকা সম্ভব হতো। কিন্তু নূতন রাষ্ট্রের বিভিন্ন জটিল সমস্যার সমাধানে তার জ্ঞান, প্রজ্ঞা ও পরিশ্রম একান্ত প্রয়োজন বিবেচনায় তাঁর পক্ষে বিশ্রাম নেওয়া সম্ভবপর হয়নি। জীবন মরণ প্রশ্নের মুখোমুখি দণ্ডায়মান অবস্থায় জিন্নাহর এ যে কত বড় আত্মত্যাগ ভাবলে বিস্মিত হতে হয়। আরও বিস্মিত হতে হয় যখন দেখা যায় তাঁর মৃত্যুর পরপরই এত কষ্টোপার্জিত পাকিস্তান রাষ্ট্র গঠনের ব্যাপারে জিন্নাহর প্রগতিশীল ও আধুনিক আদর্শকে ভূলুণ্ঠিত করে পাকিস্তানের নেতারা ক্ষমতার লড়াইয়ে মেতে উঠে দেশটির সর্বনাশ সাধনে লিপ্ত হয়েছিলেন।

পরবর্তীকালে কোয়েটার জিয়ারতে যখন তিনি বিশ্রাম ও চিকিৎসার জন্য গিয়েছিলেন, তখনও রাষ্ট্রীয় গুরুত্বপূর্ণ ফাইলগুলি তাঁর মতামতের জন্য করাচী থেকে বিমানযোগে সেখানে পাঠানো হত এবং মৃত্যুর সপ্তাহখানেক পূর্ব পর্যন্ত অর্থাৎ শারীরিক ও মানসিকভাবে তাঁর পক্ষে যতক্ষণ কাজ করা সম্ভব হয়েছিল তিনি ফাইলগুলি দেখে যাচ্ছিলেন। বলতে গেলে তাঁর প্রায় একক প্রচেষ্টায় অর্জিত রাষ্ট্রের মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত তিনি এভাবে সেবা করে গেছেন।

জিন্নাহর ব্যক্তিত্ব সম্পর্কে বিশিষ্ট ব্যক্তিবৃন্দের মন্তব্য

গভীরভাবে অবলোকন ও বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়— একজন মানুষের মধ্যে এক সঙ্গে বহু সত্ত্বার অবস্থিতি বর্তমান থাকে। যত লোক তার সংস্পর্শে আসে তার একটি বিশেষ দিক সে দেখতে পায়। জিন্নাহর সংস্পর্শে যারা এসেছিলেন তাদের কেউ তাঁর কঠোরতা দেখেছেন, কেউ তাঁর অপরের সংস্পর্শহীন থাকার প্রবণতা দেখেছেন, কেউ তাঁর দৈহিক সৌন্দর্যকে বড় করে দেখেছেন কিন্তু কেউ কোনদিন তাঁর সাধুতা, ন্যায়পরায়ণতা ও চরিত্রের বিশুদ্ধতা সম্পর্কে কখনও কোন প্রশ্ন তোলেননি।

স্যার স্ট্যাফোর্ড ক্রিপাস্ যিনি জিন্নাহকে ১৯৩০ সন থেকে জানতেন তিনি তাঁকে একজন অত্যন্ত উঁচু স্তরের সৎ ও ন্যায়পরায়ণ ব্যক্তি যার সঙ্গে তর্কে পেরে উঠা অত্যন্ত কষ্টকর বলে বর্ণনা করেছেন। ক্রিপস্ এর মনে এ ধারণার কারণ হল নিজ উদ্দেশ্য সম্পর্কে জিন্নাহর দৃঢ় চিত্ততা।

ফিল্ড মার্শাল স্যার অচিলনেক জিন্নাহ সম্বন্ধে বলেছেন, "আমি তাঁকে

www.amarboi.org

অত্যন্ত সম্মান ও প্রশংসা করি তাঁর অনমনীয়তা, অসাধারণ ব্যক্তিত্ব এবং অপ্রতিরোধ্য দৃঢ় সংকল্পের জন্য। লর্ড ওয়াভেল যার সঙ্গে শেষ পর্যন্ত জিন্নাহর বন্ধুত্বে চিড় ধরেছিল তাঁর সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হয়ে দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলে বলেছিলেন, "জিন্নাহর সঙ্গে কাজ করা সত্যিই দুরূহ ব্যাপার ছিল"।

যে সমস্ত পাকিস্তানী অফিসার দেশ বিভাগের পর তাঁর সঙ্গে কাজ করেছিলেন তাদের মধ্যে দু'এক জন বলেছেন যে, তাঁর উষ্ণতাও অনেক সময় পরিমাপের ব্যাপার ছিল। তাঁর সন্নিকটে গেলেই মনে ভীতির সঞ্চার হত। তিনি অনেক সময় রূঢ়ভাবে আমাকে চলে যেতে বলতেন, আবার কিছুক্ষণ পরেই ঘন্টা বাজিয়ে আমাকে ডেকে পাঠিয়ে সদয়কণ্ঠে বলতেন, আমি বুড়ো হয়ে গিয়েছি। সবসময় মেজাজ ঠিক রাখতে পারি না। তোমরা আমাকে ক্ষমার চোখে দেখবে।

তবে এই সহৃদয়তা কদাচিৎ পরিদৃষ্ট হত। মাউন্টব্যাটেনের স্টাফের জনৈক অফিসার জিন্নাহকে সুয়েজ খালের পূর্বদিকে সব চাইতে রূঢ় ব্যক্তি বলে বর্ণনা করেছেন। একথা জিন্নাহর কন্যা মিসেস নেভিল ওয়াদিয়ার কানে গেলে তিনি বলেছিলেন, এটা সত্য নয়। আমার পিতার সঙ্গে কেউ রূঢ় ব্যবহার করার পূর্বে তিনি কখনও রূঢ় হননি।

এখানে উল্লেখ্য যে, জিন্নাহর একমাত্র কন্যা দীনা মায়ের মৃত্যুর পর অধিকাংশ সময় মায়ের পার্শি আত্মীয়-স্বজনের সঙ্গে বাস করত এবং শেষ পর্যন্ত জিন্নাহর অমতে নেভিল ওয়াদিয়া নামে এক খৃস্টান যুবককে বিয়ে করে।

জানা যায় জিন্নাহ কন্যার এ বিয়েতে অমত প্রকাশ করে যখন বলেছিলেন হাজার হাজার উপযুক্ত মুসলমান যুবক থাকতে তুমি কেন একজন অন্য ধর্মের লোককে বিয়ে করতে আগ্রহী তখন দীনা উত্তর দিয়েছিল হাজার হাজার উপযুক্ত মুসলমান মেয়ে থাকতে বাবা তুমি কেন ভিন্ন ধর্মাবলম্বী আমার মাকে বিয়ে করেছিলে? জিন্নাহ মেয়ের মুখ থেকে উপযুক্ত উত্তর শুনে চুপ মেরে গিয়েছিলেন। তবে কন্যাকে তিনি এ অবাধ্যতার জন্য কখনও ক্ষমা করেননি এবং কন্যার সঙ্গে ভবিষ্যতে বিশেষ কোন সম্পর্কও আর রাখতেন না। কালে ভদ্রে কখনও চিঠি লিখলে মিসেস ওয়াদিয়া বলে সম্বোধন করতেন। জিন্নার মৃত্যুর পর শেষ কৃত্যের সময় মিসেস ওয়াদিয়া স্বামী সহ একবার মাত্র করাচিতে এসেছিলেন।

www.amarboi.org

জিন্নাহ অন্যায়কারীকে ভর্ৎসনা করার ব্যাপারে বিন্দুমাত্র ইতস্ততঃ করতেন না। শোনা যায় র‍্যামজে ম্যাকডোনাল্ড জিন্নাহকে একবার যখন বলেছিলেন, "মিঃ জিন্নাহ। আপনি বোধহয় জানেন আমরা ভারতকে স্বশাসন দেওয়ার কথা ভাবছি- তখন গভর্ণর করার জন্য উপযুক্ত লোকের আমাদের প্রয়োজন হবে।" জিন্নাহ সঙ্গে সঙ্গে উত্তর দিয়েছিলেন, আপনি কি আমাকে ঘুষ দেওয়ার ইঙ্গিত করছেন? জিন্নাহ বুঝতে পেরেছিলেন ভবিষ্যতে বড় বড় পদ প্রাপ্তির ইঙ্গিত দিয়ে বৃটিশ প্রধানমন্ত্রী র‍্যামজে ম্যাগডোনাল্ড তাঁকে প্রভাবিত করার চেষ্টা করছেন।

প্রশংসাকারীদের জিন্নাহ সর্বদা ভর্ৎসনার চোখে দেখতেন। কোন ব্যাপারে অতি বাড়াবাড়ি তিনি পছন্দ করতেন না। একজন লোক জিন্নাহর সঙ্গে হ্যান্ডশেক করার জন্য লন্ডনের পূর্ব প্রান্ত থেকে ট্যাক্সীতে কয়েক পাউন্ড খরচ করে বিমান বন্দরে এসেছেন শুনে জিন্নাহ তাঁর সঙ্গে হাত মিলালেও ভর্ৎসনা করে বললেন, "তোমরা মুসলমানরা অত্যন্ত অমিতব্যয়ী।"

ভাবাবেগপূর্ণ সকল প্রশংসাকেই তিনি অপছন্দ করতেন। একবার ছোট একটি শহরে কৃষকদের একটি বড় মিছিলে দেখলেন তারা মাওলানা মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ—জিন্দাবাদ চিৎকার দিয়ে চলেছে। মাওলানা হল একটি ধর্মীয় টাইটেল যেটা জিন্নাহ খুব অপছন্দ করতেন। তিনি মিছিলটিকে থামিয়ে জনতার দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করে বললেন, "আমাকে মাওলানা বলা বন্ধ কর। আমি তোমাদের ধর্মীয় নেতা নই। আমি তোমাদের রাজনৈতিক নেতা। আমাকে মিঃ জিন্নাহ বা মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ বলবে, বুঝলে? লোকগুলি অবাক হয়ে গেল। তারা ভেবেছিল মাওলানা বলে তাঁকে অধিক সম্মান প্রদর্শন করা হচ্ছিল। তারা চুপ হয়ে গেল এবং তিনি গাড়ী চালিয়ে এগিয়ে গেলেন।

জিন্নাহ যে একদা শুধু তরুণীদের মনে আলোড়ন সৃষ্টি করতে সক্ষম হয়েছিলেন তা নয়, বয়স্ক মহিলারাও তাঁর ভদ্র ব্যবহারে জলসা, বৈঠকে তাঁর প্রতি আকৃষ্ট হতেন। লেডী ওয়াভেল তাঁর সম্পর্কে বলেছেন আমি জিন্নাহর মত সুপুরুষ আমার জীবনে দেখিনি। তাঁর ছিল প্রাচ্যের গ্রীকদের মত শারিরীক গঠন ও প্রতীচ্যের সুষমামন্ডিত অবয়ব। বেগম লিয়াতক আলী বলেছিলেন, "প্রথম দর্শনেই তিনি আমার হৃদয় জয় করেছিলেন। তিনি ধারণা দিতেন যে, তিনি খুব রাগী ও আত্মাভিমানী। কিন্তু একবার তাঁকে জানতে পারলে দেখা যেত তিনি গভীরভাবে মানবিক।"

তবে জিন্নাহর বয়স যখন ত্রিশের কাছাকাছি ছিল তখন মিসেস নাইডু তাঁর সম্বন্ধে যে মতামত দিয়েছিলেন, সেটাই বোধহয় সবচাইতে সঠিক ও প্রজ্ঞাপূর্ণ। তিনি লিখেছেন ঃ

www.amarboi.org

A casual pen might surely find it easier to describe his limitations than to difine his virtues. His are none of the versatile talents that make so many of his contemporaries justly famed beyond the accepted circle of their daily labours. Not his the gracious gifts of mellow scholarship, or rich adventure or radiant conversation; not his the burning passion of phillanthropy or religious reform. Indeed, by his sequestered tastes and temperament, Mohamed Ali Jinnah is essentially a solitary man with a large political following but few intimate friendships; and outside the twin spheres of law and politics he has few resources and few accomplishments.

But the true criterion of his greatness lies not in the range and variety of his knowledge and experience, but in the faultless perception and flawless refinement of his subtle mind and spirit; not in a diversity of aims and the challenge of a towering personality, but rather in a lofty singleness and sincerity of purpose and the lasting charm of a character animated by a brave conception of duty and an austere and lovely code of private honour and public integrity.

সাধারণ লেখকের পক্ষে তাঁর গুণের ব্যাখ্যা দেওয়ার চাইতে তাঁর সীমাবদ্ধতার বিবরণ দেওয়াই সহজ। তিনি এমন কোন সর্বময় গুণের অধিকারী ছিলেন না, যা তাঁর সমসাময়িক অনেককে তাদের দৈনন্দিন কাজের পরিধির মধ্যেও তাঁদেরকে প্রসিদ্ধ করে তুলেছিল। খুব সুপরিপক্ক জ্ঞানের অধিকারী বা বাক্যালাপে অত্যুজ্জ্বল চমৎকারিত্ব তাঁর ছিল না। বিশ্ব প্রেমের গভীর আগ্রহ বা ধর্মীয় সংস্কারের চেতনায় তিনি উদ্বুদ্ধ ছিলেন না। বাস্তবিক পক্ষে তাঁর নিঃসঙ্গ স্বভাবের জন্যই মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ্ বহুসংখ্যক অনুগামীর মধ্যেও একান্তভাবে একক ও নিঃসঙ্গ মানুষ ছিলেন। তাঁর ঘনিষ্ঠ বন্ধু-বান্ধব বলতে কেউ ছিল না। রাজনীতি ও আইনের ক্ষেত্রের বাইরে তাঁর তেমন কোন সাফল্যও দেখা যায়নি।

কিন্তু তাঁর জ্ঞান ও অভিজ্ঞতার সীমার মধ্যে তাঁর বিরাটত্ব নিহিত ছিল না। এই শ্রেষ্ঠত্ব নিহিত ছিল তাঁর সঠিক অনুভূতি ও নির্ভুল সূক্ষ্ম মানসিক চিন্তা ও অদম্য সাহসের মধ্যে। অনন্য চিন্তা ও বিরাট ব্যক্তিত্ব তাঁকে বিখ্যাত করেনি। করেছিল তাঁর সুউচ্চ একাকীত্ব ও সরল স্বভাবের জন্য। তাঁর স্থায়ী

www.amarboi.org

আনন্দময় স্বভাব ও অসাধারণ সাহসী কর্তব্যনিষ্ঠা এবং সে সঙ্গে ব্যক্তিগত জীবনে চমৎকার নীতিমালার অনুসরণ ও জনজীবনে সর্বদা বিশুদ্ধতা রক্ষার মধ্যেই ছিল তাঁর শ্রেষ্ঠত্ব।"

জিন্নাহকে স্বভাবের দিক থেকে হিমশীতল ও ভাবাবেগহীন মনে হলেও তার মনের গভীরে যে মানবিক গুণের একটি ফল্গুধারার অস্তিত্ব ছিল, যেটা সরোজিনী নাইডু জিন্নাহ সম্বন্ধে তার লেখায় বহুবার উল্লেখ করেছিলেন, তার প্রমাণ কয়েকটি ঘটনা থেকে পাওয়া যায়। প্রখ্যাত সাংবাদিক বি. কৃপালনী তার ১৭-৩-৮৩ সনে প্রকাশিত (Jinnah's Last Legal Battle) বইতে লিখেছেন পাঁচ বৎসর পূর্বে আইন ব্যবসা ছেড়ে দিলেও তিনি এক বন্ধু পুত্রের অনুরোধে আগ্রায় এসে এক হিন্দু ব্যাবসায়ীর পুত্রকে ম্যাজিষ্ট্রেট কোর্ট থেকে খালাস করেন।

বসন্ত কৃপালিনী তার স্মৃতি কথায় লিখেছেন, জিন্নাহর করাচিতে একজন হিন্দু বন্ধুর পুত্র হিসাবে আমি যখন একজন হিন্দু ব্যবসায়ীর পুত্রকে রক্ষা করতে অনুরোধ জানাই তখন তিনি সে অনুরোধ রক্ষা করেন। যুবকটির বিরুদ্ধে সেখানকার সামরিক ও বেসামরিক কর্তৃপক্ষ অভিযোগ করেছিল যে, সে তাদেরকে উৎকোচ দিতে অঙ্গিকার করেছিল। যাহোক বন্ধুপুত্র বসন্ত কৃপালনীর অনুরোধে জিন্নাহ আগ্রায় ম্যাজিস্ট্রেটের কোর্টে উপস্থিত হয়ে বিনা পারিশ্রমিকে যুবকটির পক্ষ সমর্থন করে তাকে বিপদ মুক্ত করেন। এখানে স্মরণীয় সে সময়টি হচ্ছে ১৯৪২ সন যখন পাকিস্তান আন্দোলনের জন্য জিন্নাহ সকল হিন্দু মহলে নিন্দিত ও ঘৃনিত। এ ঘটনা থেকে প্রতীয়মান হয় জিন্নাহ কতখানি অসাম্প্রদায়িক ছিলেন এবং বিপদগ্রস্ত মানুষের জন্য তার মানবিক অনুভূতি কত গভীর ছিল।

জিন্নাহর ব্যক্তিগত পরিচারক ছিল একজন হিন্দু, নাম ভগবান ধোন্ডে। জিন্নাহ তাকে খুব বিশ্বাস করতেন এবং তার ওপর একান্ত নির্ভরশীল ছিলেন। বসন্ত কৃপালনী লিখেছেন আর্থিকভাবে সাহায্য করার জন্যে জিন্নাহ ভগবান ধোন্ডেকে তার ব্যক্তিগত পরিচারক করে রেখেছিলেন।

পাকিস্তানে অবস্থানকারী সাংবাদিক এম. এস. এম. শর্মার কাছে জিন্নাহ নিজেকে সংখ্যালঘুদের সংরক্ষক বলে পরিচয় দেন। একবার উদ্বাস্তু শিবিরগুলি দেখতে গিয়ে দাঙ্গায় ক্ষতিগ্রস্ত ও পাকিস্তান ত্যাগে প্রস্তুত হিন্দু উদ্বাস্তুদের দুঃখ-দুর্দশা দেখে জিন্নাহর চোখ অশ্রুপূর্ণ হয়ে উঠে এবং গন্ড বেয়ে অশ্রুধারা

www.amarboi.org

পড়তে থাকে। তিনি দৃশ্যটি সহ্য করতে না পেরে তাড়াতাড়ি স্থান ত্যাগ করেন। এসব ঘটনা জিন্নাহর মানবিক গুণের বিশেষ দিকের পরিচয় বহন করে। (সূত্রঃ জিন্নাহ-পাকিস্তান নূতন ভাবনা পৃষ্ঠা ৭ ও ২৮৯)

'৪৮ সনের ফেব্রুয়ারী এবং মার্চ পর্যন্ত জিন্নাহ দীর্ঘসময় ধরে তাঁর টেবিলে বসে কাজ করে যাচ্ছিলেন। তাঁর সইয়ের জন্য যত বিল আসছিল সেগুলি তন্নতন্ন করে পড়ে দেখছিলেন। '৪৮ সনের এপ্রিলে যখন ভারতীয় সৈন্যেরা আজাদ কাশ্মীর দখল করে নেওয়ার উপক্রম করল তখন পাকিস্তান কাশ্মীরে নিয়মিত সৈন্য পাঠাল। জিন্নাহর জীবিতকাল পর্যন্ত কাশ্মীরে যুদ্ধ চলছিল। ডিসেম্বরে কাশ্মীর ইস্যু জাতিসংঘের সিকিউরিটি কাউন্সিলে উত্থাপিত হল। জিন্নাহর মৃত্যুর প্রায় চার মাস পর জাতিসংঘের উদ্যোগে কাশ্মীরে সীজ ফায়ার ঘোষিত হয়েছিল।

এ সময় '৪৮-এর মার্চে জিন্নাহ পূর্ব-পাকিস্তানে এসে তাঁর দেশবাসীকে একতাবদ্ধ করবার একটা শেষ চেষ্টা করলেন। তিনি ঢাকার ছাত্র সম্প্রদায়কে উদ্দেশ্য করে বলেছিলেন-

My young friends, students who are present here, let me tell you as one who has always had love and affection for you, as one who has served you for ten years faithfully and loyally; let me give you this word of warning. You will be making the greatest mistake if you allow yourself to be exploited by one political party or the other.

আমার তরুণ বন্ধু এবং ছাত্রগণ যারা এখানে উপস্থিত রয়েছ, যাদের জন্য আমার সবসময় স্নেহ এবং ভালবাসা রয়েছে এবং যাদেরকে আমি গত দশ বৎসর ধরে বিশ্বস্থতা ও আনুগত্যের সঙ্গে সেবা করে আসছি তাদেরকে আমি এই সাবধান বাণী উচ্চারণ করছি তোমরা কখনও যে কোন রাজনৈতিক দলের দ্বারা পরিচালিত হওয়ার মত ভুল করো না।

তিনি উর্দুকে রাষ্ট্রভাষা করে সমগ্র পাকিস্তানকে এক রাষ্ট্রীয় বন্ধনে আবদ্ধ করবার চেষ্টা করলেন।কিন্তু পূর্ব-পাকিস্তানের অধিবাসীরা ছাত্র-জনতা-নির্বিশেষে উর্দুকে রাষ্ট্রভাষা হিসাবে স্বীকার করতে রাজী হলো না। উর্দুকে রাষ্ট্রভাষা করার ব্যাপারে তিনি দৃঢ় সংকল্প ব্যক্ত করলেন। কেন তিনি উর্দুকে রাষ্ট্রভাষা করতে চেয়েছিলেন, যে ভাষা তাঁর নিজেরও মাতৃভাষা ছিল

www.amarboi.org

না, কি রাজনৈতিক কারণে তিনি এ সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন তা এ পুস্তকের ভূমিকাতে সবিস্তারে আলোচিত হয়েছে। তাই এখানে তার পুনরোল্লেখ নিষ্প্রোয়োজন।

মার্চে ঢাকা থেকে ফেরার পর বাকী সাত মাস অর্থাৎ মৃত্যুর আগ পর্যন্ত রাষ্ট্রভাষা সম্পর্কে তিনি আর কখনও কোন মন্তব্য করেননি। এতে মনে হয় হয়ত ভাষার ব্যাপারে তিনি তাঁর ভুল বুঝতে পেরেছিলেন নয়ত পূর্ব-পাকিস্তানের নেতারা তাঁকে এখানের সঠিক পরিস্থিতি সম্পর্কে ভুল তথ্য দিয়েছিলেন।

এপ্রিলের ১৫ তারিখ থেকে ৭ দিন পর্যন্ত জিন্নাহ উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশে অনেকগুলি সংবর্ধনা ও বক্তৃতার শেষে যখন করাচী ফিরে আসেন তখন তিনি অত্যন্ত পীড়িত হয়ে পড়েছিলেন এবং অধিক্ষণ কাজ করা তাঁর পক্ষে আর সম্ভব ছিল না। তাঁর সেক্রেটারীর ভাষায়ঃ তখন তিনি অধিকাংশ সময় উপরতলায় নিজের কামরায় থাকতেন ও সোফায় শুয়ে পত্রিকা পড়তেন। এসময় পাঞ্জাবের গভর্ণর স্যার ফ্রন্সিস মোদীর মতে, তিনি পাঞ্জাবের মন্ত্রীবর্গের সঙ্গে অনেক ব্যাপারে গভীরভাবে দ্বি-মত পোষণ করছিলেন।

মে মাসে কায়েদে আযম একজন নতুন নেভাল এডিসি নিযুক্ত করলেন। এর নাম ছিল লেঃ মাজহার আহম্মেদ যিনি তাঁর মৃত্যু পর্যন্ত সঙ্গে ছিলেন। জুন মাসে কোয়েটা থেকে ৭০ মাইল দূরে জিয়ারত বলে একটি স্থানের বাংলো বাড়িতে বিশ্রামের জন্য তাঁকে নেওয়া হয়। এই বাংলোটি উঁচু পাহাড়ের উপর ছিল, যেখানে ছিল একটি টেনিস কোর্ট, অনেকগুলি ফলবৃক্ষ শোভিত একটি বাগান যার মধ্যে ছিল জুনিপার ও বন্য লেভেন্ডার পুষ্পরাজি। লেঃ মাজহার বলেন, আমরা আশা করেছিলাম তিনি এখানে বিশ্রাম নেবেন কিন্তু তা হল না, কারণ এটা ছিল তাঁর স্বভাব বিরুদ্ধ। করাচী থেকে বড় বড় বাক্সে তাঁর কাছে সরকারী কাগজপত্র আসতে আরম্ভ করল এবং তিনি দুর্বল হাতে সেগুলি দেখতে লাগলেন। লেঃ মাজহার আরো বলেছেন মিঃ জিন্নাহ সব ব্যাপারে এত নিয়মতান্ত্রিক ও শিষ্টাচার প্রিয় ছিলেন যে, তাঁকে আমার সবসময় ভীতিপ্রদ মনে হত। কিন্তু কখনও কখনও তাঁর কঠোরতা খানিকটা শিথিল হত এবং আমাদের যাতে মঙ্গল হয় এমন অনেক গল্প আমাদের শুনাতেন। আমার মনে আছে একবার তিনি সিমলাতে জাক্কু হিলস্-এ বেড়াতে গিয়ে তাঁর অভিজ্ঞতার একটি বিবরণ দিয়েছিলেন। তাঁর পকেটে তখন চিনাবাদাম ছিল এবং বেড়াতে

www.amarboi.org

গিয়ে তিনি সেগুলি তথায় অবস্থানকারী বানরদিগের দিকে ছুঁড়ে দিয়েছিলেন। তিনি আশ্চর্য হয়ে দেখলেন, চিনাবাদামগুলি ছুঁড়ে দেওয়ার পর সেগুলি খাওয়ার জন্য বানরদের মধ্যে কোনরকম হুড়াহুড়ি দেখা গেল না। অতঃপর বেশ মোটাসোটা বৃদ্ধ একটি বানর গাছ থেকে নেমে এল এবং চিনাবাদামগুলির দিকে অগ্রসর হল। বানরগুলির মধ্যে কিচিরমিচির বন্ধ হয়ে গেল। তারা তাদের দলপতির জন্য পথ করে দিল এবং দলপতি আহার না করা পর্যন্ত তারা খেল না, জিন্নাহ্ এই গল্প শেষ করে বললেন; দেখ, এমনকি বানরদরে মধ্যেও শৃঙ্খলাবোধ রয়েছে।

সরকারী অর্থ ব্যয়ের ব্যাপারেও তিনি কতটা মিতব্যয়ী ছিলেন নিম্নোক্ত ঘটনা থেকে প্রমাণ পাওয়া যায় ঃ

লেঃ মাজহার বলেন, জিন্নাহ্ একদিন তাঁর জন্য কয়েকটি গরম হাতকাটা জামা কিনে আনতে বললেন। কোয়েটার একটি দোকান থেকে কিনে এনে একবার ধুলে দেখা গেল তাতে অনেকগুলি ছিদ্র হয়ে গেছে। দোকানে নিয়ে যাওয়ার পর দোকানদার সেগুলি রিপু করে দিল। কায়েদে আযম বললেন, জিনিসগুলি নিম্নমানের তাই দোকানদারকে বল দাম কিছুটা কমিয়ে নিতে। আমি গিয়ে দোকানদারকে বললে সে পাঁচ টাকা ফেরৎ দিল। এতে জিন্নাহ উৎফুল্ল হয়ে বললেন, 'দেখলে তো? টাকার মূল্য বুঝতে শেখ।"

জিন্নাহ্ যখন জিয়ারতে বিশ্রাম নিচ্ছিলেন, এসময় করাচীতে গভর্ণর জেনারেলের বাড়ীর পাশে পাকিস্তান স্টেট ব্যাংকের বিরাট ভবন তৈরী হল। এই ব্যাংকের ভিতর দিয়ে মূর্ত হয়ে উঠল জিন্নাহ্র আজীবনের স্বাধীন পাকিস্তানের স্বপ্ন, তার স্বাধীন অর্থনীতি ও মুদ্রা ব্যবস্থা।

এই দুর্বল অসুস্থ শরীর নিয়েও সকলের নিষেধ সত্ত্বেও জিন্নাহ্ পাকিস্তান স্টেট ব্যাংক উদ্বোধন করতে জিয়ারত থেকে প্লেনে করাচী এসে পৌঁছালেন। দুর্বলতার কারণে তাঁর কণ্ঠস্বরে তেমন জোর ছিল না তথাপি উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে তিনি যে ভাষণ দিলেন তা যেমনই ছিল সুস্পষ্ট তেমনি আকর্ষণীয়। প্রত্যেকটি শব্দ তিনি সুস্পষ্টভাবে উচ্চারণ করছিলেন এবং যেখানে যেখানে জোর দেওয়ার ছিল সুনিপুণ অভিনেতার মত সেখানে যথাযথ জোরালো ভাবে উচ্চারণ করছিলেন। তিনি বললেন, 'মিঃ গভর্ণর, স্টেট ব্যাংকের পরিচালকবর্গ, ভদ্র মহোদয় ও মহিলাগণ! স্টেট ব্যাংকের উদ্বোধন আমাদের রাষ্ট্রের অর্থনৈতিক

www.amarboi.org

জগতে আমাদের সার্বভৌমত্বের পরিচায়ক। আজকে এই উদ্বোধন অনুষ্ঠান সম্পন্ন করতে পারার জন্য আমি আনন্দিত। তাঁর ভাষণের শেষদিকে তিনি কতগুলি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কথা বললেন, যেগুলি পশ্চিমা অর্থনীতি মানুষের জীবনে যে জটিলতা ও অসাম্য সৃষ্টি করেছে তার প্রেক্ষিতে খুবই গুরুত্বপূর্ণ। তিনি বললেন,

The economic system of the West has created almost insoluble problems for humanity, and to many of us it appears that only a miracle can save it from the disaster that is now facing the world. It has failed to do justice between man and man and to eradicate friction from the international field. On the contrary, it was largely responsible for the two world wars in the last half-century. The Western world, in spite of its advantages, of mechanization and industrial efficiency, is today in a worse mess than ever before in histroy. The adoption of Western economic theory and practice will not help us in achieving our goal of creating a happy and contented people. We must work our destiny in our won way, and present to the world an economic system based on the true Islamic concept of equality of mankind and social justice. We will thereby be fulfilling our mission as Muslims and giving to humanity the message of peace which alone can save it and secure the welfare, happiness and prosperity of mankind.

'পশ্চিমা ধাঁচের অর্থনীতি আজকে মানব জীবনে সমাধানহীন কতকগুলি সমস্যার সৃষ্টি করেছে। আমাদের অনেকের মতে কোন একটি অলৌকিক ঘটনা ছাড়া বর্তমানে পৃথিবী যে বিপর্যয়ের সম্মুখীন হচ্ছে তার থেকে মুক্তি পাবে না। এই অর্থনীতি মানুষে মানুষে সাম্য প্রতিষ্ঠা করতে এবং আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে সংঘর্ষ বন্ধ করতে ব্যর্থ হয়েছে। অপরদিকে এই অসাম্যই গত পঞ্চাশ বছরে বিগত দুইটি বিশ্ব যুদ্ধের কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। পশ্চিমা জগত তার যান্ত্রিক উন্নতি ও শিল্প ক্ষেত্রে দক্ষতা সত্ত্বেও আজকে ইতিহাসের সর্বাপেক্ষা বিশৃঙ্খল অবস্থায় নিপতিত হয়েছে। পশ্চিমা ধাঁচের অর্থনৈতিক নীতি গ্রহণ ও অনুসরণ, আমাদের যা লক্ষ্য একটা সুখী ও পরিতৃপ্ত জাতি গঠন কোনভাবে তার সহায়ক হবে না। আমাদের জাতির ভাগ্য আমাদের নিজেদের ঈপ্সিত পথেই গড়ে

www.amarboi.org

তুলতে হবে। আমরা জগতের কাছে এমন একটি অর্থনীতি উপস্থাপন করব যেটি ইসলামিক ন্যায়নীতি, মানব কল্যাণ ও সামাজিক ন্যায়পরায়ণতার উপর ভিত্তি করে রচিত হবে। এই পথে আমরা মুসলমান হিসাবে এমন একটি আদর্শকে রূপ দেব যা মানব জাতিকে শান্তির পথ প্রদর্শন করবে, একমাত্র সে পথে আসবে মানবজাতির নিরাপত্তা, কল্যাণ, সুখ ও সমৃদ্ধি'।

জিন্নাহর উপরোক্ত ভাষণ থেকে স্পষ্ট প্রতীয়মান হয় শুধু আইন ও রাজনীতিতে যে তাঁর প্রগাঢ় জ্ঞান ছিল তা নয়- অর্থনীতিতেও তাঁর জ্ঞান ছিল অত্যন্ত গভীর। পশ্চিমা অর্থনীতির শোষণ প্রক্রিয়ার সার্বিক রূপটি তাঁর চোখে স্পষ্ট ধরা দিয়েছিল। তাই ইসলামিক সাম্য ও ভাবধারার ভিত্তিতে একটি নূতন সামাজিক কল্যাণকর অর্থনৈতিক নিয়ম তিনি প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছিলেন।

স্টেট ব্যাংকের উদ্বোধন দিবস যতটুকু সম্ভব জাঁকজমকের সঙ্গে সম্পন্ন হয়েছিল। জিন্নাহ্ সাহেব মিস্ ফাতেমা জিন্নাহকে পাশে নিয়ে ছয় ঘোড়ার অশ্বকটে জাঁকজমকপূর্ণ পরিচ্ছদে সজ্জিত বডি গার্ডসহ্ করাচীর রাস্তা দিয়ে স্টেট ব্যাংক ভবনে গমন ও প্রত্যাবর্তন করেন। হাজার হাজার লোক তাঁকে স্পর্শ এবং সম্ভব না হলে তাঁর গাড়ীকে স্পর্শ করে তাদের মুক্তিদাতার প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রদর্শন করতে চেয়েছিল। কিন্তু পুলিশ ও নিরাপত্তা বাহিনীর লোকের হস্তক্ষেপে তা সম্ভব হয়নি। অনুষ্ঠান শেষে তিনি যখন প্রাসাদে ফিরে যান তখন তাঁকে অতিশয় দুর্বল দেখাচ্ছিল।

জিন্নাহর শেষ দিনগুলি

স্টেট ব্যাংকের উদ্বোধনের তেইশ দিন পরে জিন্নাহ্ জিয়ারতের বাংলোতে আবার ফিরে এলেন এবং একজন ডাক্তারের সার্বক্ষণিক তত্ত্বাবধানে তাঁকে রাখা হল। এই ডাক্তার হল বিলাতের গাঙ্গ হাসপাতালের একজন ডাক্তার যার নাম ছিল লেঃ কর্ণেল ইলাহী বক্স। জুলাই মাসের ৪ তারিখে ভোর বেলা তিনি জিন্নাহকে পরীক্ষা করে দেখলেন তিনি অত্যন্ত দুঃখজনকভাবে দুর্বল ও শীর্ণ হয়ে গেছেন। তাঁর রংও অনেকটা মলিন হয়ে গেছে।

জিন্নাহ্ বললেন, তাঁর শরীরে মারাত্মক কোন রোগ হয়নি। গত চল্লিশ বছর ধরে দিনে ১৪ ঘন্টা করে ক্রমাগত পরিশ্রমের ফলে তিনি দুর্বল হয়ে পড়েছেন। গত কয়েক বছর ধরে বৎসরে তাঁর একবার জ্বর ও কাশি হচ্ছিল।

www.amarboi.org

বোম্বের ডাক্তাররা বলছিল তাঁর ব্রংকাইটিস আছে। বৎসর দু'য়েক ধরে এর আক্রমণ একটু বেড়েছে। ডাঃ ইলাহী লক্ষ্য করলেন যে, জিন্নাহ্ কথা বলতে বলতে হাপাচ্ছিলেন। জিন্নাহ্ অনুযোগ করছিলেন তাঁর পাকস্থলীতে কিছুটা গণ্ডগোল আছে যার ফলে তিনি ক্রমাগত অসুস্থ্বোধ করছেন। পেটের দোষটা সেরে গেলেই তিনি সুস্থ্ হয়ে উঠবেন।

ডাঃ ইলাহী বক্স জিন্নাহর কথাকে বিশেষ গুরুত্ব দিলেন না। অন্যান্য ডাক্তারদের অভিমত নেওয়া হল এবং সবাই একমত হলেন যে, জিন্নাহ ফুসফুসের রোগে মৃত্যুবরণ করতে যাচ্ছেন। জিন্নাহকে সেবা-শুশ্রুষা করার জন্য সিস্টার ডানহাম নামে একজন মহিলা নার্সকে নিযুক্ত করা হল। মহিলা নার্সের নিযুক্তিতে জিন্নাহ্ প্রথমে আপত্তি করেছিলেন। তাঁর ইচ্ছা ছিল মিস্ জিন্নাহ্ই তাঁর দেখাশোনা করবে। যাহোক শেষ পর্যন্ত সিস্টার ডানহামের সেবা তিনি গ্রহণ করতে রাজি হলেন।

আগস্টের ৯ তারিখে চিকিৎসকরা সিদ্ধান্ত নিল কায়েদে আযমকে জিয়ারতের বিপদজ্জনক উচ্চতা থেকে কোয়েটার স্থানান্তরিত করতে হবে। তদনুসারে কায়েদের ইচ্ছা অনুযায়ী তাঁকে ভালভাবে পোষাক-পরিচ্ছদ পরিয়ে বহু কষ্টে স্ট্রেচারে করে গাড়িতে তুলে কোয়েটায় স্থানান্তরিত করা হল। তখন তাঁর ওজন ছিল মাত্র ৭০ পাউন্ড। ডাঃ মাজহার এবং তাঁর সঙ্গীরা লক্ষ্য করলেন জিয়ারত থেকে কোয়েটায় আসার প্রস্তুতির সময় অতীত জীবনে পোশাক-পরিচ্ছদ, আচার-আচরণে তিনি সারাজীবন যে আভিজাত্য বজায় রেখে চলেছিলেন তা যেন পুরাপুরি অনুসরণ করা হয় এ সম্পর্কে তিনি পূর্ণ মাত্রায় সচেতন ছিলেন।

১৬ই আগস্ট জিন্নাহ ক্ষাণিকটা সুস্থ্ হলেন এবং দিনে একঘন্টা সরকারী কাগজপত্র দেখতে লাগলেন। এ সময় চৌধুরী মোহাম্মদ আলী করাচী থেকে কোয়েটায় এসে কায়েদে আযমকে দেখলেন এবং তাঁর মনে হল মানসিক দিক থেকে তিনি আগের মতই সচেতন ও আত্মনির্ভরশীল রয়েছেন। এর কয়েকদিন পরে জিন্নাহ্ উঠে তাঁর নিজের ঘরে ক্ষাণিকটা হাটাচলা করতে সক্ষম হলেন। তিনি স্পাগাতি, পিচফল ও আঙুর খেতে লাগলেন এবং করাচী ফেরার ইচ্ছা প্রকাশ করলেন। তিনি বললেন, আমি হেঁটে যেতে চাই এবং আমার কামরা থেকে আমাকে স্ট্রেচারে করে আমাকে বহন করা হউক এটা আমি চাই না।

www.amarboi.org

ডাঃ মাজহারের মতে, তাঁর জীবনী শক্তির এটাই ছিল শেষ প্রকাশ। ২৯শে আগস্ট তিনি ডাঃ ইলাহী বক্সকে বললেন, "জান, তুমি যখন প্রথম জিয়ারতে এসেছিলে আমি তখন বাঁচতে চেয়েছিলাম। এখন আমি বাঁচি কি মরি তাতে কিছু যায় আসে না।"

ডাঃ বক্স তাঁর ডায়েরীতে পরে লিখেছেন আমি জিন্নাহর চোখে অশ্রু দেখলাম ... ... জীবনের প্রতি এই বিতৃষ্ণার কি কারণ তা আমি বুঝতে পারলাম না। তিনি যুক্তি দেখালেন তাঁর কর্তব্য সম্পন্ন হয়ে গেছে এটা আমার বিশ্বাস হল না। আমার মনে হল তাঁর উত্তর অনেকটা হেঁয়ালীপূর্ণ ও এড়িয়ে যাওয়া গোছের। পাঁচ সপ্তাহ পূর্বে তাঁর কাজ কি অসম্পূর্ণ ছিল? এরমধ্যে তিনি এমন কি কাজ করেছেন যার ফলে তাঁর মনে হল তাঁর সকল প্রচেষ্টা সফল হয়েছে? আমার মনে হল এমন কিছু এর মধ্যে ঘটেছে যার ফলে তাঁর আর বেঁচে থাকার আগ্রহ নষ্ট হয়ে গেছে।

সেপ্টেম্বরের ৫ তারিখে কায়েদে আযম নিমোনিয়ায় আক্রান্ত হলেন এবং তিনদিন পর্যন্ত তিনি ক্রমবর্ধমান শারীরিক উত্তাপ ও অস্থিরতার মধ্যে কাটালেন এবং এসময় মৃত্যুর দ্বারপ্রান্তে অচৈতন্য অবস্থায় তাঁর মনের কথাগুলি বেরিয়ে আসতে লাগল। এগুলি বেশীর ভাগই কাশ্মীর সম্পর্কে। অচৈতন্য অবস্থায় তিনি একবার উচ্চকণ্ঠে রাগতস্বরে বললেন, "আজকে কাশ্মীর কমিশনের সঙ্গে আমার একটি এপয়েন্টমেন্ট আছে। তাঁরা কি এসেছে ? তাঁরা এখন কোথায়?"

ডাঃ বক্স ১০ই সেপ্টেম্বর মিস্ জিন্নাহকে বললেন তার ভাইয়ের আর দু'চারদিনের বেশী বাঁচার সম্ভাবনা নেই। পরদিন ভোরে করাচী থেকে তিনটি বিমান এসে কোয়েটায় নামল এবং কায়েদে আযমকে স্ট্রেচারে করে তাঁর বিশেষ বিমানে তোলা হল। বিমানের বৃটিশ পাইলট এবং তার সহকর্মীরা (ক্রুরা) লাইন বেঁধে দাঁড়ালেন এবং তাঁকে একটি মর্যাদাপূর্ণ অভিবাদন জানালেন। জিন্নাহ্ ধীরে ধীরে তাঁর দুর্বল হাত একটুখানি উঁচু করে অভিবাদনের উত্তর দিলেন। কয়েক মিনিটের মধ্যে বিমান সাত হাজার ফুট উপর দিয়ে কোয়েটার অসমতল পর্বত শ্রেণীর উপর দিয়ে উড়ে চলল।

বিকেল ৪-১৫ মিনিটে সেপ্টেম্বরের ১১ তারিখে বিমানটি মৌরীপুর বিমান ঘাঁটিতে অবতরণ করল। বিমান বন্দরে তাঁকে অভ্যর্থনা করার জন্য তেমন কোন লোকজন ছিল না। কারণ তাঁর ভ্রমণটি সম্পূর্ণ গোপন রাখা হয়েছিল। এমনকি প্রধানমন্ত্রীকেও কোয়েটা থেকে বিমান বন্দরে আসতে নিষেধ করে দেওয়া হয়েছে।

www.amarboi.org

জিন্নাহ্‌র মিলিটারী সেক্রেটারী কর্ণেল জিওফ্রে নোয়েলস্‌ দেখলেন বিমান থেকে স্ট্রেচারে করে কায়েদে আযমকে নামানো হচ্ছে। তখন আকাশে কড়া রোদ ছিল। কায়েদে আযম তাঁর আচ্ছাদনের নিচ থেকে হাত উঁচু করে সূর্যের আলো থেকে নিজের চোখকে আড়াল করবার চেষ্টা করছিলেন।

একটি সামরিক এম্বুলেন্সে স্ট্রেচারটি তোলা হল। মিস্‌ জিন্নাহ্‌ ও সিস্টার ডানহাম এম্বুলেন্সে উঠার পর যাত্রা আরম্ভ হল। ক্ষুদ্র শোভাযাত্রাটি শহরের বাইরে একটি জনাকীর্ণ উদ্বাস্তু শিবিরের কাছাকাছি আসার সঙ্গে সঙ্গে এম্বুলেন্সটি অচল হয়ে পড়ল। প্রায় ঘন্টাখানেক ধরে ড্রাইভার এম্বুলেন্সটির ইঞ্জিনকে সচল করবার চেষ্টা করল কিন্তু সফল হল না। ইতিমধ্যে করাচী থেকে আর একটি এম্বুলেন্স এসে হাজির হল।

সিস্টার ডানহাম এই এক ঘন্টার কষ্টকর প্রতিক্ষার একটি মর্মান্তিক বিবরণ দিয়েছেন। "আমরা তখনও রিফিউজি ক্যাম্পের পাশে কাদা আবর্জনা ও সেই সঙ্গে শত শত মাছির মধ্যে অপেক্ষা করছিলাম। আমি কোনরকমে একটি কার্ড বোর্ডের টুকরা সংগ্রহ করে মিঃ জিন্নাহ্‌র মুখে বাতাস করে মাছিগুলি তাড়াতে লাগলাম। আমি তাঁর সঙ্গে কয়েক মিনিট সম্পূর্ণ একা ছিলাম এবং তিনি আমার দিকে এমনভাবে তাকালেন যা আমি কখনও ভুলতে পারব না। তিনি তার চাদরের নিচ থেকে হাতটি মুক্ত করলেন এবং সে হাতটি আমার বাহুর উপরে ন্যস্ত করলেন। তিনি কোন কথা বললেন না। কিন্তু তাঁর চোখ দু'টিতে একটি কৃতজ্ঞতার ভাব পরিষ্কার ফুঠে উঠল। তাঁর জন্য এ যাবৎ আমি যা কিছু করেছি ঐ দৃষ্টিতেই আমি তার সম্পূর্ণ পুরষ্কার পেয়ে গেলাম। তাঁর সমস্ত হৃদয় যেন ঐ মুহূর্তে তাঁর দু'চোখে এসে অবস্থান নিয়েছিল।

যাত্রার শেষ পর্ব আরম্ভ হল। এম্বুলেন্সে কোন পতাকা ছিল না তাই জনগণের ভীড়ের ভিতর দিয়ে সবার অলক্ষ্যে এগিয়ে চলল। ৬-১০ মিনিটের সময় এম্বুলেন্স এসে গভর্ণমেন্ট হাউসের সামনে দাঁড়াল এবং কায়েদকে তাঁর কামরায় নিয়ে যাওয়া হল। চিকিৎসকেরা এবং সিস্টার ডানহাম তাঁকে একটি হার্ট টনিক দিয়ে কিছুটা সুস্থ করবার চেষ্টা করলেন। কিন্তু তিনি এত দুর্বল ছিলেন যে, সমস্ত ঔষধই তাঁর মুখের ওষ্ঠ বেয়ে বেরিয়ে আসল। এ সময় ডাক্তাররা তাঁর বিছানার প্রান্ত উপর দিকে উঠিয়ে তাঁর হৃদপিণ্ডে রক্ত সঞ্চালনের চেষ্টা করলেন। সে সঙ্গে ইনজেকশনের মারফত তাঁর শরীরে ঔষধ প্রবিষ্ট করাবার চেষ্টা বিফল হল। রাত্রি ৯-৫০ মিনিটে ডাঃ বক্স জিন্নাহ্‌কে কানে কানে বললেন, 'স্যার, আমরা আপনাকে একটি ইনজেকশন দিয়েছি যা আপনাকে একটু সতেজ করে তুলবে। আল্লাহ্‌ চাহেত আপনি বেঁচে উঠবেন।'

www.amarboi.org

জিন্নাহ মাথা নাড়লেন এবং শেষবারের মত কথা বললেন। তিনি খুব অস্পষ্ট স্বরে বললেন, ‘না, আমি জানি তা হবে না। এর আধা ঘন্টা পরে তিনি মৃত্যুবরণ করলেন।

সমস্ত রাত ধরে শহরের সমস্ত বাজারে মহল্লায় জিন্নাহর মৃত্যুর খবর কানে কানে এবং সশব্দে প্রচারিত হয়ে গেল। হাজার হাজার লোক গভর্ণমেন্ট হাউসের সুউঁচ্চ কালো দেয়ালের পাশে এসে দাঁড়াল। হাজার হাজার মানুষ সাদা পোশাকে অন্ধকারে ঘুরে বেড়াতে লাগল এবং উত্তেজিত জনতা তাঁর প্রাসাদের দেয়াল স্পর্শ করে নীরবে প্রার্থনা জানাতে লাগল।

কিছুক্ষণ পর ধীরে ধীরে একজন লোক কাফন হাতে একটি ছোট শিশি নিয়ে জনতার ভিতর থেকে এগিয়ে এল। কাফনটি জমজমের পানিতে ভিজানো ছিল এবং শিশিটিতে কিছু আতর ছিল যা মদিনায় নবীর কবরের উপরে এক সময় এটা ছিটানো হয়েছিল। এই জিনিসগুলি লোকটি হজ্জ্ব করতে গিয়ে ঐ সময় সঙ্গে এনেছিল। কায়েদে আযমকে এই কাফন পরিয়ে আতর ছিটিয়ে করাচি শহরের মধ্যখান যেখান থেকে ৭২ বৎসর পূর্বে শূন্য হাতে ধূলাবালি থেকে তিনি একজন সাধারণ বালক হিসেবে ওঠে এসেছিলেন সে শহরেরই কেন্দ্রস্থলে একজন যুগ স্রষ্টারূপে পাক ভারত উপমহাদেশের ৭ কোটি মুসলমানের মুক্তিদাতা হিসাবে শেষ শয্যা গ্রহণ করলেন।

ক্যাবিনেট মিশন প্লানের বাস্তবায়ন মুসলমানদের জন্য মঙ্গলকর হতো কি?

আজকের দিনে অনেকেরই ধারণা কংগ্রেস ক্যাবিনেট মিশন প্লানের মৌলিক ধারাগুলিকে নিজেদের মনমত ব্যাখ্যা করতে চাওয়ার ফলে যে জটিলতা সৃষ্টি হয়ে শেষ পর্যন্ত প্লান পরিত্যক্ত হয় তাতে মুসলমানদের ক্ষতি হয় সব চাইতে বেশী। তারা মনে করে এই প্লানের ভিত্তিতে কাজ আরম্ভ হলে ধীরে ধীরে কংগ্রেস-লীগের মধ্যে একটা ঐক্যের মনোভাব গড়ে উঠত। দেশও ভাগ হতো না এবং বর্তমানে ভারত উপমহাদেশব্যাপী দিন দিন হিন্দু মুসলমানদের মধ্যে যে তিক্ততা সৃষ্টি হয়েছে তাও হতো না। প্রায় স্বাধীন তিনটি গ্রুপ একটি দুর্বল কেন্দ্রের কাছ থেকে উপযুক্ত ও ন্যায়সঙ্গত ব্যবহার পেতে থাকলে গ্রুপ ‘বি’ ও ‘সি’-এর মুসলমান প্রদেশগুলি আর কেন্দ্রের সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করার কথা চিন্তা করতো না বরং কেন্দ্রকে আরও অধিকভাবে সবল করে তোলার জন্য কার্যকরী ব্যবস্থা গ্রহণে সম্মত হত।

www.amarboi.org

ক্যাবিনেট মিশন প্লানের ভিত্তিতে কংগ্রেস-লীগের মধ্যে একটা রাজনৈতিক মিমাংসা হয়ে গেলে চল্লিশের দশক ও তার পূর্ববর্তী দশকগুলিতে ভারতব্যাপী বিভিন্ন প্রদেশে যে হিন্দু-মুসলিম দাঙ্গা হচ্ছিল তাও হওয়ার সম্ভাবনা কমে যেত এই কারণে যে, একটি হিন্দু সংখ্যাগরিষ্ঠ প্রদেশে মুসলমানদের উপর অত্যাচার হলে তার প্রতিক্রিয়ায় অন্য একটি মুসলিম প্রদেশে হিন্দুদের উপর অত্যাচার হবে এই ভয়ে হিন্দু ও মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ প্রদেশের রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ, সরকার নিজেদের এলাকার সংখ্যালঘুদের সঙ্গে ভাল ব্যবহার করতে মানসিক তাগিদবোধ করত। এইভাবে সমগ্র ভারতব্যাপী একটা পাস্পরিক সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির ভারসাম্য রক্ষার প্রবণতা দেখা দিত।

সাধারণভাবে চিন্তা করলে এরূপ ঘটাই সবাইর কাছে স্বাভাবিক বলে মনে হয়। কিন্তু একটু গভীরভাবে চিন্তা করলে দেখা যায় সবকিছু এরূপ সঠিকভাবে না ঘটারই সম্ভাবনা ছিল অধিক। বহু যুগ ধরে নানাবিধ স্বার্থের সংঘাতের কারণে হিন্দু-মুসলমান জনগণ ও নেতাদের মধ্যে যে পারস্পরিক বিদ্বেষ ও অবিশ্বাস জন্ম লাভ করেছিল তা একটা সাময়িক বুঝাপড়ার কারণে কিছুদিনের জন্য স্তিমিত হয়ে পড়লেও পারস্পরিক স্বার্থের সংঘাতে আবার যে পুনর্জীবিত না হতো তার কোন নিশ্চয়তা ছিল না। কেন্দ্রে হিন্দুরা যেহেতু সংখ্যাগরিষ্ঠ থাকত তাই সামরিক, বহির্বাণিজ্য, বৈদেশিক, অর্থনীতি, যোগাযোগ সব বিভাগ তারাই নিয়ন্ত্রণ করত এবং মুসলমানদের ন্যায্য দাবি কখনও উপেক্ষিত হলে যেহেতু কারও কাছে আপীল করবার কোন সুযোগ ছিল না সে অবস্থায় মুসলমানরা খুবই অসহায় হয়ে পড়ত। সামরিক বাহিনীর উপর আধিপত্যের সুযোগে কেন্দ্রীয় সরকার ক্রমান্বয়ে প্রদেশের অনেক ক্ষমতাই ধীরে ধীরে সঙ্কুচিত করে দিতে চাইত। কোন প্রদেশ এ ব্যাপারে বেশী আপত্তি করলে বা বিদ্রোহ করলে সৈন্যবাহিনী দিয়ে তাকে ঠাণ্ডা করে দিতে দ্বিধা করত না। তখনত আর ইংরেজ ভাইসরয় থাকত না যে মুসলমানরা ক্যাবিনেট মিশনের প্লানের চুক্তি লংঘিত হচ্ছে বলে তার কাছে প্রতিবাদ জানিয়ে সুবিচার প্রার্থনা করার সুযোগ পেত।

এ ছাড়া মুসলমানদের মধ্যে অনেকে যে এমনও মনে করে গ্রুপিং সিস্টেমে হিন্দু-মুসলিম প্রদেশগুলির শাসকেরা অন্যত্র তাদের সংখ্যালঘু স্ব-ধর্মীরা অত্যাচারিত হবে এই ভয়ে সঠিক আচরণ করতে বাধ্য হত এ ধারণাও বোধহয় ঠিক নয়। কারণ বিহারে মুসলমানরা নির্যাতিত হলে বাংলাদেশের মুসলমানরা তাদের সাহায্যে এগিয়ে যাবার কোন সুযোগই পেত না। তার কারণ বাংলা

www.amarboi.org

লর্ড ওয়াভেল ও লর্ড মাউন্টব্যাটেন

www.amarboi.org

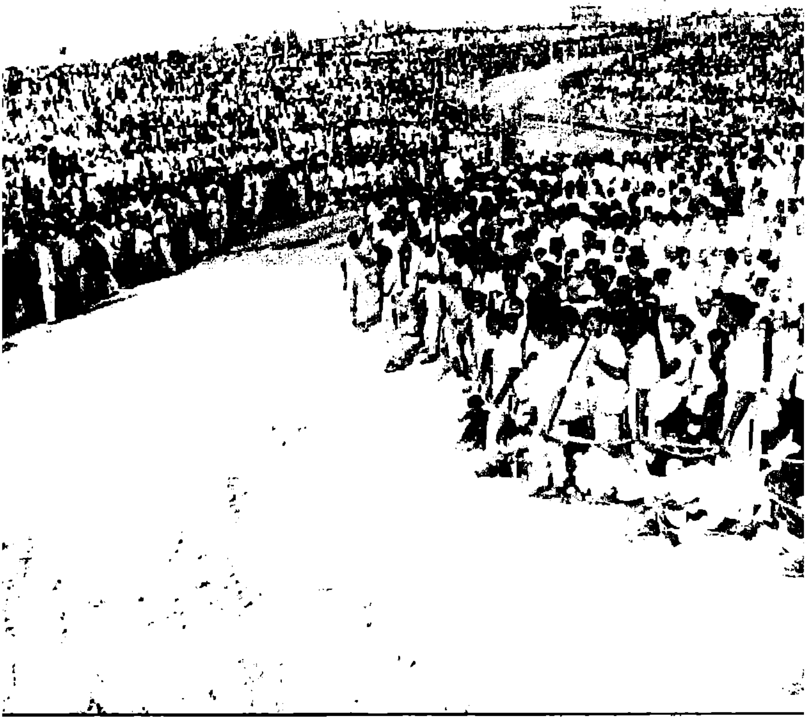

জিন্নাহর দাফনের সময় সমবেত জনতা

www.amarboi.org

থেকে কোন স্বেচ্ছাসেবক গ্রুপ বিহারে যেতে চেষ্টা করলে কেন্দ্রীয় সরকার রেল যোগাযোগ বাতিল করে দিয়ে সে চেষ্টা বন্ধ করে দিত। বিহারে স্বেচ্ছাসেবক না পাঠিয়ে যদি বাংলার সংখ্যালঘু হিন্দুদের উপর অত্যাচার করে বিহারে স্ব-ধর্মীদের উপর অত্যাচারের প্রতিশোধ নেওয়ার চেষ্টা করত তা হলেও সফল হতো না। কারণ সেক্ষেত্রে কেন্দ্র সৈন্যবাহিনীর সহায়তায় বাংলার মুসলিম সরকারকে পিটিয়ে শায়েস্তা করে দিত।

ক্যাবিনেট মিশন প্লানের সাফল্য নির্ভর করত কংগ্রেস ও লীগ নেতৃবৃন্দের সত্যনিষ্ঠ আচরণের উপর। কিন্তু লীগের বরাবরই ভয় ছিল যে কংগ্রেস নেতৃবৃন্দ শেষ পর্যন্ত কখনই তাদের প্রতিশ্রুতি রক্ষা করবে না। তাদের লক্ষ্য ছিল ইংরেজদের চলে যাওয়ার আগে কোনভাবে ক্ষমতা করায়ত্ব করা। যেহেতু অখন্ড ভারতে তারা সংখ্যাগরিষ্ঠ তাই কেন্দ্রে তাদের আধিপত্য থাকার সুযোগে ক্ষমতা একবার হাতে পেলে মুসলমানদের সঙ্গে পরে যে ব্যবহারই করুক না কেন কেউ বাধা দিতে পারত না।

ইংরেজদের অবর্তমানে কংগ্রেসের এরূপ আচরণের সম্ভাব্যতা সম্পর্কে লীগ নেতাদের মনে ভয় জন্মানোর কারণ হলো কংগ্রেস নেতাদের অতীত আচরণ। অতীতে তারা ১৯১৬ সনের লক্ষ্মৌ প্যাক্টকে অস্বীকার করেছে। ১৯২০ সনের দিল্লীর মুসলিম প্রস্তাব স্বীকার করেও পরবর্তীতে অস্বীকার করতে দ্বিধা করেনি। সর্বশেষ বিশ্বাসঘাতক আচরণ হলো ১৯৩৬ সনের নির্বাচনের পর মুসলমানদের ক্ষমতার ভাগ না দিয়ে সংখ্যাগুরু প্রদেশগুলিতে কংগ্রেসী মন্ত্রীমন্ডল গঠন। নির্বাচনের পূর্বে লীগ ও কংগ্রেস নেতাদের মধ্যে একটা অলিখিত চুক্তি হয়েছিল যে নির্বাচনের পরে সকল হিন্দু-সংখ্যাগরিষ্ঠ প্রদেশে কংগ্রেস-লীগের সঙ্গে কোয়ালিশন সরকার গঠন করবে। কিন্তু নির্বাচনের পরে যখন কংগ্রেস সকল প্রদেশে একক সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করল তখন প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করে কোয়ালিশন সরকার গঠনে সম্পূর্ণ অস্বীকৃতি জানাল। মওলানা আবুল কালাম আজাদ যদিও প্রতিশ্রুতি রক্ষার জন্য জওহর লালকে অনেক পীড়াপীড়ি করেছিলেন কিন্তু শেষ পর্যন্ত সফল হননি।

উপরোক্ত তিনটি ঘটনার পর লীগ নেতারা কংগ্রেসের আগাম কোন প্রতিশ্রুতির উপর আর আস্থা স্থাপন করতে পারছিলেন না। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ শেষে বৃটিশ ভারত ত্যাগের জন্য প্রস্তুতি নিতে গিয়ে ক্ষমতা হস্তান্তরের জন্য লীগ-কংগ্রেসের বুঝাপড়ার জন্য ক্রমাগত চাপ দিয়ে যখন ব্যর্থ হলো তখন

www.amarboi.org

নিজেরাই ক্যাবিনেট মিশনের প্রস্তাব উপস্থাপন করেন। আপাততঃ পাকিস্তান দাবি এতে স্বীকৃত না হলেও পাকিস্তান দাবির কিছু সারাংশ এতে আছে একথা বিবেচনা করে প্রায় অনন্যপায় হয়ে লীগ পাকিস্তান দাবী ত্যাগ করে মিশন প্রস্তাব গ্রহণ করেছিল। এ প্রস্তাবে প্রদেশগুলির গ্রুপিং-এর অন্তর্ভূক্তি বাধ্যতামূলক ছিল। কিন্তু কয়েকদিন পরেই জওহর লাল যখন বললেন তিনি ও তাঁর কংগ্রেস এই বাধ্যবাধকতার শর্ত মানতে বাধ্য নয় এবং মিশন প্রস্তাব ইচ্ছামত ব্যাখ্যা করবার অধিকার তাদের রয়েছে তখন জিন্নাহ সাহেব কংগ্রেসের প্রতিশ্রুতির উপর সম্পূর্ণ আস্থা হারিয়ে ফেললেন। তিনি বললেন, ইংরেজরা ভারতে উপস্থিত থাকতেই যখন কংগ্রেস এরূপ কথায় কথায় প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করছে, ইচ্ছামত চুক্তির ব্যাখ্যা দিয়ে চলেছে তখন ইংরেজদের অবর্তমানে তারা কিরূপ আচরণ করবে তা সহজেই অনুমেয়। তাই তিনি মিশন প্রস্তাব থেকে সম্মতি প্রত্যাহার করে তার পুরানো পাকিস্তান দাবিতে ফিরে এলেন এবং এরপর শেষ পর্যন্ত কংগ্রেসের সম্মতিতেই দেশ ভাগ হলো।

দেশ বিভক্তি, যেটার জন্য জিন্নাহ সাহেবকে এককভাবে কোনক্রমেই দোষ দেওয়া যায় না সেটা ভারতীয় উপমহাদেশের মুসলমানদের জন্য ভাল হয়েছিল না-কি মন্দ হয়েছিল এটা এখনও খুবই বিতর্কিত বিষয় হয়ে রয়েছে। কেউ কেউ মনে করেন যে, দেশ বিভাগ না হলে ভারতের চৌদ্দ পনের কোটি মুসলমান বর্তমানে যেরূপ অসহায় হয়ে পড়েছে অখন্ড ভারতে তারা ততটা দুর্বল পরিস্থিতির সম্মুখীন হতো না। অখন্ড ভারতে সমগ্র মুসলমান সম্প্রদায় একটা বিশেষ শক্তি হিসাবে বিবেচিত হতো। বর্তমানে সারা ভারতব্যাপী তারা যেরূপ বিজেপি, আর. এস. এস. শিবসেনার আক্রমণের শিকার হচ্ছে- এরূপ অসহায় অবস্থার সম্মুখীন তাদের হতে হতো না। অনেকে কিন্তু এ ব্যাপারে ভিন্নমত পোষণ করেন। তারা মনে করেন দেশ বিভাগ হওয়ার ফলে ভারতের পশ্চিম ও পূর্ব অঞ্চলে অন্ততঃ বাইশ কোটি মুসলমান হিন্দু মৌলবাদীদের হিংস্র থাবার হাত থেকে আপাততঃ বেঁচে গিয়েছে। দেশ ভাগ না হলে বর্তমানে হিন্দুস্থানের পনর-ষোল কোটি মুসলমানদের যে দুরবস্থার সম্মুখীন হতে হচ্ছে অখন্ড ভারতে কেন্দ্রীয় সরকারের ক্ষমতা হিন্দুদের হাতে থাকত বলে সে ক্ষমতার নিষ্পেষণ থেকে রেহাই পাওয়ার কোন উপায়ই সর্ব ভারতীয় মুসলমানরা পেত না।

জিন্নাহ সাহেব ১৯০৬ সন থেকে ১৯২০ সন পর্যন্ত কংগ্রেসের একজন প্রথম শ্রেণীর জাতীয়তাবাদী নেতা থাকা অবস্থায় হিন্দু-মুসলমান মিলনের জন্য

www.amarboi.org

আপ্রাণ চেষ্টা করেছিলেন। হিন্দু-মুসলমান দুই সম্প্রদায়ের মধ্যে। অপসারণের পরে জীবন-ধারণ প্রণালী ও স্বার্থের ব্যাপারে যে কতকগুলি মৌলিক পার্থক্য কোন হাতই সে পার্থক্যগুলিকে স্বীকার করে নিয়ে সংবিধানে মুসলমানদের জন্য কিছু র... কবচের সুপারিশ তিনি হিন্দু মহাসভাপন্থী মৌলবাদীদের ভয়েই করেছিলেন। কংগ্রেসের মধ্যে কিছু কিছু উদার মনের লোক আছে এটা তিনি স্বীকার করতেন। তবে এটাও তিনি জানতেন যে, এই উদার মতাবলম্বীদের সংখ্যা এত কম যে শেষাবধি মৌলবাদী হিন্দু মহাসভাপন্থীদের চাপে এরা গুঁড়িয়ে যাবে এবং মুসলমানেরা শেষ পর্যন্ত অতীব বিপদের সম্মুখীন হবে। দেশ বিভক্তির সময় কংগ্রেস এবং লীগ নেতারা প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন যে, তারা নিজ নিজ ভূখন্ডে সংখ্যালঘুদের পূর্ণমাত্রায় নিরাপত্তার ব্যবস্থা করবেন।

দেশ ভাগের পর পাকিস্তান সরকার তাদের ওয়াদা পুরাপুরি রক্ষা করেছেন। পাকিস্তান হওয়ার পর শুধু ১৯৫০ সন ও ১৯৬৪ সনে মাত্র দু'বার সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা হয়েছিল আর ভারতে গত ৪৬ বৎসরে কয়েক হাজার বার সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা হয়েছে যাতে কয়েক লক্ষ মুসলমান এ যাবত নিহত হয়েছে। গত কয়েক বৎসর যাবত বাবরি মসজিদকে উপলক্ষ্য করে ভারতে বিভিন্ন রাজ্যে যেভাবে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার সৃষ্টি করে মুসলিম নিধন চলছে এবং সাম্প্রতিককালে বোম্বে, গুজরাট প্রভৃতি শহরে বিজেপি'র নেতৃত্বে যেভাবে পাইকারী হারে মুসলিম হত্যা হয়েছে এসব দেখার পর সাধারণভাবেই মুসলমানদের দৃঢ় বিশ্বাস জন্মেছে যে, হিন্দুদের কাছ থেকে মুসলমানরা কোনদিনই সুবিচার পেত না। বাবরি মসজিদের ব্যাপারে ভারতের ধর্ম নিরপেক্ষতার খোলস সম্পূর্ণভাবে উন্মোচিত হয়ে গিয়েছে। বাবরি মসজিদ ভাঙ্গার ব্যাপারে কংগ্রেস সরকারের যে মৌন সম্মতি ছিল এবং ভিতরে ভিতরে বিজেপিকে যে নরসীমা সরকার পূর্ণ সমর্থন দিয়েছে এতে কোন সন্দেহ নেই। কংগ্রেসের এই গোপন হিন্দু-প্রীতিকেই জিন্নাহ সাহেব দারুণভাবে ভয় ও অপছন্দ করতেন। শেষ পর্যন্ত হিন্দু স্বার্থের বেদীতে যে কংগ্রেস তার আদর্শকে জলাঞ্জলী দেবে এ সম্পর্কে জিন্নাহ সাহেব স্থির নিশ্চিত হয়েছিলেন। তাই তিনি মুসলিম লীগকে সংগঠিত করে পূর্ব ও পশ্চিম সীমান্তে মুসলমান সংখ্যাগরিষ্ঠ এলাকা নিয়ে মুসলমানদের স্বাধীন আবাসভূমি সৃষ্টি করে ভারতের অধিকাংশ মুসলমানকে হিন্দু আধিপত্য থেকে মুক্ত করতে চেয়েছিলেন।

পূর্ব ও পশ্চিম সীমান্তে যে এলাকা নিয়ে জিন্নাহ পাকিস্তানের কল্পনা করেছিলেন তাতে বাংলা, পাঞ্জাব অখন্ড ছিল এবং দু'টি প্রদেশেই মুসলমানেরা

www.amarboi.org

সংখ্যাগরিষ্ঠ ছিল। এভাবে যদি দেশ ভাগ হতো তবে হিন্দুস্থান-পাকিস্তান দুই অঞ্চলেই সংখ্যালঘুরা প্রায় সমান সংখ্যক হতো। সে অবস্থায় নিজের এলাকায় সংখ্যালঘুদের উপর অত্যাচার করে অন্যত্র স্ব-জাতীয় বা স্ব-ধর্মের লোকদেরকে বিপদের সম্মুখীন করতে হিন্দুস্থান পাকিস্তান দুই অঞ্চলের নেতারাই তিনবার চিন্তা করতো।

কিন্তু পরবর্তীতে লর্ড মাউন্টব্যাটেনের সহায়তায় কংগ্রেস যেভাবে পাঞ্জাব-বাংলাকে বিভক্ত করতে সমর্থ হলো ও প্রায় সমগ্র আসামকে হিন্দুস্থানের অন্তর্ভূক্ত করতে সক্ষম হলো তাতে পাকিস্তানে সংখ্যালঘু রইল কোটি সোয়া কোটি আর হিন্দুস্থানে মুসলিম সংখ্যালঘু পড়ে গেল প্রায় পাঁচ ছয় কোটির মত অর্থাৎ পাকিস্তানের সংখ্যালঘুদের তুলনায় চার গুণ। তাই হিন্দুস্থানের উগ্রপন্থী হিন্দু নেতারা দেশ বিভাগের পর থেকে মনে করে আসছে পাকিস্তানের এক দেড় কোটি হিন্দুকে ফিরিয়ে নিয়ে হিন্দুস্থানের পাঁচ ছয় কোটি মুসলমানদের হাত থেকে রেহাই পেলে তারা লাভবানই হবে। এ কারণেই দেশ বিভাগের পর থেকেই দাঙ্গা বাঁধাতে তারা ভয় পাচ্ছিল না। হিন্দুর চাইতে মুসলিম জনসংখ্যা বৃদ্ধি তুলনামূলকভাবে বেশী। বর্তমানে পাকিস্তান ও বাংলাদেশ মিলে সংখ্যালঘুর সংখ্যা প্রায় আড়াই কোটি। কিন্তু ভারতে প্রায় ১৪/১৫ কোটি। তাই তাদের সেই মনন ও চিন্তা এখনও বজায় রয়েছে।

প্রথম মহাযুদ্ধের সময় ভারতীয় মুসলমানরা যুদ্ধ জয়ের ব্যাপারে ইংরেজদের প্রভূতভাবে সাহায্য করেছিল এবং এর বিনিময়ে বৃটিশ সরকার মুসলমানদের প্রতিনিধি স্থানীয় প্রতিষ্ঠান লীগকে সুস্পষ্টভাবে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল যে, ভবিষ্যত সংবিধান রচনায় বা ক্ষমতা হস্তান্তরের সময় মুসলমানদের ন্যায়সঙ্গত স্বার্থ কংগ্রেসের অনুকূলে কখনও বিসর্জন দেওয়া হবে না। এ অবস্থায় জওহর লালের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ বন্ধুত্বের সম্পর্কে আবদ্ধ লেডী মাউন্টব্যাটেনের সহায়তায় মাউন্টব্যাটেনকে প্রভাবিত করে কংগ্রেস যে এভাবে দেশ ভাগে সক্ষম হবে, পাঞ্জাবের ও অখণ্ড বাংলার বহু মুসলিম সংখ্যাগুরু এলাকা হিন্দুস্থানে ঢুকিয়ে দিয়ে বৃটিশ মুসলমানদের সঙ্গে এভাবে বিশ্বাসঘাতকতা করবে এটা জিন্নাহ সাহেব বা লীগ নেতৃবৃন্দ-কল্পনাই করতে পারেননি। তাই পাঞ্জাব, বাংলার একটা বৃহৎ অংশ ও আসামকে ছেড়ে দিয়ে শুধু নিজে গভর্ণর জেনারেল হওয়ার লোভে খন্ডিত পাকিস্তান গ্রহণে জিন্নাহ রাজী হয়ে ভারতীয় মুসলমানদের স্বার্থ নষ্ট করেছিলেন বলে অনেকে যে

www.amarboi.org

দোষারোপ করে থাকেন সেটাও সঙ্গত নয়। ওয়াভেলের অপসারণের পরে মাউন্টব্যাটেন এসে যে অবস্থার সৃষ্টি করেছিল তার উপর জিন্নাহর কোন হাতই ছিল না। এটা মুসলিম জাতির সম্পূর্ণ দুর্ভাগ্য ও নিয়তির বিধান বলা চলে।

অনেকে মনে করেন জিন্নাহ নিজে পাকিস্তানের গভর্ণর জেনারেল না হয়ে লর্ড মাউন্টব্যাটেনকে হিন্দুস্থান-পাকিস্তানের যৌথ গভর্ণর জেনারেল করলে (যেটা মাউন্টব্যাটেনের নিজেরও ইচ্ছা ছিল) রেডক্লিপের রোঁয়েদাদে বিভিন্ন এলাকাভূক্তির ব্যাপারে পাকিস্তান যতটা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল এতটা ক্ষতিগ্রস্থ হতো না। এ চিন্তা বোধহয় সঠিক নয়। ক্ষমতা হস্তান্তরের আলোচনার প্রথমাবধি মাউন্টব্যাটেন কংগ্রেসের প্রতি যেরূপ পক্ষপাতিত্ব দেখাচ্ছিলেন তাতে জিন্নাহ মাউন্টব্যাটেনের উপর সম্পূর্ণভাবে আস্থা হারিয়ে ফেলেছিলেন এবং তাকে গভর্ণর জেনারেল করলে হিন্দুস্থানের স্বার্থে মাউন্টব্যাটেন নতুন পাকিস্তান রাষ্ট্রের আরও মারাত্মক ক্ষতি করতে পারে এই ভয়ের কারণেই জিন্নাহ তাকে যৌথ গভর্ণর জেনারেল করতে অস্বীকৃতি জানিয়েছিলেন। পূর্বাপর মাউন্টব্যাটেনের আচরণে জিন্নাহর এই ভয় যে একান্ত অমূলক ছিল একথা জোর দিয়ে বলা চলে না।

জিন্নাহ দ্বি-জাতিত্ত্বের নীতি কি বিসর্জন দিয়েছিলেন?

১১ ই আগস্ট '৪৭ সনে জিন্নাহ গণ-পরিষদে যে বক্তৃতা দিয়েছিলেন তাতে তিনি বলেছিলেন 'আজ থেকে হিন্দু আর হিন্দু থাকবে না, মুসলমান আর মুসলমান থাকবে না- অবশ্য ধর্মীয় দৃষ্টিকোণ থেকে নয়, কারণ ধর্ম হল ব্যক্তিগত ব্যাপার- সেটা হবে রাষ্ট্রের নাগরিক হিসাবে'। অনেকের ধারণা জিন্নাহ এই ভাষণের দ্বারা দ্বি-জাতি তত্ত্বকে অস্বীকার করেছিলেন। তাই দ্বি-জাতি তত্ত্ব শেষ পর্যন্ত মিথ্যা প্রমাণিত হয়েছে এবং জিন্নাহ আগাগোড়া ভুল করেছিলেন। এই অবস্থায় ভুলের ফসল যে পাকিস্তান ও বাংলাদেশের সৃষ্টি তাকে অস্বীকার করে পুনরায় ভারত ভূখন্ডকে এক রাষ্ট্র করে ফেলা উচিত।

কথাটা গভীরভাবে ভাববার বিষয়। ১৯৩৬ সন পর্যন্ত জিন্নাহ'র রাজনৈতিক চিন্তাধারা ও বিশ্বাসের ভিত্তি দেখলে পরিষ্কার মনে হয় এই সুদীর্ঘকাল পর্যন্ত তিনি ভারতে হিন্দু মুসলমানদের আলাদা জাতি মনে না করে আলাদা সম্প্রদায় মনে করতেন। এই দীর্ঘসময় ধরে তাঁর বিশ্বাস ছিল হিন্দুরা রাজনৈতিক, সামাজিক ও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে মুসলমানদের ন্যায্য অধিকার

www.amarboi.org

স্বীকার করে নিলে ভারতের দুই সম্প্রদায়কে একত্র করে এক জাতি করা সম্ভব হবে। হিন্দুদের স্বার্থপরতা, মুসলমানদের প্রতি সামাজিক ঘৃণা ও তাচ্ছিল্যবোধ উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে বিদ্বেষ ও পার্থক্য ক্রমাগত বৃদ্ধি করে চলেছে। মুসলমানদের ন্যায্য দাবী স্বীকার করে সহানুভূতিপূর্ণ ব্যবহারের দ্বারা তাদেরকে রাষ্ট্রীয়ভাবে সমান মর্যাদা দিলে এই বিভেদ ও পার্থক্যবোধ দূর হয়ে এক জাতি করে ফেলা সম্ভব হবে। বলতে গেলে ১৯৩৭ সাল পর্যন্ত তাঁর মনোভাব এরূপই ছিল। কিন্তু '৩৬ সনের নির্বাচনের পর কংগ্রেস যখন নির্বাচনী ওয়াদা ভঙ্গ করল এবং শেষবারের মত প্রমাণ করল যে, মুসলমানদের ন্যায্য দাবী স্বীকার করে তাদের আস্থা অর্জন করে এক জাতির সৃষ্টি করার মত মানসিক ঔদার্য হিন্দুরা কখনও দেখাবেন, তখন জিন্নাহ স্থির নিশ্চিত হলেন যে হিন্দু কংগ্রেসের কাছ থেকে মুসলমানদের প্রাপ্য দাবী-দাওয়া উসুল করতে হলে তাদেরকে যেভাবে হয় একতাবদ্ধ করতে হবে এবং এটা করার সবচাইতে সহজ পন্থা হচ্ছে তাদেরকে আলাদা জাতির পরিচয়ে ধর্মের নামে ডাক দিয়ে একতাবদ্ধ করা।

কিন্তু পাকিস্তান পেয়ে যাবার পর তাঁর চিন্তার ক্ষেত্রে মনেহয় খানিকটা পরিবর্তন ঘটে। তিনি সম্ভবতঃ ভেবেছিলন, অখন্ড ভারতে কংগ্রেস যেটা করেনি পাকিস্তানে রাষ্ট্রীয় ক্ষেত্রে হিন্দু সংখ্যালঘুদের সর্বপ্রকার ন্যায্য দাবী স্বীকার করে তাদেরকে মুসলমানদের সঙ্গে সকল ক্ষেত্রে সমান মর্যাদা ও অধিকার দিয়ে হিন্দু, মুসলমান, বৌদ্ধ, খৃস্টান সবাইকে নিয়ে এক অখন্ড জাতি গড়ে তুলে তিনি তাঁর আজীবনের বিশ্বাস ও চিন্তাধারাকে রূপদান করতে সক্ষম হবেন এবং এভাবে তাঁর '৩৬ সনের পূর্বেকার স্বপ্ন যে সঠিক ছিল এটা প্রমাণ করতে পারবেন।

রাষ্ট্রীয় ক্ষেত্রে সমান অধিকার ও মর্যাদা পেলে বিভিন্ন জাতি ও ধর্ম গোষ্ঠীর লোকেরা কালক্রমে স্বতন্ত্র স্বত্তা ভুলে গিয়ে এক আলাদা জাতিতে পরিণত হতে পারে ইতিহাসে এর বহু প্রমাণ রয়েছে। কানাডায় ইংরেজ, ফরাসী ও স্পেনীশরা মিলে এক অখন্ড কানাডীয় জাতি সৃষ্টি করেছে যদিও ধর্ম বিশ্বাসের দিক থেকে তাদের মধ্যে রোমান ক্যাথলিক, প্রটেস্ট্যান্ট, এ্যাঙ্গলীকান প্রভৃতি বহু ধর্ম বিশ্বাসের লোক রয়েছে। আমেরিকাতেও বিভিন্ন দেশের বিভিন্ন জাতির ও বিভিন্ন ধর্ম মতের মানুষ নিজেদের স্বতন্ত্র সত্ত্বা ভুলে গিয়ে আমেরিকান জাতি গঠন করেছে। এটা সম্ভব হয়েছে অখন্ড ধর্ম-বর্ণ-জাতি-নির্বিশেষে সকলের

www.amarboi.org

দাবীকে স্বীকার করে নেওয়ার মত নীতি মালাকে সংবিধানের অন্তর্ভূক্ত করার ফলে। অর্থাৎ আইনের চোখে এবং রাষ্ট্রের সব নাগরিক এক সমান এই নীতি বাস্তবে গ্রহণ করার ফলে এক জাতি গঠন সম্ভব হয়েছে।

পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের এ সমস্ত উদাহরণ দেখে জিন্নাহ যতদূর মনে হয়, মনে-প্রাণে বিশ্বাস করেছিলেন যে, উপযুক্ত ব্যবহার ও ঔদার্যের দ্বারা সংখ্যালঘুদের মন জয় করে পাকিস্তানে মুসলমান ও সংখ্যালঘুদের নিয়ে এক জাতি গঠন করতে সক্ষম হবেন। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ তাঁর অকাল মৃত্যু তাঁর এই প্রচেষ্টাকে সফল করার কোন সুযোগ দেয়নি। আর দশ বৎসর সময় পেলে খুব সম্ভবত তিনি তাঁর স্বপ্নকে বাস্তবায়িত করতে সক্ষম হতেন। তাঁর মৃত্যুর পর অপরিণামদর্শী স্বার্থপর লীগ নেতারা হিন্দু-মুসলমান সকলকে একত্র করে এক জাতি গঠন করা তো দূরের কথা—পাকিস্তানের সকল মুসলান যে এক জাতি তা পর্যন্ত প্রমাণ করতে ব্যর্থ হয়েছে। অপরের অধিকার ও স্বার্থের প্রতি সম্মান প্রদর্শন না করে নিজের ব্যক্তিগত স্বার্থকে বড় করে দেখার ফলে পাকিস্তানের রাষ্ট্র ও জাতীয় জীবনে এই বিপর্যয় ঘটেছে।

উপরোক্ত অবস্থায় জিন্নাহ সাহেবের দ্বি-জাতি তত্ত্ব যে ভুল ছিল এবং গণ-পরিষদের বক্তৃতায় তিনি দ্বি-জাতি তত্ত্বকে বিসর্জন দিয়েছিলেন এ সিদ্ধান্তে আসা কোনভাবেই সমীচিন নয়। এখানে উল্লেখ্য জিন্নাহ দ্বিজাতি তত্ত্বের কথা বলার বহুপূর্বে হিন্দু মহাসভা নেতারা দ্বি-জাতি তত্ত্বের কথা বলেছিল যেটা এ বইয়ের ১২৩-১২৬ পৃষ্ঠায় সবিস্তারে বর্ণিত হয়েছে। বর্তমানে ভারতব্যাপী বিজেপি ও হিন্দু মহাসভার নেতৃত্বে যে হিন্দু পুনঃরুত্থান আন্দোলন মাথা চাড়া দিয়ে উঠেছে তাতে জিন্নাহর এককালের দ্বি-জাতি তত্ত্ব সঠিক ছিল বলেই আজকে প্রমানিত হয়েছে।

www.amarboi.org

জনাব আবদুল মোহাইমেন ১৯২১ সনের নভেম্বর মাসে নোয়াখালী জেলায় গুলাখালী গ্রামে নানার বাড়ীতে জন্ম গ্রহণ করেন কিন্তু তাঁর পৈত্রিক নিবাস হলো লক্ষ্মীপুর থানার অন্তর্গত নূরুল্লাপুর গ্রামে। তার পিতা ছিলেন মরহুম আবদুল মতিন বি,এ, বিটি--যিনি নোয়াখালী জেলা স্কুলের হেডমাস্টার হিসাবে ১৯৪৭ সনে অবসর গ্রহণ করেন। জনাব আবদুল মোহাইমেন চট্টগ্রাম মুসলিম হাই-স্কুল থেকে ম্যাট্রিক এবং চট্টগ্রাম গভর্ণমেন্ট কলেজ থেকে আই,এ, পাশ করে কোলকাতা ইসলামিয়া কলেজ থেকে ১৯৪৩ সনে বি,এ, পাশ করেন। কোলকাতা থাকার সময় মাঝে মাঝে তিনি আজাদ পত্রিকায় লিখতেন। তিনি ক্যালকাটা কালচারাল সেন্টারের ভাইস-প্রেসিডেন্ট হিসেবে দেশ বিভাগের পূর্বে অবিভক্ত বাংলায় সাংস্কৃতিক জগতের সঙ্গে গভীরভাবে সংশ্লিষ্ট ছিলেন।

দেশ বিভাগের পর ঢাকায় এসে তিনি পাইওনিয়ার প্রেস নামে একটি ছোট ছাপাখানা প্রতিষ্ঠা করে দেশের মুদ্রণ শিল্পের সঙ্গে যুক্ত হন এবং পরবর্তীকালে এই শিল্পের বিকাশে যথেষ্ট সহায়তা করেন। বাংলাদেশে বর্তমানে মুদ্রণ শিল্পের যে অভাবিত অগ্রগতি হয়েছে তাতে তাঁর বিশেষ অবদান রয়েছে। ১৯৫৪ সন থেকে ১৯৭০ সন পর্যন্ত একাদিক্রমে তিনি পাকিস্তান প্রিন্টিং এসোসিয়েসনের পূর্বাঞ্চল শাখার ভাইস-প্রেসিডেন্ট এবং দুই বৎসর নিখিল পাকিস্তান সমিতির প্রেসিডেন্ট ছিলেন। ১৯৬২ সন থেকে ১৯৬৫ সন পর্যন্ত তিনি ঢাকা চেম্বার অব কমার্সের অনারারি জয়েন্ট সেক্রেটারী ছিলেন।

১৯৪৯ সন থেকে তিনি দেশের প্রগতিশীল রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান--আওয়ামী লীগের সঙ্গে জড়িত ছিলেন। ১৯৭০-এর নির্বাচনে তিনি নোয়াখালীর লক্ষ্মীপুর কেন্দ্র থেকে প্রাদেশিক সভার সভ্য হন এবং স্বাধীনতা যুদ্ধ শুরু হওয়ার পর দেশ ত্যাগ করে মুক্তিযুদ্ধে জড়িয়ে পড়েন। ১৯৭৮ সন থেকে ১৯৮০ সন পর্যন্ত দেশের অর্থনীতি সম্পর্কে তাঁর কতগুলি প্রবন্ধ বিভিন্ন পত্রিকায় প্রকাশিত হয়, যেগুলি সুধী সমাজের বিশেষ দৃষ্টি আকর্ষণ করে। দেশের সাংস্কৃতিক অঙ্গনেও তিনি একজন সুপরিচিত ব্যক্তি। তিনি বুলবুল একাডেমির প্রতিষ্ঠাতা সদস্য। বহু বৎসর যাবৎ ভাইস প্রেসিডেন্ট হিসাবে এই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত আছেন। সমাজ সংস্কারক হিসাবেও তিনি একজন পরিচিত ব্যক্তি।

১৯৮৪ সন থেকে এযাবৎ বাংলাদেশের রাজনীতিতে আওয়ামী লীগ, একটি আত্মার মৃত্যু, সোভিয়েটে দুই সপ্তাহ ও অন্যান্য রচনা ও দুই দশকের স্মৃতি নামে ৪টি বই এঁর প্রকাশিত হয়েছে যেগুলি সুধীসমাজে বিপুলভাবে সমাদৃত হয়েছে। তাঁর বর্তমান গ্রন্থ 'ব্যবধান' একটি ছোট গল্পের বই। এই গল্পগুলি পাণ্ডুলিপি আকারে তাঁর যেসব সাহিত্যিক বন্ধু পড়েছেন তাঁরা এগুলি পাঠক সমাজে বিশেষ প্রশংসিত হবে বলে মনে করেন। গল্পগুলি অনেকটা পরীক্ষা নিরীক্ষার ভিত্তিতে রচিত যার সাফল্য ভবিষ্যতই বলতে পারে।